JNANANKURA

OR

THE SEED OF KNOWLEDGE

A MONTHLY ANGLO-VERNACULAR MAGAZINE AND REVIEW

OF

LITERATURE, PHILOSOPHY, SCIENCE, HISTORY, BIOGRAPHY, ANTIQUITIES AND RESEARCHES, POLITICS, ARTS, COMMERCE, &c., &c.

জ্ঞানাঙ্কুর।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয়
মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সূচী। ১ম বর্ষ

কলিকাতা

নূতন ভারত যন্ত্রে শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

১২৭৯

"এই পত্র (জ্ঞানাঙ্কুর) খানির কলেবর দেখিয়া অনেকের ভক্তির অভাব জন্মিবে। মন্দ কাগজে মন্দ ছাপা দেখিয়া অশ্রদ্ধা হইবে; কিন্তু যে পরিমাণে অশ্রদ্ধা হইবে, ভিতরে পড়িয়া সেই পরিমাণে ভক্তি এবং সুখের উদয় হইবে। যদি অন্যান্য সংখ্যা প্রথম সংখ্যা তুল্য হয়, তবে ইহা যে বাঙ্গালা পত্রের মধ্যে এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট পত্র হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দেখা যাইতেছে যে লেখকেরা কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল এবং লিপিপটু। ভরসা করি পত্র খানি স্থায়ী হইবে। অধ্যক্ষকে আমরা অনুরোধ করি যে পত্র খানি কলিকাতায় ছাপাইবেন। সুন্দরীকে জীর্ণ মলিন বসনাবৃতা দেখিলে যেরূপ কষ্ট হয়, জ্ঞানাঙ্কুর দেখিয়া আমাদের সেইরূপ কষ্ট হইয়াছে"।

বঙ্গদর্শন ৪৩১। ৩২ পৃষ্ঠা।

জ্ঞানাঙ্কুর।

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড। ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

কল্পনা কানন।

এক দিন স্বপ্নাবেশে বিষ্ণুশর্ম্মা সনে
ভ্রমিতে গেলাম আমি "কল্পনা-কাননে।
দেখিলাম নানা তরু নানা ফল ধরে;
নানাজাতি পক্ষী শোভে তাদের উপরে।
কোন স্থানে ক্ষীর-বৃক্ষে ক্ষরিছে অমিয়া;
তার কাছে বিষ-বৃক্ষ আছে দাঁড়াইয়া।
অন্য দিকে ভিন্ন রূপ গাছ দেখা যায়;
কেবল পল্লবে ঢাকা ফল নাহি তায়।
কোন স্থানে বক্তৃতা করিছে ব্যাঘ্রগণ;
বানরে সে কথা লয়ে করে আন্দোলন।
সরস্বতী-কুণ্ড হ'তে বাহিরিয়া বারি,
সরসী আকারে হয় জন-মনোহারী।
বিপুল বিস্তীর্ণ এই অরণ্য গভীর,
হিমাদ্রি হইতে ব্যাপে সাগরের তীর।
পূর্ব্বে দৈত্য অধিকারে ছিল এই বন;
তাদিগে জিনিয়া পরে নিল দেবগণ।
অধুনা অম্বিকা দেবী-অধীন এ স্থল,
এক ঘাটে বাঘেতে গরুতে খায় জল।
শ্বেতকান্তি বজ্রপাণি, ভীষণ দর্শন,
অগণন দেবগণে রক্ষা করে বন।
আর এক দল দেখি শৃগাল প্রহরী,
হরি দেখি থরহরি, ফিরে যষ্টি ধরি।
এক দেশ সিন্ধু-গর্ব্বে পূর্ণ পাতিহাঁসে,
স্বর্গে উড়ে যেতে যারা ভয় নাহি বাসে।
কিছু দিন স্বর্ণ-পাখা পেয়েছিল এরা,
কর্ম্ম-দোষে খসে গিয়ে শেষে হলো সারা।
অধুনা এখানে দেখি মহা কোলাহল;
পথে ঘাটে মহোৎসব, আলোক উজ্জ্বল।
বিখ্যাত উত্তর-নদ ব্রহ্মপুত্র নাম,
বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী, সর্ব্ব গুণ-ধাম;
বাছিয়া যাঁহারে মহাদেবী মহেশ্বরী
পাঠালেন এই বনে রাজেশ্বর করি;
এই দ্বীপে আগমন হয়েছে তাঁহার,
হংসদের আনন্দের সীমা নাহি আর।
নিশার আঁধারে পূর্ণ অপর প্রদেশ,
যেখানে নিবসে কৃষ্ণ বানর অশেষ।
পরস্পর কিড়িমিড়ি ভাষা তারা ভাষে,
বুঝিতে না পারি কিছু, শুনে হাসি আসে।

কহিলেন বিষ্ণুশর্ম্মা সস্মিত বদনে,
"দণ্ডক-কানন এই খ্যাত রামায়ণে।"
বানরে বেষ্কেছে সিন্ধু অতি চমৎকার,
দখিয়া আক্রোশ বড় বায়ু দেবতার;
মাঝে মাঝে ঘোর মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
উৎপাত করেন তিনি প্রলয় কারণ।
কাল বর্ণ বানরের বনের উত্তরে,
ভিন্ন জাতি বলীমুখ বসবাস করে।
শুনিলাম ইতিপূর্ব্বে চতুর্থ বৎসর,
ভক্ষ্যাভাবে তারা মারা গিয়াছে বিস্তর।
বনের পশ্চিম প্রান্তে পঞ্চনদী-তীরে,
থেলে বনমানুষেরা বলিষ্ঠ শরীরে;
স্বাধীনতা রক্ষা হেতু করি প্রাণপণ,
দেবতা সহিত যারা করেছিল রণ।
কিন্তু সুকৌশল-বলে জিনিয়া সমরে,
ওদিগে আপন বশে আনিল অমরে।
উহাদের পূর্ব্বে দেখি গন্ধর্ব্ব নিলয়,
খ্যাত যারা রবি শশি বহ্নির তনয়।
দৈত্যেরা গন্ধর্ব্ব-গর্ব্ব খর্ব্ব করেছিল;
অবশিষ্ট ছিল যাহা দেবেরা হরিল।
আগে মত্ত ছিল যারা রাজোন্নতি-মদে,
এবে হায়! মগ্ন তারা অহিফেণ মদে!
কাননের মধ্যদেশে গাড়রের বাস,
ঘাস খেয়ে যারা পড়ে থাকে বার মাস;
মাথায় মস্তিষ্ক নাই, উদ্যম-রহিত,
খাওয়া শোয়া ভিন্ন অন্য-বাসনা-বর্জ্জিত।
প্রাচী ভাগে নিম্ন ভূমি আর্দ্র পচাজলে,
যেথানে মর্কট প্রায় থাকে নর-দলে;
জ্বরে জ্বরে শীর্ণ দেহ, কেহ নহে বলী,
ভিতরেতে ফাঁক, জাঁক মুখেতে কেবলি।
রণঘণ্টা নামে এক শিব-পারিসদ
রাজত্ব করেন হেথা, মনে ঘোর মদ।
আপনার কাছে বিশ্ব করি তৃণ জ্ঞান,
সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁর, বড় অভিমান।
সহস্র নয়ন তাঁর সহস্র শ্রবণ,
কর্ম্মেতে সহস্র কর করেন ধারণ।
প্রত্যেকে অনেক আছে অঙ্গ সমুদয়,
বিধির বিপাকে মাত্র নাহিক হৃদয়।
সকল বিষয়ে বিজ্ঞ সব কাযে পটু,
জন-প্রিয় হইতেন, না হইলে কটু।
আপনাকে মনে করে রুদ্র অবতার
লাঞ্ছনা করেন যিনি ক্ষুদ্র দেবতার;
যাঁরে তাঁর প্রিয় পাত্র দেখি কাঁপে ডরে,
তিনি কি সদয় হন বানরে বা নরে?
প্রমত্ত প্রভুত্ব-মদে প্রাচীর ঈশ্বর,
সব কর্ম্মে হাত দিতে সতত তৎপর।
মানুষের ভাষা ভাল বুঝিতে না পারি,
সোজা করিবার তাঁর ইচ্ছা হলো ভারি।
ব্যাকরণ অভিধানে প্রকাশি বিরাগ,
চাষাদের ভাষা প্রতি হলো অনুরাগ।
চাকি ডুবু ডুবু হলে, নাকে তেল দিয়ে,
ঝুর লুসে কুপকাত সবা (ই) কর গিয়ে।
ভাষার উপরে জোর সোজা বড় নয়;
শেষে ভেসেগেল তাঁর আজ্ঞা সমুদয়।
নর মধ্যে অনেকেতে দেব-সেবা-বলে,
উপদেব হইয়া উঠিলা ধরাতলে।
দেবতার মত তাঁরা পূজা নিতে চান,
কৃতবিদ্য বলে মনে বড় অভিমান।
মাটিতে পড়ে না পদ পদ-বৃদ্ধি পেয়ে,
দেব-ভোগ উপভোগ এঁটো কাঁটা খেয়ে।
উপদেব-কাণ্ড দেখে হাসে দেবগণ,
কিন্তু রাজা রণঘণ্টা সে প্রকার নন।
অন্তর নীরস তাঁর, মুখে নাই হাসি,
বড় বড় উপদেবে বিরক্তি প্রকাশি,
মায়ায় সৃজিলা ক্ষুদ্র উপদেব কত,
লম্ফে ঝম্পে পটু, কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি-হত।

রাজাজ্ঞায় গলে তারা শিকলি ঝুলায়,
দিবা নিশি খেটে মরে, অল্প করে খায়।
পূর্ব্বেতে ছিলেন হেথা অধিদেব যাঁরা,
রোপিয়া ছিলেন এক কল্পতরু তাঁরা।
ক্রমে ক্রমে সেই তরু হইয়া বর্দ্ধিত
ধরেছিল সুধাফল সর্ব্ব-মনোনীত।
আহা কিন্তু তাহার সে শোভা দরশনে,
ঈর্ষ্যার সঞ্চার হলো রুদ্রদেব-মনে।
মর্ত্ত্যলোকে সুর-বৃক্ষ কখন কি সাজে?
নরেরা অমর হবে?- মরে যাই লাজে।
এই ভাবি রণঘণ্টা, ছাড়িয়া নিশ্বাস,
চাহিলা সমূলে তারে করিতে বিনাশ।
পুনঃ মনে ভাবিলেন মহেশ্বরী মাতা
এ কথা শুনিতে পেলে হবেন কুপিতা;
তাই স্থির করি যাতে দুই দিক রয়,
কাটিতে দিলেন আজ্ঞা উচ্চ-শাখাচয়।
সে তরু রক্ষক ছিল যক্ষ এক জন,
আরম্ভিল তার প্রতি করিতে পীড়ন;
লাজে আর মনস্তাপে সিন্ধুপারে গিয়া,
রহিল সে কিছু দিন মুখ লুকাইয়া,
পাছে তাঁর অত্যাচার লোকে টের পায়,
করিলেন অধীশ্বর তাহার উপায়,
ক্ষুদ্র অকর্ম্মণ্য লতা ছিল যে সকল,
অনুর্ব্বরা মাটিতে রোপিলা, দিয়া হল;
দীনেরে দেখাতে দয়া রাখিতে স্বমান,
পিত্ত-রক্ষা মত শিক্ষা দিলা ভিক্ষা দান।
পূর্ব্বে বলিয়াছি তাঁর দশ শত কর,
প্রত্যেকেতে কর নিতে সদা অগ্রসর;
লইয়া অশেষ কর তবু তৃপ্তি নাই,
প্রজা-প্রাণ-শেষ-কর শেষ-কর চাই।
বড় বড় পশুদের লইতে রুধির,
পূর্ব্বনৃপপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে মন্দির।
(তারা ও তেমনি ধূর্ত্ত সে ক্ষতিপূরণে
ছোট ছোট জীব-রক্ত পিয়ে প্রতিক্ষণে)
কিন্তু সর্ব্বোপরি, এই রণঘণ্টা কর,
শনির অশনি দৃষ্টি হানে নিরন্তর।
দানব, মানব, পশু, কি ছোট কি বড়
একয়ের নাম শুনে সবে জড় সড়।
এক দিন মহারাজ, সহ সহচর,
দেখিতে গেলেন নর পশুর পিঞ্জর।
কর্ম্মদোষে শৃঙ্খলেতে বদ্ধ আছে তারা,
ধারা বহে দুনয়নে, দারাসুতহারা।
ভিষক রক্ষকে কিন্তু দয়া প্রকাশিয়া,
কোন মতে রাখিয়াছে প্রাণে বাঁচাইয়া।
দুষ্ট জনে পুষ্ট দেখি রুষ্ট হয়ে মনে,
কহিলেন অধিপতি গম্ভীর বচনে।
" নষ্ট লোকে কষ্ট দিতে তুষ্ট নয় যেই,
পিঞ্জর রক্ষক পদে যোগ্য নয় সেই;
" দণ্ডধর দেবে দিব পিঞ্জরের ভার,
" যমচক্রে " সবারে ঘুরাবে অনিবার।
মরে যদি মরুক দোষীতে ক্ষতি নাই,
শাসিত হউক সবে এই আমি চাই।
লঘু হউক গুরু হউক অপরাধ হ'লে,
মানুষ পশুর পাপ যায় সুধু ম'লে।

COMPETITION.

Excelsior is the motto of the nineteenth century. Optimists are never tired of descanting on the extraordinary material advances of the "Victorian era" and of comparing the present with the past to the disadvantage of our non-progressive ancestors. It is no doubt a matter

of self-gratulation that we enjoy to-day a thousand conveniences and luxuries unheard of at the commencement of the century, and in one sense we may boast with old Homer that "we indeed are far better than our fathers." There are however two questions on this point, which may occur to the student, who without being a pessimist, is accustomed to look upon a social phenomenon from all its bearings. The first is, "Will the combative type of civilization continue to develop itself for an indefinite period of time"? The second, "Is it to be desired by the sincere well-wisher of his fellow creatures that competition should continue to be a corollary to modern civilization"? Now Europe is the cradle of the present type of civilization and it is from a retrospect of the past history of Europe that the first question proposed may be answered. We find the greater part of Europe enjoying under the Romans a civilization at least as thoroughly developed as that of the present day, yet afterwards overwhelmed by floods of barbarism from which she has not yet entirely emerged. Again, the Nile, and the Ganges which flows by us as we write, can tell a similar tale. Egypt, at one time the foremost nation of the world, now submits to the oppression of a "wretched Turk who robs her degraded peasantry to support his extravagance, while the movements of her ancient civilization are choked with sand. India abounds with the decayed evidences of a high degree of moral and material culture once attained by her peoples. In short, we find that civilization has always been subject to laws of rise and fall; that progress has invariably been succeeded by retrogression. Are we then, in the face of the world's history to consider the institutions of our own day exempt from the fate of all things mortal? As the first question may be answered by the history of the past, so the second can be replied to after a consideration of the present aspect of the civilized world. A short residence in any of the great hot-beds of modern competition would convince a dispassionate observer of the existence of a dark side to nineteenth-century progress. He would see a few examples of boundless wealth, but vastly more of abject destitution. He would notice a feverish anxiety depicted in many a face, for life is rendered daily more difficult by relentless competition in every trade and profession. In exact analogy to the Darwinian "Theory of Selection," the weaker invariably goes to the wall in the fierce struggle for life, nay, success when won, is often too dearly bought at the cost of a constitution broken and a mind disordered by the toils necessary to secure it. The recent suicide of one of the brightest ornaments of the English Bench offers a melancholy instance of this fact. The profound

maxim of Lord Bacon that "nature is governed by obeying her laws" is unheeded by the advocates of unrestricted competition. Looking then at the history and tendencies of our modern civilization, it is impossible to believe that the type will endure, or indeed to apprehend any but unmixed evil from its unrestrained development. The question now arises, " What shall take the place of competition in the economy of our social fabric"? The ancient visionary endeavoured to find in the Fortunate Isles of fable a peaceful retreat from the turmoil and cares of life. The modern religious enthusiast hopes to find in heaven that happiness and peace which is denied him on earth. The educated and thoughtful man, on the other hand, will not regard material success in life as the aim and object of human existence. Having food and raiment he will therewith be content and will build his happiness on self-culture and the exercise of charity in its widest sense, mindful of the limited capacity of mortals for selfish enjoy ment.

We, alas ! Earth's haughty kings,
We, that promise better things,
Losing soon our happy prime,
Pine and fade in little time:
Spring returns but not our bloom ;
All is silent in the tomb.



CHIVALRY.

To students of the history of European civilization, an institution such as Chivalry must possess a peculiar interest. Our readers are doubtless aware that after the decay of the Roman Empire, two great races arose, and have ever since been struggling for the upper hand; the Teutons, ancestors of the Germans and Anglo-Saxons of the present day, and the Latin races comprising French, Italians and Spaniards. It was amongst the former race that the institution of Chivalry arose, nor did it ever attain a great popularity with the Latin peoples. In order to understand the nature of a popular institution, it is necessary to examine, first, the national characteristics of the people amongst whom it prevails, and secondly, adventitious circumstances affecting the growth of the institution. Now the ancient Teutons, were characterized by an invincible love for war, a high-minded devotion to the female sex (1) and that romantic contempt for the commonplaces of life, which distinguishes nations, no less than individuals in their youth. Add to these national peculiarities of temperament, the influence of the Catholic religion which inculcates the adoration of the Virgin Mary; and again the effect of

(1) See Tacitus. De monbus Germanorai Sec. VIII.

the feudal system which placed the warrior-class above the necessity of manual labour, and enabled it to indulge its romantic proclivities; and we are in a position to understand the scope of the institution of Chivalry, which had so powerful an effect on civilization. Chivalry, then, in its most extended sense, was a principle which bound together the warrior-class of Europe to protect the oppressed, to show the utmost respect and devotion to the other sex, and to seek out and destroy those who tyrannized over the helpless women, ecclesiastics and children. The aspirant to the honour of knighthood, the highest rank in Chivalry, entered a knightly family as "page" or ladies' attendant. The next step was to the rank of "esquire" or follower of a knight. An esquire who showed exceptional gallantry was rewarded by the title of knight, which was bestowed by one who had already attained that dignity. The investiture with spurs, the insignia of knightly rank was accompanied by numerous ceremonies; and amongst these, the knightly oath stands conspicuous. With such an institution in full vigour as it was about the beginning of the 12th century, it is easy to understand the emotion caused by the preaching of Peter the Hermit. The intelligence that the Holy Land was in the possession of the Unbeliever, was sufficient to send the entire Chivalry of Europe to wrest it from infidel hands and in the attempt, to whiten the deserts of Palestine with their bones. The most romantic, but surely the noblest of all wars for an Idea! Various causes led to the decay of Chivalry as an institution. At its zenith in A. D. 1,200, it was totally extinct in less than 300 years. The growth of towns, and therefore of commerce substituted a more absorbing motive for human action, that of self-aggrandizement. The revival of learning consequent on the invention of printing detracted largely from the number of the votaries of military glory. Finally, the invention of gun-powder which was not largely utilized till A. D. 1450 gave the deathblow to Chivalry by necessitating an entirely different military system, and equalising knight and peasant on the field of battle. But the spirit of Chivalry, the abnegation of self in the interest of the weaker long survived the downfall of the system of which it was characteristic, nay, there are bright examples of chivalrous conduct in this sordid age when self is worshipped as God, and men are taught to rise by trampling on their weaker fellow creatures. Though however, we may regret, we cannot recall the past: and the great benefit arising from the contemplation of the phenomenon of a bye-gone civilization, is that the study "tends to weaken the tendency of the present day to overvalue ourselves and our age."

We learn with deep regret that Mr. Richard L. Martin, Inspector of Schools, South-West Division died of cholera at Calcutta, on the 17th November after a few hours' illness

Every one who knew him is aware how true a friend of the people Mr. Martin was, and how ably and zealously he worked in the cause of sound education.

His loss will be widely felt.

THE COCOA TREE.

The Brahman says :—

The Cocoa-tree, my son, doth now bear many a name,
Which from the Sanskrit all, from Narikela came.
Half Arabic half Persian to Nargil it was broken,
In Hindustan Nater instead of Naril spoken.
From Narik it became corrupted even more,
In Tagala Niog, and in Malay Nior.
Still softer here and there in the wide Island-Sea,
The name became at last Niu, Ni, Nu, Ni.
In the wide Island-Sea through all the Island host,
Society, Friendly, Thieves ;—and many an other coast,
Divided by the sea, whence did they get the name,
And knowing not each other, call it by the same ?
Together with the fruit ashore it surely came.
This gift the cocoanut, my son, has, you should know,
That sweet its juice remains though through the brine it go,
Nor does the ocean's salt destroy its power to grow.
Not in dry places was the palm to grow inland,
But on the brink of water it was meant to stand,
Whence easily the seed may float from strand to strand.
Created was the palm by God with this intent,

That it from shore to shore across the ocean went,
And to all arid countries carried nourishment.
Man wandered not abroad before the Cocoa-tree,
The course it took itself, that also followed he;
First swam the nut and then the boat swam in the sea.
A shy and savage people they would only dare
To land on distant isles if he saw palm trees there;
The palmtree's trunk itself had thither them to bear.
And further through the rushing waves to far-off shore,
The sturdy cocoa tree the people safely bore;
And then it served them for their dwelling place and store.
Yet now, my son, whene'er men sail across the seas,
They only like to land where palms wave in the breeze;
For where the palm trees wave, you may hope men to find,
And where no palm tree grows there neither dwells mankind.

স্বর্ণলতা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

সরলা সজল নয়নে কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলেন। মনোহারী আর তথায় অপেক্ষা করা বৃথা মনে করিয়া দোকান বাঁধিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সরলা অধিকতর ভীতা হইলেন। এদিকে গোপাল কাছে নাই যে, বাঁশীটী ফিরাইয়া দেন, অথচ মূল্য দানেরও শক্তি নাই। কি করেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে মনোহারী গমনোন্মুখ হইল। দিগম্বরী (সেই বেঁটে স্থূলাকার বিধবাটী) কহিলেন "তোমার পয়সা নে গেলে না?" মনোহারী উত্তর করিল "আমি ও বাঁশীটীর দাম চাইনা, অনেক ব্যাপার করিয়া থাকি, ভাল, একটা নয় অমনি দিলাম।" সরলা এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর দুঃখিত হইলেন।

সুবুদ্ধি মনোহারী মুখ পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বুঝিতে পারিল, বিনা মূল্যে দানের কথা বলা ভাল হয় নাই। এ জন্য পুনরায় কহিল "আমিত প্রায়ই এ পাড়ায় আসি। এবার যে দিন আসিব সেই দিন পয়সা লইয়া যাইব। সরলা এই কথা শুনিয়া যারপর নাই শান্তি লাভ করিলেন। প্রমদা যারপর নাই দুঃখিত হইলেন; আর উপস্থিত বিধবা গিন্নিরা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

একে অন্যের উপর ক্রোধবশতঃ কোন অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা করিলে যদি অন্য কেহ তাহাতে বাধা জন্মায় তাহা হইলে

তৃতীয় ব্যক্তিই সমুদায় রাগের ভাজন হয়, প্রমদা এই জন্য মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও এ মনোহারীর নিকট কোন দ্রব্য ক্রয় করিবেন না। প্রতিবাসীরা মনোহারীর নিকট হইতে অমনি পাওয়া দূরে থাকুক, কখন কোন জিনিস ধারেও পান্‌নি এজন্য তাহারাও তদ্রূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এরূপে তথায় যাহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই ব্যথিতান্তঃকরণে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

লোকে একটা কথার কথা বলে 'সৎকর্ম্ম করিলে দেশের প্রিয় হয়' কিন্তু এ কথাটী সব সময়ে খাটে না। বস্তুতঃ নিয়ম এই যে কোন সৎকর্ম্ম করিলে যাহারা সেই সৎকর্ম্মের ফলভোগী, তাহারাই কর্ত্তাকে প্রশংসা করে, আর সকলেই শত্রু হইয়া উঠে। তাহার প্রমাণ এই মনোহারী। বাঁশীটী দান করা কি ধারে দেওয়া প্রযুক্ত সকলেই তাহার প্রতি মনে মনে বিরক্ত হইলেন। কেবল মাত্র সরলাই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সোণার গাছে মুক্তার ফল।

Ladies' tears are more lovely than their smiles!

সরলা মনঃদুঃখে বাটী আসিলেন এবং নিয়মিত গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া বিরলে বসিয়া বৈকালের ঘটনা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকের বল বুদ্ধি সমুদায়ই স্বামী, কিন্তু সরলার সে বল বুদ্ধি না থাকার মধ্যেই। বিধুভূষণ প্রায়ই পাড়ায় থাকিতেন। দুবেলা আহারের ও শয়নের সময় কেবল বাটীতে পদার্পণ করিতেন; গৃহকার্য্য দেখিতেন না; এবং একপয়সা ও উপার্জ্জনের ক্ষমতা ছিল না। বাদ্য, গীত, এবং তাস ও পাশাতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। কিন্তু তিনি যৎপরোনাস্তি ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। দাদার সহিত বিবাদ করা আর পিতার সহিত বিবাদ করা তিনি এক কথাই মনে করিতেন। লেখা পড়া দ্বারা যাহাদের স্বভাব পরিমার্জ্জিত না হয় তাহারা অত্যন্ত রাগী হইয়া উঠে। বিধুরও এ দোষটী ছিল। তিনি সামান্য কারণে রাগ করিতেন না বটে, কিন্তু এক বার করিলে আর সে রাগ সহজে দূর হইত না।

সরলা ভাবিতে লাগিলেন বৈকালের ঘটনা তাঁহাকে বলা কর্ত্তব্য কি না। বলিলে যে কিছু বিশেষ উপকার হইবে তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আবার মনের দুঃখ না বলিলেও চিত্তের স্বচ্ছন্দতা জন্মে না। এই চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে গোপাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবা মাত্র অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল "মা তুই কাঁদ্‌চিস্ কেন?"

সরলা কহিলেন "কৈ কাঁদ্‌চি?"

"ঐ যে তোর চোক দিয়ে জল পড়্‌ছে?"

সরলা কহিলেন "আমার পেট ব্যাথা কচ্ছে।"

গোপাল উত্তর করিল "আমার পেট কামড়ালে শ্যামা যে ঔষধ দেয় তবে সেই ঔষধ খাস্‌নে কেন? যাই আমি শ্যামাকে ডেকে দি তার ঔষধ খেলে সেরে যাবে এখন"।

সরলা কহিলেন "না না না শ্যামাকে ডাক্‌তে হবে না। আমার পেট ব্যথা কচ্ছে না। আমার চোকে কি পড়েছে তাই চোক দিয়ে জল বেরুচ্ছে"। "তবে আয় তোর চোকে ফুঁ দিয়া দি তাহলে বেরিয়ে যাবেখন"। এই বলিয়া গোপাল নিকটে আসিল। সরলা তাহকে ক্রোড়ে লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

স্নেহের কি চমৎকার গুণ! সরলা কাঁদিতেছেন কেন গোপাল তাহার কিছু মাত্র অবগত ছিল না, কিন্তু মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার চক্ষুদ্বয় আর্দ্র হইয়া আসিল। সরলা গোপালের ছল ছল নেত্র নিরীক্ষণ করিয়া সমুদায় দুঃখ বিস্মৃত হইলেন এবং তনয়কে কোলে লইয়া বাহিরে বেড়াইতে লাগিলেন। গাপাল মাতার স্কন্ধে শিরস্থাপন করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তদ্দর্শনে সরলা তাহাকে কথা কহিবার জন্য চেস্টা করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে হাসাইবার জন্য নিজেও হাঁসিতে লাগিলেন।

সুন্দরী যুবতীর সাশ্রুনয়নে হাসি যে এক বার দেখিয়াছে সে কখন ভুলিতে পারিবে না। পাঠকগণ! সোনার গাছে মুক্তা ফল এর সহিত কি তুলনা হইতে পারে?

রুসীয় সাম্রাজ্যের অবস্থা।

রুসিয়ার শিক্ষার অবস্থা এক প্রকার নিকৃষ্ট বলিতে হইবে। কারণ এতাদৃশ সুবৃহৎ সাম্রাজ্যে, ২৮ টী বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৭৪ জন অধ্যাপক, সমুদায়ে ন্যূনাধিক নয় হাজার স্কুল ও ছাত্র সংখ্যা ৫ লক্ষ। হিসাব করিলে প্রত্যেক ১৪৩ জন মনুষ্যের মধ্যে ১ জন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকেরা কেবল সুপ্রণালী মত শিক্ষা লাভ করে, সাধারণ প্রজাবর্গ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

সামান্য প্রজাবর্গের উপর অনেকাংশে অত্যাচার হইয়া থাকে ও তাহারা প্রচুর করভার বহন করে। রুসিয়াতে এক প্রকার টেক্স আছে তাহা প্রত্যেক পুরুষকে দিতে হয়। কিন্তু যাজক সম্ভ্রান্ত ও কতকগুলি বণিককে দিতে হয় না। ইহা সামান্য অন্যায় নহে, এতদ্ব্যতীত বাণিজ্য দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির উপর কর লওয়া হয়। ব্রাণ্ডি নামক সুরার একচাটিয়া থাকায় রাজকোষে আয় বৃদ্ধি করে। এই অধিকার সময়ে সময়ে নিলামে বিক্রয় হইয়া থাকে। ব্রাণ্ডির অপকৃষ্টতা, পোলাণ্ডীয় পাদ্রিগণের সুরাপান নিবারণ জন্য যত্ন, মদ্যপানে উন্মত্তদিগের দণ্ড দান ইত্যাদি কারণে সুরা সেবন অনেকাংশে অল্প হইতেছে।

রুসীয়দিগের মধ্যে এখনও গর্হিত দাসত্ব প্রথা তিরোহিত হয় নাই। দাস গণের পশুর ন্যায় ক্রয় বিক্রয় ও বিনি-

ময় হইয়া থাকে। সর্ব্বথা তাহারা পশ্বাদি বা জড় বস্তুর ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহারা খনিজ পদার্থ উত্তোলনার্থ আকরে কৃষি কার্য্যার্থ ক্ষেত্রে, ও বাণিজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণার্থে কারখানায় পরিশ্রম করিয়া থাকে।

এক্ষণে রুসীয়দিগের সাধারণ প্রকৃতি কৃষি বাণিজ্যাদির অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

রুসিয়ার অধিবাসীরা দীর্ঘকায়, মধ্যম প্রকার সবল, দৃঢ় শরীর, শ্রমসহিষ্ণু, প্রায়ই গৌরাঙ্গ কিছু লোমশ, সচরাচর শ্মশ্রু রাখিয়া থাকে। নাসিকা চাপা, চক্ষুদ্বয় কিছু ক্ষুদ্র। সমগ্র শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করিলে সুন্দর বলা যায়। কামিনীগণ তাদৃশ সুন্দরী নহে, যৌবনের অল্পকাল পরেই সৌন্দর্য্যহীন হইতে দেখা যায়। সাধারণ স্ত্রীগণ সচরাচর ক্ষেত্রে কৃষি কার্য্য সংক্রান্ত অনেক কর্ম্ম করিয়া থাকে।

রুসীয়েরা সদয়, আতিথেয়, অল্পে সন্তুষ্ট। জনপদবাসী রুসীয়গণ যেমন শান্ত শিষ্ট ও সৎ, নাগরিকগণ তাদৃশ নহে। তাহারা প্রায়ই ধূর্ত্ত, কপট, মিথ্যা কথনে রত এবং শ্রমক্ষম হইলেও পারত পক্ষে কায়িক পরিশ্রম করিতে ভাল বাসেনা। অপরিচ্ছন্নতা তাহাদের নিতান্ত অপ্রিয় নহে।

সাধারণ প্রজাগণ প্রায়ই উদ্ভিদ ভোজন করিয়া থাকে; কিন্তু সম্ভ্রান্তেরা মাংসাদি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পরিচ্ছদ সুন্দর ও প্রয়োজনোপযোগী। আমোদ প্রমোদ রুসীয়দিগের প্রিয় বটে। গানকরিবার সময় এক প্রকার গলা কাঁপাইয়া থাকে তাহা তত সুশ্রাব্য নহে। রুসিয়ার ভাষা কোমলতা, মিষ্টতা, মাধুর্য্য, প্রাচুর্য্য প্রভৃতি গুণে ইয়ুরোপীয় অধিকাংশ ভাষার প্রতিযোগী হইতে পারে।

এই দেশে বাণিজ্যের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইতেছে। ১৮৫৭ খৃঃঅব্দে ইয়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে কিঞ্চিদূন চতুর্দ্দশ কোটী টাকার দ্রব্যাদি আমদানি হয়, ও প্রায় চতুর্ব্বিংশতি কোটী টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। আসিয়ার সহিতও বাণিজ্যে ঐ বৎসর প্রায় ৫ কোটী টাকার সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানি হইয়াছিল।

কৃষি কার্য্যের অবস্থা তত উৎকৃষ্ট নহে। কথঞ্চিৎ ষষ্ঠাংশ মাত্র ভূমিতে কৃষি কার্য্য, হইয়া থাকে, অবশিষ্ট ভূমি অকৃষ্ট হইয়া পতিত আছে।

গ্রীক্ চার্চ্চ খৃষ্টানী এই দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম, কিন্তু পোলাণ্ড প্রভৃতি অনেক স্থানের অধিবাসীগণ রোমান কাথলিক। অন্যান্য ধর্ম্মাক্রান্ত লোক স্থানে স্থানে বাস করিয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদ ও শঙ্করাচার্য্য।

ভারতবর্ষে কোন সময়ে অদ্বৈতবাদ প্রথম প্রচারিত হয়, তাহা নিশ্চয় রূপে স্থির করা সুকঠিন। কেহ কেহ বিবেচনা করেন, বেদব্যাস ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক, কারণ তাঁহার রচিত শারীরিক সূত্রের স্থানে স্থানে উহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

তিনি ভগদ্গীতাতেও ঐ মতবাদের যথেষ্ট পোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচিত পুরাণাদিতে দ্বৈতবাদের যে রূপ সর্ব্বাধিক প্রচার দেখা যায় তাহাতে তিনি স্পষ্টতঃ অদ্বৈতবাদী এমত বোধ হয় না। বিশেষতঃ তৎপ্রণীত গ্রন্থ সমূহের যে যে স্থানে অদ্বয়বাদ সংক্রান্ত কথা আছে, তাহাও এপ্রকার অস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, যে দ্বৈত অদ্বৈত উভয় পক্ষীয় লোকেরাই তাহার স্ব স্ব পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

অপর ব্যাসের পূর্ব্বেও অনেক ঋষি অদ্বৈতবাদ ঘটিত কথা বলিয়াছেন। সুতরাং ইহা ব্যাস প্রচারিত মত নহে; তাঁহার বহুকাল পূর্ব্বে হইতে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্য এই মতবাদ বিশিষ্ট রূপে এবং স্পষ্টতঃ প্রচার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি অদ্বয়বাদ সংক্রান্ত সুপ্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। উক্ত মহাপুরুষ অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি অতি অল্প বয়সেই সমুদায় ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; এবং ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া, আপন মতবাদের প্রাধান্য বিস্তার করেন।

তাদৃশ অল্প বয়সে শাস্ত্রীয় বিচারে পারদর্শিতা দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়াছিলেন; এবং তিনি সাক্ষাৎ শিব ও শিবের পুত্র ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। অধিক কি তাঁহার বিপক্ষ দ্বৈতবাদীরাও কোনকোন পুরাণে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দেখাইয়া তাঁহার মতবাদের মিথ্যাত্ব ও তাঁহার মহত্ত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। এস্থলে তাদৃশ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধ মুচ্যতে।
ময়ৈব কল্পিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥

শিব ভগবতীকে বলিতেছেন, হে দেবি! মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র, ইহা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত, কলিতে ব্রাহ্মণরূপী আমা কর্ত্তৃক কল্পিত। এই রূপ "শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ; স্বয়ং" ইত্যাদি শ্লোক বা শ্লোকাংশ লোক মুখে সর্ব্বদাই শুনা যায়। ফলতঃ শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী শিষ্যগণ বিচার শক্তির এমনই আশ্চর্য্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই, কি শাক্তেয় কি শৈব, কি অন্যান্য দেবোপাসক, সকলের মধ্যেই অদ্বয়বাদের ছায়া প্রবেশ করিরাছে। এক্ষণে ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত শঙ্কর সম্প্রদায়ী বহু সংখ্যক দণ্ডী বা সন্ন্যাসী দৃষ্ট হইয়া থাকে। কলিযুগে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ বলিয়া স্থির ছিল, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বীয় অলৌকিক বুদ্ধিমত্তা ও বিচারনৈপুণ্য দ্বারা পক্ষধর মিশ্র প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় গণকে পরাস্ত করিয়া, সন্ন্যাস ধর্ম্ম কলিতে কর্ত্তব্য, ইহা প্রতিপন্ন করেন। অনেক পণ্ডিত তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার ও সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আমরা সময়ান্তরে এই মহাপুরুষের জীবন বৃত্তান্ত, গ্রন্থ প্রণয়ন ও দিগ্বিজয় বিবরণ বিশেষ করিয়া লিখিব। আপাততঃ অদ্বৈত বাদীদিগের] মত সংক্ষেপে বলিতেছি।

অদ্বৈতবাদীদের মতে পরব্রহ্ম, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং সৎবস্তু অর্থাৎ তিনিই কেবল অস্তি' 'আছেন' পদের বাচ্য। আর কিছুই নাই। তাঁহার স্বজাতীয় অর্থাৎ তাঁহার সহিত এক প্রকারের কোন বস্তু নাই। তাঁহার বিজাতীয় অর্থাৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির কোন বস্তু নাই। তাঁহার পৃথক অংশও নাই। সংক্ষেপতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্যপদার্থের সম্পূর্ণ অভাব। জীবাত্মা পরমাত্মা একই পদার্থ। যেমন গৃহের অভ্যন্তরস্থ শূন্যকে গৃহাকাশ বলে, ঘটের মধ্যস্থ আকাশকে ঘটাকাশ বলে; কিন্তু বহিঃস্থ অসীম আকাশের সহিত কোন প্রভেদ নাই। এবং গৃহের ভিত্তি ও ঘট ভগ্ন হইলে বাহিরের আকাশের সহিত অভেদ হইবে। সেইরূপ জীবাত্মা অবিদ্যা বা অজ্ঞান রূপ আবরণ জন্য ব্রহ্মহইতে ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ সম্পূর্ণ একই বস্তু। প্রধান প্রধান দেবগণও একপ্রকার জীব কারণ তাঁহারাও অবিদ্যাবৃতচৈতন্য। জীবগণ ও অবিদ্যাচ্ছন্ন চৈতন্য। তবে এই মাত্র প্রভেদ যে কাহার অবিদ্যা নির্ম্মল এবং কাহার মলিন। যেমন স্বচ্ছ সরোবরে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব পতিত হইলে তাহা উজ্জ্বল, তেজস্বী, চাকচিক্য শালী হয়; এবং পঙ্কিল সরোবরে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব] অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ ও তেজোহীন হয়, সেইরূপ উপাধি যে অবিদ্যা তাহার মলিনতা ও নির্ম্মলতা হেতু কেহ প্রচুর জ্ঞান শক্তি বিশিষ্ট কেহ অল্পজ্ঞান ও অল্পশক্তি বিশিষ্ট। যদি দেব, মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি জীবগণ সকলই ব্রহ্ম হইল তাহা হইলে ব্রহ্মের পাপ, পুণ্য ও দুঃখ, সুখ প্রভৃতি ভোগ হইতেছে বোধ হয়। ইহাতে অদ্বৈতবাদীরা বলেন, এ সকল অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত মাত্র, বাস্তবিক নহে। যেমন মেঘ দ্বারা আমাদের চক্ষুঃ আবৃত হইলে আমরা বলিয়া থাকি মেঘে সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়াছে; বস্তুতঃ ক্ষুদ্র মেঘ কখন প্রকাণ্ড সূর্য্যকে আবরণ করিতে পারে না, সেই রূপ পরব্রহ্মে পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না; আমরা অজ্ঞান বশতঃ ঐরূপ জ্ঞান করি। এই সংসার প্রকৃত প্রস্তাবে অলীক পদার্থ। যেমন স্বপ্নে নানা সুদৃশ্য আকৃতি দর্শন করি, সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করি এবং ভোগ্য বস্তু ভোগ করি; কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য এবং তাহাদের উপভোগ সমস্তই মিথ্যা তাহা বুঝিতে পারি না; সেই রূপ জাগ্রৎ দশায় যাহা দেখি বা ভোগ করি তাহাও মিথ্যা কেবল অবিদ্যার মোহে কিছুই অনুভব করিতে পারি না যে পর্য্যন্ত এই অবিদ্যার নাশ না হইবে সেই পর্য্যন্ত জীবগণের সংসার বন্ধন সেই পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ জন্য ক্লেশ পাইতে হইবে। যখন 'সোহহ আমিই সেই অদ্বিতীয় স্বরূপ ব্রহ্ম ইহা যথার্থতঃ জ্ঞান হইবে তখন অবিদ্যা নষ্ট হইবে। আমি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহি

এই রূপ অভেদ জ্ঞানই মুক্তি। ইহাতে আমাদের স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এ প্রকার মুক্তিতে অবস্থার কোন পরিবর্ত্ত নাই। বিশেষ আনন্দও নাই। কারণ আমিই পরমেশ্বর ইহা যদি সত্য বলিয়াও মানি তাহা হইলেও আমি যাহা, তাহা জানিতে পারিলে আনন্দ হইবার কারণ কি? তাহাতে অদ্বয়বাদীরা বলেন, এই জীব ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানই পরম পুরুষার্থ, ইহা লাভ করিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়; এবং ইহাতে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আছে। মনে কর দশ জন নির্ব্বোধ যুবক সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইল এবং অপর পারে গিয়া আপনাদিগকে গণিতে আরম্ভ করিল একে একে সকলেই গণিল। কিন্তু প্রত্যেকেই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গণিয়া দেখে যে নয়জনমাত্র আছে, তাহাতে এক জনের নিশ্চয় মৃত্যু হইয়াছে স্থির করিয়া মহা দুঃখিত হইল এবং করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিল ইতিমধ্যে এক জন বিজ্ঞ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমাদের কি হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে এক জন উত্তর করিল আমরা দশ জন নদী পার হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তন্মধ্যে এক জন কুম্ভীরের উদরস্থ বা জলে মগ্ন হইয়াছে। এই বলিয়া গণিয়া দেখাইল যে নয় জন মাত্র আছে। ঐ জ্ঞানী পুরুষ দেখিলেন উহাদিগকে কুম্ভীরে খায় নাই, অথবা জলমগ্ন হয় নাই, অজ্ঞানই উহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। এই মনে করিয়া উত্তর করিলেন চিন্তা নাই, দশম ব্যক্তি আছে। ইহা শুনিয়া আনন্দে গদগদ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল কোথায়? তিনি তখন নয় জন পর্য্যন্ত গণিয়া বলিলেন, এই দেখ তুমিই দশম। ইহাতে যেমন উহাদের আনন্দ হইবার সম্ভাবনা, এবং যদি কোন ব্যক্তি কণ্ঠে মণিহার রাখিয়া সমস্ত গৃহ ব্যাকুলতার সহিত অন্বেষণ করে এবং পরে কেহ দেখাইয়া দেয় ঐ দেখ হার তোমার কণ্ঠে রহিয়াছে তখন যেমন তাহার আনন্দ হইবার সম্ভাবনা সেই রূপ অজ্ঞান বশতঃ আমি কে তাহা না জানিয়া দেব, মনুষ্য, প্রভৃতি জীবগণ বৃথা সাংসারিক সুখ, দুঃখ ভোগ করে। যে প্রকার স্বপ্ন দশায় লোকে আপনাদিগকে ধনী বা দরিদ্র, সুখী বা দুঃখী, পুত্রবান্ বা অপুত্রক বোধ করে; কিন্তু পরে জাগ্রৎ দশায় সেই সকল মিথ্যা বোধ করে, সেই প্রকার যখন জানিতে পারে যে আমাকে সাংসারিক সুখ দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না, আমি নিত্য, বুদ্ধ শুদ্ধস্বভাব পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, তখন অবশ্য তাহার সমুদয় দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া আশ্চর্য্য সুখের উদয় হয়।

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে আমি পরব্রহ্ম ইহা জানিলেই যদি মুক্তি হয়, তবে এ মুক্তিলাভ করা অতি সহজ। কোন সাধন ব্যতীত অক্লেশে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে। কারণ গুরুমুখে বা শাস্ত্রে যে দিন শুনি যে জীবাত্মা পরমাত্মা একই পদার্থ, কিছু মাত্র প্রভেদ নাই, কেবল মায়া দ্বারা ভেদ কল্পিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে মুক্তি লাভ

করিব। ইহাতে অদ্বয়বাদীরা বলেন তাহা কখনও মনে করিওনা। আমাদিগের কথিত মুক্তিলাভ করা সহজ নহে, সাতিশয় দুঃসাধ্য। বহু যত্ন, বহু সাধন, ও উপাসনার আবশ্যক। শুনিলেই বা অধ্যয়ন করিলেই হয় না। যেমন কাহারও দিগ্‌ভ্রম হইলে দক্ষিণকে পশ্চিম উত্তরকে পূর্ব্ব জ্ঞান করে কেহ বলিয়া দিলেও ঐ ভ্রম সংশোধিত হয় না সেই রূপ কেবল শ্রবণ বা অধ্যয়ন দ্বারা অভেদ জ্ঞান যথার্থ রূপে প্রতীত হয় না। বহু প্রকার সাধন উপাসনা করিলে অনেক কষ্টে অজ্ঞান দূর হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়। তখন স্বপ্নাবস্থায় আমি মরিয়াছি মনে করিয়া রোদন পরায়ণ ব্যক্তি নিদ্রাভঙ্গে যেমন সুখী হয়, সেই রূপ আপনি ব্রহ্ম স্বরূপ ইহা জানিয়া তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি পরম সুখী হয়েন। তাহারা যে সাধন প্রণালীর কথা বলিয়াছেন তাহা কঠিনই বটে, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ কিছু বলিতেছি। প্রথমতঃ জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম এই তিনের স্বরূপ গুরুমুখে উপনিষদাদি শ্রবণ করিয়া জগৎ, জীব প্রভৃতি মিথ্যা, কেবল পরব্রহ্ম সত্য ইহা নিঃসংশয় রূপে অবগত হইবে। তৎপর কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া অনুকূল যুক্তি দ্বারা পূর্ব্বে নিরূপিত অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিবে। এই রূপ শ্রবণ ও চিন্তন দ্বারা জগৎ অলীক জীব, ব্রহ্ম এক ইহা সুপ্রতীত হইলে সমাধি আরম্ভ করিবে। ঐ সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক। সবিকল্পক ধ্যানকালে আমি ধ্যান করিতেছি পরব্রহ্ম ধ্যেয় বস্তু এই রূপ জ্ঞান সত্ত্বেও সেই সর্ব্বগত অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মই আমি, এই প্রকার জ্ঞান হইবে। যেমন মৃত্তিকা নির্ম্মিত হস্তি দর্শন কালে হস্তি জ্ঞান সত্ত্বেও উহা প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত্তিকা বোধ হইতে পারে তদ্রূপ ধ্যাতা ধ্যেয় প্রতীতি সত্ত্বে অভেদ জ্ঞান সম্ভব। এই রূপ অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন আমি ধ্যান করিতেছি এরূপ জ্ঞান না থাকিয়া কেবল ধ্যেয় পর ব্রহ্মেতে একান্ত একাগ্র হইয়া নির্ব্বাত প্রদেশের দীপ শিখার ন্যায় চিত্তবৃত্তি সকল স্থিরতর হয় তখন তাহাকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি কহে এই প্রকার যোগ সাধন কালে চিত্ত বৃত্তি সকল আছে এমন ও জ্ঞান থাকে না তবে ধ্যান হইতে উত্থিত হইলে স্মরণ হওয়াতেই তাহা অজ্ঞাত ভাবে ছিল এইরূপ বোধ হয়। ইহা দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হইয়া সংসার বন্ধন ছিন্ন হয়; এবং অদ্বয়ানন্দ উপভোগ করিতে থাকে, এই রূপ সাধককে জীবন্মুক্ত বলা যায়। তখন,

"ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"।

ব্রহ্ম সাক্ষাতকারের ফল স্বরূপ হৃদয়ের ভ্রম নষ্ট হয় সংশয় দূর হয় সদসত কর্ম্ম সকল ধ্বংশ পায়। যেমন ইন্দ্রজাল দর্শক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার সকল মিথ্যা বলিয়া জানে সেই রূপ জীবন মুক্ত এই সংসার ইন্দ্রজাল তুল্য মিথ্যা জানিয়া শরীর রক্ষার উপযোগী সকল কর্ম্ম

করেন তখন অক্লেশে অভিমান হিংসা ও অন্যান্য অশুভাচার বিদূরিত হয়।

অদ্বৈতবাদীরা পরমেশ্বরকে এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। যেমন ঘট নির্ম্মাণ বিষয়ে, মৃত্তিকা উপাদান কারণ, এবং কুম্ভকার নিমিত্ত কারণ, সেই রূপ জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বর উভয় বিধ কারণ। তাঁহারা বলেন সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক মাত্র নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছুই ছিল না এবং এখন ও তিনি মাত্র আছেন। তবে এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বর শক্তিমালা দ্বারা তাহাতেই কল্পিত। ঈশ্বরের সহিত সংশ্লিষ্ট মায়ার প্রথম বিকার আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল ক্রমে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল। যেমন ঐন্দ্রজালিক নানা প্রকার অবান্তর বস্তু দর্শন করায়, ফলতঃ তাহা কিছুই নয়, সেইরূপ মায়াকল্পিত এই সৃষ্টি, বস্তুতঃ অসত্য। সংক্ষেপতঃ তাহাদের মতে পরমেশ্বরই একমাত্র পদার্থ আছেন। আর সকলের সত্ত্বা অলীক।

আমাদের দেশীয় কোন কোন আচার্য্য যেরূপ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন হিউম প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সেইরূপ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতের সহিত ঈশ্বর ও ধর্ম্ম প্রভৃতির বিশেষ কোন সম্পর্ক দেখা যায়না। * তাঁহারা অসাধারণ তর্কশক্তি ও প্রচুর বুদ্ধি চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে এস্থলে একটি তর্কপ্রণালী আভাস প্রদর্শন করা যাইতেছে।

তুমি বল এই পুস্তকখানি আছে এবং ইহা সত্য তাহার প্রমাণ কি?

উত্তর। যেহেতু আমি চক্ষুদ্বারা দেখিতেছি, অতএব ইহা বিদ্যমান আছে ও সত্য।

যদি তোমার চক্ষু না থাকিত তাহা হইলে কি ইহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতে?

উত্তর। তাহা হইলে স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ করিতাম।

মনে কর তোমার পক্ষাঘাত রোগে স্পর্শেন্দ্রিয়ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্পর্শ দ্বারা ইহার সত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতে না। অতএব তোমার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব ইহার নাই বলিতে হইল। তোমার ইন্দ্রিয়গণ আছে বলিয়াই এই পুস্তকও আছে বোধ করিতেছ অন্যথা তাদৃশ বোধ অসম্ভব। তবে ইহার অস্তিত্ব কোথায়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার যুক্তি সকল কেবল বুদ্ধি কৌশল প্রদর্শন উদ্দেশেই প্রচারিত বোধ হয়। কিন্তু আমাদিগের অদ্বয়বাদী আচার্য্যেরা একমাত্র তর্ক শক্তি প্রাখর্য্য দেখাইবার মানসে এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন এমত প্রতীতি হয়না। ইহা তাঁহাদিগের হৃদ্গত বিশ্বাস, এবং মুক্তিলাভের অদ্বিতীয় উপায় জ্ঞান করিয়াই ইহা মনুষ্য সমাজে বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিতে পারা যায় না, তাঁহারা সুকঠিন ধর্ম্ম সাধন স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এই মত সর্ব্ব সাধারণের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ বলিতে

* আমাদের দেশীয় সকলেই এমন কি নাস্তিকেরা পর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্র-মূলক।

হইবেক। "সদেব সৌম্যেদ মগ্রআসীৎ একমেবা দ্বিতীয়ম্ ইত্যাদি বাক্যে অক্ষরার্থ গ্রহণ করিয়া এই প্রকার মত সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রুতি বলিতেছে একমাত্র নিত্য বস্তু ঈশ্বর ছিলেন, তবে জগৎ কোথা হইতে আসিল? যদি বল পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন আর অমনি সৃষ্টি হইল; তাহাও হইতে পারে না কারণ উপাদান কোথায়? বিনা উপাদানে ইচ্ছা মাত্রে সৃষ্টি সম্ভব ইহা বুদ্ধির গোচর নহে। যদি বল সৃষ্টি উপকরণ পরমাণু সকল ছিল, উহা অনশ্বর ও নিত্য তাহা আচার্য্যেরা মানিতে পারেন না কারণ তাহা হইলে "কেবল নিত্যবস্তু পরমেশ্বর মাত্র ছিলেন" এই শ্রুতি মিথ্যা হয়।

সুতরাং কল্পনা করিতে হইল পরমেশ্বরই একাংশে ব্রহ্মাণ্ড রূপে পরিণত হইলেন।

ফলতঃ মনুষ্যের অপরিজ্ঞেয় বিষয় নিশ্চয় রূপে স্থির করিতে হইলে এই রূপ জটিল যুক্তি ও কল্পনা অবলম্বন করিতে হয়।

পরমেশ্বরের স্বরূপ ও কার্য্যপ্রণালী কিরূপ তাহা জানা অসম্ভব, তবে যতটুকু জানা যায় তাহাতেই আস্তিকগণ আনন্দ অনুভব করেন।

সভ্যতার ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য—২ পৃথিবীর মণ্ডল বিভাগ—৩ গ্রীনল্যাণ্ডের বিবরণ—৪ ল্যাপ্লাণ্ডের বিবরণ—৫ আইসলাণ্ড দ্বীপের বিবরণ—৬ হিম মণ্ডল-সম্বন্ধীয় উপসংহার—৭ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ—৮ সুমাত্রাদ্বীপের বিবরণ—৯ বোর্ণিও দ্বীপের বিবরণ—১০ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের বিবরণ—পপুয়া বা নিউগিনির বিবরণ—১২ ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের বিবরণ—১৩ আরব দেশের বিবরণ—১৪ ব্রেজিল দেশের বিবরণ—১৫ উপসংহার।

তৃতীয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য

এ অধ্যায়ে আমরা কোন নুতন বিষয়ের বিবরণ লিখিব না; কেবল যুক্তি ও তর্ক দ্বারা দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা প্রমাণ করা হইয়াছে, পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাজ্য হইতে তাহারই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। অর্থাৎ ইতিহাস দ্বারা সপ্রমাণ করিব যে, আদিম কালে, অতিশয় শীত বা গ্রীষ্ম প্রধান দেশ সভ্য হয় নাই; কেবল সমমণ্ডল বাসি-দিগের মধ্যেই কোন কোন জাতি বিদ্যা, বুদ্ধিও সামাজিক উন্নতিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

পৃথিবীর মণ্ডল বিভাগ

নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ২৩ ½ অক্ষাংশ ও দক্ষিণে ২৩ ½ অক্ষাংশ একুনে ৪৭ অক্ষাংশ অর্থাৎ যেস্থান অতিক্রম করিয়া সূর্য্য

রশ্মি কখন লম্বভাবে পতিত হয় না, সেই স্থান গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত গ্রীষ্ম-মণ্ডল নামে আখ্যাত হইয়াছে। আর উত্তর মেরুর দক্ষিণ ২৩ ½ অক্ষাংশ ও দক্ষিণ মেরুর উত্তর ২৩ ½ অক্ষাংশ স্থান শীতাধিক্য বশতঃ হিম-মণ্ডল নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট ৮৬ অক্ষাংশ, অর্থাৎ উত্তর গ্রীষ্ম-মণ্ডলের উত্তর ও উত্তর হিম-মণ্ডলের দক্ষিণ ৪৩ অক্ষাংশ এবং দক্ষিণ গ্রীষ্ম-মণ্ডলের দক্ষিণ ও দক্ষিণ হিম-মণ্ডলের উত্তর ৪৩ অক্ষাংশ, যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ সমমণ্ডল নামে খ্যাত।

যদিও এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ ভূতত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সম-মণ্ডল নামে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার যে অংশ গ্রীষ্মমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী, তাহা গ্রীষ্ম প্রধান। আর যে স্থল হিম মণ্ডলের সমীপ-স্থিত তথায় শীত অপেক্ষাকৃত প্রবল। প্রকৃত সমমণ্ডল নামে বাচ্য হইতে পারে এরূপ স্থল অতীব বিরল।

৩ গ্রীণ ল্যাণ্ডের বিবরণ

আমরা হিম মণ্ডল বা তন্নিকটস্থ অতিশয় শীতপ্রধান দেশের বিবরণ অল্পই অবগত আছি, সুতরাং তাহা ভালরূপে লিখিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তথাপি বহুতর ইংরাজি ইতিহাস ও পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তে যাহা কিছু অবগত হইয়াছি, তাহাই পাঠক দিগের গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গ্রীণলাণ্ড দ্বীপ উত্তর, মহা সাগরস্থিত। এদেশে শীত এত অধিক যে বৎসরের অধিকাংশ সময় অনেক স্থল হিমাবৃত থাকে। মৃত্তিকা সাতিশয় অনুর্ব্বরা সুতরাং অধিবাসীগণ কখনই মানব মণ্ডলীমধ্যে গণ্য মান্য হইতে পারে নাই।

কথিত আছে, খৃষ্টের দশ শতাব্দীর পরে, উত্তর নরওয়ের অধিপতি উল্ফ, শত্রু কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আইসলণ্ডে পলায়ন করিয়াছিলেন। কালে তাঁহার বংশে এরিক নামক এক জন ব্যক্তির জন্ম হয়। এরিক নরহত্যা অপরাধে স্বদেশ হইতে নিষ্কাসিত হইয়া পঞ্চবিংশতি পোত সহকারে গ্রীনল্যাণ্ডে গমন করেন, এবং তথায় বসতি করেন। ইহাঁর তনয় বানিজ্য-প্রিয়তা-বশতঃ বহুতর দেশে গমনাগমন করিতেন। তিনি নরওয়ে হইতে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন এবং গ্রীনল্যাণ্ডবাসী দিগের মধ্যে সেই ধর্ম্মবাদ প্রচার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এবং তাহারা বিনা আপত্তিতে পূর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই অভিনব ধর্ম্মগ্রহণে অগ্রসর হইল। যাহারা সত্য মিথ্যা ও হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া, কেবল রাজার অনুরোধে সহসা আপনাদিগের ধর্ম্ম সুতরাং চির প্রচলিত সামাজিক আচার ত্যাগ করিতে পারে তাহাদিগকে কিরূপে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত এবং সভ্য বলা যাইতে পারে?

৪ ল্যাপলণ্ডের বিবরণ

ল্যাপলাণ্ড ইউরোপীয় রুসিয়ার অন্তর্গতও হিমমণ্ডলের সীমার মধ্যেস্থিত। এদেশে প্রায় ছয়মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যোদয় হয় না, সুতরাং শীত অত্যন্ত অধিক। মৃত্তিকা সাতিশয় অনুর্ব্বরা। এই দুইকারণ বশতঃ

অধিবাসিগণ অদ্যাবধি পাশুপাল্যাবস্থ। তাহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। আপনাদিগের সুবিধানুসারে কিছুকাল একস্থানে, পটগৃহ নির্ম্মান করিয়া বাসকরে, এবং পরে স্থানান্তর গমন করে।

এক প্রকার মৃগই (reindeer) ইহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি, এবং এইরূপ সহস্র মৃগপতিই সমাজমধ্যে সমৃদ্ধিশালী। যাঁহার তিন শত মৃগ আছে, তিনি মধ্যমাবস্থ। মৃগ পালন ও বর্দ্ধন ব্যতীত ল্যাপলাণ্ডবাসীদিগকে অন্য কোন বিষয়ে আগ্রহ বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। শীত কালে এই পশুই ইহাদিগের বাহন, খাদ্য, ও প্রায় সমগ্র প্রয়োজনোপযোগী। ল্যাপলাণ্ডীয়দিগের সদৃশ অপরিণামদর্শী প্রায় অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ইহারা ভোগ্য বস্তু দর্শনে এত লোলুপ হয় যে ক্রমে অভ্যাসদ্বারা ৫।৬ দিবসের আহার্য্য একেবারে উদরস্থ করিয়া ঐ কাল সম্পূর্ণ অনশনে অতিপাত করিতে সক্ষম হইয়াছে। মৃগয়া ও মৎস্য ধারণ ল্যাপাণ্ডীয় দিগের অন্যতর জীবনোপায়।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইহারা আমোদ প্রমোদ সম্বন্ধে ও একবারে অনভিজ্ঞ। একত্রভোজন ও কথপোকথন ব্যতীত অন্য কোন রূপে আমোদ করিতে জানেনা।* ল্যাপলাণ্ডের এপ্রকার অনুন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, এক মাত্র প্রকৃতির অনুদারতাই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া প্রতীতি হয়।

৫ আইসলাণ্ড দ্বীপের বিবরণ

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন আইসলাণ্ড সমমণ্ডলের সীমার অন্তর্গত হইলেও হিমমণ্ডলের তুল্য শীত প্রধান তথাপিও কেন কিছু কিছু উন্নত হইয়াছে? আদিম কালে নরওয়ে হইতে হেফালফিউডের যুদ্ধে পরাভূত উত্তরাঞ্চল-বাসীস্বাধীনতা-প্রিয়-বীর-পুরুষ দিগের আইসলাণ্ড গমনের পুর্ব্বে, কখন আইসলাণ্ড কিছু মাত্র উন্নত হয় নাই।

আইসলাণ্ডে শীত এত অধিক এবং তথাকার ভুমি এরূপ অনুর্ব্বরা, যে বিশেষ কএকটি পরিশ্রমোত্তেজক কঠোর রাজনিয়ম * প্রচলিত না থাকিলে, কখনই ইহা দিগের বংশাবলী ভাল অবস্থায় থাকিতে পারিত না।

এই সকল রাজনিয়ম প্রচলিত থাকায় আইসলণ্ডের নুতন অধিবাসি-গণ সমধিক পরিশ্রমশীল ছিল, তন্নিবন্ধন অন্যান্য শীতপ্রধান দেশ-বাসিদিগের ন্যায় নিতান্ত হীনাবস্থ না হইয়া কথঞ্চিৎ সুখে সচ্ছন্দে কাল যাপন করিত।

৬ হিম মণ্ডল সম্বন্ধীয় উপসংহার

এতদ্ব্যতীত হিমমণ্ডলবাসী যে জাতির বিবরণই কেন অনুসন্ধান করা যাউক না

---

* কেহ কেহ বলেন ল্যাপণ্ডীয় দিগের মধ্যে প্রচলিত আছে; কিন্তু এবারত আমাদিগের বিশ্বাস যোগ্য নহে

* স্বধান ব্যতীত কেহই (অর্থাৎ তিন বৎসর পর্য্যন্ত যে আপনার ভরণ পোষণ আপনই নির্ব্বাহ করিয়াছে) পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না।

(২) ভিক্ষা দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ

কোথাও এই সত্যের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়না।

বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য ইউরোপীয়গণ হিম মণ্ডলের যে স্থলে গমন করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই এই সত্যের ভূরি পরিমাণে প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তথাকার যে জাতিই কথঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছে তাহারা আদিম নিবাসী নহে, কোন বিশেষ কারণোপলক্ষে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তথায় বসতি করিতেছে।

এই সমস্ত পাঠ করিয়া বোধ হয় যেন, সৃষ্টি কর্ত্তা এ মণ্ডল মনুষ্যের বাস জন্য নির্ম্মাণ করেন নাই। তবে যাহারা স্বদেশে অত্যাচারী রাজার অন্যায় উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইবে, তাহারাই তথায় জীবন রক্ষা হেতু, প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিবে।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশ — একক্ষণে একবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা যাউক। মধ্য আমেরিকা, মধ্য আফ্রিকা, আসিয়ার কোন কোন দেশ, এবং ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরস্থ কতিপয় দ্বীপই আমাদিগের উদাহরণস্থল, পাঠকগণ মনে রাখিবেন আমাদিগের গ্রীষ্ম মণ্ডল অবিকল ভূতত্ত্ববিৎদিগের গ্রীষ্ম মণ্ডল নহে। পরন্তু যে দেশে গ্রীষ্ম অধিক, তাহা কর্কট ও মকর ক্রান্তির অন্তর্গত হউক, বা না হউক, আমরা তাহাকে গ্রীষ্ম মণ্ডল নামে অভিহিত করিব।

৮ সুমাত্রা দ্বীপের বিবরর — এই দ্বীপ ভারত মহাসাগরস্থিত এবং বিষুব রেখার উত্তর ৪ ই অক্ষাংশ হইতে ৬ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুমাত্রাবাসিদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ ও মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী। যখন ঐ দ্বীপ উক্ত ধর্ম্ম দ্বয়ের উৎপত্তি স্থান নহে, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তাহাদের অবস্থা বিদেশীয় লোকের সংস্রবে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সুতরাং তাহারা আমাদিগের প্রমাণ স্থল হইতে পারে না। কেবল সুমাত্রা দ্বীপের কতকগুলি লোক অদ্যাবধি আদিম অবস্থায় দৃষ্ট হয়। ইহারা নিতান্ত অসভ্য ও যারপর নাই হীনাবস্থাপন্ন।

৯ বোর্ণিয়ো দ্বীপের বিবরণ — বোর্ণিয়ো ভারত মহাসাগরস্থিত ও নিরক্ষ বৃত্তের উত্তর ৭ অক্ষাংশ হইতে দক্ষিণ ৪ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বোর্ণিয়োদ্বীপের ডিয়াক, ইটান ও ট্রিটান নামক আদিম জাতিত্রয় অতীব অসভ্য। তাহারা শত্রুদিগের মাংস আহার করে। এই জাতিত্রয়ের মধ্যে একটি অতি আশ্চর্য্য নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। যে, স্বহস্তে অন্ততঃ এক জন শত্রুর শিরশ্ছেদন না করিয়াছে, সে বিবাহ করিতে পারে না এই জন্য শত্রু নিপাতহেতু ইহারা যার পর নাই গর্হিত উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এতদ্ব্যতীত বোর্ণিয়োবাসী-গণ দস্যু কার্য্য ও প্রবঞ্চনা জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

১০ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের বিবরণ — অষ্ট্রেলিয়া ভারত মহাসাগরেস্থিত। এবং নিরক্ষ বৃত্তের দক্ষিণ ৯ ই অক্ষাংশ হইতে ৩৯ ই পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ এত বৃহৎ যে ভূতত্ত্ব বেত্তারা ইহাকে পৃথি-

বীর পঞ্চম মহাদেশ নামে বাচ্য করিয়া থাকেন। ইহার সকল স্থান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম বাসি গণ নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ইহাদিগের বর্ণ অসিত, চক্ষু কোঠরগত, অধিক লোম বিশিষ্ট এবং দেখিতে অত্যন্ত কদর্য্য বোধ হয়। অষ্ট্রেলিয়া বাসীগণ এত অসভ্য যে অদ্যাবধি ভোজ্য বস্তু রন্ধন করিতে শিক্ষা করেনাই। ইহারা পক্ষী শিকার করিলে, তাঁহার লোমাদি বিচ্ছেদ না করিয়াই জলন্ত অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করে। এবং কিঞ্চিৎ কাল পরে উঠাইয়া কিয়দংশ আহার করে। এবং অবশিষ্টাংশ অগ্নি মধ্যে দেয়।

অষ্ট্রেলিয়াবাসিদিগের মধ্যে সামাজিকতা প্রচলিত নাই বলিলে ও অত্যুক্তি হয় না। অষ্ট্রেলিয়াতে প্রত্যেক ৫০ ক্রোস ব্যবধানে এক এক প্রকার স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলিত দেখাযায়। এই সকল ভাষা এত বিভিন্ন, যে কাহারও মধ্যে দন্ত্য (স) প্রচলিত না থাকা ব্যতীত অন্য কোন রূপ একতা লক্ষিত হয় না। ইহারা অদ্যাবধি প্রাকৃতিক অবস্থাতেই অবস্থিত, ভূমি কর্ষণ বা কৃষি কার্য্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নিতান্ত ঋজু স্বভাব এবং উদর পূর্ত্তি ও শারীরিক ইন্দ্রিয় তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যই জানে না। এ দেশে বিস্তর নদী আছে; এবং মৃত্তিকা সাতিশয় উর্ব্বরা এই সকল সুবিধা পরম্পরা সত্ত্বেও যে কি জন্য অধিবাসিগণ সভ্য হয় নাই; এক মাত্র অন্নাচ্ছাদন প্রাপ্তির সহজ উপায় ও গ্রীষ্মাতিশয্য ব্যতীত, ইহার অন্য কোনই কারণ লক্ষিত হয় না।

নিউগিনির বিবরণ

১১ পপুয়া অথবা নিউগিনি ভারত মহাসাগরস্থিত এবং নিরক্ষ বৃত্ত হইতে ১০ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সর্পভয় প্রযুক্ত নিউগিনির অধিবাসিগণ বৃক্ষশাখা অথবা জলমধ্যে মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। এই সকল অসুবিধা পরম্পরায় ইহারা কিছু উন্নত হইয়াছে। ইহারা কথঞ্চিৎ রূপে ভূমি কর্ষণ ও কৃষি কার্য্যাদি করিয়া থাকে।

নিউব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের বিবরণ

এই দ্বীপদ্বয় ভারত মহাসাগরস্থিত এবং দক্ষিণ গ্রীষ্ম মণ্ডলের সীমার অন্তর্গত। এস্থানের অধিবাসিগণ কিয়ৎপরিমানে উন্নত; কিন্তু ইউরোপীয়দিগের সহিত ইহাদিগের আচার ও শরীরগত এত ঐক্য আছে যে, ইহাদিগকে ইউরোপের উপনিবাসী বোধ হয়।

নিউ ক্যালীডোনিয়া দ্বীপের বিবরণ

নিউ ক্যালিডোনিয়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত এবং গ্রীষ্ম মণ্ডলের সীমার অন্তর্গত। অধিবাসিগণ সবল কায় ও অপেক্ষাকৃত সুদৃশ্য। ইহারা কৃষি কার্য্য করে। ভুবনবিখ্যাত নাবিক কুক সাহেব বলেন এস্থানের স্ত্রী লোকেরা অন্যান্য দ্বীপ-বাসিনী অপেক্ষা স্ত্রীস্বভাবা ও লজ্জাশীলা। কিন্তু তথাপি ইহাদিগকে আমারা অর্দ্ধ সভ্য জাতি দিগের মধ্যেও গণ্য করিতে পারিনা; যে হেতু তাহাদিগের মধ্যে নরমাংসাহার ও শরীর ভূষণার্থে নর মুণ্ড ব্যবহার অদ্যাবধি পরিত্যক্ত হয় নাই। মানব সমাজ যখন প্রথম সভ্য

তার দিকে অগ্রসর হয়, তখন পতি-পত্নী মধ্যে প্রেমের যেরূপ আধিক্য দৃষ্ট হয়, ইহাদিগের মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। স্বামীর অভাবে বিধবা স্ত্রীলোকেরা হিন্দু মহিলাদিগের ন্যায়, অনেক কঠোর ব্রত পালন করে।

ফিলিপাইন দ্বীপের বিবরণ — ফিলিপাইন দ্বীপ, প্রশান্ত মহাসাগর-স্থিত এবং গ্রীষ্মমণ্ডলের সীমার অন্তর্গত। অতি প্রাচীন কালে মালয় বাসীগণ এই দ্বীপ জয় করিয়া আপন আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া ছিল সুতরাং এ জাতির ইতিহাস ও অবস্থা অনুসন্ধান করা আমাদিগের উপস্থিত বিষয়ে অনাবশ্যক।

১২ ম্যাডাঘ্যাস্কর দ্বীপের বিবরণ — ম্যাডাঘ্যাস্কর ভারত মহাসাগর স্থিত এবং গ্রীষ্ম মণ্ডলের সীমার অন্তর্গত। এই দ্বীপটি বাহ্যদৃষ্টিতে বড়ই সুদৃশ্য, মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা অধিবাসীগণ অর্দ্ধসভ্যজাতি মধ্যে গণ্য হইতে পারে। ইহাদিগের আদিম অবস্থার বিবরণ আমরা অতি অল্পই অবগত আছি। বর্ত্তমান সময়ে এক দ্বীপে অনেক বিদেশীয় বনিক ও ইউরোপীয় খৃষ্টান ধর্ম্মের যাজক বাস করে, তন্নিবন্ধন অধিবাসীদিগের আচার গত বিস্তর পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইয়াছে। এই কারণবশতঃ এ জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান আমাদিগের প্রয়োজনের উপযোগী নহে।

গিনি দেশের বিবরণ — এই দেশ আফ্রিকা খণ্ডের পূর্ব্বে স্থিত এবং গ্রীষ্ম মণ্ডলের সীমার অন্তর্গত। এ দেশের মৃত্তিকা সাতিশয় উর্ব্বরা সুতরাং বৃক্ষ লতাদি সতেজ হইয়া সর্ব্বদা পথিকদিগের মনোরঞ্জন করে। এ প্রদেশে অনেক জাতীয় লোক বাস করে। রত্ন গর্ভ দেশবাসী হইয়াও ইহারা অদ্যাপি প্রাকৃতিক অবস্থাতেই বাস করিতেছে!

গিনিতে রাজকীয় শাসন প্রণালী প্রচলিত নাই। ১০। ১২ পল্লির লোক একত্র হইয়া এক জনকে প্রধানের পদে প্রতিষ্ঠিত করে। এবং সেই প্রধান ব্যক্তি তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ভঞ্জন ও শান্তি রক্ষা করিয়া থাকেন। দেশের শস্যশালীতা বশতঃ ইহাদিগের কিছুরই অভাব নাই; সুতরাং মাতার "আদুরে ছেলের" ন্যায় চিরজীবন অজ্ঞানতা ও দুঃখে কাল যাপন করে।

১৮ আরব দেশের বিবরণ — এই দেশ আসিয়া মহাখণ্ডস্থিত এবং নিরক্ষ, বৃত্তের উত্তর প্রায় ৮ অক্ষাংশ হইতে প্রায় ৩৪ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যদি কেহ প্রাকৃতিক অবস্থার মাধুর্য্য অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি আরববাসীদিগের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করুণ। এ দেশের মৃত্তিকা কোথায় বা অতিশয় উর্ব্বরা কোথায় বা এত অনুর্ব্বরা যে সে স্থলে জীবন ধারণ করা যায় না। আরব দেশ কখন এপর্য্যন্ত অন্যের অধীনতা স্বীকার করে নাই। জয়—লিপ্সু,—শত্রু এই দেশে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে দ্বারের নিকট প্রহরী স্বরূপ মরুভুমি দর্শন করিয়াই পলায়ন করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী অতীত হইল, আরব দেশে সুপ্রসিদ্ধ মহর্ম্মদীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহর্ম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন এই ব্যক্তি অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন।

ইনি যে কেবল একটী অভিনব ধর্ম্মবাদ সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে। ইনি (মহম্মদ) মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক পৃথিবীর ভাবী উন্নতির প্রকৃত বীজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহম্মদ মেদিনার যুদ্ধে আরবদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহার সংস্থাপিত অভিনব-ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। *

যে জাতি, এক জন ব্যক্তির ষড়জালে ও বাহু বিক্রমে আপনাদিগের বহুকাল প্রচলিত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে পারে তাহারা যে কত দূর উন্নত তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে।

১৪ ব্রেজিল দেশের বিবরণ

ব্রেজিল দক্ষিণ আমেরিকা-স্থিত এবং গ্রীষ্ম মণ্ডলের সীমার অন্তর্গত, এস্থলে মৃত্তিকা যে রূপ উর্ব্বরা ও ফল-ফুল-শোভিত-বৃক্ষ-লতা-পরিপূর্ণা, অন্যত্র কদাপি তাহা লক্ষিত হয় না। অরণ্য-মধ্যে সুমধুর-ফল-যুক্ত-বৃক্ষা-বলী নানা বর্ণে চিত্রিত পক্ষী-সমূহের আবাসস্থল হওয়াতে সর্ব্বদাই পথিক গণের মনোহরণ করিতেছে।

এস্থলে কেবল মনুষ্য ব্যতীত সকলেরই বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হয়।

"Man seems the only creature that dwindles here"

আদিম কালে যে অতিশয় শীত বা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সভ্যতার সঞ্চার হয় নাই, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা এস্থলেই শেষ করিলাম। ক্রমশঃ প্রস্তাববৃদ্ধি হয়, এই জন্য আমরা আর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম না। ফল কথা, পৃথিবীর যে দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি, সর্ব্বত্রই এই মহান্ সত্যের প্রমাণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান দেখিতে পাই।

১৫ উপসংহার—অতি শীত প্রধান দেশে, যেমন প্রকৃতির প্রতিকূলতা সভ্যতা সঞ্চারের অন্তরায়; আবার তেমন অতিশয় গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও প্রকৃতি স্নেহময়ী জননীর ন্যায় একান্ত উদার হওয়াতে তথাকার অধিবাসিগণ প্রয়োজনাভাব বশতঃ শ্রম-বিমুখ হইয়া থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে নিতান্ত অসাড় হইয়া পড়ে, সুতরাং সভ্যশ্রেণী মধ্য গণ্য হইতে পারে না।

* যুদ্ধে পরাজিত আরব জাতি "আল্লা" নাম ও "কাবা" ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় পরিবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

To

The Editor of the *Jnankoora.*

DEAR SIR,

IT has not been the fortune of many editors of newspapers to have addresses from any influential body of men. The case of Mr. Routledge, the editor of the Friend of India, stands most prominently before the public and does credit not to that gentleman only, but to the respectable residents of Rajshye, who have congratulated him on his successful career as an editor, and expressed their sincere regret for his vacating the editorial chair so soon.

Every one who has watched carefully the present state of feelings that

exists between the conqueror and the conquered must have perceived with regret the breach that has been opened by the imprudent and malicious lucubrations of the editors of the journals. Far be it from me to exclude the native editors from this category. They, no less, have been the instruments of giving use to this antagonism of race. Mr. Routledge be it said to his credit, was an honourable exception. He tried his head and heart to heal the wound and exerted his best influence, through his columns to reconcile the natives and Europeans, and to bring about an understanding between them, when all of them were pursuing a different course. Unmindful of consequences he opposed manfully where opposition was necessary, and applauded where applause was calculated to encourage some good act. Unlike other editors, his weapon was politeness, not satire. The bold tone and disinterested motive which he expressed in his columns, anent the Kuka execution, will perpetuate his memory among the lovers of truth. Among the numerous voices that were raised against Government for its acts on this subject, he, perhaps, was the only man who applauded them, and pointed out most emphatically the evil consequences of shrinking from a course, which every just and impartial government should follow under such circumstances, however painful it may be. His liberal views and sentiments had a full play during the discussion which followed the introduction of the Native Marriage bill in the Legislative Council of India.

There was a very large body of influential gentlemen both native and European, who condemned the bill in very strong language on the ground of premature legislation, and did every thing in their power to prevent its becoming a law. An editor of ordinary energy and ability would have shrunk from the responsibility of backing the efforts of the minority, respectable though it was, through whose instrumentality the bill was introduced and afterwards, became the law of the land.

The latter part of his career was marked by religious toleration by allowing a very interesting correspondence to appear in his paper on the tenets of the Brahmos. On whatever point of view we consider him, he deserves our warmest thanks, and the residents of Rajshye have done their duty by not allowing him to depart without expressing the deep sense of their gratitude at his leaving our shores.

I assure him therefore, that he takes with him the highest opinion of not a very unimportant body of the natives of Bengal, who heartily wish him every success in his future life.

One who has signed

The address.

The Bengalis and the Commerce of Ancient India.

Every man who has carefully watched the signs of the time must have observed the resolution that is every day taking place in the natives of India. New thoughts, new aspirations, new sentiments, have now been substituted for those superstitious ideas and feelings which disgraced the nation before this. That Western literature and science have had a large share in bringing about such a salutary effect in the minds of the natives is a fact that requires no proof, and though the advent of the English nation in India has been marked by the introduction of various evils which were before unknown and which more than counterbalances the blessings which they have bestowed on the country, still it must be confessed that some good has been derived from them.

Of all the tribes of India the Bengalis have been called the most imitative creatures in the world. They have imitated the dress of the English, their food, mode of living, in fact all those manners and customs which mark the exterior of a nation. This however is not the most creditable side of the Bengali character. Their weakness in this respect is the more reprehensible when we consider that the best qualities of the English have never been imitated. If instead of their dress, food, &c., they would have tried to copy their moral courage, energy and enterprizing spirit, it would have not only redounded to the credit of the Bengalis, but would have raised them in the same level with the other civilized nations of the world.

As it is, the Bengalis are fit only for such posts as clerks, accountants and other such offices which require no boldness, courage or spirit. But how long can such a state of things go on? How many clerks, accountants can the government require? Of all the graduates and under-graduates that are anually turned from our schools and colleges, how many will be fortunate enough to get appointments? Certainly not all? And the question is, how shall the remainder be provided for? How shall they earn their livelihood. If they fail to secure any berth, what would be their fate? Certainly they cannot starve; but then? The question goes home to every bosom and it is the interest of every right thinking man to solve it for the sake of humanity. Any man, who can do so, will do a service to the natives. For our part we cannot hit upon any means which can extricate them from such a difficulty. There is one way however which we can suggest and that is this—All those who have the means should engage themselves in commerce with foriegn countries.

In the discussion on Female Education and remarriage of widows, we have seen how warmly and zealous-

ly were instances cited from the practice of the ancient Hindus. Why should not the same principle be followed in this no less important question. It has been satisfactorily proved by many eminent historians and antiquarians that the ancient Hindus did not lack the spirit of commercial enterprize and in many countries they had established relationship by either exchanging their commodities or settling themselves as colonists. There are some writers however, who question the truth of the Indians ever engaging themselves in foreign commerce. They assert that the articles from India were indeed carried to many countries, but they were conveyed by land and not by sea.

This assertion has been successfully refuted by the author of the Pereplus of the Erythrean sea, professor Heeren Vincent, and others who have devoted much attention on that important subject. Even the Institutes of Menu the highest authority on questions relating to ancient Indians make mention of the rules to be observed when money is to be lent to men well acquainted with *Sea Voyages.*

This passage clearly proves, that Indians in anicient times carried on extensive commerce with foreign countries.

It is however a matter of question as to whether the Indians were themselves the navigators or employed other nations to guide their ships.

This subject however is foreign to our present discussion. It is our object in this article to prove that the ancestors of the present generation had no less adventurous spirit than any nation on the face of the earth, and that the barriers placed before their eyes, the Sindhu on one side the Brahmaputra on the other were the wild fancies of the politicians of later dates or the wicked imposition of the priests.

It is impossible to trace, at this distance of time, the places which the Hindus frequented. Most probably Arabia, China, Egypt, Nubia, Ethiopia and some other countries, which border upon the Mediterranean and the Black seas, were the fields of their commercial enterprises and the marts where they exchanged their commodities.

A writer even asserted that he has seen a people whose features, religion, manners and customs, exactly coincide with those of the natives of India.

The settlement of the Hindus in other countries has been adduced as a proof of the commercial activity of the people in ancient days and refutation of the assertion that there ever was any objection of a religious nature on their part to their crossing the Sindh or the Brahamaputra.

Professor Hersen of Germany has the following in his learned Essays on the constitution and commerce of the ancient Indians. "The foregoing comparative sketch of these

nations will furnish the readers with an abundant matter of reflexion." * * It is by no means my present intention to confine the circle of our view and terminate the enquiry by asserting the derivation of the Egyptians from the Hindus. That is not at all my own opinion. But as we have already proved the antiquity of the commercial intercourse between the natives of the southern world, there is nothing improbable in such an opinion; on the contrary it is perfectly agreeable to Hindu manners that colonies from India, i e Bania families should have passed over into Africa and carried with them their native industry and perhaps also their religious worship.*

Another country where their commercial propensity led them to settle was Nubia. We cannot forbear quoting here the very appropriate words of the Reverend Michael Russel whose learned history of Nubia and Abysisnia deserves more attention than it hitherto has attracted.

"The most obvious confirmation of the opinion now stated, may be drawn from the striking resemblance which is known to subsist between the usages, the superstitions, the arts, and the mythology, of the ancient inhabitants of Western India and those of the first settler on the Upper Nile. The sanctuaries of Nubia, for example, exhibit the same features, whether as to the style of architecture or the forms of worship which must have been practised in them with the similar temples that have been recently examined in the neighbourhood of Bombay.

In both cases, they consist of vast excavations hewn out in the solid body of a hill or mountain and are decorated with huge figures, which shadow forth the same persons of nature, or same as emblems to denote the same qualities in the subordinate divinities which were imagined to preside over the mateneal universe.

We have elsewhere mentioned, as a proof of the hypothesis, the very remarkable fact, that the Sepoys, who joined the British army in Egypt, imagained that they found their own temples in the ruins Dendera and were greatly incensed at the natives, for neglecting the ancient deities, whose statues are still preserved; so strongly, indeed were they themselves impressed with this

* [The colonization of the eastern coast of India, a fact so well established by Sir Stamford Ruffles is sufficient to prove that they were Brahmans, and not Bania merchants, who effected these settlements. And had any portion of the ancient literature of Egypt been preserved to our time, it is more than probable the author's supposition would be found correct. Fr. Transl.] [See Schlegel's Ind. Bbbl. toen I. p. 400 425. A writer in the Asiatic Journal (vol. IV p. 325) gives a curious list of the names of places in the interior of Africa mentioned in Park's second journey, which are shown to be all Sanscrit and most of them actually current in India at the present day. Transl.

identity, that they proceeded to perform their devotions with all the ceremonies practised in ther native land. There is a resembalance too in the minor instruments of their superstition,—the lotus, the *lingam*, and the serpent which can hardly be regarded as accidental. But it is no doubt, in the immense extent, the gigantic plan, the vast conception, which appear in all their sacred buildings that we most readily discover the influence of the same lofty genius, and the endeavour to accomplish the same mighty object. The excavated temple of Guerfeh Hassan, for example, reminds every traveller of the cave of Elephanta. The resemblance indeed, is singularly striking, as are in fact all the leading principles of Nubian architecture to that of the Hindus- They differ only in those details of the decorative parts, which trifling points of variation in their religious creeds seem to have suggested; but many even of the rites and emblems are precisely the same, especially those of the temples dedicated to Iswara the Indian Bacchus. In either country, the hardest granite mountains have been cut down into the resemblance of splendid buildings, the fronts of which are adorned with sculpture. In both, also large masses of rock have been excavated into hollow chambers whose sides are decorated with columns and statues carved out of the same stone or lifted up into the air in the form of obelisks and pillars".

Had we time we would have treated the subject more minutely than we have done; but from what we have stated our readers will be convinced of the fact that the ancient Indians had possessed more enterprising spirit than their descendants. If precedents be followed and examples be sufficient incentives to noble exertions, we are certain that the natives of India instead of wasting their learning and genius in the pursuit of dependant posts would do well to engage themselves in commerce. This course will not only give them sufficient and independent livelihood but open before them and their country-men a noble field of ambition and usefulness.

প্রত্যক্ষদর্শন ও কমটী

No II.

প্রত্যক্ষ দর্শনের উদ্দেশ্য।

যেরূপ প্রত্যক্ষ গোচর ব্যতীত কিছুই প্রত্যক্ষ দর্শনের বিষয় নহে; সেই রূপ প্রত্যক্ষ ব্যতীত কিছুই তাহার উদ্দেশ্যও নহে। যেরূপ কাল্পনিক বা আনুমানিক বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শনে স্থান পায় না; সেইরূপ তাহার উদ্দেশ্যও কল্পনা বা অনুমান সিদ্ধ বস্তু নহে। প্রত্যক্ষ দর্শনের উদ্দেশ্য, সর্ব্ব প্রকার কল্পনা ও অনুমান সিদ্ধ ব্যতীত একান্ত সত্য সম্বন্ধীয় বিষয়।

৩ কম্‌টীর শক্তি ও পাণ্ডিত্য — দার্শনিকদিগের জটিল অনুমান পরম্পরার ও কবি দিগের অননুভবনীয় অপ্রাকৃতিক কল্পনার মূলোৎপাটন হেতু পণ্ডিতবর আগস্ঠস্ কম্‌টী ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন সত্য বটে পূর্ব্বে পণ্ডিত ও কবিগণ ভ্রান্ত, কিন্তু সেই ভ্রম দূর করিতে গিয়া, কম্‌টী তদপেক্ষা ও গুরুতরভ্রমজালে আবদ্ধ হইয়াছেন। এক জন অদ্যাপি সত্যের নিকট আসিতে পারেননাই; অপর জন সত্যকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। এক জনের বুদ্ধি "মোটা" অপর জনের এত সূক্ষ্ম যে আছে কিনা সন্দেহ। বাস্তবিক উভয়েই ভ্রান্ত। প্রকৃত সত্য, এই দুই য়ের মধ্যবর্ত্তী। আমরা কম্‌টীর অসাধারণবুদ্ধিমত্তা ও অলৌকিক উদ্ভাবনীশক্তি অস্বীকার করিনা বরং সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার পক্ষপাতী-বলিলেও অত্যুক্তি হয়না, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে স্থূলদর্শী ও বাহ্যানুসন্ধায়ী ব্যতীত গূঢ় মর্ম্মজ্ঞ বলিতে কোনক্রমেই সক্ষম হইবনা, বোধ হয় কম্‌টী. বস্তুর দুই দিক অতি অল্পই বিবেচনা করিতেন এবং, প্রখর বুদ্ধিশালী হওয়াতে তন্নিবন্ধন অধীরতাগ্রস্ত ছিলেন।

৩ প্রত্যক্ষ দর্শন উৎপত্তি — উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ আরোহণ করিয়া একবার অধোভাগে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, স্থাবর জঙ্গম, চেতনাচেতন, সমুদায়ই মনুষ্যের প্রয়োজনীয়। ভূমণ্ডলে এমন কিছুই নাই যদ্দ্বারা তাঁহার কোননা কোন অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না। এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়াই বোধ হয় কম্‌টী "মনুষ্যের হিতসাধন" আপনার দর্শনের উদ্দেশ্য স্বরূপ ব্যখ্যা করেন এবং "মানব সমাজ পূজাই" মনুষ্যের ধর্ম্ম বলেন।

৪ কম্‌টীর ভ্রম — কি আশ্চর্য্য! জগতের এরূপ অননুভবনীয় ও অভাবনীয় শৃঙ্খল ও কৌশল দেখিয়া তাঁহার মনে "জ্ঞানময় কর্ত্তার" ভাব উদয় হয় নাই। এই বিষয় আলোচনা করিয়া কম্‌টী, মস্তিষ্কের পীড়া বশতঃ প্রলাপ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধাবাদিরা যে একথা সর্ব্বথা অলীক বলিয়া থাকেন, তাহাই বা কিরূপে বলিতে সাহসী হওয়া যায়।

৫ কোন মানব সাধারণের হিত সাধণ কর্ত্তব্য? — হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রত্যেক সম্প্রদায়স্থ লোকই, কেহবা মোক্ষ লাভ, কেহবা ঈশ্বর প্রাপ্তি, কেহবা স্বর্গ সুখোপভোগবাসনা কেহবা আত্মা ও মনোবৃত্তির উন্নতি, মনুষ্যের উদ্দেশ্য বলেন। তাঁহাদের মতে সমাজের হিতসাধন সেই লক্ষ্য সাধনের উপায়বিশেষ। কিন্তু কম্‌টী উদ্দেশ্য বিরহিত হইয়া, এই অঙ্গ বিশেষকে মনুষ্যের সর্ব্বস্ব স্থির করিয়াছেন। নিষ্কাম হইয়া মনুষ্যের হিতে ব্রতী হও, কম্‌টী এই উপদেশ দেন। তাঁহার বাক্য প্রতিপালন করিলাম, আমার কি লাভ হইল, কৈ কিছুইত দেখিতে পাই না। পরের হিত সাধনে, সময়ে সময়ে, মনে কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ হয়, কিন্তু ইহার কি উপায়ান্তর নাই। বৈরনির্য্যাতন কর, অপার আনন্দানুভব করিবে। নন্দবংশধ্বংসের পর চানক্য কি একটুও সুখ প্রাপ্ত হন নাই? যদি বল সে কেবল, ক্ষণিক, তাঁহার মনে কখনই শান্তি

ছিলনা; স্বীকার করি; কিন্তু লোকের হিত সাধন করিয়াই কে কোথায় চির শান্তি পাইয়াছে?

* লোকের হিত সাধন উদ্দেশ্য হইলে ন্যায়া-ন্যায়, সত্যমিথ্যা থাকেনা। যদি লোকের হিত সাধনই কেবল উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে যে কোন উপায়ে তাহা সংসাধিত হয়, তাহাতে ইতস্ততঃ করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। সময়ে সময়ে, অনৃত বাক্য প্রয়োগ ও ন্যায় বিরুদ্ধ আচরণ অনেকের হিত হয়. তাহাই কি কর্ত্তব্য?। তুমি চিকিৎসক। মৃত্যুশয্যায় শায়ী রোগী, "জীবনের আশা আছে" কিনা তোমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল. তুমি কি উত্তর দিবে? যদি বল "নাই" রোগী নিশ্চিতই নৈরাশ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, আর যদি আপনার বিশ্বাস বহির্ভূত মিথ্যা বল, তবে আশ্বস্তমনারোগী, হয়ত, রক্ষা পাইতে পারে এবং তুমিও সেই মিথ্যা দ্বারা কাহার অপকার করিলে না। এস্থলে মিথ্যা বলিতে দোষ কি? কম্‌টী কিম্বা তাঁহার শিষ্যেরা একথার কি সদুত্তর প্রদান করিবেন। যদি বলেন এরূপ মিথ্যাতে রোগীর কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে কিন্তু মনুষ্য সাধারণের অপকার করা হইল, ইহাতে কেবল জটিল যুক্তি ও অনুমান চলিবে, সিদ্ধান্ত হওয়া বড়ই দুষ্কর। প্রত্যক্ষ দর্শনের লক্ষণে যাহা নিষিদ্ধ, তদ্দ্বারা তাহাই প্রবর্ত্তিত হইল।

• মনুষ্য স্বাভাবিক আপনার সভ্য ব্যতীত কিছু করিতে ইচ্ছা করেনা। আপন প্রকৃতি অনুসারেই মনুষ্য স্বার্থপর। নবযৌবনে মনুষ্য প্রবৃত্তিবলে কোন কোন কার্য্য করে, কিন্তু কিঞ্চিৎ পরিণত বয়স্ক হইলে কেবল স্বার্থসাধনজন্য ব্যস্ত হয়। অধিকাংশ যুবকই উদারচেতা ও প্রশস্তহৃদয়; কিন্তু বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া রঙ্গভূমি সংশার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, কয়জন পূর্ব্ব রূপ নিঃস্বার্থ পরহিতে ব্রতী থাকে? যাহাদের স্বার্থপরতা অনন্ত কালের দিকে ধাবিত হয়, তাঁহারাই কেবল যৌবন সুলভ দেশহিতৈষিতা বিরহিত হন না। পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান কর, ইহলোকে অমরতা বা পরলোকে অমরতা এই দুয়ের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য সাধন হেতু মহতী কীর্ত্তি সকল সংস্থাপিতা দেখিবে। বাস্তবিক বিবেচনা কর দেখিবে স্বার্থই তাহার মূল। কম্‌টীর মত বালক দিগের নিকট শ্রুতিমধুর। 'নিঃস্বার্থ পরোপকার" শুনিলে হৃদয় বিগলিত হয়। কিন্তু স্থির চিত্তে আলোচনা করিলে কেবল কবি কল্পনা সম্ভূত আকাশকুসুম এবং শশশৃঙ্গের প্রতীয়মান হইবে।

৮ স্বার্থনাশই ধর্ম্ম। উপসংহার কালে কম্‌টী বলেন, সকল প্রকার স্বার্থপরতাশূন্য হইয়া সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানই মনুষ্যের চরম অবস্থা। কেবল একমাত্র উপচিকীর্ষাবৃত্তিকে স্বার্থাপেক্ষা বলবতী করাই প্রত্যক্ষ দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঈশ্বর আছেন, কি না আছেন, কেহ কখন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ করে নাই। এবং যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ বা অসিদ্ধি করিতেও সক্ষম হয় নাই। তিনি বলেন "তদেব নিত্যং সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বাদীরা যেরূপ ভ্রান্ত ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' বাদী-

রাও তদ্রূপ। অপ্রত্যক্ষ বা অপ্রামাণ্য ঈশ্বরে কোন প্রয়োজন নাই। সাক্ষাৎ পরম দেবতা স্বরূপ বিদ্যমান মানব সমাজকে পূজা কর, তাহার সেবাতেই সর্ব্ব প্রযত্নে ও কায়মনো বাক্যে আত্ম সমর্পণ কর। ইহাই তোমার কর্ত্তব্য, ইহাই ধর্ম্ম ও ইহাই উপদেশ।

৯ উপাসনার স্বাভাবিকত্ব

যদিও কম্‌টী বিকারী রোগীর ন্যায় এই সকল প্রলাপ উচ্চারণ করিয়াছেন, কিন্তু যাহাই কেন বলুন বা করুন না, মনুষ্যপ্রকৃতির বিরুদ্ধে কখনই বলিতে পারেন নাই। ঈশ্বরতৃষ্ণাও উপাসনার ভাব, মনুষ্যের স্বাভাবিক; কম্‌টী এত দূর পণ্ডিতও কার্য্যাভিমানী হইয়া তাহা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি মনুষ্য পূজার বিধি প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহার পুরোহিত ঘোষণা করিয়া ছিলেন। এই অভিনব ধর্ম্মের মতে তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে শ্রাদ্ধ ও অন্নপ্রাশনাদি অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

কম্‌টী বলেন পরলোক গত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিলে তাহার কোন হিত হউক বা না হউক, শ্রাদ্ধকারীর যথেষ্ট উপকার হয়। তাহার মনে কৃতজ্ঞতার ভাব উপস্থিত ও স্বার্থ নাশ হয়। কম্‌টীর এই সকল বাক্যে বোধ হয় মনুষ্য কোনক্রমেই স্বভাবজয়ী হইতে পারেন না। ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়াও কম্‌টী উপাসনার ভাব ত্যাগ করিতে সক্ষম হইবেন না। তিনি স্বীকার করুন বা না করুন, ইহাতে উপাসনার স্বাভাবিকত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। কেবল তাহা ঈশ্বরের দিকে ধাবিত না হইয়া অন্যদিকে যাইতেছে।

১০ সমাজ পূজোপযোগী হওয়া

কম্‌টী স্বার্থনাশ করিয়া ক্রমে আত্মাকে নর পূজার দিকে অগ্রসর করিবার এই বিধি প্রদান করেন। প্রথমতঃ শৈশব কালে জনক জননীর প্রতি স্নেহ ধাবিত হয়। কালে সেই স্নেহ সোদর সোদরার উপর বর্ত্তে এবং ক্রমশঃ যতই স্নেহের বৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই মনুষ্য নিঃস্বার্থ হয়। যৌবন কালে মনুষ্য যখন "যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদেতৎ হৃদয়ং মম" উচ্চারণ করিয়া নারীর পাণিগ্রহণ করে এবং প্রণয়িণীর সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয়, তখনই স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত হয় এবং অচিরে তাহা উন্মূলিত হইয়া পড়ে। উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াই স্বার্থনাশের সর্ব্বপ্রধান উপায়। কারণ পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগিনীদিগের প্রতি প্রীতি স্বভাবতঃ ধাবিত হয়। তদুপরি আমাদের কোন ক্ষমতা নাই। "নিয়তি কেন বাধ্যতে" কিন্তু পরিণয় ও প্রণয়িণীর প্রতি প্রেম সেরূপ নহে। এটি কেবল স্বেচ্ছাসাধ্য। এতদ্ব্যতীত স্নেহময়ী নারীর সহবাসে মনুষ্য আপন কঠোর ভাব পরিত্যাগ করিয়া স্নেহের কোমল মধুরতা আস্বাদন করিতে পারেন। সকলেই স্নেহে বশীভূত হয় ও কালে কঠোরতা পরিত্যাগ করিয়া স্নেহ করিতে শিক্ষা করে। বন্য পশুকেও স্নেহ করিলে সে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় না। এস্থলে মনুষ্য যে নারীর সহবাসে কোমল প্রকৃতি হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? জগতে রমণী স্নেহের ভাণ্ডার। সংসারযন্ত্রণাদগ্ধ-

হৃদয় মনুষ্য যদি গৃহে স্নেহময়ী দেবীর বিরাজ দেখিতে না পাইত, তবে নিশ্চিতই সে আনন্দধাম সংসারকে মরুভূমি ব্যতীত অন্য কিছুই ভাবিত না। বাস্তবিক মনুষ্য যতই কেন শোক সন্তপ্ত হউকনা মধুর ভাষিণী যৌবনপ্রমত্তা রমণী সন্দর্শন এবং তাহার সহিত কথোপকথন করিলে কিঞ্চিৎ তৃপ্তি পাইবেই পাইবে। লাবণ্যময়ী নবীনা উপস্থিত হইলে, তদীয় সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?। এইরূপ, ভাবের নেতা কেবল "কাম" নহে। রমণীর আকৃতিগত মাধুর্য্য এমনই মনোহর, যে স্বার্থশূন্য হইয়া তাহাকে কেনই বা প্রীতি করিতে ইচ্ছা হয়।

১১ ধর্ম্ম শিক্ষক হইবার জন্য নারীর কেমন হওয়া উচিত।

পাছে নারীগণ পুরুষ দিগের ন্যায় চিন্তাদগ্ধহৃদয়া হইয়া তৎসহবাস অভিলাষীর চিন্তাগ্নিকে আরও প্রজ্বলিত করেন, এই জন্য কম্‌টী তাহাদিগের সাংসারিক গৃহ কার্য্য ব্যতীত অন্য বিষয়ের সংস্রব হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিরহিত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। কম্‌টীর মতে মহারাণী এলিজেবেথ কিম্বা ক্যাথারাইন প্রকৃত স্ত্রীলোকের মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না। এবং ইঁহাদিগের ন্যায় স্ত্রী সহবাসে কিছু মাত্র উপকার নাই, পক্ষান্তরে কেবল অপকার অর্থাৎ কঠোর ভাব বৃদ্ধিরই সম্ভব। আরও কম্‌টীর স্ত্রীলোককে দার্শনিক দিগের ন্যায় কঠোর মনোবৃত্তি চালনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ তাহাতে তাহাদিগের স্ত্রীজনোচিত কমনীয়তা হৃত হয়। কম্‌টীর এই কয়েকটী কথা বড় সারগর্ভ। অধুনাতন ইংরেজ মহিলাগণ সুশিক্ষা প্রভাবে পুরুষ সদৃশ উন্নতমনা হওয়াতে আর পূর্ব্বমত স্নেহময়ী নাই। অল্প দিবস হইল কোন একখানী সংবাদ পত্র এজন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। বাস্তবিক কারণান্তর সত্ত্বেও "অযথা (যত দূর স্ত্রীলোকের উচিত নহে) মনোবৃত্তি চালনা ইহার (স্ত্রীলোকের স্নেহ হ্রাস হওয়ার) একটী প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কাহারও আপন সীমা অতিক্রম করা বিহিত নহে ইহার অন্যথাচরণ করিলে অশুভ ফলোৎপত্তি ব্যতীত কখনই কোনরূপে মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। পুরুষের ন্যায় কঠোর মনোবৃত্তি চালনা দ্বারা স্বাভাবিক কোমলতা নষ্ট করা কখনই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নহে প্রত্যেকেই প্রকৃতিগত স্বীয় অধিকারে সন্তুষ্ট থাকিয়া অভাবমোচনে চেষ্টা করুন এই সত্যের উপদেশ।

১২ বিবাহের উদ্দেশ্য

কম্‌টীর মতে পরিণয় বা রমণীসহবাস অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়চরিতার্থ জন্য নহে, বরং একেবারে লোপ করিতে বলেন।* প্রকৃ

* স্ত্রীপুরুষের মধ্যে জাতীয় সম্বন্ধ লোপ পাইলে, কম্‌টী বলেন, অন্য কোন রূপে সন্তানোৎপত্তি হইবে। কি আশ্চর্য্য? এই কি প্রত্যক্ষ দর্শন? এই কি একান্ত সত্য সম্বন্ধীয় বিষয়? কম্‌টী কিরূপে স্থির করিলেন, কালে জাতীয় সম্বন্ধ লুপ্ত হইবে, এবং তখন অন্য উপায়ে সৃষ্টি রক্ষিত হইবে? এতদপেক্ষাও গুরুতর কল্পনা কি মনে ধারণ করা যায়?

তিকে কোমল করিয়া মনুষ্য পূজোপযোগী হওয়াই ইহার মুখ্যোদ্দেশ্য। কম্‌টী আরও বলেন, কামপ্রবৃত্তি থাকায় এপক্ষে ভালই হইয়াছে; কাম উত্তেজিত হইয়া মনুষ্য পরিণত হইবে, কিন্তু কালে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে আর সে ভাব থাকিবে না। তখন তাহারা ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় নিঃস্বার্থ প্রেমানুবর্ত্তী এক জন অপরের নিকট অন্য কিছুর প্রার্থী হইবে না। (এই একান্ত সত্য)

১৩ স্বার্থমূলোৎপাটন

মনুষ্য পরিণত হইলে কালে সন্তান মুখাবলোকন করেন এবং তখনই স্বার্থ নির্মূল হইয়া অপত্য স্নেহ উপস্থিত হয়। নিতান্ত স্বার্থপরায়ণদিগেরও অঙ্গজ বদন অবলোকন করিলে হৃদয় স্নেহপূর্ণ হইয়া কোমল হয়। কে না অবগত আছেন জনক জননী আপন সুখপ্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া সর্ব্ব প্রযত্নতঃ সন্তানের শুভ কামনায় সর্ব্বদা ব্রতী থাকেন। সুস্থশরীর সুপ্ত শিশুর বদন নিরীক্ষণ করিলে মাতার কি আর আনন্দের সীমা থাকে? সে ভাব দর্শন করিলে কাহার না মনে তৃপ্তি জন্মে! আবার সেই শিশু কিঞ্চিৎ রুগ্ন হইলে পিতা মাতা আহার নিদ্রা প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য পর্য্যন্তও ত্যাগ করেন। বোধ হয় তাঁহাদিগের এই সময়ের ভাব সন্দর্শন করিয়াই লোকে বলে "বিপদ্‌ কালে স্নেহ আরও বৃদ্ধি হয়"। অনেক সময়ে, জলমগ্ন জননীর শব প্রাপ্ত হইলে দেখা যায় যে, তিনি মৃত্যু কালেও শিশুকে ক্রোড় হইতে পরিত্যাগ করে নাই। পাষাণ! এভাব দেখিয়া কি তুমি বিগলিত হওনা? সন্তানের প্রতি স্নেহ ধাবিত হইলে স্বার্থ নষ্ট হইল এবং কালে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত সরসাম্বুচক্রের ন্যায় সেই বৃত্ত আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। এইরূপে সমুদায় মনুষ্যের উপর প্রীতি সমভাবে ধাবিত হয় সেই সময়ে মনুষ্য আপন স্বার্থ সাধন হেতু আর কোন কার্য্য করেন না। তখন তিনি যাহা কিছু করেন সকলেরই উদ্দেশ্য পরহিত। এই লোকের প্রকৃত উন্নতি অবস্থা। মনুষ্য যত কর্ম্ম করিবেন সমুদায়ই যেন এই অবস্থা প্রাপ্তিজন্য হয়।

এ অবস্থাতে প্রীতির উপর বুদ্ধির প্রাধান্য থাকে না। বুদ্ধির আধিক্য থাকিলে মনুষ্য নিঃস্বার্থ পরোপকারী হইতে পারেন না। এস্থলে বৈষ্ণবদিগের সহিত প্রত্যক্ষ দর্শনের বিলক্ষণ ঐক্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা জ্ঞানের উপর ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন। তবে এক জন সেই ভক্তি ঈশ্বরের প্রতি অর্পণ করেন, অপর জন মনুষ্যের প্রতি এই মাত্র বিশেষ।

১৪ কম্‌টীর দর্শনের দোষ

ঈশ্বর পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য না করিলে আমরা প্রত্যক্ষ দর্শনকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিতে পারিতাম। তত্ত্বপরায়ণদিগের সহিত উদ্দেশ্য ও উপাসনাগত ব্যতীত, ইহাদিগের কার্য্যগত কোনই পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এবং কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়স্থ লোকদিগকে এরূপ পরহিতে রত দেখা যায় না।

কম্‌টীর প্রকৃত শিষ্যদিগের মধ্যে

একটী ব্যতীত অন্য দোষ দেখা যায় না তবে আজ্ কাল্ অনেক কপটাচারী তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কলঙ্কিত করিতেছে। কিন্তু আমরা তাঁহার প্রকৃত গুণে কখনই অন্ধ হইব না। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, স্বার্থনাশের সর্ব্ব প্রধান সোপান স্ত্রীগ্রহণ। এবং স্ত্রীগণই মনুষ্যকে নর পূজা শিখাইবার পুরোহিত। পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যেই অগ্রে এ দর্শনের মত প্রচলিত হইবেক, যেহেতু তাহাদিগের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত কোমল এবং হৃদয় সরস। আত্মীয় বন্ধু কুটুম্বের দুর্দশা দেখিলেত হইতেই পারে, বিদেশীয় কোন ব্যক্তিকেও বিপদাপন্ন দেখিলে রমণীর কোমল হৃদয় বিগলিত হয়। অতএব তাহার শীঘ্র স্বার্থশূন্য হইবে বিচিত্র কি? সন্তান পিতা মাতা উভয়েরই শোণিত-মাংসজাত, কিন্তু তৎপ্রতি উভয়ের স্নেহ তুলনা করিলে অনেক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। পিতা কুলপাবন সৎপুত্রকে সমধিক স্নেহ করেন। কিন্তু মাতা সর্ব্বাপেক্ষা অক্ষম সন্তান উপরি সমধিক স্নেহশালিনী। ইহাতে কি ভাব প্রকাশ করে? পিতার স্নেহ যতই কেন অধিক হউকনা সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য নহে। আর মাতা সন্তানকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ প্রীতি করেন। কম্‌টী বলেন এই (স্ত্রীলোক) শিক্ষক নিকট আমাদিগের উপদেশ লইতে হইবেক, এবং তাহাদিগের সহবাসে ও দৃষ্টান্তে আত্মাকে দিন দিন উন্নত করিলে আমরা "প্রকৃত মনুষ্য" হইব।

কম্‌টীর বিশ্বাস যে' সম্ভ্রান্ত লোকদিগের অপেক্ষা সামান্য লোকেরাই প্রত্যক্ষ দর্শনপ্রিয় হইবেক। সাধারণ লোকদিগের সাংসারিক বৈভবাদি তাদৃশ সুখদায়ক নহে, সুতরাং স্বার্থনাশ তাহাদিগের পক্ষে সেরূপ ক্লেশসাধ্য হইবেক না। এটী সম্পূর্ণ ভ্রম।

প্রত্যেকের বিত্ত প্রত্যেকের নিকট সম প্রিয়। ধনী যে নয়নে আপন অট্টালিকা নিরীক্ষণ করেন, একজন দরিদ্রও সেই চক্ষে আপন পর্ণ কুটীর অবলোকন করিয়া থাকে। উভয়ের নিকট, সম সন্তোষ প্রদ, ভোগাভিলাষ পরিতৃপ্ত না হইলে কেহই সংসার-বিরাগ প্রকাশ করিতে পারেনা।

Alas! the world from distance seen
'Appears all blissful and serene'
বহুদূর হতে যেই নিরখে সংসার।
সুখের আলয় বলি প্রতীতি তাহার॥

ধনী লোকের ভোগ্য ভোজ্য বস্তুর অপ্রতুল নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের কোন সুখৈষণাই প্রায় অতৃপ্ত থাকে না। তাঁহারা যে অনায়াসে স্বার্থ পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?। দূরবস্থাপন্ন সামান্য লোক, সাংসারিক সুখে যে কত তৃপ্তি আছে, তাহার কিছুই ইয়ত্তা পায় না। অবিবাহিত যুবকের কামিনী-সংসর্গ সুখের কল্পনার ন্যায় তাহার মনে উচ্চবাস্থা-স্থিত সুখের কতই মাধুর্য্য উদয় হয়। প্রত্যক্ষ ব্যতীত এই দুরাশা নিবারণ-সক্ষম আর কি আছে?। "প্রত্যক্ষ দরিদ্রদিগের পক্ষে বড়ই দুষ্কর সুতরাং তাহারা স্বার্থ শূন্য হইয়া কিরূপে সমাজোপাসক হইবেক?।

তবে যে কম্‌টী বলেন সামান্য লোক অন্যকে "ভ্রাতা" বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এ কথা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। যে হেতু দরিদ্রদিগকে প্রায় অহঙ্কারী বা গর্ব্বিত দেখা যায় না। তাহাদিগের কি আছে যে তাহারা অহঙ্কার প্রকাশ করিবে?। কিন্তু দরিদ্রাবস্থা হইতে যাহারা হঠাৎ উচ্চাবস্থায় অবস্থিত হয়, তাহাদিগের গর্ব্বে বৃক্ষলতাদিও দলিত হয় এবং তাহারা ব্রহ্মাণ্ডকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। দরিদ্রাবস্থায় যাহারা নত থাকে, তাহাদিগকে প্রকৃত নম্র বলা যায় না। বৃক্ষ ফলাবনত হইলে মৃত্তিকামুখ হইবে এবং বনবাসিনী যুবতী সুনীতির বশবর্ত্তিনী থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি?। সুতরাং এই সকল যুক্তিতে সম্পূর্ণ প্রমাণ হইতেছে যে কম্‌টীর এ কথা নিতান্ত বালকের ন্যায়। উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে কম্‌টী বিধবা বা মৃতপত্নীক ব্যক্তিকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে নিষেধ করেন; এবং তিনি সম্পূর্ণ ব্যভিচারের বিরোধী।



সম্পূর্ণ



Registered No. 109.

No more the Journal will be despatched to any one without advanced subscription.

বিজ্ঞাপন।

১। জ্ঞানাঙ্কুরের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাস্থল সহ ২॥০ টাকা প্রতি সংখ্যা।০।

২। এই পত্রে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথম তিন বার পর্য্যন্ত প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা হিসাবে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপন দীর্ঘ স্থায়ী হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

৩। যাঁহারা এই পত্রের গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা রাজসাহী বোয়ালিয়ায় জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিবেন।

৪। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত আর পত্র দেওয়া যাইবে না। গ্রাহক গণ মনে রাখিবেন যে তাঁহারাই পত্রের জীবন।

৫। ষ্টাম্প দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিতে হইলে প্রতি টাকায় ১০ অর্দ্ধ আনা অতিরিক্ত দিতে হইবে।

রাজশাহী বোয়ালিয়া
জ্ঞানাঙ্কুর পত্রালয়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস।
সম্পাদক।




JNÁNÁNKURA

OR

THE SEED OF KNOWLEDGE

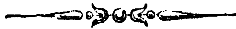
A MONTHLY ANGLO-VERNACULAR MAGAZINE AND REVIEW

OF

LITERATURE, PHILOSOPHY, SCIENCE, HISTORY, BIOGRAPHY, ANTIQUITIES AND RESEARCHES, POLITICS, ARTS, COMMERCE, &c., &c.

জ্ঞানাঙ্কুর।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয়
মাসিক পত্র ও সমালোচনা।



সূচী

কলিকাতা

নূতন ভারত যন্ত্রে শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

১২৭৯




"প্রথম সংখ্যার ন্যায় অন্যান্য সংখ্যা হইলে ইহা বাঙ্গালা ভাষায় এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট পত্র হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। লেখকেরা কৃতবিদ্য চিন্তাশীল ও লিপিপটু।" বঙ্গদর্শন

"যে কএকটী প্রবন্ধ লিখা হইয়াছে, তাহা উত্তম হইয়াছে।" এডুকেশন গেজেট।

"এরূপ পত্র সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের মঙ্গল হইবে।"

সোমপ্রকাশ।

"আমরা পরম প্রীতির সহিত কয়েক খণ্ড 'জ্ঞানাঙ্কুর' পাট করিয়াছি। রাজসাহী আজ কাল অনেক বিষয়ে অনেক জেলাকে পরাভব করিতেছে এবং জ্ঞানাঙ্কুর পত্র রাজ সাহীর আরো মুখোজ্জ্বল করিতেছে। ইহাতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিয়য়ক উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। আমরা ইহার যখন যে বিষয়ের প্রস্তাবটী পাঠ করিয়াছি তখন তাহাতেই লেকেকর ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি আমাদের দেশের লোকেরা যদি সুলেখক গণকে উৎসাহ দিতে চাহেন, আপনারা যদি দুই দণ্ড কাল পাঠ বিষয় লইয়া সুখে কাটাইতে চাহেন, তবে এখানি তাহাতে সুন্দর মত চলে তাহার যত্ন করিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা

"Among the other publications of the new year the Jnanankoora desereves more than a passing attaintion. Along with its contemporary the Banga dursun, this periodical marks an important period in this historyof Bengalee literature asshowing that the taste for solid reading has entered largely into the constitution of our countrymen. Hitherto our periodicals were merely the channel for conveying information to the people, with much that was good and irretrievably lead in them. We have how before us a Journal which contains really readable articles in english and in Bengalee—the result entirely of extensive thought and reflection. The present number contains aming other things a discerning criticism of comte's positive philosophy, a chapter on the history of civilization, the pantheism of Sankaracharja and a tale entitled the Sannalata. * * * * "

INDIAN MIRROR

3 JANUARY 73

জ্ঞানাঙ্কুর।

মাসিক পত্র।

১ম খণ্ড। মাঘ ১২৭৯ ৫ম সংখ্যা।

সভ্যতার ইতিহাস।

চতুর্থ অধ্যায়

অধ্যায়ের উদ্দেশ্য—২ মনুষ্যের জন্ম ও অভ্যাস—সুতরাং অবস্থাগত পরস্পর বৈষম্য—৩ জ্ঞানি-লোক সংখ্যার তারতম্যোপরি উন্নতি নির্ভর করে—৪ দুই প্রকার পরিশ্রমের ফল—৫ প্রকৃতি ও রুচিভেদের কারণ—৬ জন্মানুসারে ক্ষমতা ও রুচিভেদ—৭ সংসর্গগত বৈষম্য—৮ চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী পদার্থ ভেদে লোকের প্রকৃতিভেদ—৯ প্রয়োজন উন্নতির মূল—১০ শ্রম বিভাগের উপকার—১১ শ্রম বিভাগ দরিদ্রের পক্ষে অপকারী নহে—১২ উন্নতাবস্থ-লোক দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়—১৩ শ্রম বিভাগ দরিদ্র দিগের দুরবস্থার হেতু নহে—১৪ শ্রম বিভাগে কেহ দরিদ্র হয় না—১৫ দেশ ভেদে ভোজ্য বৈষম্য—১৬ বিভক্ত শ্রেণী।

অধ্যায়ের উদ্দেশ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এক জাতি অপেক্ষা অন্য জাতি কি কারণ বশতঃ উন্নত হইয়াছে তাহা স্থূল স্থূল বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে একজন মনুষ্যের অপর অপেক্ষা উন্নত হইবার কারণ কি? যখন আদিমাবস্থায় সমুদয় মনুষ্যেরই অবস্থা একরূপ ছিল, যখন সকল মনুষ্যই সম ভাবেই পৃথিবীতে আসিয়াছিল তখন কি নিমিত্ত প্রাচীন কাল হইতে মানবগণ-মধ্যে সকলে সমাবস্থ নহে? কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ প্রধান, কেহ নিকৃষ্ট, এইরূপ সম্প্রদায়-ভেদ কেন অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে?

২ মনুষ্যের জন্ম ও অভ্যাস, সুতরাং অবস্থাগত পরস্পর বৈষম্য।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই সকলের বুদ্ধিবৃত্তি একরূপ নহে। কেহ এক বিষয় ভাল বুঝিয়া থাকেন, কেহ বা বিষয়ান্তরে বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করেন। কবি ও দার্শনিক, যোদ্ধা ও ধর্ম্ম-প্রচারক প্রভৃতি সকলেই মনুষ্য বটে, কিন্তু ইহাদের

অন্তরের ভাব ও শারীরিক প্রকৃতি পর্য্যালোচনা কর, জন্মসময়েই কত প্রভেদ দেখিতে পাইবে। আবার আহার, পীড়া প্রভৃতি দোষ বশতঃ শারীরিক শক্তির কত বিভিন্ন ভাব হয়। কেহ বা জন্মাদে যে চিররুগ্ন ও দুর্ব্বলকায় ; কাহারও বা পুষ্টিকর আহারের অভাবে অথবা অজ্ঞতা নিবন্ধন শরীর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই ; কেহ বা হঠাৎ রুগ্ন হইয়া চিরকাল অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। এই সকল কারণে সকল মনুষ্য কখনই সমান শ্রম করিতে পারে নাই, সুতরাং সমান লাভবান্ও হয় নাই। যাহার শারীরিক সামর্থ্য অধিক, বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ, তাহার উপার্জ্জনও অধিক হইবে এ কথাতে সন্দেহ কি ? আবার, উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি যদি অপেক্ষাকৃত মিতব্যয়ী হন, তবে যে অন্যাপেক্ষা অধিক ধন সঞ্চয় করিতে পারিবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি ?

পক্ষান্তরে পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখ, সকলের একরূপ রুচি নহে। কেহ কেহ ধন উপার্জ্জনে আসক্ত ; কেহ বা সামান্য আহার বিহারেই সন্তুষ্ট থাকিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে সমুদয় জীবন ক্ষেপণ করেন ; কেহ বা সামান্য ইন্দ্রিয়সুখ অথবা আলস্যে কালক্ষেপ করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং রুচি ভেদ, সামর্থ্য ভেদ, অর্জ্জনস্পৃহার প্রাবল্য, আলস্যপরতন্ত্রতা, মিতব্যয়িতা, প্রভৃতি নানা কারণে কেহ ধনী কেহ নির্ধন, কেহ প্রভু, কেহ ভৃত্য, ইত্যাদি অবস্থা-ভেদ হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রাচীনকালীয় লোকেরা যে সকল জাতিকে যুদ্ধে পরাভব করেন তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া দাসত্বে নিয়োগ করিতেন। ইহাও অবস্থা-ভেদের অন্যতর কারণ। *

ও জ্ঞানি-লোক-সংখ্যার [illegible]র-হ্রাসো-পরি উন্নতি নির্ভর করে।

জ্ঞানোপার্জ্জন, ধন-সঞ্চয়, প্রভৃতি কার্য্য গুলি সমধিক পরিশ্রম ও আয়াস-সাধ্য সুতরাং অল্প লোকেই এই সকল উৎকট শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক জ্ঞানবান্ বা ধনবান্ হইয়াছিলেন, অতএব প্রাচীন কাল হইতেই জ্ঞানী অথবা ধনীর সংখ্যা অপেক্ষা সামান্য লোকের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে অধিকাংশ লোক কৃষি-কার্য্যাদি শারীরিক শ্রম করিত না, মানসিক চিন্তাই যাহাদিগের প্রধান অবলম্বন ছিল, সেই সকল জাতিই সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিল। গ্রীস্, মিসর ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এই সকল দেশের মৃত্তিকা এরূপ উর্ব্বরা যে, অল্প লোকের শ্রমেই বহু লোক প্রতিপালিত হইতে পারে এবং উহাই তত্তদ্দেশের সভ্যতার অন্যতর কারণ। জাতি সাধারণ সকলেই যদি কৃষি প্রভৃতি শারীরিক শ্রমে ব্যাসক্ত থাকিত, তাহা হইলে মানসিক চিন্তার ফল স্বরূপ যে সকল উন্নতি লক্ষিত হইতেছে, তাহা কদাপি লক্ষিত হইত না। ফলতঃ ধনসঞ্চয়ই আদিম সভ্য-

* কিঞ্চিৎ উন্নত না হইলে এরূপ ঘটে নাই।

তার প্রধান হেতু। ধনবৃদ্ধি * না হইলে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে পারে না, এবং তৎকালে ভূমির উর্বরতা শক্তিই ধন সঞ্চয়ের এক মাত্র উপায় ছিল : এই জন্য যে কারণে জাতি সাধারণ অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়াছে, সেই কারণেই একজন অপেক্ষা অন্যজন উন্নত হইয়াছে।

৪ দুই প্রকার পরিশ্রমের

পরিশ্রম দুই ভাগে বিভক্ত, সাক্ষাৎ ও পারম্পারিক। যে যে কার্য্যে যে পরিশ্রম জনিত ফলোৎপন্ন হয় তাহারই নাম সাক্ষাৎ পরিশ্রম। ধান্যোৎপত্তি সম্বন্ধে কৃষকের পরিশ্রমের ফলকে সাক্ষাৎ পরিশ্রমের ফল বলা যায়। অপর একের পরিশ্রমে অন্য ব্যবসায়ীর যে সাহায্য হয়, তাহাকে পারম্পারিক পরিশ্রম বলা যায়। যেমন কর্ম্মকার লাঙ্গল প্রস্তুত করিয়া কৃষকের সাহায্য করে। এস্থলে কৃষি সম্বন্ধে কর্ম্মকারের পরিশ্রমকে পারম্পারিক পরিশ্রম বলা যায়। এইরূপে দার্শনিক প্রভৃতির পরিশ্রমকেও কৃষি প্রভৃতির সম্বন্ধে পারম্পারিক পরিশ্রম বলা যায়। কারণ, দর্শন, রসায়ন প্রভৃতি পদার্থবিদ্যা দেশ মধ্যে চলিত হইলে, তদ্দ্বারা মনুষ্যের বুদ্ধি বৃত্তি প্রখর ও পদার্থ প্রভৃতির প্রকৃতি জ্ঞান হয় ; তন্নিবন্ধন কৃষক প্রভৃতির ব্যবসায়েরও উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া থাকে। যদি দেশ মধ্যে সমুদায় লোক একমাত্র কৃষি ব্যবসায়ে ব্যাসক্ত থাকিত তাহা হইলে যে কেবল অন্যান্য শাস্ত্রের কিছুমাত্র চর্চ্চা থাকিত না এরূপ নহে ; কৃষিকার্য্যের ও উন্নতির অনেক ব্যাঘাত হইত। মনে কর, এক্ষণে যেমন সমাজ মধ্যে শ্রম বিভাগ, অর্থাৎ কেহ কৃষক, কেহ শিল্পী, ও কেহ দার্শনিক আছে, তখন তাহা থাকিত না, সুতরাং প্রখর বুদ্ধি চালনার ফলস্বরূপ তত্ত্ব সকল অনাবিষ্কৃত থাকিত।* এবং যন্ত্রাদি সাহায্যে এই কালে যেমন শত ব্যক্তির কর্ম্ম ৫ জন দ্বারা সম্পান্ন হইয়া থাকে তাহাও হইত না। বাস্তবিক যখন কোন ব্যক্তির বুদ্ধি প্রভাবে একটী অভিনব যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া, কি কৃষক, কি শিল্পী, কি অন্য ব্যবসায়ী, সকলেরই প্রচুর পরিমাণে সাহার্য্যকারী হয় এবং যন্ত্র সাহায্যে শত ব্যক্তির পরিশ্রমে-সাধ্য কর্ম্ম পাঁচজনের শ্রমসাধ্য হইয়া থাকে, তখন একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে কৃষক প্রভৃতি সাক্ষাৎ পরিশ্রমে সমাজ যতদূর উপকৃত হইয়া থাকে, উক্তরূপ বিজ্ঞানবিৎপণ্ডিত দিগের নিকট তদপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক উপকৃত হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য নহে যে, কৃষক ব্যতীত একমাত্র দার্শনিক দ্বারাই সমাজ চলিতে পারে। ফলতঃ যেমন মানব শরীরের প্রত্যেক অঙ্গই বিশেষ প্রয়োজনীয়, সমাজ সম্বন্ধেও তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যবসায়ই সমাজের

* বার্ত্তাশাস্ত্র লেখকদিগের "ধন" আমাদিগের ধন নহে। শ্রমলব্ধ জীবনোপায় ধন নামে অভিহিত হলই।

* আধুনিক সভ্য জাতিরা, যে জাতি মধ্যে শারীরিক শ্রম জীবীর সংখ্যা অল্প অথবা যাহাদিগের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক মানসিক শ্রম করিয়া থাকে, সেই জাতিকেই অপেক্ষাকৃত অধিক সভ্য বলিয়া থাকেন।

বিশেষ অঙ্গ স্বরূপ। তাহার একটির অভাবেই সমাজ বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে।

৫ প্রকৃতি ও রুচি-ভেদের কারণ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মানব জাতির শরীরগত বিভিন্নতার ন্যায় তাঁহাদের মানসিক শক্তিরও বিশেষ বিভিন্নতা আছে। কবি, দর্শনিক, জ্যোতির্ব্বিৎ প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগের মানসিক ভাব আলোচনা কর, কত বিভিন্ন দেখিতে পাইবে। মানসিক ভাব ভিন্ন হওয়াতেই মানবজাতি ভিন্নরুচি হইয়াছে। ফলতঃ যেমন হস্ত পদাদির সংখ্যাগত ও আকৃতিগত একতা সত্ত্বেও, আমারা দেখিবা মাত্র দুই ব্যক্তির আকৃতির পার্থক্য অনায়াসে অনুভব করিতে পারি, তদ্রূপ সাধারণতঃ মানব জাতি সম প্রাকৃতিক হইলেও, পূর্ব্বোলিখিত ঠিক সমপ্রকৃতি দুইজন মধ্যে পাওয়া যায় না। দুই ব্যক্তির কার্য্য কলাপ দৃষ্টি করিলে অথবা তাহাদের সহিত উত্তম রূপ আলাপ পরিচয় হইলে উভয়ের মনোবৃত্তি কত বিভিন্ন তাহা অনায়াসেই অনুভূত হইয়া থাকে।

জন্মানুসারে ক্ষমতা ও রুচি ভেদ।

পিতা মাতার মানসিক ভাব ও শারীরিক প্রকৃতি অনুসারে অনেকাংশে সন্তানের শরীর ও মনের ভাব হইয়া থাকে।* এতদ্ব্যতীত জন্মান্ধতা, পঙ্গুতা, প্রভৃতি অঙ্গ বৈকল্যও রুচি ভেদের কারণ। যাহার হস্ত নাই, হস্তসাধ্য ব্যবসায়ে তাহাকে নিযুক্ত না করিয়া বিষয়ান্তরশিক্ষা দেওয়াই যেমন যুক্তি সিদ্ধ, বোধ হয় তদ্বিষয়েই তাহার রুচি ও হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ গুণবতী বিবি মিস্ কলেট যদি শিল্প শিক্ষা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না; এবং জন সমাজ এই ক্ষণে তাঁহার নিকটে যে উপকার প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা হইতেও সুতরাং বঞ্চিত হইত। প্রসিদ্ধ কবি সেকস্‌পিয়ার যদি কাব্য লিখন পরিত্যাগ করিয়া দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা, অথবা নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি • স্বাভাবিকদর্শন বিষয়িনিবুদ্ধিবৃত্তির আলোচনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কবিতা লিখিতেন তাহা হইলে, বোধ হয়, মানব জাতি তাঁহাদের নিকট অনুমাত্র ও উপকৃত হইত না।

দ্বিতীয় সংসর্গ।

১ সংসর্গ-গভীরসমস্যা

সামান্য কথায় বলিয়া থাকে বালকের মন আদ্র মৃত্তি-

* এবিষয়ে অনেক মত ভেদ আছে; তাহা বর্ণন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে।

• এরূপ কথিত আছে, রঘুনাথের অধ্যাপক "তামাক খাবার" জন্য রঘুনাথকে অগ্নি আনয়ন করিতে বলেন। রঘুনাথ গুরুপত্নীর নিকট যাইয়া অগ্নি প্রার্থনা করেন। গুরুপত্নী হাতায় করিঅগ্নি তুলিয়া বলিলেন, "শীঘ্রধর" আমার দুধ পড়িয়া যায়, রঘুনাথ কোন পাত্র লইয়া গিয়াছিলেন না, অমনি নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকা, অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বলিলেন আমার হাতে দিন। এই সময়ে রঘুনাথের বয়স ৫। ৬ বৎসর মাত্র ছিল, অধ্যাপক তাহার বুদ্ধি বৃত্তি দেখিয়া তাহাকে ন্যায় শাস্ত্র পড়িতে আদেশ করেন। এই রঘুনাথের দ্বারা নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপন আরম্ভ হইয়াছিল।

কার ন্যায়। যেমন আর্দ্র মৃত্তিকা দ্বারা স্বেচ্ছানুরূপ ঘটাদি প্রস্তুত করা যায় সেইরূপ উপদেশ দান ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা অনায়াসেই বালকের রুচি পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে পারা যায়। পিতা, মাতা বা অন্য অভিভাবক প্রভৃতি যাহার নিকট বাস করে, বালকের চরিত্র অনেকাংশে তাহার চরিত্রের অনুরূপ হইয়া থাকে। এবং বাল্যকাল হইতে যে অভ্যাস হইয়া যে সংস্কার অথবা যে প্রকার রুচি থাকে, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় কোন রূপেই তাহা একবারে নির্ম্মূল হইয়া যায় না। এই কারণেই জগতে অধিকাংশ মনুষ্যকে পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে দেখা যায়। এই কারণেই (ইহার আরও অনেক কারণ আছে, গত অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাশী বিপ্লব উপলক্ষে তদ্দেশে যত যুদ্ধবীরের আবির্ভাব হইয়াছিল অপর কোন সময়ে, কোন দেশে, তদ্রূপ দেখা যায় নাই। এবং এই কারণেই মহাবীর লুয়ীঃ নেপোলিয়ান স্বীয় পিতৃব্য নেপোলিয়ান বোনাপার্টীর ভ্রাতষ্পুত্র নামে যথার্থই উক্ত হইয়াছেন *। মহাবীর আলেকজণ্ডর শৈশবকালে হোমারের ইলিয়ডের (ট্রয় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কবিতা) অতিশয় প্রিয় ছিলেন এবং পরিণত বয়সে যুদ্ধও সাম্রাজ্য লাভই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়াছিলেন।

৩য় চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী পদার্থের প্রকৃতি।

৮ চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী পদার্থ ভেদে লোকের প্রকৃতি ভেদ

আমরা যে সকল মনুষ্য ইতরজন্তু এবং উদ্ভিদ বা জড় পদার্থ বারিবেষ্টিত রহিয়াছি, অনেক সময় তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে আমাদের প্রকৃতির গঠন হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তু-প্রধান-দেশ-বাসীদিগের মৃগয়াপ্রিয়তা অনেক স্থানেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এই দেশীয় অত্যুন্নত পর্ব্বত ভয়ঙ্কর ঝাটিকা বৃষ্টিপাত ও প্রবলনদীস্রোত দৃষ্টিকরিয়া স্বভাবতঃই এই সকল দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া বোধ হয় এবং এই ভীকতা প্রযুক্তই প্রাচীন আর্য্যজাতি স্রোত পরিবর্ত্তন অথবা নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ অথবা যে সকল কার্য্যে জড় পদার্থের * অনতিক্রমণীয় শক্তি দ্বারা মনুষ্যগণ স্বাভিষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকে, তাহাতে পরাঙমুখ ছিলেন। এজন্যই প্রাচীন ভারতবর্ষ-বাসীরা কল্পনা শক্তির পরাকাষ্ঠা ও কবিত্ব শক্তির এক শেষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

৪র্থ প্রয়োজন।

৯ প্রয়োজনই উন্নতির মূল

প্রয়োজন সকল কর্ম্মের নায়ক। মনুষ্য নিষ্প্রয়োজনে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়না। বিশেষতঃ যে

* কথিত আছে বালক কালে নেপোলিয়নের শয্যার কাছে রণবেশধরি প্রতিমূর্ত্তিস্থাপিত ছিল।

* প্রাচীন আর্য্যগণ একেবারে এ বিষয় কিছু জানিতেন না, তাহা আমাদিগের বক্তব্য নহে। অন্যান্য আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ উন্নত ছিলেন, এ বিষয়ে তদ্রূপ নহে।

সকল অভাবে স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে, আহার বা পরিচ্ছদের ক্লেশ হয়, মনুষ্য প্রাণ পণ করিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা পায়। ইংলণ্ডের অনুর্ব্বরতাই তদ্দেশে বাষ্পীয় লাঙ্গল প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে। এবং তথায় অনেক প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবই ইংরাজ দিগকে বাণিজ্য প্রবৃত্তি দিতেছে। জেনীর পীড়া• বশতঃ আর্ক্রাইটের সূত্রের অভাবই স্পিনিং জেনীর সৃষ্টি করিয়াছে! পক্ষান্তরে গৃহে বসিয়া কোন রূপে বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে বীজ নিক্ষেপ করিলেই প্রচুর শস্যলাভ করা যায় এবং আহার বা পরিচ্ছদের নিমিত্ত বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না, সুতরাং আমাদের দেশে সেই "বলরাম ঠাকুরের" সময় যে রূপ লাঙ্গল ছিল অদ্যাপি তাহার কোন উন্নতি হয় নাই।

ইংলণ্ড দেশে যখন প্রজার সংখ্যা অল্প ছিল, তৎকালে সামান্যরূপ কৃষি কার্য্যেই দেশবাসীদিগের চলিতে পারিত; পরে যখন প্রজাসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন তথাকার অনুর্ব্বরা ভূমিতে সামান্য রূপে কৃষি কার্য্য দ্বারা আর চলিবার উপায় রহিল না, সুতরাং ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য বাষ্পীয় লাঙ্গলাদির আবশ্যক হইয়া উঠিল এবং যত্নে ও পরিশ্রমে তৎকার্য্য সম্পন্ন হইল। ভরতবর্ষের ভূমি এরূপ উর্ব্বরা যে অল্প পরিশ্রমেই বহুব্যক্তির আবশ্যকীয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু এদেশে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তও ভূমির অনুপাত অনুসারে লোকসংখ্যা এত বৃদ্ধি হয় নাই যে কৃষির নিমিত্ত উৎকট পরিশ্রমের আবশ্যক হয়।

শ্রম বিভাগের উপকার

উপরি উক্ত কারণ চতুষ্টয় হইতে জাতি সাধারণ এবং লোক সাধারণ মধ্যে শ্রম বিভাগ প্রবৃত্তি হয়। শ্রম বিভাগই সামাজিক উন্নতির আদি কারণ। শ্রম বিভাগ না থাকিলে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। এক ব্যক্তির বহু বিষয়ে চিন্তা থাকিলে কোন বিষয়েই উত্তম রূপে জ্ঞান লাভ হয় না; পক্ষান্তরে শ্রম বিভাগ প্রথা থাকায় প্রত্যেকে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে।

চিরদিন এক বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তদ্বিষয়ে যে, বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হইতে থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। অভিজ্ঞতা লাভ হইলে তৎকার্য্যও উত্তম রূপে সম্পন্ন হয়, ফলতঃ শ্রম বিভাগমূলক কার্য্য বিভাগ, কার্য্যবিভাগমূলক অভিজ্ঞতা লাভ এবং তদ্দ্বারাই সংসারের প্রচুর পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইতেছে।

"One science will one genius fit
So vast is Art so narrow human wit"

শ্রম বিভাগ থাকাতে যেমন প্রত্যেক ব্যবসায়ী স্বস্ব কার্য্য উত্তম রূপে সম্পন্ন করিতেছে তদ্রূপ এক কার্য্য ত্যাগ করিয়া

• ইংলণ্ড দেশে আর্ক্রাইট নামক এ ব্যক্তি তন্তুবায়ের ব্যবসা করিত; আর্ক্রাইটের বনিতা জেনী সূত্র প্রস্তুত করিত এবং আর্ক্রাইট তদ্দ্বারা বস্ত্রবয়ন করিয়া কথঞ্চিৎ রূপে জীবন নির্ব্বাহ করিত। একদা জেনী পীড়িতা হইলে এবং সূত্রাভাবে আর্ক্রাইটের আহার নির্ব্বাহ কষ্টসাধ্য হইল এবং তখনই তিনি সূত্র নির্ম্মাণের কল প্রকাশ করিলেন।

কার্য্যান্তরে প্রবৃত্ত হইতে যত সময় অনর্থক নষ্ট হইত, তাহাও বাঁচিয়া যাইতেছে। এই জন্যই অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে অনেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে।

১১ শ্রম বিভাগ দরিদ্রের পক্ষে অপকারী নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মানবজাতি সম প্রাকৃতিক নহে। রুচি, ক্ষমতা, সহিষ্ণুতা, সঞ্চয়-শীলতা প্রভৃতি সকল গুণ একাধারে অথবা সকল মনুষ্যে সমান রূপে নাই। এই কারণেই সমাজ মধ্যে শ্রম বিভাগ, তন্মূলক মনুষ্যের অবস্থা বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে। অনেকে বলিতে পারেন শ্রম বিভাগ যদি বিভিন্ন অবস্থার কারণ হইল, তবে এই কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা উচ্চশ্রেণীস্থ লোকদিগকে যে হিংসা করিয়া থাকে, শ্রম বিভাগকেই তাহার কারণান্তর বলা যায়। আপাততঃ এরূপ বোধ হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। শ্রম বিভাগ না থাকিলে সকলের অবস্থা একরূপ হইত বটে, কিন্তু তাহা হইলে মানবজাতি এই কালে যেমন পরস্পর দ্বারা উপকৃত হইতেছে, তখন ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করা যাইত না। ইউরোপ এসিয়া প্রভৃতির সুসভ্য ও অর্দ্ধ সভ্য জাতিদিগের অবস্থা দেখ, সমাজ মধ্যে অন্ধ, আতুর, প্রভৃতি অক্ষম ব্যক্তিদিগের রক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা কত উদ্যোগ করিতেছেন। অনাথ-নিবাস, দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি কত উপায় অবলম্বিত হইতেছে; পক্ষান্তরে অসভ্যজাতি মধ্যে শ্রম বিভাগের অভাব, এই একমাত্র কারণেই তাহাদের অবস্থা এত শোচনীয় যে তাহারা অপর ব্যক্তির উপকার করা দূরে থাকুক, দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়াও কথঞ্চিৎরূপে উদরান্ন সংগ্রহ করিয়া থাকে।

১২ উন্নতাবস্থ লোকদ্বারা সমাজ উপকৃত হয়। একের উন্নতিতে অপরের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, বরং অনেকাংশে লাভেরই সম্ভাবনা। গ্রামের মধ্যে একজন সাধুচরিত্র, বিদ্বান অথবা ধনী থাকিলে তদ্দ্বারা কত লোকের উপকার হয়। মহাত্মা জেমস্ ওয়াটের আবিষ্ক্রিয়াতে জল ও অগ্নি চিরশত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া কত-শত লোকের কায়িক শ্রমের লাঘব করিতেছে। এদিকে দেখ, অপর ব্যক্তির উন্নতি দেখিলে স্বভাবতই মনে উন্নতীচ্ছা বলবতী হইয়া থাকে এবং এইরূপ সাধুদ্বন্দ্বিতা মনোমধ্যে উপস্থিত হওয়াতে তাহার উন্নতির কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয় ও তৎপ্রভাবে নিজের উন্নতি হইয়া থাকে। যে দেশে জ্ঞানে ধনে উন্নত লোক ভূরি সংখ্যক আছে, তথায় অনেকানেক মূর্খ সন্তানকে পণ্ডিত এবং দরিদ্র সন্তানকে ধনী হইতে দেখা যায়; ইংলণ্ডের অবস্থাই ইহার প্রমাণ।

পক্ষান্তরে যে স্থানে সকলের প্রায় সমাবস্থা, তথায় এইরূপ হীনাবস্থা হইতে উন্নতি লাভ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। সুইজর্লণ্ডের অবস্থা দেখ, সেখানে উন্নতলোকের সংখ্যা যেমন অত্যল্প, অপেক্ষাকৃত দুর্দ্দশাপন্নদিগের উন্নতি লাভও তেমন অল্প।

১৩ শ্রমবিভাগ দরিদ্রদিগের দুরবস্থার হেতু নহে। যদিও প্রাচীনকাল হইতেই সর্ব্বত্র প্রধানেরা নিকৃষ্টদিগকে পদতলস্থ করিয়া

রাখিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যজাতির শূদ্রের* প্রতি ব্যবহার গ্রীকের হেলট্, † ও রোমের প্লিবিয়ান ‡ এবং প্রাচীন মিসরীয়ও পেরু বাসীদিগের অবস্থা যে নিতান্ত শোচনীয় ছিল, শ্রম বিভাগ তাহার কারণ নহে। তাহার কারণ নিম্নে লিখিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আদিম নরগণ উদরান্ন অথবা সাংসারিক অন্যান্য বিষয় লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত। আদৌ মনুষ্য কেবল একমাত্র নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরই বশীভূত ছিল। তৎকালে তাহার মনে ধর্ম্ম ভাবের সম্যক রূপে উদয় হওয়া দূরে থাকুক, ছিল কি না সন্দেহ। যখন সমাজ এক প্রকার বদ্ধমূল হয়, তখন হইতেই দয়া, * ন্যায়পরতা, ঈশ্বরে প্রীতি প্রভৃতি ভাবের কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি পাইয়া আসিতেছে। ধন-সংগ্রহ-মূলক যখন সমাজস্থ সকলের অবস্থা বিভিন্ন হইয়া আসিয়াছিল, অথচ দয়া প্রভৃতি ধর্ম্মভাব গুলি স্পষ্ট স্ফূর্ত্তি পায় নাই, তৎকালীন প্রভুত্ব পরায়ণ স্বার্থপর ধনিবর্গ যে দরিদ্র প্রজাগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিবে তাহাতে বিচিত্র কি ?

(২) উন্নতাবস্থ লোককে সম্মান করা মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ধনী অথবা বিদ্যাবান লোককে সম্মান করিতে আপনা হইতেই ইচ্ছা † হয়। তাহাদিগের নিকট কোন উপকার প্রত্যাশায় প্রোক্ত সম্মান করা হয় না। নিম্নস্থ লোকের এইরূপ সম্মান প্রদর্শন যে প্রধান দিগের অনুচিত প্রভুত্বলাভকে অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত করিয়াছিল ‡। এবং তাহাদিগের আপন আশয় অতি ক্ষুদ্র করিয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি ?

---

* মনুতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের সহিত একত্র উপবেশন করিতে পারিবে না, কিম্বা তাহাদিগের উপর কোনরূপ অনাচরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণের শূদ্রকে বধ ও বিড়াল কুক্কুর বধ উভয়ই সমান।

† "The Helots were bound to the soil, and could not be torn from it, or sold into another country ; a regulation which must have made their lot, hard as it was, bearable in comparison with that of the slaves in other parts of Greece, who might be sold or dragged from their homes at the pleasure of their masters. Some were employed in public works ; others in domestic service." ***

‡ The race, of the original Plebs or Plebians of Rome, was derived from the conquered nations especially the Latins. They were not citizens of Rome, so they could neither intermarry with the houses, nor could belong to the state nor had any share in the states government or of property.

Though free in person not slaves, yet subject politically were the Plebians the commons of Rome.

* ইহার অঙ্কুর পূর্ব্বে ছিল, কিন্তু প্রস্ফুটিত হয় নাই।

† Theory of Moral Sentiments. Adam Smith.

‡ ধনীদিগের অবস্থা অনভিজ্ঞতা এবং তাহাদের কার্য্যাদির সমারোহ, দরিদ্রদিগের সম্মান প্রদর্শনের কারণ। আবার বিদ্বান্ ব্যক্তি দিগের অনেক কার্য্য দৃষ্টে, অনেক সময় সাধারণ লোকদিগের মনে তাহাদিগকে দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে পণ্ডিতদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ইহাই কারণ।

(৩) এইরূপে প্রধান দিগের অত্যাচার যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, ক্রমে অত্যাচারিত হওয়াতে নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের তেজস্বিতাও ততই হ্রাস হইয়া যায়। পরিশেষে তাহারা এতদূর নিস্তেজ হয়, যে কাল ক্রমে প্রধান দিগের যন্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠে। প্রধানেরা যে পথে চলেন, তাহারা বিচার শক্তি বিহীন হইয়া সেই পথেই চলিয়া থাকে। কিন্তু যেমন আকাশ নিতান্ত প্রশান্ত হইলে পরক্ষণেই প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়া পূর্বভাব একেবারে বিদূরিত করে, তদ্রূপ শীতল প্রকৃতি নিম্ন শ্রেনীস্থ লোক দিগের মনে হঠাৎ তেজস্বিতার প্রাদুর্ভাব হইয়া প্রধান দিগের অত্যাচারের বিলক্ষণ প্রতিশোধ দিয়া থাকে। এই সময়ে সমাজ এত পরিবর্ত্তিত হয় যে, অনেক প্রধান হীনাবস্থ হয় এবং সামান্য ব্যক্তিও প্রধান হইয়া পড়ে।

(৪) প্রধান এবং সামান্য এই দুই শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে যে সম্প্রদায়ে অপেক্ষাকৃত অল্প লোক থাকিবে, তাহারাই অপর দল কর্ত্তৃক সমাদৃত হইবে। ভৃত্যের সংখ্যা অধিক হইলে প্রভুর এবং প্রভুর সংখ্যা অধিক হইলে ভৃত্যের আদর হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। পরে সমাজ মধ্যে যাহারা সমধিক বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন নহে, যাহাদের পূর্বপুরুষগণ কিছু মাত্র সঞ্চয় করিয়া যায় নাই, তাহারাই শ্রমোপজীবী হইয়া থাকে। অথচ প্রাচীন কালে ধন সঞ্চয়ের যেরূপ প্রণালী ছিল* তাহাতে ধনীর সংখ্যাও অনেক অল্প ছিল। সামান্য লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক থাকাও প্রধানদিগের অনুচিত প্রভুত্বের একটী কারণ।

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, শ্রমবিভাগ অত্যাচারের কারণ নহে। অনেকে বলিতে পারেন, যখন একমাত্র শ্রমবিভাগ দ্বারাই লোকের অবস্থা বিভিন্ন হইয়াছে, এবং সেই বিভিন্নতাই প্রধানদিগের অত্যাচারের হেতু, তখন কেমন করিয়া শ্রমবিভাগ অত্যাচারের কারণ বলা যায় না। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, কোন দুষ্প্রবৃত্তি-পরায়ণ ব্যক্তি বুদ্ধি প্রভাবে যে সকল অপক্রিয়া করিয়া থাকে তাহার কারণ তাহার বুদ্ধি, কি আন্তরিক দুষ্প্রবৃত্তি? আমরা বলি, আন্তরিক দুষ্প্রবৃত্তি। প্রোক্ত অপক্রিয়া দৃষ্টে কেহই এরূপ সিদ্ধান্ত করে না যে, মনুষ্যজাতির বুদ্ধিই সকল অনিষ্টের মূল। বুদ্ধিবৃত্তিই যে মানবগণের মহত্ত্ব লাভের মূল তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। অগ্নিদ্বারা গৃহ দাহ হয় বলিয়া, অগ্নি না থাকিলেই ভাল ছিল, মনেও এরূপ কল্পনা করা

* স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে কেহই ধন সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক হয় না; যেহেতু ন্যায় বিচার না থাকায়, বলবান্ ইচ্ছা করিলেই তাহা হইতে দুর্বলদের সর্ব্বস্বাপহরণ করিতে পারে। সুতরাং এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে প্রাচীনকালে অপেক্ষাকৃত ধনীর সংখ্যা অল্প ছিল যে হেতু এ অবস্থাতে অল্প লোকেরই ধন সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি হইত।

যায় না; অগ্নির উপকারিতা প্রসিদ্ধই আছে। বস্তুবিক যেমন বুদ্ধি থাকায় মনুষ্যের মহত্ত্ব লাভ হইয়াছে এবং অগ্নি-দ্বারা সংসারের পরমোপকার হইতেছে, তাহাদের দ্বারা অনিষ্ট হইলেও লোকে সেই সকল অনিষ্টের কারণ বুদ্ধি ও অগ্নিকে নির্দ্দেশ না করিয়া তাহার কারণান্তর নির্ণয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রম-বিভাগকেও পূর্ব্বোক্ত অত্যাচারের কারণ না বলিয়া তাহার কারণান্তর অনুসন্ধান করা বিধেয়।

১৪ শ্রম বিভাগে কেহ দরিদ্র হয় না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ধন সংগ্রহ সভ্যতার অন্যতর কারণ। এই সংগৃহীত ধনের কিয়দংশ প্রধান সম্প্রদায় ও অপর ভাগ সামান্য লোকের হস্তে ন্যস্ত হয়। সামান্য লোক-দিগের সংখ্যা অধিক, সুতরাং তাহাদি-গের মধ্যে উহা বহুভাগে বিভক্ত হওয়াতে তাহারা প্রধানদিগের ন্যায় ধনবান হইতে পারেনা। দেশ মধ্যে জন সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই সামান্য লোকের সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইবে; কারণ ধনী সন্তা-নেরা, পৈতৃক ধন বিভক্ত হওয়াতে অল্প ধনী ও পরিশেষে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন এবং ইতর লোকে পৈতৃক ধন যৎকিঞ্চিৎ যাহা পায় তদ্দ্বারাও উন্নতা-বস্থ হইতে পারে না। ইহাতে এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, মানব সমাজ ক্রমে নির্ধন হইয়া যাইতেছে।

পরিশ্রম, কার্য্যবিভাগ এবং ভূমির উর্ব্বরতা, এই তিন কারণে দেশ মধ্যে ধন সংগ্রহ হইয়া থাকে। লোক সংখ্যা অধিক হওয়াতে অপেক্ষাকৃত অধিক ভূমি কৃষ্ট হয়, সুতরাং সমাজ মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ধন বৃদ্ধি হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি কিয়ৎ পরিমাণে ধনী হওয়াতে ধন-গৌরব হ্রাস হইয়া উঠে। এবং পূর্ব্বে যত ধন থাকিলে কোন ব্যক্তি ধনী বলিয়া বিখ্যাত হইত এই সময়ে আর তাহা হইতে পারে না। অপেক্ষা-কৃত অধিক ধন না থাকিলে আর তাহাকে ধনী বলা যায় না, সুতরাং অধিকাংশ স্থলে ধনী সন্তানগণ মধ্য-বিত্ত বলিয়া অভিহিত হয় এবং সামান্য লোকে কিয়ৎ পরিমাণে ধনী হই-লেও তাহাদের মধ্যে অনেকেই মধ্যবিত্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারে না।*

প্রাচীন আর্য্য, মিসর প্রভৃতি জাতি মধ্যে সামান্য লোকের হীনাবস্থার বিষয় সর্ব্বত্র খ্যাত আছে। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা হেনরী টমাস্ বক্‌লস্ ইহার নিম্নলিখিত কারণ প্রদর্শন করেন। সম প্রকৃতিক উভয় দেশ মধ্যে যে দেশে খাদ্য সুলভ, তথায় জনসংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অধিক বৃদ্ধি হইবে।†

* কিন্তু ইহা মনে করা কর্ত্তব্য নহে যে, যে ব্যক্তি যত আহার করিবে, তাহার তত সন্তান হইবে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির অন্যান্য সামান্য কারণের মধ্যে, খাদ্য সুলভ হওয়া এক প্রবল কারণ।

† ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংলণ্ড-দেশীয় মোটিস সাহেব প্রথমতঃ এইমত উদ্ভাবন করেন। সে সময়ে অনেক কারণ বশতঃ, বিশেষতঃ নেপোলিয়ানের সহ ঘোরতর সমরা-নলে অনেকে গতাসু হইতে ছিল। বার্ত্তা

এই নিয়মানুসারে দেশ মধ্যে খাদ্য-দ্রব্য সুলভ কি দুর্লভ তাহা অনুসন্ধান করিলেই তদ্দেশে প্রজাসংখ্যা কত দূর বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাও অনুমিত হইতে পারে।

১৫ দেশভেদে ভোজ্য বৈষম্য

খাদ্য দ্বারা দুই প্রকার উপকার সাধিত হয়। প্রথমতঃ শারীরিক উষ্ণতা রক্ষা* দ্বিতীয়তঃ ক্ষতি পূরণ †। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শারীরিক উষ্ণতা সহজেই রক্ষা পায়। অতএব তদ্দেশে কেবল দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োজনোপযোগি খাদ্যের বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু তাহাও শীতপ্রধান দেশের ন্যায় আবশ্যকীয় নহে। কারণ গ্রীষ্মমণ্ডলবাসীর অল্প পরিশ্রমে অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তথায় উৎকট রূপে অঙ্গচালনা করিতে হয় না। অতএব তাহাদের অঙ্গের ক্ষতিও অল্প হয় এবং অল্প কালেই সেই ক্ষতি পূরণ করা যাইতে পারে। আর উষ্ণদেশীয় লোকের শারীরিক ক্ষতি পূরণার্থে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা উদ্ভিজ্জে প্রচুর পরিমাণে আছে এবং মাংসাহার ব্যতীতও তদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে চলিতে পারে‡। নিরামিষাহার অল্প শ্রমেই সংগ্রহীত হইয়া থাকে, সুতরাং উষ্ণপ্রধান দেশেরআহার সুলভতানিবন্ধন লোক সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে।

পরন্তু শীতপ্রধান-দেশীয় লোকের অধিক পরিশ্রম ব্যতীত প্রয়োজনীয় বস্তু পাইবার উপায় নাই। অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে শারীরিক ক্ষতিও অধিক হয়। ক্ষতি পূরণার্থ অধিক আহারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অপর তথাকার বায়ু মধ্যে অম্লকর ভাগ অধিক এবং শীত প্রভাবেও অতিরিক্ত পরিশ্রমে লোকের অধিক প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। অধিক অম্লকর বায়ু শরীরস্থ হওয়াতে উষ্ণতা রক্ষার্থ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে যবক্ষার বায়ুর আবশ্যক। মাংস মধ্যে, উদ্ভিদপেক্ষা, যবক্ষার অধিক, সুতরাং তদ্দেশে মাংসের নিতান্ত প্রয়োজন। শীত প্রধান দেশে উদ্ভিদ নিতান্ত সহজে উৎপন্ন হয় না, এবং একমাত্র উদ্ভিদে জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়াও সম্ভব নহে; সুতরাং মাংসাহার-নিমিত্ত † তদ্দেশীয়

শাস্ত্রে জনস্টুয়ার্ট মিল এইমত সম্যক উদ্ভাবন করেন। এইমতের ভ্রম প্রথমতঃ অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রোফেসর ফরসেট সাহেব স্থির করিয়াছেন।

* এই উষ্ণতার স্বাভাবিক পরিমান তাপমান যন্ত্রের ৯৮ অংশ। খাদ্য বস্তুর মধ্যে যে বস্তু অঙ্গারক সেই অংশ শরীরস্থ অম্লকর বায়ু সহিত মিলিত হওয়ায় এই কার্য্য সম্পন্ন হয়।

† ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ যে অঙ্গ যত চালনা করা যায় তাহার তত দূর অন্তরস্থ মাংস পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া থাকে, ঐ বিকৃত মাংস রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। দূষিত রক্ত ফুস্-ফোষে আসিয়া বিশোধিত হয়, খাদ্যের সারাংশ ঐ প্রশ্বাস দ্বারা গৃহীত বায়ুর অম্লকরাংশ দ্বারা এই রক্ত বিশোধিত হইয়া শরীরের ক্ষতি পূরণ করে।

‡ শারীরিক উষ্ণতা রক্ষার্থে উষ্ণ দেশীয় লোকের মাংসাহার একেবারে প্রয়োজন নাই আমরা এ কথা বলি না। বস্তুত: অনেক সময়ে আবশ্যক হইয়া পড়ে।

† আপাততঃ অনেকেই অনুমান করেন শারী-

লোকে বাধ্য হইয়া মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়। কৃষিকার্য্যে যেমন অধিকাংশ স্থলে পরিশ্রমের ফল পাওয়া যায় এবং তাহাতে যেমন প্রাণনাশের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই, মৃগয়া তদ্রূপ নহে। মৃগয়াতে অধিক সময় বিফল-প্রযত্ন হইতে হয়, হয়ত উপবাসেই সমস্ত দিন অতীত হইয়া যায়। অনেক সময় প্রাণনাশের সম্ভাবনা, হয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। সুতরাং আহার দুঃসাধ্য হওয়াতে শীতপ্রধান দেশে লোক সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অল্প হইতে থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে অবশ্যই দেশমধ্যে ইতর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং খাদ্য সুলভতা বা দুষ্প্রাপ্যতা অনুসারে লোক সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। বোধ হয় এই কারণেই ভারতবর্ষ, মিসর প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত প্রাচীনদেশ সকলে জনসংখ্যার আধিক্য হইয়াছিল এবং এই জনসংখ্যার আধিক্য হওয়াতেই, ইতরসংখ্যাও অবশ্যই অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।* এই বৃদ্ধি হেতুই প্রধান লোকেরা সামান্য লোকদিগকে বিশেষ অত্যাচার করিত।

১৬ বিভক্ত শ্রেণী। শ্রমবিভাগই সভ্যতার মূল, এ কথা উপরেই বলা হইয়াছে এবং শ্রমবিভাগ অনুসারেই যে সমাজে বিভিন্নাবস্থ-লোক হইয়াছে তাহাও উপরেই বিবৃত হইয়াছে। এই শ্রম বিভাগ অনুসারে মনুষ্য অতি প্রাচীন কালেই ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল যথা—

১। কৃষক,
২। সৈন্য।
৩। শাসনকর্ত্তা [রাজা]
৪। শিল্পী।
৫। বণিক ও মূল ধনী।
৬। পণ্ডিত [যাজক গ্রন্থ কর্ত্তাদি]

এই ছয় শ্রেণীর লোকের সহায়তা নিমিত্ত অপর এক শ্রেণী ছিল, তাহাদিগকে ভৃত্য বলা যায়।

এই ছয় শ্রেণীর মধ্যে কিরূপে কোন্ ব্যবসায়ীর উৎপত্তি হইল এবং কালক্রমে ইহা হইতে অপরাপর শ্রেণী সকলের কিরূপ উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর বলা হইবেক। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে মানবসমাজে বিবাহ কিরূপে আরম্ভ হয় এবং তাহার সহিত যে সভ্যতার কি সম্বন্ধ তাহা বর্ণন করা সমধিক আবশ্যক।

রিক ক্ষতি পূরণ হইলে শরীর রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা ভ্রম। চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করিয়াছেন অধিকাংশ লোকই উষ্ণতা রক্ষা না হওয়ায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় অল্প সংখ্যক মাত্রের শারীরিক ক্ষতি পূরণ না হওয়ায় মৃত্যু হয়।

যদিও বক্‌লস্ সাহেব যেরূপে খাদ্যের সহিত প্রজা বৃদ্ধির সম্বন্ধ বিবেচনা করেন, তাহা সত্য নহে, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত বলা যায় যে খাদ্য সুলভ হইলে অধিক পরিমাণ লোক বিবাহিত হয়, এবং অধিক খাদ্য পাওয়াতে সেই সকল বিবাহিত ব্যক্তি হৃষ্ট-পুষ্ট-কায় হওয়াতে প্রকৃতির নিয়মানুসারে অধিক সন্তানোৎপাদন করে।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন সময়ে গোলা বারুদ আবিষ্কৃত না হওয়ায় যুদ্ধাদিতে তাদৃশ সংখ্যক লোক গতায়ু হইত না।

Why the History of India shows no Politics.

The Indian character is often said to be naturally wanting in political aptitudes, and unlike the western nations to be habitually partial to despotism. It is by many set down and believed, that for the Indians to talk of a constitutional form of Government is, as if the fishes whimpered for a flight. We must own that there is some plausibility in the views thus formed of our national character.

We proceed to show how this plausibility arises.

The most obvious way for a nation to become great is by conquest. But to be conquered has not in few cases been also the path to improvement and progress. Development of politics results mainly from the effects of conquests. Politics is a tree which generally grows up between the clashing of two nations placed one over the other, when the nation destined to occupy the lower position is not altogether so elastic as to offer no resistance nor friction. Thus it was that the science of politics had a peculiar development in the history of Rome and that has been playing so extraordinary a part in the history of England. In the latter country the Norman conquest served to rouse and foster those national passions, which came in time to constitute the elements of the great national strife carried on between power on one hand and right on the other, between authority and justice, till the two were harmoniously blended together. In Rome, for a long period, a parallel course of things transpired barring the adventitious and formal differences. Although the early portion of the history of that mighty power is hidden in mist, we can safely say that the Plebians were a distinct people brought under the subjugation of the Patricians by force of arms. And it was owing to this fact that great jealousy subsisted between the two sections of the population at the great city and that it bore political fruits. And thus if the English people sesecured their Magna Charta, the Petition of Right, the Bill of Right and the Act of Settlement; the Romans got the Publian law, the Valerian law, the Canulian law, the Publilian law, and the Papian law and the like.

India too was conquered. But conquest bore other fruits in India. The conquest of India by the Mahomedans proved to her unmixed injury. Far from spurring her sons to assertions of right and justice, it completely unmanned and prostrated them. They became timid and cringy. The sense of personal honor bade adieu to many a Hindoo breast making room for cunning and artfulness. This difference in the effect, produced by the like cause on the three nations, may seem to argue a natural difference in the constitution of the national character of the peoples. Thus an air of plausibility is given to the theory of a natural in-

aptitude of the Indians for free institutions! Other facts may be added tending to give color to the same theory. As the effect of conquest on Hindoostan was unlike that on England and on the Primitive Latins, so at first sight the antecedent history of India, when she was her own master, hands down no traditions and tales of free institutions imperfect and unchaste, if they were to be as the early history of Greece and Rome and of the Teutonic races affords. Greece had her popular assemblies and aristocratic bodies.—Rome her Senates—England her Witenagemot and general popular meetings. The Teutonic tribes again often exercised the right to elect kings. But what semblances of free institutions can India talk of? None of her traditions go that way.

Thus we have fully represented one side of the question. Now look at the other side, granting the above facts we may make a plea of demurrer. We hope to show satisfactorily that the assertion of a natural unfitness of the Indians for free institutions is as baseless as it is unphilosophical. The arguments, stated above in favour of this assertion, are the easiest of refutation. First, addressing ourselves to the want of traditions of free institutions in India, in the first place, traditions are fashioned by the feelings and thoughts of men among whom they became current more than they are relics of historic truth. In this case, the wish is after a falter to thought. Thus there can be little doubt that, much of the free and independent character that is ascribed to ancient institutions, is often the creation of imagination. Eliminating this portion of the traditions, the boasted free institutions of the Teutonic and other races will be indeed reduced to the barest and meagerest shape. And when this is done the apparent bulky disadvantage, to which comparison would place India, is greatly diminished independently of what the facts may be in her own case.

Now these facts are not bad for her. True she has no traditions of free institutions. The reason of this we will explain presently. But she had as much of free institutions as any other country. It may be safely stated that in the ancient Hindoo population of India the Brahamans represented the governed classes and the Kshetriyas the governing class. How this came about we need not pause to explain. But this conclusion is arrived at by men who made deep researches into the Indian history, that the Brahmans and the kshetriyas were not originally on good feelings towards each other. Now, was the government of the kshetriyas absolute? Was the kshetriya king allowed to exercise a pure despotism? No! there were more restraints on him than on the Anglo Saxon, Roman or Spartan king. There was a powerful council formed of Brahmans whom he had to obey. The laws

and rules formed by the Brahmans were to be adopted and bided by him. If with these facts a comparison be now made between the Hindoos and the nations referred to, the Hindoos will gain and not lose by it. As to election of kings. This was a concommitant and up-shoot of the primitive barbarity of the Teutonic races, rather a matter of elaboration and free rational choice. An exuberance of physical force, coupled with intellectual darkness and social rudeness, urged them into many a pitiful change and the election of kings, such as it was with them, belonged to this habit. But the period at which we get the first glimpse of Hindoo history, the Hindoos were a thoroughly civilized people. They had institutes like those of Justinian and Code Napoleon. The different orders in society were neatly arranged. The cultivation of science, art and philosophy was at a high pitch. At such a stage, they could not display that exuberance of physical force, which marks the boy-hood of individuals as of nations and had none of the characteristic incident to such boyish exuberance. This is surely little to their prejudice.

Then in the latter period of her independent existence, India led a life yet more tranquil and placid. There is little exhibition of any individual force of character or of jealous assertions of right between the governors and the governed. No Magna Charta was thought of, no law for religious independence. But the reason is not that the Indians were naturally dead to feelings of independence and personal honor but that the atmosphere, they lived in, was above that level of mental structure in which factions and strife are occasioned. They differed from their western brethren as they, to some extent, do now differ, by one thing above all the res. This is their grand motto অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ not to pain is the best piety. Their kings fashioned their conduct strictly after this principle and studiously avoided all oppressive plans of personal aggrandisement or of ambition. They did not enter into constant wars with their neighbours and had no occasion to flinch the pockets of their subjects under this pretext or that. Beyond the ordinary revenues, which were paid to the state from time immemorial, they imposed no ship-money or the tonnage or the poundage. The internal government was as inoffensive as just. Their being a number of independent rajahs each governed a narrow circle of people and that with a personal love and a personal care. The king treated his subjects really as junior members of the family and they in return reciprocated like kindly feelings and attachment to him as the patriarch. Thus all the advantages of a feudal system were enjoyed by the Indians with none of its vices. The people of India had thus no occasion to quarrel with their rulers.

Political struggles were foreign to them, not because that they themselves were so abjectly docile and insensitive as never to have the boldness and the inclination to question the acts of their rulers, but because the circumstances under which they lived obviated the necessity of such struggles. As to the other argument, viz. that drawn from the effects of the Mahomedan conquest we shall take it up in another number.

On the fallacy of confounding the condition of a thing with its essence or cause. with a special view to expose the theory of empirical school generally.

THAT the rudiments of our knowledge are communicated to us through sensations is a truth which none can dispute.

Without the sense of hearing, for example, we could never have the science of acoustics—nor that of odours without the organ of smell—nor that of hardness, softness, pain or pleasure without the sense of touch; but of all the tracts of conveyance which have been opened up between the mind of man, and the external world in which he dwells, there is none which is at once the source of so much instruction, joy and beauty as the organ of sight. It is this which gives him a command over the scenery of nature, enables him to examine the surface of the globe, and fills his mind with the wonders with which it abounds; and it is by this organ that he obtains a knowledge of the multitude of other globes that lie scattered over the immensity of space. Such is the knowledge which we acquire by means of our senses.

That it is possible for the Supreme Being to have given us a knowledge of all things without the organs of sense cannot be reasonably disputed. We have reason to believe that, when we change our mortal bodies, our knowledge shall be improved rather than be impaired, that. the Supreme Being Himself comprehends all things,—their ideas with their several relations one to another without bodily organs. But what the Deity understands first, man does not. God begins with the principles and causes of all things, man begins with the things themselves, and by them ascends to their principles and causes. Thus all human studies and investigations into the nature and principles of all things begin in the reverse of the natural order, from sensibles to intelligibles, from body to space—from succession to time, from effects to causes. But though, after the mind has been enriched with the knowledge of things and the things themselves, yet if all sensibles were annihilated, still thought after thought, feeling after feeling would start into being. "The divine Continuer of our mental frame", to adopt the language of an eminent philosopher, who formed the soul to

exist in certain states on the presence of an external object, "formed it also "to exist in certain other states "without the presence or direct "influence of any thing external. "The one set of phenomena is the "result of the laws both of matter "and mind, the other result from the "susceptibilities of the mind itself." To illustrate this distinction by an example, let us suppose a philosopher in walking accross a garden to see the fall of an apple from an apple tree. The fall of the apple or the light which is reflected from it is the cause of a certain sensation in him which we call the sensation of vision—a sesnsation which belongs to the mind indeed; but which without the fall of the apple could not have been felt by it. But this is not the only thing our philosopher feels, other things take hold of his mind Our philosopher may ask himself, for example, why may not this power which occasioned the fall of an apple extend to the moon, and if so, what other force would be necessary to retain her in her orbit. He may further consider that if the moon was retained about the earth by terrestrial gravity, the planets which move round the sun ought, certainly, on similar priciples, be retained in their orbits by their gravity towards that body. He may find by Kepler's law that the force of gravity decreases proportionally to the squares of the distances; and having thus determined the law of gravity of the planets to the sun, he may apply it to the moon. Of the states of the mind which these processes of thought involve, the only one which can be referred to an external object as its cause, is the primary sensation or perception produced by the fall of an apple, the rest have been the result of not any thing foreign or adventitious and mere passive impressions upon the mind from without; but the result of something native and domestic to it or actively exerted from the mind itself.

There is thus an obvious distinction of our knowledge as in relation to their causes internal and external. Yet it is only by losing all sight of a distinction so obvious, and confounding the two distinct sources of our knowledge, that philosophers have claimed the honor of founding the four great philosophic shools or systems of philosophy. These systems are Sensualism, Idealisin, Scepticism and Mysticism.

রাজনীতি বিজ্ঞান।

সকল জাতি মধ্যেই অবস্থার বৈষম্য চলিয়া আসিতেছে। ধনবান্ দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ, রাজা প্রজা ইত্যাদির কুত্রাপি অভাব নাই। মনুষ্য মাত্রই একরূপ ভৌতিক ও মানসিক নিয়মাধীন হইয়া কিজন্য এবম্প্রকার * বিষম অবস্থাপন্ন? এই প্রশ্নের কারণ অনুসন্ধান বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিষয়। রাজা প্রজা সম্বন্ধ কিরূপে সৃষ্ট হইল, তাহার আবশ্যক বা কি এবং তাহা কি প্রকার সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত, ইত্যাদি রাজনীতি, বিজ্ঞানের বিচার্য্য বিষয়। প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় করদ-জমিদারদিগকেই স্থল বিশেষে রাজা বলা যায়, কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাঁহাদিগকে প্রজা মধ্যে পরিগণিত করে। সমাজ মধ্যে, যাঁহার ব্যবস্থাপকের এবং কার্য্য পরিচালন ক্ষমতা আছে কেবল মাত্র তাঁহাকেই রাজা বলা যাইবে।

পৃথিবীর আদিম অবস্থায় বিদ্যা চর্চ্চার সাতিশয় অভাব ছিল। এবং তন্নিবন্ধন প্রায় সকল লোকেরই মানসিক বৃত্তি নিতান্ত নিস্তেজ ছিল। তখন জ্ঞানাভাবে সমস্ত জাতিই অসভ্য অবস্থায় বাস করিত এবং বাহুবলই তাহাদিগের একমাত্র সম্বল ছিল। এ অবস্থায়, কলে কৌশলে কতিপয় বলবান্ লোককে আয়ত্ত করিতে পারিলে, আধিপত্য স্থাপনের আর কোন প্রতিবন্ধন হইত না। তৎকালে কেবল এই এক পদ্ধতিক্রমে সর্ব্বদেশে রাজ্যাভিষেক হইত। এক ব্যক্তি এইরূপ শাসন স্থাপন করিলে তাঁহার সন্তান সন্ততিও হয়তো তৎপদে অধিরোহণ করিত, না হয় অন্য কোন বলবান্ পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইতেন। আর্য্য জাতিয়েরা বাহুবলেই ভারতবর্ষ অধিকার করেন এবং প্রথমতঃ তাঁহাদের সেনাপতিই রাজা হন। তৎকালে রাজার ক্ষমতা অসীম ছিল তাঁহার যাহা ইচ্ছা হইত তাহাই করিতেন। ইচ্ছা হইলে নিরপরাধীরও প্রাণ বিনাশ করিতেন; আবার নিতান্ত ঘৃণিত অপরাধীকেও পুরস্কৃত করিতেন। প্রজার ধন, মান, জাতি, প্রাণ সমুদায়ই রাজার হাতে ছিল। তাঁহার উৎপীড়ন অতিশয় ভয়ানক হইলেও লোকে তাঁহাকে বাধা দিত না, এবং তত কষ্টও হইত না। তাঁহাকে "ঈশ্বরের অবতার" বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, তিনি পরমেশ্বরের প্রিয় পাত্র এবং তজ্জন্য অতিশয় জঘন্য প্রকৃতির ব্যক্তি হইলেও সকলের পূজ্য। তাঁহার পদে সকলেরই শির অবনত করা উচিত। ঈশ্বর অনুগৃহীত ব্যক্তির কার্য্য-কলাপের দোষ গুণ বিচার করা কাহার সাধ্য! সাধারনতঃ এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত থাকাতে রাজার আর কোন আশঙ্কা ছিল না। তিনি নির্ভীকচিত্তে আপন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-নিচয়ের প্রশ্রয় দিয়া মনুষ্যনামের কলঙ্ক রটাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না। আমাদের মানসিক ধর্ম্ম এই যে যত দিন একটা কার্য্য গর্হিত বলিয়া বিশ্বাস না হয়, তত দিন তাহার প্রতিকারের প্রযত্ন উপস্থিত হয় না। সুতরাং তখন শোণিত-

* আমরা এ বিষয় সম্যক্‌রূপে সভ্যতার ইতিহাসের চতুর্থ অধ্যায় বর্ণন করিয়াছি।

শুষ্ককারী অত্যাচার সহ্য করিয়া লোকে নীরব থাকিত। এ রূপ শোচনীয় অবস্থা পৃথিবীতে চলিয়াছে এবং এখনও কতিপয় অসভ্য জাতি মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্রমে যখন বিদ্যালোচনা হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক বৃত্তি সমুদয়ের উৎকর্ষতা লাভ করিতে আরম্ভ করিল। তখন রাজার দুই একটা কার্য্যের উৎকর্ষতাপর্ষকতার বিচার হইতে লাগিল। তখন রাজার দৌরাত্ম্য নিরতিশয় অসহনীয় হইলে দুই একজন সিংহাসন চ্যুত হইতেন। গ্রীস এবং রোমান ইতিবৃত্তে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ রহিয়াছে। এই জন্যই খৃ ৫০৯ বর্ষ পূর্ব্বে রোমে কনসল* পদ স্থাপিত হয়। বিদ্যার উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়াতে লোকে রাজার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিল। তাঁহার প্রতিকার্য্যের তখন আলোচনা হইতে আরম্ভ হইল এবং তাঁহার ক্ষমতার ও সীমা নির্ণয় হইল। এই সময়ে মানব সভ্য অবস্থায় পদার্পণ করিল। তাহার মানসিক বৃত্তি সমুদায় বিকশিত হইয়া, পরম রমনীয় শোভা ধারণ করিল। তখন বুদ্ধি প্রভাবে মনুষ্য সমস্ত জড়জগৎ এবং মানসিকজগৎ স্বীয় আয়ত্বাধীন করিয়া, এবং সর্ব্ব বষয়ে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া আপন সুখ বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

ব্যক্তি সমষ্টি মিলিত হইয়া সমাজ স্থাপিত হয়। স্বাধীন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ এবং শরীর ও সম্পত্তি নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ সকলেরই ইচ্ছা। কিন্তু অবস্থাভেদ এবং অভ্যাস দোষে লোক অন্যের উপর আক্রমণ করে। সমাজ অন্তগত এবম্বিধ অত্যাচার নিবারিত না হইলে তাহা অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমার কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ আছে, অপর এক বলবান্ ব্যক্তি সেই ধন লিপ্সু হইয়া আমাকে আক্রমণ করিয়া তাহা কাড়িয়া লইয়া গেল। এ অবস্থায় আমার পুনর্ব্বার আর ধন সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা হইবে না। কিম্বা আমি, আবার অপেক্ষাকৃত বলহীন লোককে নিস্ব করিব, অথবা আমি আমার আক্রমণ কারীকে প্রতিফল দিতে আরম্ভ করিলাম। পরস্পর যদি এই ভাব উপস্থিত হয় তাহা হইলে আর সমাজের মঙ্গল কোথায়? অতি অল্প কালেই সংসার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। তখন মনুষ্য এবং পশুতে কোন প্রভেদ থাকেনা। অতএব এই শোচনীয় অবস্থা পরিহারার্থে সমাজের যাবতীয় লোক সংমিলিত হইয়া কতিপয় নিয়মাবলী প্রস্তুত করে এবং

* কথিত আছে খৃীস্টের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গর্ব্বিত টারকুইন নামক একজন ব্যক্তি রোমের রাজা হইয়াছিলেন। টারকুইন প্রজাদিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেক্সটসও পিতার সদৃশ লোকের অনিষ্টকারী হইয়া উঠিলেন। একদা সেক্সটস স্বীয় ভ্রাতৃবধূলুক্রিসিয়ার রূপে বিমোহিত হইয়া রজনীযোগে তাঁহার গৃহে অতিথি হইলেন এবং নিশিথ সময়ে যখন বাটীর দাস দাসী নিদ্রিত ছিল, নিষ্কাসিতাসি-হস্তে লুক্রিসিয়ার শয্যা সমীপগত হইয়া বলে স্বীয় দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিলেন। এই ঘটনাতে সমগ্র রোমিয়েরা একত্র হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার অত্যাচারী পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রজাতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল।

তাহা পরিচালনার্থে এক ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টি মনোনীত হয়। ঐ নিয়মাবলীকেই প্রকৃত সংহিতা (আইন) এবং ঐ মনোনীত ব্যক্তিকে বা ব্যক্তি-সমষ্টিকেই প্রকৃত "রাজা" বলা যায়। রাজা প্রজা মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধই স্বাভাবিক সম্বন্ধ। স্বাধীন দেশ মাত্রেই এই নিয়মে রাজ কার্য্য চলিতেছে। যে দেশে প্রজার সম্মতি ব্যতীত আইন প্রস্তুত হয় সে দেশ কখনই স্বাধীন বলা যাইতে পারে না। স্বাধীন তন্ত্র দেশে সমাজ-প্রতিষ্ঠিত-ব্যবস্থা বহির্ভূত কার্য্য করিতে রাজার ক্ষমতা নাই এবং প্রয়োজন-বশতঃ করিলে তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রতিফল ভোগ করিতে হয়। বস্তুত এরূপ নিয়ম না হইলে সমাজের সর্বাঙ্গ সুন্দর মঙ্গল হয় না; এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে কোন সভ্য দেশে ভবিষ্যতে রাজপদ-সৃষ্ট হইতে গেলে উপরোক্ত নিয়মে স্থাপিত হইবে।

স্বর্ণলতা

৪র্থ অধ্যায়।

"সোনার চন্দ্রহার"

মাতার সদ্গুণ সন্তানে সর্ব্বদা বর্ত্তে না বটে, কিন্তু তাহারা দোষের ভাগ সচরাচর সুদ সমেত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পিতা পুত্র উভয়েই পণ্ডিত অতি বিরল, কিন্তু উভয়েই চোর এরূপ প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে। প্রমদা তাহার এক উদাহরণ স্থল। তাঁহার পিতার নাম দেবরাজ ভট্টাচার্য্য। বাটী চন্দ্রভূষনের বাটীর অতি নিকটে, দ্বেষ, হিংসা কলহ প্রিয়তা ইত্যাদি কতকগুলি দেবরাজ ভট্টাচার্য্যের বংশের দোষ। তাঁহার বংশের কন্যা যে পরিবারে গিয়াছে সে পরিবারেই দ্বন্দ্ব কলহের ভদ্রাসন হইয়াছে। প্রমদা এই পৈতৃক সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতার যে সরলতা একটী গুণ ছিল তাহার লেশ মাত্রও পান নাই। যাজকের অবস্থা ইদানীং যত ভাল তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিবাহ হওয়া অবধি প্রমদা দুটী একটী টাকার মুখ দেখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে যখন শাশুড়ীর মৃত্যুর পর গৃহের একমাত্র কর্ত্রী হইলেন তখন তিনি আর পৃথিবীকে তৃণজ্ঞানও করিতেন না। যখন ৪ গাছা মল পায়ে দিয়ে বাটীর বারাণ্ডার উপর বেড়াইতেন তখন আর বাটীতে অন্য কিছুই শ্রুতিগোচর হইত না।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে বিধুভূষণ কোন কায কর্ম্ম করিতেন না। কিন্তু সরলার নিকট হইতে প্রমদা তাহার বিলক্ষণ রূপে ক্ষতি পূরণ করিয়া লইতেন। প্রমদা নিজ গৃহ হইতে কখনই বাহির হইতেন না। রন্ধনাদি এবং অন্যান্য গৃহ কার্য্য সমুদয়ই সরলাকে করিতে হইত। এর উপর আবার ভাত বাড়িয়া লইয়া উপরের ঘরে প্রমদাকে দিয়া আসিতে হইত। যদি কেহ কখন এ বিষয় লইয়া প্রমদাকে কিছু বলিত তাহা হইলে প্রমদা অমনি বলিতেন "কিইবা কায যে তা নিয়ে এত কথা জম্মে, আমি যদি রোগা না হইতাম তাহা হইলে একায দেখ্‌তে দেখ্‌তে করে ফেলিতে

পারিতাম।" প্রমদা যখন তখন এই পীড়ার কথা কহিতেন পীড়াটী কি তাহা বলা দুঃসাধ্য। কারণ সে পীড়া-বশতঃ প্রমদাকে এক দিনও উপবাস করিতে দেখা যায় নাই, শরীর কখন ক্ষীণ হয় নাই, বরঞ্চ উত্তর উত্তর পুষ্টি দেখা যাইত। পীড়াটীর এক লক্ষণ মাত্র জানা আছে যে সকালে সকালে আহার না হইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত। পাঠকবর্গ এখন বুঝান এ কোন্ পীড়া।

বৈকালে মনোহারীর দ্রব্যাদি লইয়া প্রমদা ও সরলার যে কথোপকথন হয় তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। সরলা বাটী আসিয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহাও জানিতে পারিয়াছেন। অতঃপর প্রমদা কি করিলেন তাহা শ্রবণ করুন। স্বভাবতঃ যেরূপ পদধ্বনি করিয়া থাকেন তদপেক্ষা ১০ গুণ অধিক শব্দ করিয়া প্রমদা নিজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বাররুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। বাটীর লোকে সেই শব্দ শুনিয়াই স্থির করিল আজ একটা না একটা বিভ্রাট ঘটিবেক।

প্রমদার বাক্য গুলি এমন মিস্ট যে একবার শুনিলে আর কেহ তাহা দুবার শুনিতে ইচ্ছা করিত না। সুতরাং কারণ জিজ্ঞাসা করিতে কেহ অগ্রসর হইত না।

বিপিন পাঠশালা হইতে বাটী আসিয়া মায়ের নিকট যাইতেছিল কিন্তু দরজা বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া গেল। কামিনী "মা ম" করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রমদা তথাপি উত্তর দিলেন না।

বাটীর দাস দাসী, কর্ত্তা ও গৃহিণীরই বশীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু শশিভূষণের বাটীতে এ নিয়ম খাটিত না। শ্যামা প্রমদাকে যত ভক্তি না করিত, সরলাকে তাহা অপেক্ষা অধিক করিত। তাহার কারণ উভয়কেই সমান তিরস্কার খাইতে হইত। এজন্য উভয়ের পরস্পরর মিত্রতা হইয়াছিল। সরলাকে তিরস্কার করিলে শ্যামার চক্ষে জল আসিত। শ্যামাকে তিরস্কার করিলে সরলা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। শ্যামার এক বিশেষ গুণ এই ছিল যে, যে, যেখানে পরামর্শ করুক না কেন, শ্যামা তাহা শুনিতে পাইত। এরূপ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সর্ব্বস্থানে যাইত যে কেহই তাহা জানিতে পারিত না। কথাটী সমাপ্ত হইলেই তথা হইতে প্রস্থান করিত এবং সরলার নিকট আসিয়া সমুদায় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিত। সরলাও শ্যামার নিকট কোন কথা গোপন করিতেন না।

সরলা শ্যামার নিকট মনোহারীর দোকান সম্বন্ধীয় সমুদয় বিবরণ কহিল। শ্যামা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল "আজ আর একখানা গয়না হবে।"

ক্রমে ক্রমে দিবা অবসান হইল। শশিভূষণের বাটী আসিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া শ্যামা নিয়মিত জল গাড়ুটী, গামছা খান, ও খড়ম জোড়া বারাণ্ডায় রাখিল এবং ঠাকুর ঘরে আহ্নিকের জায়গা করিয়া দিল। সরলার চিত্তে নানাবিধ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রমদা শয্যোপরি শয়ন করিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন। নেত্রাসার বর্ষণ হইতে

লাগিল। পাড়া হইতে খেলা করিয়া বিপিন আসিয়া "মা মা" করিতে লাগিল। কামিনী কান্না ধরিল এমন সময় শশিভূষণ বাটী উপস্থিত হইলেন।

প্রত্যহ যেরূপ প্রথমতঃ নিজের গৃহে যাইতেন, অদ্য শশিভূষণ সেইরূপ যাওয়াতে গৃহদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া "ঘরে কে আছ" বলিয়া বারম্বার ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। পরিশেষে শ্যামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন "শ্যামা এরা কোথায় গিয়াছে?"

শ্যামা উত্তর করিল "ঐ ঘরের মধ্যেই আছেন।" এই বলিয়া একটা কলসী লইয়া শ্যামা জল আনিবার ছলে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শশিভূষণ এবার কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বলি দোর খুলে দেবে না আমি চলে যাব"।

প্রমদা বুঝিতে পারিলেন যে আর অধিক কস্‌টাইলে লেবু তিক্ত হইবেক, এজন্য আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। শশিভূষণ তাঁহার আরক্ত-নয়ন, মলিন-বদন ও ঘন-নিশ্বাস দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন কাণ্ডটা কি। কারণ প্রমদার পক্ষে এরূপ রাগ করা নূতন ব্যাপার নহে। মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন হইলেই রাগ হইত। একখান নূতন গয়না কিম্বা একখান ভালরকম কাপড় লইতে হইলেই প্রমদা রাগ করিতেন। এবং শশিভূষণও প্রার্থিত দ্রব্যাদি দিয়া রাগ ভঙ্গ করিতে ক্রুটী করিতেন না। এজন্য শশিভূষণ নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আজ আবার কি?"

কোন উত্তর নাই।

"বলি আজ আবার কি হোলো?"

নিরুত্তর! যেন দেয়ালের সহিত কথোপকথন হইতেছে।

তৃতীয়বার জিজ্ঞাসায় কোন উত্তর না পাইয়া, শশিভূষণ মনে করিলেন "আজকের ব্যাপারটী বড় লঘু নহে," শ্যামাকে ডাকিয়া বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যাউক। এজন্য শ্যামা শ্যামা করিয়া ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু তাহারও উত্তর না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি বিপদ কেউ কি আমার কথার জবাব দেবে না"?

এই কথা শুনিয়া প্রমদা সকরুণ বচনে কহিলেন "কি, কি বল্‌ছো?"

শশী। "এতক্ষণ পরে হুঁস হলো না কি? না তুমি এখানে ছিলে না?" না কালা হইয়াছ যে আমার কথা এতক্ষণ শুনিতে পাও নাই"?

প্রম। "আমি কালাই হই আর কাণাই হই, লোকের তাতে কি ক্ষতি? আমাকে যদি কেউ দেখিতে না পারে তবে আমাকে বলে না কেন? তাহলে আমি চলে যাই তাদের উৎপাত যায়।"

শশিভূষণ সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর বিরক্ত হইয়া বাটী আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া রাগত হইয়া কহিলেন "রোজি বল চলে যাব। কৈ যাও দেখি কোথায় যাবে?"

প্রম। "কেন আমার কি আর যাবার

জায়গা নাই? বাপের বাড়ী গিয়া পড়ে-থাকলে তারা চাট্টি না দিয়ে খেতে পার্ব্বে না।”

বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলাপানা চক্র। প্রমদার বাপের বাড়ীর অবস্থা তো “অদ্য ভক্ষ্য ধনুগুর্ণঃ”। নিকট বলিয়া প্রমদা মাঝে মাঝে চাল্‌টে ডাল্‌টে, কখন টাকাটা সিকেটা চুরি করে দিতেন, তাহার জোরেই দেবরাজের প্রত্যহ আহার চলিত।

শশিভূষণ টের পাইয়া সে সকল দেখিতেন না। এজন্য প্রমদার বাপের বাড়ীর যাবার কথা শুনে তাঁহার হাসি আইল। বলিলেন “যাও এক্ষণেই যাও, কিন্তু আমি চাল ডাল পাঠাতে পারিব না।”

বাপের বাড়ির নিন্দা কখনই স্ত্রীলোকের সহ্য হয় না। তাতে প্রমদা রাগ করিয়াছিলেন এজন্য শশিভূষণের ব্যাঙ্গোক্তি শুনিয়া, একেবারে মর্ম্মে বেদনা পাইলেন এবং অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শশিভূষণ বুঝিতে পারিলেন প্রমদাকে গুরুতর বেদনা দেওয়া হইয়াছে. কিন্তু তখনিই কোন সান্ত্বনার কথা কহিলে বেদনার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবেক এই ভাবিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু স্থানান্তরে গিয়াও অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। এজন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা আন্দাজ পরে আবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন প্রমদা শয়ন করিয়াই আছেন। কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসিলেন “কি, হইয়াছে!” প্রমদা উত্তর দিল না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তথাপি কোনই উত্তর পাইলেন না।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শশিভূষণ আরম্ভ করিলেন, “অদৃষ্টে যার যা লেখা থাকে কার সাধ্য তা খণ্ডন করে; মনে করিয়া আসিতেছিলাম যে, যে চন্দ্রহারের জন্য এক বৎসর দরবার হইতেছে আজ তাহার বায়না; আজি বাটী গিয়া বড়ই আদর পাইব. কিন্তু অদৃষ্টে তাহা নাই। সুতরাং কিপ্রকারে তাহার সঙ্ঘটন হইবে? আদর পড়ে মরুক আজ কথাটিও শুনিতে পাইনা।”

শশিভূষণ পুর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন “বিধু কহিত এখন চন্দ্রহার স্থগিত রাখিয়া বরঞ্চ বৈঠকখানা ঘরটা সম্পূর্ণ করুন। আমি মনে করিলাম বৈঠকখানা তো হবেই, যেখানে অর্দ্ধেক হইয়াছে আর অর্দ্ধেক বাকি থাকিবেক না।”

প্রমদা আর থাকিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ সোনার চন্দ্রহারের কথা, দ্বিতীয়তঃ তদ্বিষয়ে বিধুভূষণের প্রতিবন্ধক জন্মান ইহা শুনিলে মৃত হইলেও প্রমদার চৈতন্য হইত। তিনি কহিলেন, ওদের দুজনের জ্বালাতেই তো আমি চির কাল্‌টা জ্বালাতন হইলাম। আমার এত অনিষ্ট করিয়াও কি তোদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না!

শশিভূষণ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ওরা কারা আর তোমাকেই বা কি জ্বালাতন করিল?”

প্রম। “কি জ্বালাতন করিল আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? কেন বাকি রেখেছে কি?”

শশি। “স্পষ্ট করিয়া না বলিলে তো

আমি বুঝিতে পারি না। আমি তো জানু নই যে এক কথার অর্দ্ধেক না শুনিয়াই সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিব ? তুমি তো একা বিধুর নাম কর নাই, ওরা বল্লে। সে কে কে তাহা কি প্রকারে জানিব ?”

প্রমদা। “কে, কে আবার, কে হতে পারে? কর্ত্তা আর গিন্নী। কর্ত্তাটী তোমার পাছে লেগেছেন; আমার কিছু হইলেই যেন তাঁর সর্ব্বনাশ হয়। তিনি যেন নিজের টাকা ভেঙ্গে দিয়েছন। আর গিন্নিটী যাতে আমি পাঁচজনের কাছে অপদস্থ হই তাহারই চেষ্টায় থাকেন।”

শশী। “কেন বিধু তোমাকে তো না দেবার কথা বলে নাই, সে বলিতেছিল লোক জনটা এলে স্থানাভাবে কষ্ট হয়, এজন্য বৈঠকখানাটা আগে হইলেই ভাল হয়।”

প্রমদা। “ইচ্ছায় বলি কি তোমার বুদ্ধি কম? তুমি ভাল মানুষ ওসব তো বুঝিতে পার না। বিধুটীকে বড় সহজ লোক জ্ঞান করিও না। বৈঠকখানার উপর এত যত্ন কেন তাতো জান না। ওকি বৈটকখানা হইলে তোমার যে ভাল হবে তার জন্য বলে ? তা নয়। ওতো এখনও পাড়ায় থাকে তখনও থাকিবে। তবে কিনা বৈঠকখানা হইলে তার ভাগ পাবে আর আমার গয়না হইলে তো পৃথক হইবার সময় তাহার অংশ পাইবে না।”

প্রমদা যে শশিভূষণকে বোকা বলিতেন সেটী বড় মিথ্যা কথা নয়। বস্তুতই এসব বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি তাদৃশ ঘুরিত না। কিপ্রকারে প্রজা দিগকে কষ্টদিয়া পয়সা আদায় করিতে হয়, এবং তাহার জমা খরচ রাখিতে হয় ইহাই বুঝিতেন। এক্ষণে প্রমদা যাহা বলিলেন তাহা ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় সত্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন হাঁ এত দিনের পর বুঝিতে পারিলাম। এইজন্যই ভায়া আমায়, যখন তখন, সর্ব্ব কার্য্যের অগ্রে বাটীটী সম্পূর্ণ করা ও বিষয় আশয় করার পরামর্শ দেন এবং স্ত্রীর গয়না দেওয়া আর টাকা জলে ফেলে দেওয়া সমান বলিয়া থাকেন। বটে আমি এতদিনে টের পেলাম তুমি বর্ণ-চোরা আঁব।

এতদূর পর্য্যন্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া স্পষ্ট কহিলেন “তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ। আমি যদি ইহা অগ্রে জানিতে পারিতাম তবে একখানি ইটও প্রস্তুত করিতাম না।”

প্র। “তুমি তো আমার কথা শুন না জিজ্ঞাসাও করো না। তুমি মনে মনে ভাব তোমার ভাইটী যেমন রামের ভাই লক্ষণ। কিন্তু ওটী যে ভরত তাতো জান না।”

শ। “বৈঠকখানা ঐ পর্য্যন্তই থাকিল দেখি কে করে। আর কি বলিতেছিলে? গিন্নীর কথা কি বলিতেছিলে?”

প্র। বলিতেছিলাম গিন্নিটী কর্ত্তার বড়ো তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য। তাঁর সর্ব্বতোভাবে যত্ন কিসে আমাকে তোমাকে অপমান করিতে পারেন।”

শ। “কি আমাকে অপমান ? যারি খাবেন তারি সর্ব্বনাশ কর্ব্বেন?”

প্র। “সেকথা বলে কে?”

শ। “কি, কি অপমানের কথা বলেছে বলতো?”

প্র। "বাকিই বা কি রেখেছেন ? তুমি শুনিলে প্রত্যয় করিবে না, আজি একজন মনোহারি দোকান লইয়া আসিয়াছিল। বিপিন কামিনী ছাড়েনা এইজন্য ও পাড়ায় দিগম্বরী ঠাকুরুণ দিদির কাছথেকে দুইটী পয়সা ধার করিয়া ওদের দুটী বাঁসি কিনে দিলাম। ছোট গিন্নী তাই দেখে রাগ করে, সেখানে থেকে চলিয়া এসে, গোপালকে ডেকে নিয়া একটা বাঁসি দিলেন। দাম দেবার সময় বল্লেন "দীদী আমাকে একটা পয়সা ধার দাও আমি সুদ দেব। আমি বলিলাম এক পয়সার আবার কি সুদ ভাই আমি তো জানি না। ছোটবোউ বল্লেন চিরকাল মাহাজনি করিতেছ জান না কেন। শুনে অবাক হইয়া থাকিলাম। ছোটবউ তার পর যা মুখে এলো তাই বল্লে।"

শ। "কি কি কথা বল্লে ?"

প্র। "আমার তত মনে নাই, আমি সাদা মানুষ অত কথার পেঁচ বুঝিনা ; ওপাড়ার সকলেই ছিল শুনিয়াছে। তোমার যদি শুনিবার ইচ্ছা থাকে কালি দিগম্বরী ঠাকুরুণ দীদীকে ডাকিয়া আনিব সেই সমস্ত বলিবে।"

শ। "হাঁ এ যে শোনা উচিত হইতেছে। কালি অবশ্য করে দিগম্বরীকে ডাকিয়া আনা হয় যেন।"

প্র। "তাতো হবে, কালিকার কথা কালি কবে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সত্য বলিবে ?

শ। "কেন বলিব না ? অবশ্য বলিব।

প্র। "যতার্থ কি চন্দ্রহারের বায়না দেওয়া হইয়াছে ?"

শশিভূষণ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "হাঁ হইয়াছে ; কেন ?"

প্র। "তোমার কথা শুনে বোধ হইতেছে হয় নাই।"

শ। "তবে হয় নাই।"

প্র। "কেন তবে মিথ্যা কথাটী বল্লে ?

শ। "মিথ্যা বলিয়াছি বটে কিন্তু কালি সত্য হইবেক। কালি সেঁকরা ডেকে বায়না দেব। ভেবে ছিলাম আগে বৈঠকখানাটাই সমাধা করিব, কিন্তু তোমার মুখে যেসব কথা শুনিলাম, তাহাতে আর বাটী প্রস্তুত করিতে আমার ইচ্ছা নাই। নিজে পরিশ্রম করিয়া পরকে কে কোথায় দিয়া থাকে ?"

প্রমদা আর কথা কহিলেন না।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবে, শ্যামা দাসীর গুপ্তকথা শুনা একটা রোগ ছিল। দ্বারে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া উল্লিখিত কথোপকথনের আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া সরলার নিকটে গিয়া কহিল "কেমন খুড়ি মা আমি যা বলেছিলাম তা সত্য হলো কি না ?"

সরলাও কি কথোপকথন হইয়াছে শুনিতে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। শ্যামাকে দেখিয়া কহিলেন "কি শ্যামা কি বলেছিলি যে সত্য হলো।"

শ্যা। "আমিতো বলে ছিলাম মা যেদিন রাগ করিবেন সেই দিন একখান অলঙ্কার হবে। আজি সোনার চন্দ্রহার।"

শ্যামা চন্দ্রহার হইতে আরম্ভ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ সরলাকে কহিল।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিবরণ।

উপক্রমণিকা।

আমরা, প্রথম সংখ্যক পত্রে স্পষ্টতঃ বলিয়াছি, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারই বঙ্গ দেশের উন্নতির আদি কারণ। অতএব সর্ব্ব বিষয়ের পূর্ব্বে আমরা তাহারই ইতিহাস বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রাচীন আর্য্যাদিগের সর্ব্ববিষয়েরই প্রকৃত ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। ইহাঁদিগের মধ্যে কবিগণই ধর্ম্মশাস্ত্র লেখক, দার্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ ও ইতিহাস রচয়িতা। কবি-কল্পনাসম্ভূত বাগাড়ম্বর ও রচনা-চাতুর্য্য প্রদর্শিত হওয়াতে সকল বিষয়ই নানারূপ কাল্পনিক অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে। কোথাও প্রকৃত সত্য পাওয়া যায় না। সুতরাং এদেশে কোন্‌সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রথম উৎপন্ন এবং কাহার দ্বারাই বা প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা নিরূপণ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তথাপি নিঃসংশয়ে একথা বলা যাইতে পারে যে, ইহা কখনই ভারত ভূমিতে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিলনা। গত ৯। ১০ শতাব্দী মাত্র ইল প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বিরোচন, বলী, হনুমান্ বিভীষণ, গুহ, হরিশ্চন্দ্র আম্বিরস, বিদুর, সুদামা, চন্দ্রহংস, কুন্তি, দ্রৌপদী, শ্রুতদেব, প্রাচীন বর্হ, বাল্মীক, রুক্মাঙ্গদ, ময়ূরধ্বজ, সুরথ, সুধন্না, অক্রূর, পরীক্ষিত, শুকদেব প্রভৃতি বিখ্যাত নামা বিষ্ণুভক্তমহাপুরুষগণ সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

ধ্রুব ও প্রহ্লাদ—প্রহ্লাদের পূর্ব্বে, ধ্রুব ব্যতীত আর যে কেহ বিষ্ণুপাসক ছিলেন পুরাণাদিতে তাহার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে হিরণ্যকশিপু নামক একজন ভূপাল ছিলেন, প্রহ্লাদ তাঁহারই জ্যেষ্ট পুত্র। হিরণ্য কশিপু নিরতিশয় যজ্ঞাদি আসক্ত ছিলেন, কিন্তু প্রহ্লাদ ভক্তি মার্গের প্রাধান্য অনুভব করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে পিতার বিপরীত মতাবলম্বন করিয়া ছিলেন। হিরণ্য কশিপু পুত্রের ঈদৃশ মত সন্দর্শনে যার পরনাই দুঃখিত ও কুপিত হইয়া পুত্রকে নানারূপ অনুনয় বিনয় ও উৎপীড়নাদি করেন, কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই আপনার বিশ্বাসের বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করেন নাই। প্রহ্লাদের সরল ভক্তি ও বিশ্বাস এবং নানারূপে উৎপীড়িত হওয়া সম্বন্ধে পুরণাদিতে অনেক কথার উল্লেখ দেখা যায়। সে যাহাহউক প্রহ্লাদ হইতেই প্রথমতঃ বিষ্ণূপাসনা ও কর্ম্মকাণ্ডোপরি ভক্তির প্রাধান্য বিস্তৃত হয়, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিরোচন ও বলী ইহাঁরই পুত্র ও পৌত্র।

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে স্বয়ম্ভুর বংশে উত্তানপাদ নামক একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। উত্তান পাদের ২ টী মহিষী ছিল; জেষ্টার নাম সুরুচি ও কনিষ্টার নাম সুনীতি। উত্তান

পাদ জেষ্ঠা মহিষীতে সমধিক আসক্ত ছিলেন, সুতরাং সদসৎজ্ঞান শূন্য হইয়া তাহার গর্ভজাতসন্তান উত্তানের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করেতেন, আর সুনীতি তাদৃশী রাজার অনুরাগ ভাগিনী ছিলেন না সুতরাং তাঁহার তনয় ধ্রুবও রাজার আদর পাইত না।

পিতার অনাদরে ধ্রুব আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া বন গমন করিলেন এবং বিষ্ণুপ্রতি মনঃস্থির করিয়া বহুকাল তপস্যা করিলেন। ধ্রুবের সরল বিশ্বাস ও ভক্তি বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে বাহুল্য রূপে বর্ণিত আছে. কিন্তু তদ্বিষয় সমুদায় বিশ্বাস যোগ্য না হইলেও একথা বলা যায় যে তিনি কর্ম্মকাণ্ড-বিরহিত-বৈষ্ণব ছিলেন।

হনুমান্—এই মহাপুরুষের নাম সকলেই অবগত আছেন? ইনি বোধহয়, দাক্ষিণাত্যবাসী একজন ভারতবর্ষের আদিম জাতীয় লোক; হনুমান্ বড় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন।

বিভীষণ—বিভীষণ লঙ্কাধিপতি মহারাজ রাবণের সর্ব্ব কনিষ্ট ভ্রাতা। রামায়ণে রাবণের সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে বোধহয়. তিনি নামে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী মাত্র ছিলেন. কিন্তু সর্ব্বদা নানারূপ পাপকার্য্যে আসক্ত থাকিতেন। বিভীষণ বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার সাতিশয় নিষ্টাও ছিল।

বিভীষণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এতই প্রবল ছিল যে, তিনি ন্যায়ানুরোধে ভ্রাতার বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বন ও স্বজন বর্গের এমন কি আপন পুত্রের মৃত্যুদর্শনেও কুণ্ঠিত হন নাই।. বিভীষণ ভক্তির প্রাধান্য মাত্র স্বীকার করিতেন. কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড বিরহিত ছিলেন না।

আঙ্গিরস—মহারাজ আঙ্গিরস একজন পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। কথিত আছে আঙ্গিরসের যশঃ সৌরভ এত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে পার্শ্বস্থলোক তাহা শুনিয়া একেবারে মোহিত হইয়াছিল।

বিদুর—এই মহাপুরুষের বিষয় যেরূপ শুনা যায়. তাহাতে বোধহয়. তিনি একজন পরম ধার্ম্মিক ছিলেন এবং কর্ম্মকাণ্ডানুযায়ী চলিতেন না।

সুদামা, কুন্তী, দ্রৌপদী, চন্দ্রহংস, পরীক্ষিত. ময়ূরধ্বজ প্রভৃতি যদিও ভক্তি মার্গের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যজ্ঞাদি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও যজ্ঞাদিতে উৎসাহও দিয়াছেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি ২। ১টী ব্যতীত পূর্ব্বকালীয় কোন বৈষ্ণবই কর্ম্মকাণ্ড বিরহিত ছিলেন না। প্রহ্লাদ ভগবদ্গীতা রচনারও পূর্ব্বকালীয় লোক।

এই ভগবদ্গীতা রচিত ও প্রকাশিত হইলে অনেক * লোক ইহার মতানুযায়ী বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু ২।১ জন সন্ন্যাসী ব্যতীত কেহই বোধ হয় তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতেন না। এই সকল মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পুরাণাদিতে এত অস্পষ্ট ভাবে রচিত আছে যে, সত্য মিথ্যা নির্ব্বাচন করা অতীব দুরূহ। সু-

* পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ গীতার পর।

তরাং একালের ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া আমরা কিরূপে বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্ব কালীয় ভারতবাসিগণ, বেদভিন্ন অন্য কিছুই বুঝিতেন না। যত সম্প্রদায়ই দৃষ্ট হয় সকলেই বেদকে অবিচলিত ভক্তি করেন এবং এক বেদকেই আপনাদিগের মতের মূলরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আবার বেদ ও আর্য্যদিগের অন্যান্য গ্রন্থাদি যে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাহা বড়ই দুর্ব্বোধ। বুদ্ধির প্রাবল্য থাকিলেই ভাষা দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে॥ এই জন্যই এক বেদ অবলম্বন করিয়া পরস্পর বিরোধী সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন সম্প্রদায় ও তান্ত্রিক বৈষ্ণবাদি ধর্ম্মবাদ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই বেদ হইতেই ভগবদ্গীতার উৎপত্তি হয় এবং ভগবদ্গীতাই বৈষ্ণব দিগের আদিগ্রন্থ। ভগবান্ ব্যাসদেব আত্মীয়-স্বজনসহ যুদ্ধে অনিচ্ছুক অর্জ্জুনকে সংসার মিথ্যা ও সকলের সহিত সম্বন্ধ অকিঞ্চিৎকর এই মূলে শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে যে কতিপয় উপদেশ দেন, তাহাই ভগবদ্গীতা নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া বিখ্যাত।

ভগবৎগীতা ভক্তি মূলক গ্রন্থ, কিন্তু তথাপি তাহাতে কোন কোন স্থানে কর্ম্মকাণ্ডের উল্লেখ দেখা যায়। ভগবৎ গীতার মত আমরা নিম্নে উর্দ্ধৃত করিলাম।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যক।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি।

৮ম অধ্যায় ১১ শ্লোক

পরমেশ্বরের সত্ত্বাদি গুণ স্বরূপ মায়া যাহা হইতে মুক্ত হওয়া অতি কঠিন, যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক অবিচ্ছেদে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই মায়ামুক্ত হইয়া আমাকে জানিতে পারেন।

তেষাং জ্ঞানী নিত্য যুক্ত
এক ভক্তি গমিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানি নো হত্যর্থ
মহং সচ মম প্রিয়ং॥

৮ম অধ্যায় ১৬ শ্লোক।

কয়েক প্রকার ভক্তের মধ্যে আত্মজ্ঞানী সর্ব্ব প্রধান, কারণ এক আত্মজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্বদা ঈশ্বর নিষ্ঠ ও ভক্তিমান অতএব আত্মজ্ঞানীরা আমার বিশেষ প্রিয়।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্তনন্যয়া।
যস্যান্তস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততং॥

২২ শ্লোক ৮ম অধ্যায়

হে পার্থ! যে অনাদি কারণের মধ্যে সকল সংসার তিষ্ঠিয়া থাকে এবং চরাচর বিশ্ব যৎ কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত কেবল তাঁহার প্রতি ভক্তি রাখিলেই সেই পুরুষ লভ্য হয়।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমং।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্মং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং॥

৯ম অধ্যায় ২৩ শ্লোক

হে অর্জ্জুন! তুমি, যে জ্ঞান দ্বারা সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, পরমেশ্বরকে জানিতে সক্ষম হইবা, আমি তোমাকে তাহাই বলিতেছি। এই জ্ঞান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুহ্য ও পবিত্র, ইহার

ফল প্রত্যক্ষ আর বেদোক্ত সমগ্র কর্ম্ম ফল এই জ্ঞানের অন্তর্ভূত। অনায়াসে এই জ্ঞান অভ্যাস করিয়া অক্ষয় হওয়া যায়।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামু পয়ান্তিতে
১ শ্লোক ১০ম অধ্যায়।

যাঁহারা নিরন্তর আমাতে আসক্ত ও আমাকে প্রীতি করেন, তাঁহারা পরম সুখী!

এতদ্ব্যতীত একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সর্ব্বপ্রকার কামনা বিরহিত হইয়া কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং বোধ হয় কালে ইহা হইতেই ভগবতের নিষ্কাম ভক্তি-তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে।

তৎপর দ্বাদশ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত হইবার ও স্পষ্টাক্ষরে বিধান দৃষ্ট হয়।

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং॥
৭ শ্লোক ১২শ অধ্যায়।

যজ্ঞাদি পশু অথবা বৃক্ষ লতাদি হিংসা ব্যতীত সম্ভূত হয় না, এজন্য সাংখ্য কারিরা তাহা স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করেন। কিন্তু ভগবৎগীতার এই মত, যতদিন চিত্তের সকামত্ব দূর না হয় ততদিন নিত্য কর্ম্ম করিবেক এবং তৎপরে একেবারে কর্ম্ম কাণ্ড বিরহিত করিয়া ভক্তি-মার্গে বিচরণ করিবেক। ভগবৎগীতার মূলভাব নিষ্কাম ভক্তি।

এই ভগবৎগীতা হইতে কালে ভাগবতের উৎপত্তি হয়। ভাগবতের ভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, তাহা কখনই অতীব প্রাচীন গ্রন্থ * নহে; কয়েকটী আধুনিক পুরাণ ব্যতীত আর্য্যদিগের প্রাচীন গ্রন্থাদির কোন স্থানেও ভাগবতের নামোল্লেখ দেখা যায় না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের বিধি নাই। গীতা বলেন, মূর্খেরা এ কার্য্য করে। যথা—

"তক্ষবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।
দেবান্দেব যজোয়ান্তি সভক্তায়ান্তিমামপি॥

কিন্তু ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে স্পষ্ট বিধি দিয়াছেন।

ভাগবৎ তন্ত্রাপেক্ষাও আধুনিক যে হেতু, একাদশ স্কন্ধের যোগ তত্ত্বে স্পষ্টতঃ তন্ত্রকে উল্লেখ করিয়া কয়েকটি বচন লিখিত থাকা দৃষ্ট হয়।

আর্য্য বংশীয়েরা আপনাদিগের কোন গ্রন্থেরই আধুনিকত্ব স্বীকার করেন না; এই জন্য ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে, একজন পাষণ্ড কর্ত্তৃক ভাগবৎ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বারিপতি বরুণ তাহা সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কালে কলিতে বোপদেব ভাগবৎ উদ্ধার করিয়া জগতে প্রচার করেন।

বোপদেবের পরে এবং রামানুজ আচার্য্যের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল বৈষ্ণব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শান্তিশতক লেখক বিল্বমঙ্গলঠাকুর † সমধিক প্রসিদ্ধ।

---

* পুরাণের মধ্যে কেবল বিষ্ণুপুরাণ ব্যতীত আর সমুদায়ই নিতান্ত আধুনিক বোধ হয়। এই বিষ্ণুপুরাণের কোন স্থানেই ভাগবতের উল্লেখ দেখা যায় না।

† ভক্ত মাল গ্রন্থে এই নাম লিখিত থাকা?

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কৃষ্ণানদী তটে কর্ম্ম-বাদী গ্রামে বিল্লমঙ্গল জন্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তিনি যৌবনকালে সাতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন। নদীর অপর পারে চিন্তামণী নাম্নী একজন বেশ্যা বাস করিত, বিল্লমঙ্গল ঠাকুর এই বেশ্যার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। এমন কি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে হইলেই নিরতিশয় ক্লেশানুভব করিতেন। একদা বিল্লমঙ্গল ঠাকুর আপনার পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিবসে স্থির করিয়াছিলেন যে, রজনীতে আর উপপত্নীর আলয় গমন করিবেন না। এইস্থির—সংকল্প হইয়া বিল্লমঙ্গল শয়ন করিয়াছেন, নিশীথ সময় দুর্দমনীয় কামোত্তেজিত হইয়া আর প্রেয়সীর বদন নিরীক্ষণ না করিয়া থাকিতে পারি-লেন না এবং রজনীতে তথায় গমন-সং-কল্প হইলেন। ভক্তমালে লিখিত আছে বিল্লমঙ্গল তরনীপ্রাপ্ত না হইয়া একটী শব মাত্র আশ্রয় করিয়া পর পারে উত্তীর্ণ হইলেন এবং চিন্তামনীর আলয় গমন করিয়া দেখেন যে দ্বারুরুদ্ধ, কিন্তু কাম-মুগ্ধ লোক একবারে বাহ্যজ্ঞান রহিত হয়, সুতরাং একটী সর্পের লাঙ্গুল অবলম্বন করিয়া বাটীর ভিত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া উপপত্নী সমীপগত হইলেন। চিন্তামনী এ তাবত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে অনেক প্রকার তিরস্কার করিতে লাগিল এবং সেই তিরস্কারেই বিল্লমঙ্গলের অন্তরে চৈতন্য উপস্থিত হওয়াতে তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করি-লেন এবং অবশিষ্ট জীবন কেবল ঈশ্বর চিন্তাতেই ক্ষেপণ করিলেন।

আমরা তাহাই লিখিলাম কিন্তু এতদ্দেশে তাঁহার নাম শ্রীহলন বলিয়া বিখ্যাত।

এই বিল্লমঙ্গলই শান্তিশতক নামক বিবেক-উদ্রেক-কর-গ্রন্থের রচয়িতা। শান্তিশতকের লালিত্য ও বৈরাগ্যের ভাব পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবী-ভূত হয়। এই বিল্লমঙ্গলের পরেও অনেক বিষ্ণুভক্ত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তন্মধ্যে রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্ব-কালীয় কোন লোকের বৃত্তান্তই আমরা বিশেষ রূপে অবগত নহি।

নরের প্রতি মৃত্যুর ভৎ‍র্সনা।

হে মূঢ় মানব! চিত্রি বিকট আকারে—
অঙ্গে পরাইয়ে অতি কুৎসিত বসন—
সাজাও আমারে কেন? কিহেতু বা মোরে
ভাব এত শত্রুভাবে? সত্যকরি কহ,
জিজ্ঞাসি তোমারে. মুখেতে আমার কিম্বা
বেশে, কি এমন আছে, যাহা নিরখিলে
নরে পায় ভয়? নরমাংস-লোভী নহি
নৃশংস শার্দ্দুল, কভু নাহিধরি কাল
ফণিনীয় ফণা, নহে রাক্ষস কুলেতে
জন্মমোর। তবে কিকারণে যাও ত্রাসে
পলাইয়া দেখিলে আমায়? কেন মম
পদধ্বনি এত তব শ্রবণ-কঠোর?
মহা ভয়ঙ্কর ঘোর অমঙ্গল দূত,
ইহজগতের সর্ব্ব অনর্থের মূল,
বলিয়া আমরে কেন কর সম্বোধন?
অমূলক এ অপবাদ। আমি নিরন্তর
থাকি মানবের হিতে রত, কভু নাহি

আচরি খলের ভাব। সদা যত্ন পাই
পূরিতে তাহার হৃদি আনন্দের স্রোতে,
বর্দ্ধিতে তাহার সুখরাশি। সত্য বটে
লয়ে যাই দূরদেশে, স্থানান্তর করি,
এসুখ জগত হতে মানব তনয়ে!
কিন্তু সে কেবল সাধিতে তাহার হিত
জানিবে নিশ্চয়, লয়ে যাই শান্তি বাসে,
কি কার্য্য থাকিয়া বৃথা সংসার মাঝে।
প্রিয়জন বিরহেতে কাতর যে নর,
তাহরে শয্যার পার্শ্বে হয়ে উপনীত,
স্পার্শন করাই এই দণ্ড মোহনীয়,
অমনি ত্বরিতে হয় মিলন দোঁহার।
বিধবা সহায় হীনা, কিন্তু সাধ্বী সতী,
শোকেতে কাতরা যদি দেখি কোন নারী,
এমনি আমার হয় দয়াদ্র হৃদয়,
দেখিলে তাহার সেই অশেষ যন্ত্রনা,
দ্রুতপদে গিয়ে তার পর্ণ কুটীরেতে,
(আশঙ্কা পাছেতে তার বাড়ে সে যাতনা)
ত্বরা করি লয়ে যাই স্বর্গ সুখাবাসে।
রোগেতে আতুর অতি শোষিত শরীর
শোকেতে সন্তপ্ত হয়ে আছে যেই নর,
ধীরে ধীরে গিয়া আমি বসি তার কাছে
শ্রবণ করিয়া তার দুঃখের কাহিনী,
বন্ধুভাবে ধরিয়া তাহার দুটী করে
অনায়াসে লয়ে যাই স্বর্গ সুখাবাসে।
ধনহীন যে নরের বহুপুত্র আছে,
অন্নাভাবে কিন্তু সবে হয়ে শীর্ণকায়
পিতারে করিছে ব্যস্ত, আমি তথা যাই
অন্য কোন তাদের না দেখিয়া উপায়,
ত্বরাকরি লয়ে যাই স্বর্গ সুখাবাসে।
অসময়ে হারাইয়ে যুবতী সুন্দরী,
বিরহ দহনে সদা দহিছে যে যুবা,
স্মরিরে সুখের দিন ভাসি আঁখিজলে,
করিতে তাহার সেই যাতনার শেষ,
ত্বরাকরি লই স্বর্গ সুখাবাসে।
জিজ্ঞাসি তোমারে নর তবে কিকারণ
নির্দ্দয় বলিয়া মোরে কর সম্ভাষণ।
সংসারের ক্লেশ দূর করিবার তরে
যে জন লইয়া যায় স্বর্গ সুখাপারে?
যে করে তোমার এত মঙ্গল সাধন,
উচিত কি তার প্রতি এই আচরণ?
অতএব এ অবধি কৃতজ্ঞতা ভরে
নরের বান্ধব বলি ডাকিহ আমারে।

———

The Lotus *

The Brahman says :—
My son, behold the River, watch its rise and fall—
Here feeding smaller streams, and there fed by the small.
But though it fall and rise, still on its bosom grows
The Lotus flower, which from the river's deep arose.
It floats with even balance on the rolling tide
But from its given place it strays to neither side.
No idle tale was that told to us many an hour,
That Brahma's cradle is this very Lotus flower.
A temper, which commands the varying life within
With even balance, is to Brahma's self akin.

* Translated from Rueckert.

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় খগোল ২॥০
,, ,, ভুবনমোহন সরকার পুঠিয়া ২॥০
,, ,, কৃষ্ণলাল মৈত্র পতিসর ২॥০
,, ,, ব্রজনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা ২॥০
,, ,, রামদাস সেন বহরম্পূর ২॥০
,, ,, রামনৃসিংহ মুস্তৌফী বহরম্পূর ২॥০
,, ,, বিষ্ণুচন্দ্র শর্ম্মা ঐ ২॥০
,, ,, তারেশচন্দ্র রায় রুক্মিনীকান্ত দাস ছন্দড়া ০
,, ,, আশুতোষ সান্যাল কৃষ্ণনগর ১।১০
,, ,, রাধাগোবিন্দ দাস বোয়ালিয়া ১।০
,, মিয়া সলিম সরকার বোয়ালিয়া ১।০
,, বাবু দেবেন্দ্রনাথ সিংহ ঐ ৸০
,, ,, কাশীকান্ত সেন ঐ ২॥০
,, ,, কৃষ্ণজীবন সাহা ঐ ২॥০
,, ,, শুকলাল ঘোষ ঐ ২॥০
,, ,, দৈবকীনন্দন সেন ঐ ২॥০
,, ,, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য যগোদল (মাঃ বাবু দৈবকীনন্দন সেন) ২॥০

মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত যে মুল্য আদায় হইয়াছে, তাহাই কেবল প্রকাশিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

পাবনা মেডিকালহল।

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ অপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হইবে শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছুক হইলে পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিয়া ঔষধের মুল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইতে হইবেক।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

হেয়ার প্রিজারভার।

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দ্বারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।]

হেয়ার প্রিজারভার কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, কেশ ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থা হইবে।

ইহার মূল্য প্রতি সিসি „ ১ টাকা
ঐ ডাক মাসুল সহিত „ ১।৶

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড মধুমেহ, অর্শ,বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ বিক্রয়ার্থ "পাবনা মেডিক্যাল হলে" পস্তুত আছে।

ঔষধের মূল্যের জন্য যাহারা পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প পাঠান তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আদ আনা মূল্যের ষ্টাম্প পাঠান।

হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন, তাহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতিদিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে শিরঃ শূল গ্রস্থ রোগের পক্ষে এই তৈল বিশষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য „ ১ টাকা
ঐ ডাক মাসুল সহিত „ ১।৶

কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওয়াউঠা রোগের কর্পুরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৷০ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেকের চারি আনা।

বিলাতি যতপ্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী, ও ব্যবহার্য্য। পত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

Registered No.109.



কোন কোন লোকের অনুরোধে আমরা এবারও কাহাকে কাহাকে অগ্রিম মূল্য ব্যতীত পত্র দিলাম।

বিজ্ঞাপন।

১। জ্ঞানাঙ্কুরের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সহ ২॥০ টাকা প্রতি সংখ্যা।০।

২। এই পত্রে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথম তিন বার পর্য্যন্ত প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা হিসাবে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপন দীর্ঘ স্থায়ী হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

৩। যাঁহারা এই পত্রের গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা রাজসাহী বোয়ালিয়ায় জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিবেন।

৪। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত আর পত্র দেওয়া হইবে না। গ্রাহক গণ মনে রাখিবেন যে তাঁহারাই পত্রের জীবন।

৫। ষ্টাম্প দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিতে হইলে প্রতি টাকায় ১০ অৰ্দ্ধ আনা অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৬। কলিকাতায় যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি বাহির সিমলা সুকাসষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বাবু রজনী কান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়কে পত্র লিখেন এবং তাঁহারই দস্তখত রসীদে মূল্য দেন।

রাজসাহী বোয়ালিয়া
জ্ঞানাঙ্কুর কার্য্যালয়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস।
সম্পাদক।



JNA'NA'NKURA

OR

THE SEED OF KNOWLEDGE

A MONTHLY ANGLO-VERNACULAR MAGAZINE AND REVIEW

OF

LITERATURE, PHILOSOPHY, SCIENCE, HISTORY, BIOGRAPHY, ANTIQUITIES, AND RESEARCHES, POLITICS, ARTS, COMMERCE, &c. &c.

জ্ঞানাঙ্কুর।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয়

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

—:॥:—

সূচী।

কলিকাতা।

বহুবাজার, হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিস্থিত ৫২ সংখ্যক ভবনে,

স্মিথ এণ্ড কোর যন্ত্রে, শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৭৯।

জ্ঞানাঙ্কুর

মাসিক পত্র।

১ ম খণ্ড ফাল্গুন ১২৭৯ ৬ ষ্ঠ সংখ্যা

সভ্যতার ইতিহাস

পঞ্চম অধ্যায়

ক্ষুধা নিবৃত্তি—২ আদিমকালে বিলাস চিন্তা সর্ব্ব প্রধান—৩ বল প্রয়োগ হইতে কালে দাম্পত্যের ভাব—৪ স্বেচ্ছা বিহার উন্মূলিত না হইবার কারণ—৫ স্বেচ্ছা বিহারের ক্রমশঃ হ্রাস—৬ সন্তান রক্ষণ—৭ অকর্ম্মণ্যাবস্থা—৮ লোকে একাকী উন্নত হইতে পারেনা-৯ স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি ও শরীরগত দাম্পত্য সম্বন্ধ—১০ দুই জন পুরুষ এক স্ত্রীতে আসক্ত—১১ স্বেচ্ছা বিহার ও প্রজোৎপত্তি—১২ ক্রমশ উন্নতি প্রকৃতির লক্ষণ —১৩ উপসংহার।

ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলে আদিম নরগণ কাম প্রপীড়িত হইয়াছিল।

সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, বোধ হয় মনুষ্য সৃষ্টহইয়া সর্ব্বাদৌ আহারান্বেষণে সমুদায় সময় ব্যয় করিত। বস্তুতঃ "অন্ন চিন্তা চমৎকারা," লোকমুখে আমরাযে এই প্রবাদটী শুনিতে পাই, তাহা সর্ব্বথা যথার্থ। যতক্ষণ প্রজ্জ্বলিত জঠরানল নির্ব্বাণ না হয়, ততক্ষণ মনের অন্য সমুদায় ভাবই একেবারে ভস্মীভূত হইয়া হৃদয়ে বিলীন হয়। বিবিধ পুষ্পপরিপূর্ণ সুগন্ধ কুসুমোদ্যানে স্থাপিত হইলেও ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি কিছুতেই শান্তি পায় না। ক্ষুধার্ত্ত হইলে বিদ্যা-বুদ্ধি, বেশ-ভূষা, ধন-মান, যশ-অভিমান কিছুতেই অন্তঃকরণকে প্রফুল্ল করিতে পারে না। চিত্তবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা যে অনুপম সুখ হয় তাহাতে মনঃ নিযুক্ত থাকিতে পারে না। অনেক কারণ সত্ত্বেও যখন এই ঊনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় উন্নত ও সুসভ্য সময়ে ক্ষুধার এইরূপ প্রাধান্য দেখিতে পাইতেছি, তখন একথা

সহজেই অনুভব করিতে পারা যায় যে আদিম কালে নরগণ ক্ষুধা নিবারিত না হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক * ক্লেশানুভব করিত।

এই ক্ষুধার শান্তি হইলে যাহার মনে যে ভাবের প্রাধান্য, তাহার মনে তাহাই উদয় হয়। সাধুর মনে ঈশ্বর, অধ্যাপকের মনে গ্রন্থ, সংসারীর মনে অর্থ, জনক জননীর মনে প্রিয় সন্তান এবং ভোগীর মনে বিলাস ভবনের কামিনী। কিন্তু ঈশ্বরকে যে চিন্তা করেনা, তাহার মনে কখন ঈশ্বরের ভাব উদয় হয় না। যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করেনা, তাহার মনে গ্রন্থের কথা উপস্থিতির কোন সম্ভব দেখা যায় না। এবং যশস্বী, মানী বা পিতা ব্যতীত অন্য কেহই যশ, মান বা পুত্রের বিষয় চিন্তা করে না। কিন্তু যৌবনসুলভ কামিনী মূর্ত্তি কল্পনা, কি বিবাহিত, কি অবিবাহিত সকলেই করিয়া থাকে। ইহার নেতা "কাম" ক্ষুধার ন্যায় নিয়তই শরীর সম্বন্ধ। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যেমন স্বভাবতঃ আহার্য্যানুসন্ধান করে, সেইরূপ কামোত্তেজিত লোক কামিনী সহবাস অনুসন্ধান করে। তবে উভয়ের মধ্যে এই মাত্র পার্থক্য লক্ষিত হয় যে, একের অভাবে লোকে গতাসু হয়, কিন্তু অপরের অভাবে তাহা হয় না। কামিনী সহবাস লাভেচ্ছা স্বভাব জাত হইলেও আমাদিগের ইচ্ছানুগ। যতই সে বিষয় মনে কল্পনা করা যায়, ততই তাহা ভাব সংসর্গ * গুণে মনোমধ্যে বিদ্ধ হয়। সুতরাং আমরাও সেই পরিমাণে তজ্জন্য লালায়িত হই।

* বিষয়ান্তরে মনকে নিযুক্ত রাখিতে সক্ষম হইলে ক্লেশানুভূতি কথঞ্চিৎ হ্রাস হয়।

২ আদিম কালে বিলাস চিন্তা সর্ব্ব প্রধান।

মন কখনও চিন্তা বিরহিত হইত পারে না। যদি কোন সদ্বিষয় আলোচ্য না থাকে, তাহা হইলে আপনা হইতেই মন মন্দ চিন্তাতে নিবিষ্ট হয়। এইজন্য লোকে বলিয়া থাকে "Satan always finds some mischiefs with idle hands to do" আদিম কালে এক আহারের চিন্তা দূর হইলে, অন্য চিন্তার বিষয় বিরহে যে এই চিন্তাটীই সমধিক প্রবল হইয়াছিল, তাহা অনুমান সিদ্ধ হইলেও প্রত্যক্ষবৎ বিশ্বাস যোগ্য। একে স্বভাব উত্তেজক, মন চিন্তা শূন্য, তাহাতে আবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শকরূপে পশু পক্ষ্যাদি সম্মুখে বিরাজিত। একে রক্ষা নাই, তাহাতে তিন কারণ। সুতরাং অন্য কর্ম্ম ও চিন্তা বিরহিত যুবকগণ যুবতীদিগের এবং যুবতীগণ যুবকদিগের অনুসরণে দিবা রাত্রি অতিবাহন করিতে লাগিল, এ কথাতে সন্দেহ কি? সম্মুখস্থ শিক্ষক (পশু পক্ষ্যাদি) আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে ক্ষণমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করে না, সুতরাং শিক্ষা সম্বন্ধে আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

৩ বল প্রয়োগ হইতে কালে দাম্পত্যের ভাব।

বিবাহ প্রাকৃতিক সম্বন্ধ নহে, সুতরাং একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আদিমাবস্থাতে বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। কিন্তু 'জিজীবিষা' ও স্ত্রী পুরুষের জাতীয়

* Association of ideas.

সম্বন্ধ নৈসর্গিক. সুতরাং তাহা তখনও ছিল। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা * ও ভীরু প্রকৃতি। সুতরাং একমাত্র পুরুষ দিগের উদ্ধত ব্যবহার ব্যতীত আদিম নরনারীগণের জিজীবিষা বৃত্তি চরিতার্থতার আর উপায়ান্তর ছিল না। এবং তাদৃশ আচরণ যে যে কারণবশতঃ নিবারিত হয়, তাহা তখন বর্ত্তমান না থাকায় পুরুষ গণের উগ্রজনোচিত অনুষ্ঠান যে, কিছুকাল পর্য্যন্ত অবিশ্রামে চলিয়াছিল, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ের মানব জাতির প্রকৃতি অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ধর্ম্মভয়, লোক ভয়, রাজভয়, লজ্জা ও ভক্তি বাৎসল্য প্রভৃতি অন্যভাব সহ সংযুক্ত থাকায় দর্শন মাত্রে কামোত্তেজনার অভাব, এই কয়টী কারণ বশতঃ লোকে অন্য স্ত্রীর উপর বল প্রয়োগ করে না। কিন্তু আদিম কালে লজ্জা ব্যতীত অন্য প্রতিবন্ধক ছিল না।

প্রথম ধর্ম্ম ভয়।

ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস থাকায়, লোকে বর্ত্তমান সময়ে অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতেছে। পুনঃ পুনঃ শ্রবণ বা আলোচনা দ্বারা যাহা মনের সহিত বিদ্ধ হয়, সকলেই তদ্বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হইতে ভীত হয়। বস্তুতঃ স্বার্থই লোকের প্রধান প্রবৃত্তি। এই স্বার্থ প্রযুক্ত অনন্ত কালের সুখের জন্য আমরা ঐহিকের সুখ ত্যাগী হই। কিন্তু শিক্ষা ও বিজ্ঞতা ব্যতীত কদাপি এরূপ স্বার্থ উপস্থিত হয় না। সুতরাং আদিম কালে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ধর্ম্মভয় লোককে অসৎ কর্ম্ম হইতেনিবৃত্ত করিতে পারিত না।

দ্বিতীয় রাজ ভয়।

ইদানীন্তন মানব সমাজে অনেকে ধর্ম্ম ভয় ব্যতীত কেবল রাজ ভয় প্রযুক্ত অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়। কোন অসৎ কার্য্য করিলে রাজা তজ্জন্য অপরাধীকে শাসন করেন। এবং এই শাসন ও দণ্ডের ভয়ে অনেকে অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু আমরা যে কালের বিবরণ লিখিতেছি তখন রাজা বা কোন রূপ শাসন কর্ত্তা ছিল না। সুতরাং অপরাধীও কোন রূপ দণ্ডিত হইত না। অতএব রাজ ভয় প্রযুক্ত আদিম নরগণ দুষ্কর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইতও না।

তৃতীয় লোক ভয়।

অনেক লোকে ধর্ম্ম ভয় ও রাজ ভয় ব্যতীত কেবল লোক ভয় প্রযুক্তও, অনেক সময়ে কুকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। লোক ভয় দুই ভাগে বিভক্ত। লোকের নিকট সুনাম হানি সুতরাং তজ্জনিত মনঃক্লেশ ও অবিশ্বাস ভাজন হওয়াতে যে ক্ষতি হয়, দ্বিতীয় অপরাধীকে লোকে স্বয়ং বা

*লজ্জা স্বাভাবিক বলায়, কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন। এস্থলে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, "ভাব" (feeling) কখন শিক্ষা দ্বারা উপার্জ্জিত হইতে পারে না। ভাবের অঙ্কুর প্রাকৃতিক স্বীকার না করিলে তাহার অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়

রাজা দ্বারা শাসন করিতে প্রয়াস পায়। লম্পট চোর প্রভৃতি ধৃত হইলেই, অনেক সময়ে, রাজার শাসন সাপেক্ষ না হইয়া লোকে আপনারাই প্রহারাদি করিয়া থাকে। বিশেষ: যাহার ক্ষতি করা যায়, সে ক্ষতি কারিকে ক্ষতি গ্রস্ত ও অপদস্থ* করিতে কায়-মনো-বাক্যে চেষ্টা পায়। কিন্তু আদিম কালে লোক ভয়ের এই সকল কারণ কিছুই বর্ত্তমান না থাকায় তাহা লোককে অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। বিশেষ তখন ঐরূপ বল প্রয়োগ দোষ বলিয়াই গণ্য হইত না। যে দেশে সকলেই চোর তথায় কখন চৌর্য্য বৃত্তি দূষ্য কর্ম্ম বলিয়া প্রতীতি নাই।

৪ র্থ ভক্তি বাৎসল্য

ভক্তি বাৎসল্য প্রভৃতি অন্য ভাব সহ পূর্ব্বে সংযুক্ত থাকা প্রযুক্ত, বাহ্য দর্শন মাত্রে কামোত্তেজনাভাব হওয়ায় আমরা ভগিনীকে চিরকাল স্নেহময় চক্ষে এবং মাতাকে ভক্তির চক্ষে দৃষ্টি করি, এই জন্য তাহাদের মূর্ত্তি কালে ভক্তিও স্নেহ ভাব সহ সংসৃষ্ট হয়, সুতরাং যৌবন কালেও ভগ্নি ও মাতাকে সন্দর্শন করিলে, লোকে কামোত্তেজিত না হইয়া, স্নেহ ও ভক্তি রসে প্লাবিত হয়। কিন্তু আদিমাবস্থায় ভ্রাতা ভগিনীর এই রূপ সম্বন্ধ, বোধ হয়, অতি অল্পই ছিল, সুতরাং প্রায় সমুদায় স্ত্রীদর্শনেই লোকে কামোত্তেজিত হইত। ২। ১ পুরুষান্তে যখন এই জন সম্বন্ধাদি বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন রমণী সন্দর্শন মাত্রই জিজীবিষা বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া তাদৃশ বাসনা চরিতার্থ করা কথঞ্চিৎ নিবারিত হইয়া আসিল।

* This is a general assertion. There may be honorable exceptions to it, as there are in every thing else.

পঞ্চম লজ্জা

উপরি উক্ত কয়েকটি কারণের মধ্যে কিছুই স্বাভাবিক্ নহে, সুতরাং আদিম কালে কার্য্যকারী হইত না। যেরূপ বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যের মনে লজ্জার প্রাধান্য দেখা যায় তাহা আদিমাবস্থায়ও ছিল। কেবল আদিম কালে লোক সংখ্যা অতি অল্প প্রযুক্ত লজ্জার বিষয়াভাবে তাদৃক উত্তেজিত হইত না। এক জনের প্রতি এক কালে দুই ভাব সমভাবে উপস্থিত হয় না, সুতরাং যাহাকে দেখিয়া কামোত্তেজিত হইত তাহাকে দেখিয়া তাদৃশ লজ্জা উপস্থিত হইত না। অতএব এই রূপে, আদিম কালে, অবিচ্ছেদে পশুবৎ আচরণ চলিত। কিন্তু মনুষ্য উন্নতি ক্ষম জীব; সুতরাং এভাব কখন চিরকাল চলিতে পারে না। বিশেষ স্বেচ্ছা বিহারের প্রতিবন্ধক স্বরূপ বিলাসিনীতে স্নেহ উপস্থিতি স্বাভাবিক। আমরা যদ্দ্বারা উপকৃত হই বা যাহার নিকটে আমাদিগের আন্তরিক অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, আপনা হইতেই তাহার দিকে স্নেহ ধাবিত হয়। আবার এক বার স্নেহ বদ্ধমূল হইলে প্রণয় ভাগিনীকে সর্ব্বদা দেখিতে ও নিকটে রাখিতে ইচ্ছা হয়। বিশেষ স্ত্রী লোকের প্রকৃতিগত

কমনীয়তা ও মাধুর্য্য এমনই মনোহর যে পুরুষের তাহাকে প্রীতি ও আলিঙ্গন করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা জন্মে। ইত্যাকার কারণে লোকে ক্রমশঃ যথেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল বা কোন স্থলে যাবজ্জীবন দাম্পত্যে আবদ্ধ হইল। কিন্তু তখনও স্বেচ্ছা বিহার সম্পূর্ণ নিবারিত হইল না।

৪। স্বেচ্ছাবিহার উন্মূলিত না হইবার কারণ

স্বেচ্ছাবিহার স্বভাবজাত, সুতরাং তাহা কখন সম্পুর্ণ নিবারিত হয় না। আদিম কাল কেন বর্ত্তমান সময়ের দৃঢ় নিয়মাবলি সত্বেও যখন তাহার পথ রুদ্ধ হইতেছে না, তখন সে সময়ে কি হইয়াছিল তাহা কি রূপে বলিব? অনেকে আমাদিগের এইরূপ মতে আপত্তি করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন এ মত ধর্ম্ম শাস্ত্র বিরোধী।

কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিবাহ পদ্ধতি সম্পূর্ণ সামাজিক প্রথা। এবং আমরা সত্যের অনুরোধে, সাহস পুর্ব্বক বলিতে পারি যে, স্বেচ্ছা বিহার হইতে সামাজিক ও প্রজোৎপত্তি সম্বন্ধে দোষ না জন্মাইলে কখনই তাহা দোষের আকর হইত না। স্বেচ্ছাবিহার যে স্বভাব জাত, তাহার প্রমাণ স্থলে আমরা নিম্ন লিখিত কয়েকটী হেতু প্রদর্শন করিলাম।

(১) পশু দিগের দৃষ্টান্ত।

(২) কামিনী সন্দর্শনে কামোত্তেজন।

(৩) দূর হইতে কামিনী সন্দর্শনে মনে কল্পিত সুখ। This distance lends enchantment to the view."

(৪) এক জন যুবতীকে সন্দর্শন করিয়া তাহার সহ বিলাসে যেরূপ সুখ লাভ কল্পিত হয়, তদ্বিষয়ে নৈরাশ হওয়া।

(৫) নবীন, মনুষ্যের নিকট স্বভাবতঃ মনোহর।

(৬) যাহা হইতে দুঃখ উপস্থিত হইবেনা নিশ্চিত জ্ঞান আছে অথচ তাহার প্রকৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃ তদ্দিকে আকৃষ্ট হওয়া।

ক্রমশঃ হ্রাস

এই সকল কারণ বশতঃ স্বেচ্ছা বিহার এখনও চলিতেছে, তখনও চলিতে ছিল। যেমন এক দিকে স্বভাব বশতঃ স্বেচ্ছাবিহার চলিতেছিল, অপর দিকে আবার সেই রূপ প্রবৃত্তির অনুযায়ী দাম্পত্য সম্বন্ধ বর্দ্ধিত হইতে ছিল।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে আদিম কালে সর্ব্বত্র কেবল স্বেচ্ছা বিহার প্রচলিত ছিল। সুতরাং শেষোক্ত কারণ বশতঃ তাহার দিন দিন হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি হয় নাই।

স্বেচ্ছাবিহারের দোষাবলি।

(১) পিতার স্থৈর্য্য না থাকিলে মাতা একাকিনী সন্তানকে রক্ষা করিতে ক্ষমবতী নহেন।

(২) মনুষ্য সস্ত্রীক না হইলে ধন সঞ্চয় বা অন্যান্য পক্ষে উন্নতি করিতে অগ্রসর হয় না।

(৩) পীড়িত হইলে বা অন্য কোন কারণ বশতঃ অশক্ত হইলে লোকে কাহার দ্বারা রক্ষিত হয়?

(৪) পুরুষের আশ্রয় ব্যতীত স্ত্রীলোক জীবন ধারণ করিতে পারে না এবং সস্ত্রীক না হইয়া পুরুষে স্বচ্ছন্দে কাল কর্ত্তন বা

সুন্দর রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে না।

(৫) এক স্ত্রীতে ও দুই পুরুষ আশক্ত হইলে পরস্পর বিরোধ হয়।

(৬) এক স্ত্রী বহু পুরুষ বা এক পুরুষ বহু স্ত্রীতে উপগত হইলে প্রজা বৃদ্ধি পক্ষে অনেক ব্যাঘাত হয়।

৬সন্তান রক্ষণ। পুরুষের সাহায্য নিরপেক্ষ মাতা কখন একাকিনী শিশু সন্তান লালন পালন করিতে পারেন না। স্ত্রীলোক কোমলপ্রকৃতি; সুতরাং মৃদুপরিশ্রমই তাহাদিগের স্বভাবানুযায়ী। যেমন এইরূপ পরিশ্রম তাহাদিগের পক্ষে নৈসর্গিক, সেই রূপ ইহাতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় পারগত জন্মে। রন্ধন এবং গৃহ কার্য্যে যেরূপ স্ত্রীলোকেরা পারগ, পুরুষ কদাপি সেরূপ হইতে পারে না। কোমলা স্ত্রী কঠোর শ্রমসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না; কারণ তাহা উহাদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। আবার কঠোর শ্রমব্যতীত কখন আহার্য্য সংগ্রহ হয় না। সুতরাং পিতার স্থৈর্য্য না থাকিলে কে সন্তানের জন্য আহার্য্যাহরণ করিবে?

কিন্তু স্বেচ্ছা বিহার প্রণালীতে কখন পিতার স্থৈর্য্য থাকে না, সুতরাং বড়ই অসুবিধা হয়। বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিলে তাহাকে লালন পালন করা লোকের স্বভাব সিদ্ধ ও রাজাজ্ঞানুযায়িক। সুতরা ভক্তিতেই হউক বা ভয়েতেই হউক লোকে সন্তান পালন করিয়া থাকে। কিন্তু বিবাহ প্রণালী প্রচলিত না থাকিলে এ পক্ষে অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

৭অকর্ম্মণ্য বস্থা। যদি জাতীয় সম্বন্ধ ব্যতীত, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রেম অথবা অন্য কোন মহৎ ভাব না থাকে, তাহা হইলে এক জন আশক্ত বা পীড়িত হইলে অবশ্যই অপর কর্ত্তৃক পরিত্যাজ্য হইবে। এই রূপ অবস্থায় জীবন ধারণ করা এবং না করা উভয়ই সমান। সকলেই অবগত আছেন ২দিন নির্ব্বন্ধু স্থানে বাস কি ক্লেশের ব্যাপার। লোকে কেন সহজে বিদেশ গমনেচ্ছুক হয় না? ইহার একমাত্র কারণ তথায় তাহার বন্ধু নাই, সুতরাং বিপন্ন হইলে কে রক্ষা করিবে? কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি যুবতী, জগজ্জনমোহিনী সুন্দরী, কি তদীয় বিলাসভবনের নবীন নাগর কাহারই সকল দিন সমান যাইবে না। অদ্য দুঃখের দিন না হয়, কল্য হইবে, কল্য না হয় পরশ্বঃ হইবে। একেবারে দুঃখের হস্ত অতিক্রম করিয়াছেন এরূপ লোক কুত্রাপি দেখা যায় না। সুতরাং এরূপ স্থলে বুদ্ধিজীবী মনুষ্য কখন চিরদিন আবদ্ধ থাকিবেনা। এবং সকল বন্ধুতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বন্ধুতা জাতীয় সম্বন্ধ-যুক্তস্ত্রী পুরুষের দাম্পত্যভাব এই সমুদায় অসুবিধা পরম্পরা হইতে উপস্থিত হইল*।

৮লোকে একাকী উন্নত হইতে পারে না। মনুষ্য একাকী থাকিলে জীবনের ভারস্বানুভব করিতে পারে না, সুতরাং কেবল আমোদ প্রমোদ করিয়াই কাল ক্ষেপণ করে।

মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যের পরিবার প্রতি

* আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি "অভাব"ই সকল কার্য্যের নিয়ামক।

পালনভার স্কন্ধে ন্যস্ত না হইলে সঞ্চয় শীলতা জন্মে না। বাস্তবিক একাকী থাকিলে ধন সংগ্রহ (পাঠক গণ মনে রাখিবেন আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি ধন সংগ্রহই আদিম সভ্যতার প্রধান কারণ) করিবার কারণ অতি অল্পই বিদ্যমান রহিয়াছে। কঠোর শ্রমোৎপন্ন ধন আপনাকে বঞ্চিত করিয়া কাহার জন্য সঞ্চয় করিব? এক উদরের চিন্তা কি? কেবল প্রিয় স্ত্রী পুত্রের জন্যই মনুষ্য আপন উদরকে বঞ্চিত করিয়া কিঞ্চিৎ ২ সঞ্চয় করিয়া থাকে। এই জন্যই, ইংলণ্ড দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা অলিবার গোল্‌ড্‌স্মিথ বলেন দরিদ্র দিগের প্রথমতঃ উদ্বাহ শৃঙ্খলে* আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য, লোকের যতই কেন আয় হউক না সস্ত্রীক না হইলে প্রায় ধন সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হয় না।

৯ স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি বৈপরীত্য ও দাম্পত্য সখ্য

স্ত্রী পুরুষের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি দেখায়াই বোধ হয়, উভয়ের একত্র আবাস সৃষ্টি কর্ত্তার অভিপ্রেত। এক জন গার্হস্থ কার্য্যাদিতে দক্ষ, অপর বহিস্থ, এক জন স্নেহের দ্বারা সকলকে আবদ্ধ করেন, অপর জন আপনার তেজস্বিতা দ্বারা আক্রমণ কারী হিংস্র জন্তু ও আততায়ীকে পরাভব করিয়া গৃহস্থিতা দেবীকে রক্ষা করেন। এতদ্ব্যতীত আধুনিক দার্শনিকেরা বলেন যে "আত্মার সমুদায় বৃত্তির সামঞ্জস্য উন্নতিই মানব জীবনের লক্ষ্য।" এই বাক্য সত্য হইলে তাহা সংসাধন হেতু বিবাদ অপ্রতিহার্য্য রূপে আবশ্যক। যে হেতু একত্র সহবাস না করিলে উভয়ে উভয়ের নিকট যেরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তাহা পায় না। বিশেষ নব যৌবনের প্রারম্ভে স্ত্রী পুরুষের সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি ব্যতীত কখন কাল সুলভ বিলাস বাসনা চরিতার্থ হয় না। এবং এই কারণ বশত. অধুনাতন অনেক বঙ্গীয় যুবক সুনীতি অতিক্রম করিতেছেন। এতদ্‌ ব্যতীত আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তি স্বাভাবিক এবং মনুষ্যের সর্ব্ব কার্য্যের নেতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইত্যাকার কারণ পরম্পরায় কালে ক্রমে স্বেচ্ছা বিহার প্রণালী নিবারিত হইয়া বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত হইতে লাগিল।

১০ দুইজন পুরুষ এক কাকে প্রার্থক।

কল্পনা কর, যখন মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিক্ষা করিয়াছিল অথচ বিবাহ প্রণালী আরম্ভ হয় নাই, তখন অবশ্যই লোকে কাম প্রপীড়িত হইয়া পরস্পরের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিত। মনে কর, এক বামা একেবারে দুইজন সমকক্ষবীরের অনুরাগ ভাগিনী হইলেন। প্রত্যেকেই আপন আপন মনোরথ চরিতার্থ হেতু প্রয়াস পাইতে লাগিল। সর্ব্বনাশ কেন? প্রাণান্ত না হইলে কেহই দারুণ দুর্দমনীয় কামের হস্ত হইতে নিস্তার পায় না। আমরা তাহাদিগকে এবিষয় সম্বন্ধে দোষী বিবেচনা করিতে পারি না। যেহেতু প্রকৃতিই শিক্ষক, উত্তেজক ও নেতা। এরূপ অবস্থাতে সমাজ কত বিশৃঙ্খল হয়। মানব সমাজ ক্রমে উন্নত হইয়া যখন বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল, তখনও যে

* আমরা এ মতের এক পক্ষ মাত্র বলিলাম।

এই রূপ কত অত্যাচার চলিত এবং বর্ত্তমান সময়ে এবিষয় সম্বন্ধে কত দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা মনে করিলে একেবারে হৃৎকম্প হয়। কত দেশ, কত রাজ্য, কত নগর, কত শত শত লোক এই জন্য প্রাণ হারাইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া সংখ্যা বদ্ধ করা দুঃসাধ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় সভ্য সময়ে, ধর্ম্মভয়, লোকভয়, রাজভয় প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও, যখন ঈদৃক আচরণ দেখিতেছি, তখন পূর্ব্বে যে কিরূপ হইত তাহা কল্পনা দ্বারাও মনে ধারণ করিতে পারা যায় না।

এইরূপে এই সকল অসুবিধা পরম্পরা হইতে সাময়িক দাম্পত্য ভাব এবং তাহা হইতে কালে চির দাম্পত্য ভাব উপস্থিত হইয়াছে। বিবাহ একপুরুষ বা একশত বৎসরের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই, কিন্তু বহু কাল ও ক্লেশের ফল॥

১১ স্বেচ্ছাবিহার ও প্রজোৎপত্তি। নানারূপে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, স্ত্রী পুরুষ সমতেজস্বী না হইলে সন্তানের উৎপত্তি হয় না। স্বেচ্ছা বিহার প্রণালী প্রচলিত থাকিলে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে তেজের তারতম্য হয়, সুতরাং প্রজোৎপত্তি সংবন্ধে বিলক্ষণ ব্যাঘাৎ হইবার সম্ভব। বেশ্যাদিগের মধ্যে যে অধিকাংশ সন্তানশালিনী হয় না, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। কিন্তু এনিয়মটী মানব সাধারণ কখন অতি আদিম কালে অবগত হয় নাই। কারণ ইহা উদ্ভাবন করিতে সমধিক দৃষ্টি ও মার্জ্জিত বুদ্ধির আবশ্যক হইয়াছে।

১২ ক্রমশ উন্নতি প্রকৃতির লক্ষণ। পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান কর, একটী আশ্চর্য্য নিয়ম দেখিতে পাইবে। এক ব্যক্তি বা এক সাময়িক লোক দ্বারা কখন একটি সত্য আবিষ্কৃত হয় না। বহুলোকে বহু পরিশ্রমে একটি সত্য উদ্ভাবন করে কিন্তু অনায়াসে তাহাদের পরকালীয় লোক তাহা উপভোগ করে। আদিম নরগণ এইরূপে স্বেচ্ছা বিহারের নানা রূপ দোষ সন্দর্শন করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বিবাহ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। সমুদায় সমাজস্থ লোকেই একবাক্যে এই প্রণালী বিধিবদ্ধ করিল, সুতরাং যে কেহ ইহার অন্যথাচরণ করিত সে একেবারে সকলেরই ক্রোধের পাত্র হইত। এইজন্য আদিম কালে ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী যারপর নাই দোষী বলিয়া গণ্য হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন সংহিতা কারকেরা * যেরূপ বলেন ব্যভিচার সেরূপ দোষের বিষয় নহে। কিন্তু যে সময় স্বেচ্ছা বিহারের পরিবর্ত্তে বিবাহ কেবল প্রচলিত হইতেছিল তখন ব্যভিচারের বিরুদ্ধে কঠোর রাজ নিয়ম নিয়োজিত না হইলে কখন তাহার হ্রাস হইত না।

এই সময়েই প্রথম ব্যভিচার ও স্বেচ্ছা বিহার পরিবর্ত্তে মানবগণ দম্পাতি ভবে অবস্থিতি করেন।

১৩ উপসংহার। উপসংহার কালে বক্তব্য উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াই মানব জাতির সভ্যতার প্রথম সোপান। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য দাম্পত্যে আবদ্ধ না হইয়াছিল সেই পর্য্যন্ত নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় অবস্থিত ছিল।

* Institutes of Muno, Solon &c.

মনেকর আজ কাল ইউরোপীয় কিম্বা অন্য কোন সুসভ্য দেশে যদি বিবাহের পরিবর্ত্তে পুনরায় স্বেচ্ছাবিহার প্রচলিত হয়, তাহা হইলে বহু কালের ও বহু শ্রম সাধ্য উন্নতি একেবারে নির্ম্মূল হইবে। এবং সমাজ যে কিরূপ বিশৃঙ্খল হইবে তাহা কল্পনা করিলেও হৃৎকম্প হয়।

এই অধ্যায়ে যে সকল কথার উল্লেখ করিলাম পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার উদাহরণ সবিস্তার প্রদর্শন করিব।

——

রামানুজ সম্প্রদায়
অথবা
শ্রীবৈষ্ণব।
(রামানুজ দর্শন)

অধুনাতন পণ্ডিতদিগের মতে, খৃষ্টের ৫। ৬ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে ৮। ৯ শতাব্দী পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রধান ছিল। এই ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতবর্ষ, হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীরা তাহাদিগের সহিত অনেক তর্ক ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে সক্ষম হন নাই। হয়ত কোন সময়ে বৌদ্ধেরা কিঞ্চিৎ নিস্তেজ হইয়ছিল, এবং কখন বা তাঁহারাও নিষ্প্রভ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে ভারত খ্যাত পরিব্রাজক শঙ্করাচার্য্য ও কুসুমাঞ্জলির গ্রন্থকর্ত্তা উদয়নাচার্য্য আপনাদিগের পাণ্ডিত্য ও বাক্‌পটুতা প্রভাবে, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ পরাভূত করেন। এই সময়ে তন্ত্র লিখিত শক্তি ও শিবোপাসক সংখ্যা প্রবল হয়। শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার দর্শনে ও উপদেশে তথায় শৈব মত * ও তৎ সহযোগী শক্তি উপাসনা সমধিক প্রবল হয়, এবং পূর্ব্বোক্ত গীতায় মতাবলম্বীর সংখ্যা অতি নিস্তেজ ও হীনপ্রভ হয়। একেত গীত মতাবলম্বীর সংখ্যা অতি অল্পই ছিল, বোধ হয় ২। ১ জনের আন্তরিক বিশ্বাস ব্যতীত তাহা কখনই তখন সম্প্রদায় গত ধর্ম্ম ছিল না, আবার শঙ্করের অনতিক্রমণীয় দর্শন জালে আবদ্ধ হইয়া তাহারা (১) অকর্ম্মণ্য হইল।

এই সময়ে, ৭। ৮ শতাব্দী অতীত হইলে, মান্দ্রাজ নগরের উত্তর পশ্চিম পেরুম্বর গ্রামে কেশবাচার্য্য নামক এক জন ব্রাহ্মণের ঔরসে রামানুজাচার্য্যের জন্ম হয়। শঙ্করাচার্য্যের দর্শনে ও উপদেশে যদিও শৈব মত অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়া ছিল, কিন্তু তিনি কোন ক্রমেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু রামানুজ সেরূপ ছিলেন না; তিনি কি রূপে শৈবেরা নিস্তেজ হইবে এবং বৈষ্ণব মত প্রধান হইবে, এই বাঞ্ছাতেই সমুদায় কার্য্য করিতেন। দাক্ষিণাত্যে রামানুজের তুল্য প্রসিদ্ধ লোক অতি অল্প দৃষ্ট হয়। যেমন বঙ্গ দেশে

---

* যদিও শঙ্কর লিখিত কোন গ্রন্থ দ্বারা একার্য্য সাক্ষাৎ সম্পন্ন না হউক কিন্তু পরোক্ষে হইয়াছিল অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

(১) ইহাদিগকে এপর্য্যন্ত আমরা বৈষ্ণব নামে অভিহিত করিতে পারি না তবে এই মাত্র বলিতেছি যে কালে ইঁহাদিগের হইতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় উৎপন্ন হয়।

চৈতন্য ঈশ্বর অবতার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হন, ইনিও দাক্ষিণাত্যে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া খ্যাত আছেন।

রামানুজ কাঞ্চিপুরে বিদ্যাধ্যয়ন করেন এবং তথায় প্রথমতঃ আপনার মত প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তৎপরে তিনি কাবেরী নদীর দ্বীপ শ্রীরঙ্গে অবস্থিতি করিয়া রঙ্গনাথের সেবা করেন ও আপনার মত প্রতিপাদক বিবিধ গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময় রামানুজ অনেক শিব মন্দির অধিকার করিয়া তাহাতে বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপন করেন। কিয়দ্দিবস পরে রামানুজ দিক্‌বিজয় করিতে বহির্গত হইয়া অনেক স্থলে আপনার মত প্রচার করিয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়ান্তে যখন রামানুজ শ্রীরঙ্গে প্রত্যাগত হইলেন, তখন শৈব ও বৈষ্ণব মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। চোলপতি শ্রীরঙ্গ ক্রমিকোণ্ডের অধিকার ভুক্ত ছিল। ক্রমিকোণ্ড বড় শিবভক্ত ছিলেন। তিনি আপন অধিকারস্থ যাবতীয় লোককে স্বীয় উপাস্য দেবের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, অঙ্গীকার পত্র প্রদান করিতে আদেশ প্রচার করিলেন। কিন্তু রামানুজাচার্য্য ব্যতীত অন্যান্য সকলেই রাজাজ্ঞা প্রতি পালন করিল। ক্রমিকোণ্ড রামানুজের উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে ধৃত করণাভিপ্রায়ে সৈনিক পুরুষ প্রেরণ করিলেন। রামানুজ পলায়ন করিয়া তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিল এবং কর্ণাটাধিপতির শরণাপন্ন হইল। কর্ণাটপতি বেতাল দেব বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু রামানুজ তাঁহাকে উপদেশাদি দ্বারা স্বমতে দীক্ষিত করিলেন এবং সদর সিঁড়িতে একটী বিষ্ণু মন্দির সংস্থাপন করিলেন। তদনন্তর তিনি ক্রিমিকোণ্ডের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার শ্রীরঙ্গে প্রত্যাগত হইলেন ও জীবনাবসান পর্য্যন্ত তথায় বাস করিলেন অদ্যাবধি দাক্ষিণাত্যে এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব বিস্তর দৃষ্ট হয় এবং তাহাদিগের অনেক আখড়া আছে। রামানুজের সংস্থাপিত মঠাদির মধ্যে চারিটী মাত্র মঠ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ বদরিকাশ্রম মঠই সর্ব্ব প্রধান। রামানুজাচার্য্যের মতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

রামানুজ সম্পূর্ণ রূপে অদ্বৈতবাদ বিরোধী। তিনি বলেন সংসারে প্রকৃ অদ্বৈতবাদী কখনই দেখা যায় না। কোন্ প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি বলিতে পারেন "সচ্চিতানন্দ শিবোঽহং"। আমার চক্ষু আছে, আমি জড়ের রূপ দর্শন করিতেছি, কর্ণ আছে, শব্দ শ্রবণ করিতেছি। এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যতীত কেহই দর্শন শাস্ত্রের অনুরোধে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদী এবং ইউরোপীয় ভাবমাত্র বাদী দার্শনিকগণ (The Ileal Philosophers) পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া মুখে বা তর্ক স্থলে যিনি যাহাই কেনবলুন না, কার্য্যে সাধারণ লোক দিগের ন্যায় ব্যবহার করেন। রৌদ্র বা বৃষ্টি পীড়িত হইলে তাঁহারা কেন সাধারণ লোকের ন্যায় ছত্র ব্যবহার করেন।

রামানুজের মতে পদার্থ তিন

প্রকার—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। ঈশ্বরের সহিত চিৎ ও অচিতের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিনই সম্বন্ধ আছে। ঈশ্বরের প্রকৃতি সহ, জড়ের ও চিতের প্রকৃতি গত যে ভেদ আছে, তাহাকে "ভেদ" বলা যায়। আর এক ঈশ্বর হইতেই সমুদায় উৎপন্ন হওয়াতে "অভেদ" শব্দ প্রয়োগ হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ ও চিতের স্বরূপ এক জাতীয়, তথাপি পৃথক্, এই জন্য "ভেদাভেদ" কহা যায়।

শরীর স্থূল বা কৃশ হইলে যেমন আমরা বলিয়া থাকি, আমি স্থূল বা কৃশ, বস্তুতঃ আমি কখন স্থূল বা কৃশ হই নাই। অথচ আমি শরীরে ছিলাম এই জন্য শরীর স্থূল বা কৃশ না বলিয়া আমি স্থূল বা কৃশ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইরূপ ঈশ্বর সর্ব্বত্র অবস্থিত বলিয়া সকল বস্তুই তাঁহার সহিত 'ভেদাভেদ' সম্বন্ধে যুক্ত। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!' এই যে শ্রুতি অবলম্বন করিয়া অদ্বয়বাদ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার এ অর্থ নহে যে, হে শ্বেতকেতো! তুমিই সেই ব্রহ্ম, কিন্তু হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই ব্রহ্ম হইতে ভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত।

পূর্ব্বকালীয় অন্যান্য পণ্ডিতের ন্যায় রামানুজও শ্রুতি দ্বার সমুদায় প্রতিপাদন করিতেন। আমাদিগের দেশীয় দার্শনিকদিগের এই একটী বিশেষ প্রকৃতি দৃষ্ট হয় যে, কেহই নূতন মত বা নূতন কথা আমার উদ্ভাবিত ইহা বলিতে সাহসিক হন নাই। সকলেই একমাত্র শাস্ত্রের 'দোহাই দিয়া' নানারূপমত প্রচার করিয়াছেন।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে 'ব্রহ্ম-নির্গুণ' এস্থলে রামানুজ বলেন, ব্রহ্মের কোন গুণই নাই এরূপ শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। তবে তিনি প্রাকৃতজনের ন্যায় রাগদ্বেষাদিগুণ রহিত।

(২) রামানুজ বলেন জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক জাতীয় হইলেও পরস্পর পৃথক্। অতএব পরস্পর একত্রিত হইলেই সম্পূর্ণ একীভূত হইতে পারে না। সমুদ্রের জল ও নদীর জল উভয়ই জল বটে, কিন্তু নদীর জল সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলে কখন আপনার মিষ্টত্ব হারাইবে না। যে অংশটুকু নদীর জল তাহা সমুদ্রস্থ হইলেও সুস্বাদ থাকে, কেবল তাহা সমুদ্র জল হইতে বিছিন্ন করিতে না পারায় আমরা প্রত্যক্ষানুভব করিতে অক্ষম। দুগ্ধ ও জল উভয়ই তরল পদার্থ। কিন্তু মিশ্রিত হইলে কি একীভূত হয়? জীবাত্মা ঈশ্বর ভিন্ন, সুতরাং এক জাতীয় হইলেও পরস্পর সংস্রব দ্বারা একীভূত হয় না।

নদী সমুদ্রয়োর্ভেদঃ শুদ্ধোদ লবণোদয়োঃ।
তথাজীবেশ্বরৌভিন্নৌ বিলক্ষণ গুণান্বিতৌ।
নদ্যঃ সমুদ্রে মিলিতাঃ সমন্তান্নৈক্যং গতা বিভিন্নতয়া ন ভান্তি।
ক্ষীরোদ শুদ্ধোদকয়োর্বিভেদাদ্যা স্তেতয়োর্বা স্তব এব ভেদঃ॥ * *
এবং জীবাঃ পরম পুরুষে ধ্যান যোগাদ্বিলীনা
নৈক্যং প্রাপ্তা বিমল মতয়ঃ সন্ত এবং বদন্তি।

(৩) উপনিষদের মতে 'উত্তিষ্ঠ-জাগ্রত প্রাপ্য' *

হে জীব সকল! উত্থান কর, জাগ্রত হও, সদাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া উপদেশ গ্রহণ কর। অদ্বয়-বাদের মতে আচার্য্য শিষ্য উভয়ই মিথ্যা, তবে কে উপদেশ দিবে? আচার্য্য মায়াবৃত না হইলে অহঙ্কার নিজে পৃথক সত্ত্বা যুক্ত হন না, সুতরাং তাঁহার উপদেশ দানেরও শক্তি থাকে না। আর মায়াবৃত ব্যক্তি কিরূপে অন্যকে মায়া হইতে মুক্ত হইবার উপ-দেশ দিবেন। এক অন্ধ অপর এক অন্ধকে পথ দেখাইলে উভয়েরই পথ-ভ্রষ্ট হইবার সম্ভব। অতএব অদ্বৈত-বাদীদিগের মুক্তি কেবল গুটিকতক কথার 'মার প্যাঁচ মাত্র।'

(৪) যদি সকল আত্মাই এক হয়, তবে একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি হইবে। সুতরাং কেহ মুক্ত, কেহ মায়াবদ্ধ, এবাক্য যার পর নাই যুক্তি বিরুদ্ধ। রামানুজ বলেন শাস্ত্রে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়েরই অস্তিত্ব বলিতেছে। ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ, জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন চৈতন্য, অতএব উভয় কখন এক হইতে পারে না। জগতে সকল বস্তুই তাহার বিপরীত বস্তু সহ দেখা যায়, তবে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অদ্বয়বাদ অভ্রান্ত মত।

জীব কোথা হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শক্তির আকর কেবল এক ব্রহ্ম। অতএব আমরা আশ্রিত হইয়া কিরূপে বলিব আমি ব্রহ্ম।

জগৎ ব্রহ্ম হইলে আমাদিগের মনে কিরূপে ব্রহ্মের ভাব উদয় হ-ইবে। যেহেতু কেবল জগৎ কার্য্য সন্দর্শন করিয়া আমরা কর্ত্তা ঈশ্বরের বিষয় অবগত হই।

রামানুজ ব্রহ্ম নির্গুণ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ব্রহ্ম নির্গুণ হইলে কিরূপে সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হইল। সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষের অস্তিত্ব না থাকিলে বিশ্ব কোথা হইতে আসিল।

যেমন কোন লোক রাজার হস্তী, অশ্ব, দাস, দাসী দ্বারা সজ্জিত হইয়া বলে, আমি রাজা। জীবের সেই রূপ অহং ব্রহ্ম উক্তি। সুতরাং তাহা সম্পূর্ণরূপে যুক্তি ও ধর্ম্ম বি-রোধী। জীব, ব্রহ্ম পৃথক, একজন প্রভু অপর ভৃত্য। একজন দাতা অপর গ্রহীতা। সুতরাং এক জন উপাস্য, অপর জন উপাসক। হে ভ্রান্ত ক্ষুদ্র মানব! তুমি কিরূপে আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বলিয়া স্পর্দ্ধা কর। এতদপেক্ষাও গুরুতর ভ্রম কি মনে কল্পনা করা যায়?

কোন কোন অদ্বয় বাদীরা আপ-নাদিগের মত পোষণ হেতু বলেন, জীবের অস্তিত্বে ঈশ্বরের ভাব মাত্র। রামানুজ জিজ্ঞাসা করেন, এ ভাব কেন? এবং কোথা হইতেই বা উপ-স্থিত হয়? ঈশ্বর মায়াচ্ছন্ন নহেন সুতরাং জীবের মায়াচ্ছন্নতা ইহার একমাত্র কারণ স্বীকার করিতে হইবে। জীবের অস্তিত্ব মায়ার উপর নির্ভর করে এবং মায়ার অস্তিত্ব জীবের উপর। এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় অপরিহার্য্য।

রামানুজ আরও বলেন, আত্মা কোথা হইতে মায়াচ্ছন্ন হয়। মায়া স্বয়ং অক্ষম, অতএব জীব আপনার মা-য়াতে আপনি আচ্ছন্ন। আপনার মায়া

কোথা হইতে আসিল? আর মায়াবশতঃ সৃষ্টি হইলে ঈশ্বরকেও মায়াধীন বলিতে হইল, সুতরাং ঈশ্বর তবে সর্ব্ব শক্তিমান নহেন একথাও স্পষ্ট বলা হইতেছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, বৈদান্তিক মায়ার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভ্রম। আর ঈশ্বর মায়ার স্বভাব জানিয়াও কেন সৃষ্টিকে তাঁহার অধীন করিতেছেন? এটা কি তাঁহার বালকের ন্যায় ক্রীড়া? তিনি আনন্দ স্বরূপ এতদ্দ্বারা তাঁহার আনন্দ কি আরও বর্দ্ধিত হইল? বিশেষ জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান, তাহা কখন পৃথক পদার্থ হইতে পারে না। রামানুজ যেরূপ অদ্বয়বাদবিরোধী, সেইরূপ আবার অদ্বৈত দর্শন বিরোধী। অদ্বৈতেরা বলেন, দেহের পরিমাণানুসারে জীবের পরিমাণ। যদি এই কথা সত্য হয়, তবে এক জীবের একবার মানব আবার পিপীলিকা দেহ ধারণ শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, তাহা কিরূপে সম্ভবপর। যদি বল দীপালোকের ন্যায় সঙ্কোচ প্রসারণ দ্বারা এ কার্য্য সাধিত হয়, তাহা হইলে জীবাত্মা অনিত্য ও বিনশ্বর প্রমাণ হয়। যদি জীবাত্মা নাশশীল হয় তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে না।

রামানুজ আচার্য্যের মতে "ঈশ্বর সকলের নিয়ামক, হরি পদবাচ্য, জগতের কর্ত্তা, উপাদান, সকলের অন্তর্যামী, এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজঃ প্রভৃতি গুণসম্পন্নতারূপ স্বভাবশালী। চিৎ অচিৎ সমুদায় বস্তুই তাঁহার শরীর স্বরূপ। এবং পুরুষোত্তম বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা, তিনি পরম কারুণিক এবং ভক্ত বৎসল উপাসকদিগকে যথোচিত ফল প্রদান করিবার আশয়ে লীলাবশতঃ পাঁচ প্রকার মূর্ত্তিধারণ করেন। প্রথম অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমাদি। দ্বিতীয় রামাদ্যবতার স্বরূপ বিভব। তৃতীয় "বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ,' এই চারি সংজ্ঞাক্রান্ত ব্যূহ। চতুর্থ সূক্ষ্ম, ও সংপূর্ণ ষড়্‌গুণ, বাসুদেব নামক পরংব্রহ্ম। পঞ্চম অন্তর্যামী সকল জীবের নিয়ন্তা। এই পাঁচ মূর্ত্তির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের উপাসনা দ্বারা পাপক্ষয় হইলে উত্তরোত্তরের উপাসনাতে অধিকার জন্মে। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগভেদে ভগবানের উপাসনাও পাঁচ প্রকার। দেব মন্দিরের মার্জ্জন ও অনুলেপন প্রভৃতিকে অভিগমন কহে, এবং গন্ধ পুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজনকে উপাদান, পূজাকে ইজ্যা, অর্থানুসন্ধান পূর্ব্বক মন্ত্রজপ ও স্তোত্র পাঠ, নাম সংকীর্ত্তন ও তত্ত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসকে স্বাধ্যায় এবং দেবতানুসন্ধানকে যোগ কহে। এইরূপ উপাসনা কর্ম্ম দ্বারা বিজ্ঞান লাভ হইলে করুণাসিন্ধু ভগবান স্বকীয় ভক্তগণকে নিজপদ প্রদান করেন, ঐ পদ প্রাপ্তি হইলে ভগবানকে যথার্থ রূপে জানিতে পারা যায় এবং পুনর্জন্মাদি কিছুই হয় না।'

রামানুজ সম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইঁহারা লক্ষ্মী নারায়ণ বা যুগল মূর্ত্তির পূজা করে। দাক্ষিণাত্যের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেই শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ দৃষ্ট হয়। ইঁহাদিগের মতে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ

করা অনিবার্য্যাবশ্যক নহে। কিন্তু তথাপি এই সম্প্রদায় ভুক্ত অনেক সন্ন্যাসী দৃষ্ট হয়। এতৎ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ স্থানে স্থানে মন্দিরাদি সংস্থাপন করিয়া রামকৃষ্ণ ও লক্ষ্মী নারায়ণ প্রভৃতি বিষ্ণু মূর্ত্তির পূজা করে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা উৎকলের জগন্নাথ দেবকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। অনেক শ্রীবৈষ্ণবের বাটীতে নিত্য সেবাও দেখা যায়। এতদ্দেশীয় বৈষ্ণব দিগের সহ শ্রীবৈষ্ণবদিগের একটী প্রভেদ আছে, ইহারা বিশেষ রূপে জ্ঞাত না হইয়া দীক্ষা গুরু মনোনীত করে না, এবং ব্রাহ্মণ জাতীয় বৈষ্ণব ব্যতীত কেহই কাহাকে দীক্ষিত করিতে পারে না। 'ওঁ রামায় নমঃ' এই মন্ত্রে শ্রীবৈষ্ণবেরা দীক্ষিত হয়, সচরাচর শ্রীবৈষ্ণবেরা স্বয়ং রন্ধন করিয়া ভোজন করেন। কিন্তু শুদ্ধাচারী শিষ্য রন্ধন করিলে আহার নিষিদ্ধ নহে। আহার কালে পট্টবস্ত্র ব্যতীত কার্পাস বস্ত্র পরিধান করিয়া আহার করা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। 'দাসোহং' বা 'দাসোস্মি' এই ইহাদিদিগের অভিবাদনের মন্ত্র।

ইহারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে দ্বারাবতীর গোপী চন্দনের তিলক লেপন করে।

'যোমৃত্তিকাং দ্বারাবতীসমুদ্ভবাং করে সমাদায় ললাট পট্টে। করোতিনিত্যং তথাচার্দ্ধপুণ্ড্রং কোটী গুণং সদাভবেৎ॥' এতদ্ব্যতীত কেহ২ তপ্ত মুদ্র ধারণ করে। আর তুলসী মালা জপ ও ধারণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে।

রামানুজ আচার্য্যকৃত শ্রীভাষ্য, বেদার্থ সংগ্রহ, বেদান্ত প্রদীপ, এবং বঙ্কটাচার্য্য কৃত স্তোত্র ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ ইহাদিগের সমধিক আদরণীয়। এতদ্ব্যতীত ইঁহারা বিষ্ণু, নারদীয়, গরুড়, পদ্ম, বরাহ ও ভাগবৎ এই ষট্ পুরাণ প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন।

আধুনিক রাধা কৃষ্ণ উপাসক বৈষ্ণবদিগের সহ শ্রীবৈষ্ণবদের বিস্তর অনৈক্য আছে।

স্বর্ণলতা।

৫ম অধ্যায়।

সরলার স্বপ্ন।

"Tir'd nature's sweet restorer, balmy Sleep!
He, like the world, his ready visit pays
Where fortune smiles; the wretched he forakes;
Swift on his downy pinion flies from woe,
And lights on lids unsullied with a tear.
From short (as usual) and disturbed repose
I wake: How happy they who wake no more.
Yet that were vain if dreams infest the grave.
I wake emerging from a sea of dreams
Tumultous; * * * * * * "

Young's Night Thoughts.

যে রাত্রিতে প্রমদা ও শশিভূষণ পূর্ব্বো-ধ্যায়োল্লিখিত কথোপকথন করেন, বিধু সে রাত্রি বাটী আইসেন নাই। পাড়ায় এক বাটীতে যাত্রা হইতেছিল, তিনি সেই খানেই ছিলেন। স্ত্রী লোকের সকল বল স্বামী। সরলা এ সমস্ত বৃত্তান্ত স্বামীকে কিছুই জানাইতে না পারিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন। কি করা কর্ত্তব্য, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মনে স্থির করিলেন আজি নিদ্রা যাই। শয়ন করিলেন নিদ্রা হইল না। শয্যায় উপবেশন করিলেন। ভাবিলেন অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলে নিদ্রা হইবেক। কিন্তু বসিয়া থাকিয়াও কোন ফল দর্শিল না। নানা বিধ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন শ্যামাকে পাঠাইয়া দিয়া স্বামীকে ডাকিয়া আনা কর্ত্তব্য। 'শ্যামা শ্যামা' করিয়া ডাকিতে ২ শ্যামা উঠিল। সরলা কহিলেন, শ্যামা তুই একবার গিয়া ওদের ডেকে আনিতে পারিস ?

শ্যা। 'কোথা থেকে ডেকে আনিব ? তিনি কোথায় কেহ কি জানে ?'

স। 'সে যাত্রার কাছে আছে। আমাকে বলিয়া গিয়াছিল আজি যাত্রা শুনিতে যাব।'

রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কাহাকে কোন কাজ করান বড় সহজ নহে। নিদ্রা তন্দ্রা ইত্যাদিতে পুরুষকেই জড়ীভূত করিয়া ফেলে--শ্যামাতো দূরে থাকুক। আপাততঃ দুই হস্ত দ্বারা চক্ষু মার্জ্জন করিয়া শ্যামা কহিল ;

'আমি কেমন কোরে সেখানে যাব, আর অত লোকের মধ্যে আমাকে যাইতেই বা দেবে কেন ?'

স। 'শ্যামা তুই কি আজ নূতন যাত্রার কাছে যাচ্ছিস না কি ? আর কখন কি বেসি লোকের কাছে যাস্ নি ?,

শ্যা। 'তোমাকে তো আর কথায় পারিব না। এই চলিলাম, এই চলিলাম' এই বলিয়া শ্যামা প্রস্থান করিল।

শ্যামাকে পাঠাইয়া দিয়া সরলার চিত্ত চাঞ্চল্য অনেক দূর হইল। ক্ষণকাল তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া শয়ন করিলেন। প্রত্যূষের সুস্নিগ্ধ সমীরণ সঞ্চালনে তাহার নিদ্রাবেশ হইল। সরলা নিদ্রিত হইলেন।

শ্যামা যাত্রার নিকট গিয়া ক্ষণকাল এ দিকে ও দিকে অনুসন্ধান করিল, বিধুকে দেখিতে পাইল না। তখন যাত্রা শুনিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ যে বাজাইতেছিল তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িল, শ্যামা দেখিল বিধুভূষণ বাজাইতেছেন কিন্তু কেন যে তিনি যাত্রার দলে বসিয়া বাজাইতেছেন বুঝিতে পারিল না। শ্যামা তাঁহার সহিত চক্ষে ২ দেখা হইবার নিমিত্ত অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া আবার একাগ্রমনে যাত্রা শুনিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে সরলা নিদ্রিত আছেন। আহা নিদ্রা কি মনোহর! রোগ, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা সকলই নিদ্রিত হইলে লোকে বিস্মৃত হয়! নিদ্রার ন্যায় মোহিনী শক্তি আর কাহার আছে ? দিবসে সংসার কোলাহলে চিত্তে যে

দুশ্চিন্তা উদ্বেগ হয়, রজনীতে নিদ্রাকর্ষণ হইলে সে সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়।

নিদ্রার ন্যায় শান্তিদায়িনী আর সংসারে কিছুই নাই। নিদ্রা মনের প্রিয়তমা সহচরী, চিন্তাদগ্ধচিত্তকে নিদ্রা সখীর ন্যায় সুস্থ করেন। কিন্তু দুঃখীর সুখ কোথাও নাই। চির দুঃখিনীর ভাগ্যে "কুস্বপ্ন" নিদ্রার অরি হইয়া তাহাকে শান্তি সুখ হইতে বঞ্চিত করে।

সরলা পুত্রটি কোলে করিয়া শয্যায় নিদ্রিত আছেন, মস্তকের নিকট জানালার উপর একটা তৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। বাতাসে দীপ শিখা অল্প ২ নড়িতেছে, এজন্য মুখ খানি মাঝে মাঝে ভাল দেখা যাইতেছে না। বাতাসবন্ধ হইলেই আবার সুন্দর দেখা যাইতেছে। মস্তকের বসন বাম পার্শ্বে পড়িয়াছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম স্থানে স্থানে একত্রিত হইয়া মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে। লোহিত ওষ্ঠ দুটি অল্প ২ কম্পিত হইতেছে। মুখ ভঙ্গি চিন্তা শূন্য বোধ হইতেছে না। নিদ্রিত হইয়া সরলা কি ভাবিতেছেন? সরলা স্বপ্ন দেখিতেছেন।

প্রথমতঃ তাঁহার বোধ হইল যেন তিনি আর নিজ বাটীতে নাই। কে আসিয়া যেন তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া গিয়া এক সামান্য কুটীরে রাখিয়াছে; তাঁহার স্বামী নিকটে নাই। আর কোথা রহিয়া আছেন তাহার স্থিরতা নাই, জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ বলিতে পারে না। যেখানে আছেন তাহার নিকটবর্ত্তি যে সমস্ত লোক আছে, কেহ তাঁহার সহিত কথাও কহে না, তাঁহার নিকটও আইসে না, নিজে যদি কাহারও কাছে যান, সে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করে। তাঁহার শরীর কৃশ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, হস্ত পদে পূর্ব্ববৎ বল নাই, বসন মলিন হইয়াছে, গৃহের দ্রব্য সমস্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব সুখের লেশ মাত্রও নাই। কিন্তু গোপাল এ পর্য্যন্ত কাছেই আছে, পরিশেষে সেও তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতে চাহে। তিনি কোন মতেই তাহাকে যাইতে দিলেন না। গোপাল তাঁহার কথা না শুনিয়া তাঁহার হস্ত হইতে নিজ হস্ত জোরে ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। তিনি দৌড়িয়া গোপালকে ধরিতে যাবেন এমন সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সরলা দেখিলেন রজনী শেষ হইয়াছে এবং গোপাল শয্যা হইতে উঠিয়া তাঁহাকে 'মা, মা' করিয়া ডাকিতেছে।

৬ অধ্যায়।

পাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে ইতিপূর্ব্বে দিগম্বরী ঠাকুরুণ দিদির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এইক্ষণে তাঁহার সহিত আপনাদিগের বিশেষ পরিচয় করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। শশিভূষণের বাটীর ১০। ১২ রশী পূর্ব্বে তাঁহার বাটী। ঠাকুরুণ দিদির ২ খানি ঘর। একখানি থাকিবার, আর এক খানি রন্ধনশালা। সম্মুখে ছোট একটু উটন, উটনের দক্ষিণে ছোট একটা বাগান। বাগানের মধ্যে গুটী কতক ফুল গাছ,

একটী কি দুটী পেপের গাছ আর একটী নারিকেল গাছ। বাড়ী খানি এমনি পরিষ্কার যে সিন্দূর টুকু পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়। এই বাটীতে ঠাকরুণদীদী 'বিকল্পে' একাকিনী বাস করেন। বিকল্পে একাকিনী বাস করা কি, তাহা ব্যাকরণজ্ঞ ব্যক্তিগণ মাত্রেই অবলীলা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহাদের ব্যাকরণের বিদ্যা আমারই মতন তাঁহাদের বোধসৌকার্য্যার্থে বলা কর্ত্তব্য যে বিকল্প শব্দের অর্থ "কখন বটে কখন নয়।"

ঠাকরুণদীদীর রূপ গুণের পরিচয় দেওয়া বড় সহজ নয়। তাঁহার বর্ণটি জবা ফুলের মত নয়, গোলাপ ফুলের মত নয়, দোপাটী ফুলের মত নয়, বেল ফুলের মত নয়, মল্লিকা ফুলের মত নয়, রজনীগন্ধের মত নয়,আয়েশার মতনয় আশমানির মত নয়, ও তিলোত্তমার মত নয়। কেমন পাঠকবর্গ বুঝেছেন তো এখন ঠাকরুণদীদীর বর্ণটী কেমন? যদি না বুঝে থাকেন, তবে পুস্তকখানি এইক্ষণেই বন্ধ করুন। 'নবেল' পড়া আপনার কাজ নয়। গ্রন্থকারদিগের ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া কোন বিষয় বর্ণনা করিবার নিয়মনাই। আর যদিও ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া কোন বিষয় বর্ণনা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কি ক্ষতি? আপনাদেরি বুদ্ধির স্থূলত্ব প্রকাশ পায়। অতএব যদি আপনারা 'অল্প বুদ্ধি' এই গালটী স্বীকার করিয়া লইতে পারেন, তবে আমি কেবল মাত্র বর্ণ কেন ঠাকুরুণদীদীর সম্বন্ধে যাহা কিছু জানি সকলই বলি শ্রবণ করুন।

ঠাকুরুণদীদীর বর্ণ কোন্ ২ জিনিসের মত নয় তাহা বলা হইয়াছে, কোন্ ২ জিনিসের মত তাহা এক্ষণে বলা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ জমিদারী সেরাস্তার কালি, রান্নাঘরের ঝুল,আলকাতরা ইত্যাদির ন্যায়। ঠাকরুণদীদী বেঁটে, স্থূল কলেবরা, মস্তকটী প্রায় কেশ শূন্য, দাঁতগুলি মাঘ মাসের মূলার মতন চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ, পদদ্বয় স্তম্ভাকার, পায়ের অঙ্গুল গুলি এখানে একটী ওখানে একটী, যেন পরস্পর বিবাদ করিয়া পৃথক্ হইয়াছে। ঠাকরুণদীদী তাঁহার পিতার বড় আদরের মেয়ে ছিলেন। এজন্য ১০। ১২ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত তাঁহাকে ব্যাটা ছেলের মত কাপড় পরাইয়া সঙ্গে ২ সর্ব্বত্রেই লইয়া যাইতেন। ঠাকরুণদীদীকে না চিনিত এমন লোকই নাই, ঠাকরুণদীদীও সকলকেই চিনিতেন। আপাততঃ তাঁহার প্রায় ৪০ বৎসর বয়ক্রম, জন্মাবধি বিধবা বলিলেই হয়, কারণ বিবাহ হইয়া এত অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার স্বামীর পরলোক প্রাপ্তি হয় যে, তিনি কদিন সধবা ছিলেন বলা বড়ই দুঃসাধ্য। ঠাককণদীদী বৈধব্যাবস্থায় একবার শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিলেন, কিন্তু ৩। ৪ দিবসের মধ্যেই কলহ বিবাদ করিয়া তথা হইতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার পিতার কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল এক্ষণে তাহাতেই জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। ঠাকরুণদীদীর এই এক অসাধারণ গুণ ছিল যে তাঁহার বাটীতে যে কেহ যাউক না কেন, কাহাকেও

অনাদর করিতেন না। সকলকেই সমভাবে যত্ন করিতেন। আজ কাল গৃহস্থের গরু হারাইলে খোঁয়াড়ে গেলেই যেমন তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি চাকর বাকর অনুপস্থিত হইলে ঠাকরুণ দীদীর বাটী গেলেই তাহার তত্ত পাওয়া যাইত।

প্রত্যূষে যেমন সরলা গোপালের হস্ত ধারণ করিয়া বাহির হইবেন সম্মুখে ঠাকরুণদীদীকে দেখিতে পাইয়া অমনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঠাকরুণদীদী অপরদিগে মুখ ফিরাইয়া প্রমদার ঘরের দিগে চলিয়া গেলেন।

অবিলম্বেই সরলা বাহির হইয়া দেখিলেন ঠাকুরুণদীদী প্রমদার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরলার গৃহ হইতে প্রমদার গৃহ এক প্রাচীর মাত্র ব্যবধান এজন্য তিনি নিজ গৃহে থাকিয়া কি কথোপকথন হয় শুনিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুই শুনিতে না পাইয়া পুনরায় বাহিরে আসিয়া সংসারের কাজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্যামা যাত্রা শুনিবার উপলক্ষে বাটী না থাকা প্রযুক্ত এবং আমাদের প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করা অভ্যাস নাই, এই দুই কারণবশতঃ প্রমদার ঘরের ভিতর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গকে বিদিত করিতে পারিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত যুক্তি করিয়া ঠাকুরুণদীদী বাহিরে আসিলেন এবং সরলাকে ডাকিয়া কহিলেন 'একটা কথা শুনিয়া যাও।'

সরলা সশঙ্কিতা হইয়া ঠাকুরুণদীদীর নিকট অগ্রসর হইয়া কহিলেন " কি ? '

ঠাকরুণদীদী কিঞ্চিৎ কৃত্রিক দুঃখ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন 'কথা এই ভাই—আমার কোন দোষ নাই– আমি কিকরিব ভাই— আমাকে তুমি এক কথা বলে পাঠালে প্রমদার কাছে বলিতে হবে আর তিনি এককথা বলে পাঠাইলেও তোমার কাছে বলিতে হবে। আমাকে ভাই গালি দিও না, আমি হইয়াছি সীতাহরণে মারীচ—

সরলা ভূমিকা শুনিয়া আরও ভীতা হইলেন। ঠাকুরুণদীদীর উপমা শেষ না হইতে হইতেই কহিলেন, " সেসব তুলনায় আর কাজ কি ? তোমাকে যা বলিতে বলিয়াছে তা বল, তোমার কথার বাঁদুনি শুনে আমার যে প্রাণ চমকে যাচ্চে। "

ঠা। "কতকটা চমৎকার কথাই বটে। তা যেখানে বল্‌তে হবে একেবারে বলে ফেলাই ভাল। প্রমদা বল্লেন কি একত্র থাকিলে ক্রমাগত বিবাদ বিসম্বাদ হয়। অতএব এ ঝকড়া বিবাদে কাজ কি। আজ অবধি তুমিও পৃথক হইয়া খাও আর তিনিও পৃথক হউন। আমার কি ভাই আমি বলে খালাস। "

কথা শুনিয়া সরলার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। যে ভয়ে তিনি কখন মুখ তুলিয়া প্রমদার নিকট কথা কন নাই, যে ভয়ে তিমি এত সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ সেই বিপদ উপস্থিত। বিধুভূষণও বাটী নাই। এ ঝকড়ার বিন্দু বিসর্গও তিনি জানেন না। হয়তো তিনি সমুদায় দোষ সরলারই মনে করিবেন।

কিয়ৎকাল অধোবদনে থাকিয়া সরলা সজল নয়নে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসিলেন

" ঠাকুরও কি এই কথা বলিলেন ? "

ঠাক্‌রুণদীদী একটী কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন " শিব কি কখন শক্তি ছাড়া থাকেন ? "

ঠাক্‌রুণদীদীর এই পৌরাণিক শাস্ত্র সম্বলিত উত্তর শুনিয়া এত দুঃখেও সরলার মুখে হাসি আসিল। কিন্তু অবিলম্বেই সে হাসা সংবরণ করিয়া সকরুণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাক্‌রুণদীদী এখন উপায় কি ? '

ঠা। " উপায়ের কথা আমি কি বলিব, সে তুমিই জান। শশিভূষণ আমাকে বলিলেন ঠাক্‌রুণদীদী আজি তুমি চারটি ভাত না দিলে আমায় অনাহারে থাকিতে হয়, ওর ব্যামহ ওতো কোন কর্ম্ম করিতে পারিবে না, কালি নাগাত অন্য কোন একটা সুবিধা করিব। তাই আমি আজি চারিটী রেঁদে দিয়া যাব। আমার কি ভাই, আমাকে তুমি ডাকিলেও আসতে হবে, আর তিনি ডাকলেও আসিতে হবে। '

ঠাক্‌রুণদীদী এই কথা বলিয়া রন্ধন শালায় গমন করিলেন, সরলাও আপনার ঘরে গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শশিভূষণ বাহির হইয়া যাইবার সময় ঠাক্‌রুণদীদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ' ঠাকরুণদীদী ওদের রান্না আজকার মতন ঐ গোয়ালের পাশে হউক, তার পর কালি একখান ঘর ঠিক করিয়া দেওয়া যাইবে। '

বিধুভূষণ পূর্ব্ব দিবস আহারান্তে পাড়ায় গিয়া শুনিলেন, মুখুয্যেদের বাড়ী যাত্রা হইবেক, আর তাঁহাকে পায় কে ? শুনিবামাত্রই মুখেয্যেদের বাড়ী গিয়া তিনিও উপস্থিত হইলেন এবং যাত্রা সম্বন্ধীয় বন্দবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। কখন ফরাস তদারক করিতেছেন, কখন সকলে আসিয়া কোথায় বসিবে তাহার উদ্যোগ করিতেছেন। কখন এর কাণে কাণে একটা কথা বলিতেছেন, কখন আর একজনের সহিত পরামর্শ করিতেছেন--অর্থাৎ যেন তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা। ক্রমে যত সন্ধ্যা সমাগত হইতে লাগিল তাঁহার ততই আমোদ বাড়িতে লাগিল। সকাল ২ চারিটী আহার করিতে বাটী আসিলেন, কিন্তু রান্না হয় নাই দেখিয়া 'আমি আজি যাত্রা শুনিব' এই মাত্র সরলাকে বলিয়া ফিরিয়া গেলেন। বাটীতে যে গোলযোগ হইয়া গিয়াছে সরলা সে বিষয় তাহাকে কিছু বলিলেন না। আর তিনিও কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

বাটী হইতে ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন যাত্রাদলের প্রধান বাদ্যকরের ওলাউঠা হইয়াছে, এজন্য যাত্রাওয়ালারা সে রাত্রে গান বন্ধ রাখার প্রস্তাব করিতেছে। কিন্তু এদিগে সমস্ত নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, উপায় কি, কেহ স্থির করিতে পারিতেছে না। বিধু কহিলেন "বাজানার জন্য ভয় নাই। আমিই নয় বাজাব। " উপস্থিত যাঁহারা ছিলেন সকলেই এই প্রস্তাবে মত দিলেন। বিধুর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

নিয়মিত সময়ে যাত্রা আরম্ভ হইল। যাত্রাওয়ালারা মনে করিয়াছিল বাদ্যের দোষ বশতঃ প্রাপ্তি দূরে থাকুক লজ্জা

পাইতে হইবেক কিন্তু দুই একটী গান সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহারা নিষ্কারণ ভয় পাইয়াছিল। বিধুর বাজনা তাহাদের নিজ বাদ্যকর অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট সুতরাং তাহাদের ভয় ঘুচিয়া উৎসাহ হইল। এবং যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিল প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহার দশ গুণ ফল লাভ হইল।

যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেলে যাত্রাওয়ালারা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ লাভের অংশ দিতে চাহিল। কিন্তু বিধুভূষণ তাহা গ্রহণ করিলেন না। হৃষ্ট চিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় শ্যামার সহিত দেখা হইল। শ্যামা গান শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল। বিধুভূষণ জিজ্ঞাসিলেন 'শ্যামা তুই কোথায় গিয়াছিলি ?"

। আপনাকে ডাক্‌তে গিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি যে লোকের মধ্যে বসে বাজাচ্ছিলেন দেখ্‌লাম আমার সেখানে যেতে ভরসা হলো না।

"ভয়ই বা কি ?

"সেখানে যে লোক ?

"লোকে কি তোকে ধরে খেতো ? তুই তো আর পাকা আবটী নোস্‌ যে তোকে পেলেই ধোর্‌বে ?

"আপনার ঐ এক রকম কথা। আমি কি বোল্‌ছি আমি পাকা আঁব ? বিধু। "আমার একই রকম কথা। আমি রোজ্‌ই তাই বলি কিন্তু তুই তো তার জবাব আজু দিলি নে।"

"যাও আমি তোমার ওসব কথা শুনতে চাইনে।" (উভয়েই বাটীর কাছে আসিয়াছে) 'যে চায় তাকে গিয়া বল।'

'সে কে শ্যামা।'

'বাটীর ভেতর গিয়া দেখ কে, যে আমাকে ঘুম থেকে তুলে তোমাকে ডাক্‌তে পাঠাইলে

ভারত ভূমি।

এই কি সে দেশ হায় !
পূজা দিত যার পায়
ভূমণ্ডল সমুদায় ? এই কি সে দেশ ?
এই কি ভারত আহা !
মর্ত্ত্যলোক মাঝে যাহা
অমরাবতীর তুল্য ধরিত সুবেশ !
কোথা সেই বুদ্ধি বল ?
কোথা সে প্রতাপানল ?
রাজ্ঞী ছিলে দাসী হলে কুপুত্র প্রসবি।
স্বর্ণ অলঙ্কার ভার
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত যাঁর,
ধুলায় এখন তাঁর লুটাইছে ছবি !
ধন, মান, কুল, গর্ব্ব,
সকলি হয়েছে খর্ব্ব,
বিজাতির পদানত হয়েছে এখন ;
অবনত মাথা আর
শক্তি নাহি তুলিবার
কেবল নয়ন-নীরে ভাসিছে বদন।
অন্তর্গত তব কীর্ত্তি,
মলিন নলিন মূর্ত্তি,
বদনে বচন স্ফূর্ত্তি না হয় এখন।
হেরে তব দশা হায় !
দুখে বুক ফেটে যায়,
আগ্নেয়াদ্রি মত হয় অন্তর দাহন।
কেন হায় ! পদ্মাসন,
ভুলাতে ভুবন মন,
এ হেন সুন্দর রূপ দিলেন তোমায় !
রুক্ষ-গিরি-মরু-মুখী,

হলে তুমি হতে সুখী,
এড়াইতে অধীনতা শৃঙ্খলের দায়।
অপূর্ব্ব রূপের ডালি,
তোমার হইল গালি,
যবনাদি রিপুচিত্ত করিলে চঞ্চল।
পশ্চিম প্রদেশ হতে,
আসি তারা, নানা মতে
বলেতে তোমারে দলি করিল বিকল।
সত্য বটে স্বরূপসি,
এখনো ও মুখ-শশী,
একেবারে হয় নাই শোভা-বিরহিত।
বাহিরে বিকৃতি-শূন্য,
কিন্তু ঘোর অচৈতন্য,
ভিতরে হয়েছে যেন আলো তিরোহিত।
সদ্যোমৃতা রামা সমা
মূর্ত্তি তব মনোরমা,
দেখিয়া দর্শক চিত্তে লাগে চমৎকার;
কোমল কমল কান্তি,
দেখি মনে হয় ভ্রান্তি,
এখনো দেহেতে আছে জীবের সঞ্চার।
পুত্র তব পদ্মাধিক,
কিন্তু ইহাদিগে ধিক,
সব দেখি অচল অকৃতি অভাজন।
হেন শক্তি আছে কার,
হরে তব অন্ধকার?
নির্জীব শরীর পুন করে সচেতন?
অদ্যাপি সহস্রকর,
বিস্তারি সহস্র-কর,
সুপক্ক করেন তব রসাল রসাল;
নিশা ভাগে নিশাকর,
যুড়াইতে কলেবর,
প্রসারেণ সুকোমল দীধিতির জাল।
অদ্যাপি সে সুরেশ্বরী
মুক্তামালা রূপ ধরি,
বিরাজেন তব বক্ষে পূর্ব্বের মতন,
যাঁর কূলে পুরাকালে,
মহাবল মহীপালে,
যজ্ঞ করি অশ্ব-মুণ্ড করিত ছেদন।
পূর্ব্ব মত কলকলে,
জল তার বেগে চলে,
মরকতে মণ্ডিত করিয়া দুই তীর।
অদ্যাপি সে হিম-গিরি,
মস্তক উন্নত করি,
স্বর্গ ভেদি, স্বীয় দর্প রাখিয়াছে স্থির।
প্রাকৃতিক শোভা যত,
সব আছে পূর্ব্ব মত,
একমাত্র আর্য্য-জাতি ঘৃণার আস্পদ;
নত শিরে, অন্ধকারে,
থাকে সদা কদাচারে,
ভিখারী বিদেশী-দ্বারে হারায়ে সম্পদ।
বল-বীর্য্য-জ্ঞান-হীন,
পরতন্ত্র, পরাধীন,
একতা-সভ্যতা-শূন্য বিষণ্ণ মানস।
নব কীর্ত্তি থাক দূরে,
পূর্ব্ব কীর্ত্তি নাহি স্মরে,
মন্ত্র-প্রায় সমাচরে, বিজাতির বশ।
মূর্খতা নিগড় পায়,
তাদের কি শোভা পায়?
জ্ঞান-সূর্য্য জনমিল যাহাদের কুলে।
দর্শন, জ্যোতিষ শাস্ত্রে,
চিকিৎসা, সাহিত্য, শাস্ত্রে,
ছিল যারা সর্ব্বোপরি এ মহীমণ্ডলে।
কোথা সে "কারিকা"-কার?
সুবিখ্যাত মত যাঁর,
নির্গুণ পুরুষ আর সগুণা প্রকৃতি।
কোথা সেই অক্ষপাদ?

করি যিনি 'ন্যায়, বাদ'
জড়, জীব, ঈশ্বরের করিলা বিবৃতি॥
কোথা হায় দ্বৈপায়ন?
এক-ব্রহ্ম-পরায়ণ,
দ্বৈত-বোধ ভ্রম নাশে যাঁহার প্রয়াস।
কোথা বুদ্ধ নির্ব্বিকার?
সর্ব্ব জীবে দয়া যাঁর,
নির্ব্বাণ-মুকতি প্রতি অটল-বিশ্বাস॥
কোথা সেই আর্য্যভট্ট?
বিস্তীর্ণ আকাশ-পট্ট,
হস্তামলকের প্রায় জ্ঞান হ'ত যাঁর।
দিবানিশি দিনকরে,
ধরা প্রদক্ষিণ করে,
এই বার্ত্তা যাঁহা হ'তে হইল প্রচার।
কোথায় ভাস্করাচার্য্য?
গণিত যাঁহার কার্য্য,
লীলাবতী গ্রন্থ যাঁর বিখ্যাত ধরায়।
কোথায় চরক মুনি?
ভিষকের শিরোমণি;
অস্ত্র চিকিৎসার গুরু সুশ্রুত কোথায়?
কোথা সে অতুল বীর,
জিতেন্দ্রিয় রণে স্থির,
খাণ্ডব-দাহন-কারী তৃতীয় পাণ্ডব?
কোথা রাজা চন্দ্র গুপ্ত?
গ্রীক গর্ব্ব করি লুপ্ত,
রক্ষা করিলেন যিনি দেশের গৌরব॥
প্রতাপে জিনি আদিত্য,
কোথা সে বিক্রমাদিত্য?
শক-বংশ ধ্বংশকারী তেজস্বী ভূপতি।
অপর সে নাম ধারী,
সর্ব্ব জন মনোহারী,
কোথা হায়! নব রত্ন সভা অধিপতি॥
কোথা সে সভার রবি,
কালিদাস মহাকবি?
বিকাসে হৃদয়পদ্ম যাহার প্রভাবে।
অভিজ্ঞান শকুন্তলে
কার নাহি চিত্ত গলে?
রঘুবংশে কে না হয় হয় গদ গদ ভাবে
কোথা বা সে উজ্জয়িনী,
অলকা নগরী জিনি,
মেঘ দূতে শোভা যার রয়েছে চিত্রিত
যেথা হ'তে বুধগণে
যাম্যোত্তর * রেখা গণে,
জ্যোতিষ ও সাহিত্যের ধাম মনোনীত॥
এবে সে মোক্ষদায়িকা।
পুণ্য পুরী অবন্তিকা,
সামান্যা পুরীর মত আছে সিপ্রা তটে।
শঙ্কর গর্ব্ব তার।
হইয়াছে ছার খার,
আর কিসে মনোরমা সুষমা প্রকটে?
কোথা পুষ্প পুর (১) হায়!
চিহ্ন নাহি পাওয়া যায়;
"প্রিয়দর্শী,, অশোকের লুপ্ত রাজাসন
সুত যাঁর সুবিক্রম,
মহেন্দ্র মহেন্দ্রোপম!'
দ্বীপান্তরে বৌদ্ধ মত করিল রোপণ।
বিখ্যাত পাটলি পুত্র
আছে সুধু নাম মাত্র,
যবন নির্ম্মিত পুর "আজিম-আবাদ'।
নাহিক পূর্ব্বের ভাতি,
তথাপি পাটনা, খ্যাতি;
এখন পাটন বলা সুধু মিথ্যাবাদ॥

* longitude

(১) পুষ্পপর, কুসুম পুর, এবং পাটলী পুত্র, প্রাচীন পাটনার নাম। এক্ষণে উহা পাটনা বা আজিমাবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হিন্দুদের অহঙ্কার,
সমস্তই ধূলিসার;
নাহি আর পূর্ব্বকার কোন রাজধানী।
হস্তিনা মৃত্তিকা মগ্ন,
কাণ্যকুব্জ দেখি ভগ্ন,
কৌশাম্বী নগরী হায় কোথায় না জানি
ইন্দ্র প্রস্থ গৃহোপরি,
সাহজাহানের পুরী, *
অপূর্ব্ব মাধুরী ধরে যমুনার ধারে।
অযোধ্যা করিয়া নাশ,
ফৈজাবাদ সুপ্রকাশ;
প্রয়াগ এলাহাবাদ যবনাধিকারে॥
পুরাতন কীর্ত্তি যত,
সকলি হয়েছে হত;
নূতন যা কিছু দেখ বিজাতি-স্থাপিত
পূর্ব্ব দিকে কর দৃষ্টি
অপূর্ব্ব নগরী স্থষ্টি,
কলিকাতা রাজধানী ইংরাজ রচিত॥
আর্য্যদের বুদ্ধি বল,
সব গেছে রসাতল,
বিদেশীয় সুকৌশল মোহিছে নয়ন।
কোথায় পুষ্পক রথ!
শত দিবসের পথ,
এক দিনে রেল-যানে করিছে ভ্রমণ॥
দেশ ভেদ কাল ভেদ
একেবারে করি ছেদ
তড়িল্লতা বার্ত্তাবহ হয়েছে এখন।
গ্যাসেতে মসাল ধরে,
কিম্বা, নিম্বি নভশ্চরে,
অদ্ভুত বিমানে নরে করিছে বহন।
হায়রে ভারত বাসি!
বিদেশী কৌশল রাসি
স্বচক্ষে দেখিয়া তবু না হও লজ্জিত?
তোমরাও নর বট,
জ্ঞানে কেন পাছু হট?
উহাদের মত কেন নও সুচেষ্টিত?
"যাদৃশী ভাবনা যার,
সিদ্ধি তার সে প্রকার"
কখন অন্যথা নয় শাস্ত্রের রচন।
আলস্যেরে পরিহর,
সাহসেতে ভর কর;
যতন করিলে পাবে অবশ্য রতন।

—:।:—

পারিশ নগরীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সুপ্রসিদ্ধ মহাপ্রতাপসম্পন্ন ইউরোপস্থ ফ্রান্স রাজ্যের স্বর্ণ-পুরী তুল্য পারিস-নগরীর বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে ইহার একটী প্রাচীন-ইতিহাস সংক্ষেপে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। জনশ্রুতি এই প্রকার যে ট্রয়ের অধিপতি সুবিখ্যাত প্রায়েমের দ্বিতীয় পুত্র পারিসের নামে এই নগরের নামকরণ হইয়াছে। ইহার প্রথম অবস্থা অতিশয় হীন ছিল, তৎপরে ফ্রান্সাধিপতি ষষ্ঠ ও সপ্তম লুই দ্বারা ইহার অনেক উন্নতি সাধন হয়। ধর্ম্মশালা, চিকিৎসালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, উপাসনালয়; রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, ও উদ্যান সমুদায় ষষ্ঠ লুইএর সময়ে নির্ম্মিত হয়। এই সময়ে পারিস-নগরী একটী সুপ্রশস্ত দৃঢ়কায় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই দুই সম্রাট-দ্বয়ের পরবর্ত্তী অধিপতিগণ সুদৃঢ় দুর্গ, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মশালা, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পরিশেষে নবম লুইএর রাজত্ব কাল হইতে ইহার প্রকৃত

*নূতন দিল্লী।

সৌন্দর্য্য ও উন্নতি সাধিত হইতে আরম্ভ হয়, ও লোকসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই এই নগরী সুসভ্য ইউ-রোপ খণ্ডের এক প্রধান সমৃদ্ধিশালী ও নানা সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা নগরী বলিয়া প্রসিদ্ধা হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু গত ১৮৭০ খৃঃঅব্দে গর্ব্বিত ফরাশিশগণ ভীষণতর রণ মদে মত্ত হইয়া আপনা-দিগের স্বর্গপুরীতুল্যা রাজধানী ধ্বংশ করিয়াছে। তথাপি আধুনিক পরি-ব্রাজক মহাশয়গণ বলিয়াছেন যে "ষোড়শ শতাব্দিতে যেমন ইহার ধ্বংশ হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে পুনরায় পুর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ও সেই রূপ আবার পারিস পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই'।

ফ্রান্স রাজ্যের সমৃদ্ধিশালী জগদ্বি-খ্যাত রাজধানী পারিসনগরী সিন নামক সুস্নিগ্ধ তটিনীর তীরে সংস্থা-পিত। এই নগরীর মধ্যে প্রায় পৃথিবীস্থ সকল জাতির বসতি আছে। ইহা "বর্ত্তমান বেবিলন" লণ্ডন নগরীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে লোকের জনতায় পরিপূর্ণ। বিদেশীয়গণের মধ্যে আমেরিকাস্থ সম্ভ্রান্ত লোকের অধিক বসতি। এই স্থানে কোন বস্তুর অভাব নাই, যখন যাহা ইচ্ছাকর তাহা অনয়াসে প্রাপ্ত হইতে পার। পারিসের পরিস্কৃত শ্বেতবর্ণ রাজমার্গ, পার্শ্বদ্বয়ে রাজ প্রাসাদতুল্য অট্টা-লিকা, স্থানে স্থানে নির্ঝর, মধ্যে মধ্যে নিভৃত নিস্তব্ধ নিকুঞ্জ বিশিষ্ট উদ্যান, স্থানে স্থানে সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপরোধক বৃক্ষাবলীর দ্বারা শোভিত রাজমার্গ, হরিদ্বর্ণ তৃণ শোভিত সুপ্র-শস্ত ক্ষেত্র, শোভ মান রহিয়াছে। উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া গমন করিলে নানা বিহঙ্গমগণের সুমিষ্ট সুমধুর অব্যক্ত মধুরধ্বনি কর্ণকে অমৃতা-ভিষিক্ত করে, নগরের মধ্য দিয়া গমন করিলে প্রায় প্রত্যেক বাটী হইতে উৎসব ও আনন্দ শব্দসূচক সংগীত ধ্বনি, অপরাপর বালক বালিকাগণের কলরব শুনিয়া মন আনন্দরসে আপ্লুত হয়। কোন ভ্রমণকারী বলেন 'পারিস নগরের অনু-পম শোভা আমার হস্তস্থিত লেখনী লিখিয়া ব্যক্ত করিতে সক্ষম হয় না। ইহার অভ্যন্তরস্থ এক পুরাতন রাজ-বাটীর পার্শ্বে একটী প্রশস্ত চতুষ্কোণ ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রের উপর মহাবীর নেপোলিয়ান তদীয় অসম-সাহসিক সৈনিক পুরুষগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিতেন, ও তাহাদের যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ডি-লা-কনকর্ডি নামক প্রসিদ্ধ সুদৃঢ় অট্টালিকা। ইহার পার্শ্বে সুন্দর ও বহুদিনের নির্ম্মিত পিত্তলের দুইটী নির্ঝর ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে। ইহার নিকটে চেম্পাস ইলিজি নামক সুন্দর ও সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকা সিন নদীর তীরে স্থাপিত। ইহার চতুপার্শ্বস্থ পথ সমুদায় নানাবিধ পুরাতন বিটপী দ্বারা দুই পার্শ্বে আচ্ছাদিত ও অতি সুন্দর। আর একটী পুরাতন রাজ-বাটীর মধ্যে চতুর্দ্দশ লুইএর বহুমূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহার মধ্যে নেপোলিয়ান ও ফান্সের অন্যান্য সুবিখ্যাত রাজা ও রাজ্ঞীগণের প্রতি-মূর্ত্তি আছে, এবং সুবিখ্যাত নেপো'

লিয়ানের কয়েকটী সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতিরও প্রতিমুর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই স্থানে নটি্রডেম নামক বহুদূরব্যাপী সুপ্রসিদ্ধ প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা লণ্ডনগরের "ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবি" নামক সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকার ন্যায়। ইহার মধ্যে ফ্রান্সের প্রত্যেক রাজার রাজ্যাভিষেক হইয়া থাকে। ইহার নিকটে চতুর্থ হেনিরির একটী পিত্তল নির্ম্মিত অশ্বারূঢ় প্রাত মূর্ত্তি আছে। পারিসের সর্ব্বপ্রধান উপাসনালয়ে ফ্রান্স-সম্রাট সুবিখ্যাত মহাত্মা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সেণ্টহেলেনা নামক দ্বীপে নেপোলিয়ানের সমাধি কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহার কয়েক বৎসর পরে ফ্রান্সবাসিগণে তাঁহাকে সমাধি মন্দির হইতে উত্তোলন করে, ও যে প্রকার অবস্থায় নিহিত করা হইয়াছিল, সেই প্রকার অপরিবর্ত্তিত অবস্থা দর্শন করিয়া তাহারা পারিসে লইয়া আসে ও উক্ত উপাসনালয়ে নিহিত করে।

পারিসে নানা প্রকার প্রসিদ্ধ অট্টালিকা, অসংখ্য হোটেল, বিদ্যালয়, চিত্রালয় ও শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থান শিল্পের আকর বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এখানে সংগীত ও সুসভ্য ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্ব প্রধান স্থান বলিলে বলা যায়।

THE POLITICAL EFFECTS OF THE MAHOMEDAN CONQUEST.

In keeping with the meagre form f the first part of this article, we carcely hesitate to attempt treating the huge topic heading this paper into the contemptible size of a nut-shell.

In order to understand or explain the effects of the Mahomedan conquest on India from any point of view whatever, it is necessary to know precisely what the state of things in India was when she was siezed by the Moslem power. But the grief is, for this we are mostly left to conjecture. That the civilization of India was loftier and more consummate than of Greece or Rome requires but little proof. Her science, her art, her philosophy, her poetry; her language, her grammar, her laws, her medicines, and her religion and her manners, all had reached to a degree of excellency which cannot fail to command admiration. The governing institutions that formed and fostered the sovereign power that sheilded, the forces of national character that engendered, these, must have all been transcendingly great. The common opinion is that the greatness of the Hindoo civilization--nay that civilizatin itself was the product of mere meditative cogitations---the result of mere thought and reflection. This we must say-however impudent or unsafe it may be to differ from established opinions--to be a mistake. Art and science and in short a high form of civilization can never be brought forth by thought alone. An extensive and deep civilization such as ancient India had must be the issue of thought married to facts and not to facts of a bare and slender form but strong and impressive

facts. Seeing therefore, if it were, only the admirable remains of Hindoo civilization as they are now to be met with, one might safely assert that that civilization was not merely the product of retired meditation—but that there were also great events to stir, feats of ambition to animate, brilliant conquests, splendid triumphs, concentration of national power, and a fair redistribution of it, to bring it about. In a word, there must have been some sort of paralels in India to the courses of aggrandizement which transpired in Greece and Rome. But how came to fall that great power in India ? What were the causes of its decline, how it was affected by the nations that bordered India on the north west, that were yet far more kindred and congenial to the people of this country than the introduction of the Mahomet's religion has left them, how the aborigines of the country accelerated or retarded its downward march, how its internal manner and habits tended to sink it—all these are unfortunately questions which stand more or less unanswered and unsolved.

One thing however is certain.

From a considerable time before the advent of the Mahomedans the Hindoo Government had been waning in forces of arms and generally in physical power, while the empire of the Hindoo mind in the world of ideas was yet in a strong position. The dispersion of the Hindoo nation over the vast continent of India had, as if it were, diluted the Hindoo power, but at the same time the tastes for literary pursuits and the habits of religious and philosophical cultivation continued without abatement. About six centuries before the birth of Mahomet, the Court of Vikramaditya was shining with that literary splendour which the courts of Augustus Cœsar, or Elizabeth could scarcely rival. And some time before that era a Hindoo was inaugurating a religion which spread no less fast than did the religion of the Arabian Prophet with the sure sword to aid it and which spread over an area larger perhaps than that occupied by the Mahomedan religion. But this religion of the Budh or the Wise got little footing in the country where it sprung. Prophets never meet with consideration in their own land. The Budhistic religion was thus a dissenting system. Its effects on the orthodox religion was to strengthen the latter and to cause a greater degree of attachment to it in the popular mind.

But how do the above circumstances connect themselves with our topic ? The connection is clear. We began in the preceding number with the proposition that conquests lead to develope national character in a political aspect. And then we undertook to show why the Mahomedan conquest led to no such result in India and to point out that that does not prove any natural inaptitude in the Indian character for free institutions. Now as regards the first proposition—that conquests are salutary in effect to the con quered—this is true only under

certain conditions. The homœpathic doctrine of the similar curing the similar would exactly apply to this subject. If the conquering nation is similar to the conquered nation in some essential point, improvement is likely to follow. That would also be the case if the two nations can manage to assimilate themselves to each other in some important matter even though at the begining they might not be any way congenial one to the other. The conquered Saxons were to such an extent like the conquering Normans that there were little difficulties in the way of the two fusing into each other. They differed no doubt in some measure in manners, customs and laws, but neither nation had reached to an inflexibility of attachment to the practices and institutions that obtained among them, while on many points in their tastes and habits and especially as to their religious belief they were alike. The same may be said of the conquered plebs and the conquering citizens of the Imperial city. Conquests, in short, are like manures which will fertilize the old soil provided those manures are fit to be assimilated to it. What commerce and international communications do in a higher and purer phase conquests do in a lower and coarser form. But the parties must understand each other in order to benefit by conquests.

If the conquering nation be immeasurably superior to the conquered in all respects either relating to body or mind, the conquered nation is destined in most cases to perish away, as in the case of the American aborigines and partially in the case of the aborigines of India.

But there is a third alternative and to that belongs the case of the conquests of the Mahomedans in India. When the conquerors have gained in the strife of physical force but can neither conquer nor submit to be and permitted to be conquered in the great war of moral force. When the conquered though vanquished in the battle fought with arms remain defiant and scornful in the field of religion, thought, customs and manners. When this is the case, conquests have all their evils but none of that good which results from intercommunion and gentle pressure. The Hindoos as we have seen although they had been for various causes unable to offer a successful resistance to the arms of the Mahomedans, were, at the time the Mahomedan invasions began, thoroughly strong in the regions of ideas and feelings. There India was as patriotic as fortified, as proud as uncompromising. Its sons as a body never for once even, thought to condescend so far as to work with the *jaban* in any cause. Even there was a mighty gulf between the Mahomedan conquerors and the conquered Hindoos. The Hindoos might quail before the sword of the Mahomedans but in mind they would never but despise the *jabans* as wanting in purity of religion and refinement of thought. It was rather the Mahomedans—bigotted and staunch

in creed as they were, it was rather they that on many occasions sought to conciliate the Hindoos. But no, they would not bear, they would rather bear up with oppression, they would rather hide themselves in obscurity, they would rather resort to hypocricy than compromise their national sentiments and feelings. There were individuals who mixed into Mahomedan society and attached themselves to the Mahomedan courts and they were raised to high offices, but the nation as a whole remained as stiff and asunder as ever. Thus it was that the Mahomedan conquest produced a different result than the Norman conquest in England or the Roman conquest of the neighbouring populations. The cause of the difference is not as at first view it is often imaginned to be, a natural tendency to slavishness and submission in the oriental character. The cause is as shown the very opposite of it and every Hindoo ought to be proud of the attiude which his forefathers assumed to their Mahomedan conquerors who attempted to jeopardize the thing which reasonably and naturally enough they held next to their heart. If they had not observed this instinctive policy, they might have made themselves politically better but like that language of the bazar of Delhi they would have stood the risk of reducing themselves to a contemptible new forged race. Thus far from being naturally unable to appreciate and have a free or constitutional Government, they of their own accord refrained from seeking it and refraiend for good reason. The great trial for India was not that she had to bear a foreign despotic Government but that lest the Hindoo mind should be vanquished and ruined. Thanks to the great God the trial was successfully passed through and it is surely very little that the Hindoos did not seek to get a more adequate share in the Government of their country than they actually had, that they did not seek for institutions in which they as a nation would have had ... gle with the Moslems.

ANCIENT COMMERCE OF INDIA

No. II

In our first article we had merely cursorily remarked, that the fact of the ancient Indians engaging themselves in commercial enterprises, was not only probable but certain and that the perfect coincidence with the manners and customs, relegion and social institutions and architectural style with some of the most remote nations on the face of the earth prove without the shadow of a doubt that close communication by means of sea must have existed before such adventurous spirits had been known in any other country in the world.

The researches of the antiquarians have already proved that India was one of the countries which first received the light of civilization. (Every kind of arts and sciences, all the conveniences of life, and those articles of living which civilized society requires

were abundantly to be found in India.)

"Necessity is the mother of Invention" and necessity must always reign when civilization has increased demand. With demand there must always be a proportionate desire to satisfy it and satisfaction of such demands is impossible unless met by ready and vigorous supply.

In this state of thing it is but natural to expect, that those whose inclination or ambition induces them to enrich themselves at the expense of others, should take upon themselves the duty of mininistering to the *wants* of the great. No doubt they should, first of all, try to supply the wants from what is within their reach but when such resources fail, they cannot but be obliged to look to other countries for accomplishing their objects. Their first attempt must be to sail on rude canoes or junks to some nearer islands such as Ceylon, Java or Sumatra and by and bye to remote countries. Then were required those laws and regulations which Manu had wisely framed for the protection of their rights and privileges. Due encouragements were also indispensably necessary for keeping their spirits up and enabling them to bear all the dangers, and privations incident to such precarious lives and rich remunerations in return for the investments of that money.

It must be granted that many centuries must have elapsed before the Indians could venture out in such bold enterprizes, but that the country had attained such state at the time of Manu is certain from the rules, that are to be found among his institutes, regarding the condtion upon which money should be lent to traders and the manner in which they should behave themselves in foriegn countries, when thrown upon their own resources and out of the protection of their countries' laws. Numerous passages occur in Hindoo books which confirm the assertion. In Kiskinda kanda of Ramayan, in the instructions given to Nakul and Urjoon in the Mahabharat on the occasion of their undertaking the expedition for the conquest of the whole world, in Kamandkie Nitisar and in many other celebrated works mention has been made of sea voyages.

It has been mentioned that Gokarna once went to sea on a mercantile expedition but that his ship was wrecked. Then story of Pudma a Hindoo baniah having made seven voyages to the sea is we believe known to many as also the adherents of Salivan having fled to foreign countries by means of ship when their monarch fell in the battle with his enemies.

But lest it should be said that the testimonies of the native historians are unreliable from the fact of their being in the habit of exaggerating every thing they describe, let us turn for proof to foreign authors who treat on such subjects. We would here quote the words of Tacituas as traslated by Murphis.

"Pliny the Elder relates the fact after Cornelius Nepos who, in an

account of a voyage to the North, says, that in the Consulship of Quintus Miletus Celer and Sercius Africanus, (A. U. B. 694 B. C, 60) certain Indians who had embarked on a commercial voyage were cast away on the coast of Germany and given as a present by the king of the Suavians to Miletus who was at that time Proconsul or Governor of Gaul Pliny Sec. II. 3. 67.

Now every one who woul read the above passage cannot but be astonished at the enterprizing spirit of the ancestors of the present homesick Hindoos who would find it great difficulty in budging an inch out of their country either for pleasure or gain.

Every reader of history must remember how much did the world congratulate itself when the Cape of Good Hope was doubled so late as 1498 A. D. It was then surmised that Europe and Asia, Eastern and Western Worlds, shall henceforth be knit together by ties of mutual interest and that interchange of thoughts and feelings, knowledge and wealth, would establish relationship on a permanent basis between the countries which before this time were separated by insuparable barriers. The whole of the credit was unreservedly given to Vasco de Gama who could unmindful of the danger of such an uncertain voyage, hazard his whole in the interets of his fellow creatures. Later still did Franklin the celebrated voyager who undertook to explore passage through the Arctic Ocean gained unbounded credit.

But would the reader for one moment consider how those Indian merchants reach the German Ocean ? It must be remembered that merchants as a body are very cautious as to how and where they go. Not only their lives but their whole wealth is risked on the chance of a voyage so that it cannot be expected that they would sail to such places or through such seas which had not been previously explored or properly navigated. If these merchants went to Germany 60 years before the Christian era as is proved by their being given as presents to Miletus who held at that time the Proconsulship of Gaul, it is but reasonable to conclude, that the passage to those parts of the world must have been known to the Hindoos at least forty or fifty years before that period or about 16 centuries before Vasco de Gama ventured to discover the passage to India through the Cape of Good Hope or before Franklin sailed to the Artic Ocean. We speak of these two passages because the merchants of India must have passed either of them in order to reach the Northern Sea.

The proofs that we have collected as to the ancient Indians having undertaken long voyages are so overwhelming that we cannot in justice to our Bengali readers mention them all in this number but till to satisfy the curiosity of those readers who hve no leisure or opportunity to make researches on such antiquarian subjects, we shall give a few more instances.

It is said that Servious, a Roman philosoher, had held conversation with some Brahmans in his house at Alexaindria in Egypt.

Nonus an Egyptian poet has written that the Indians were very expert sailors and they could fight on sea better than on land. This was in the fifth century before the birth of Christ. Dr. Nelson the antiquarian has said that there was a great communication between Egypt and India.

Many travellers have borne testimony to the fact. From what they saw in Socotra it was plain that the present inhabitants were the descendants of those Hindoos who formerly settled there. A slight knowledge in geography would show that this could not have been effected but by a daring sea voyage undertaken by skillful navigators. More than two thousand years ago Hindoo servants were numerous in Greece and that there are still to be found Indians in Colchis between the Caspian and Black Seas.

We have, we hope, adduced sufficient proofs to show that the ancestors of the present Hindoos did not lack the spirit of commercial enterprize. The cause why that spirit is now wanting may be looked for in the total subjugation of the nation by the Mahomedans who were quite ignorant of the art of navigation for so many centuries together.

We have, thank God, in our present rulers such teachers who are willing to encourage in every thing that can enbellish life or increase the conveniences of the common wealth.

We advise therefore all those who have the means at their disposal to follow the examples of their governors and thus give sufficient employment to the best Indian intellects and geniuses whose exertions are now directed either to the attainment of a Keranidom or lost in sedentary or unprofitable studies of English poets and historians.

A BRAHMAN'S TALE.*

The old King lies in bed, to sleep at last he tries,
But care for justice scarcely lets him close his eyes.
For little it avails that princes fashion laws
Unless unceasingly they their observance cause.
How seldom makes its way to palaces of kings
A prayer which the oppressed against injustice frings!
But from his chamber wall this king of whom I tell
Has outside hung a string and inside hung a bell
And will'd, that all who suffer wrong in any thing
May to his chamber come and freely pull that string.
When at his ear the bell is rung by unseen hands
The king awakes and well that voice he understands.
Then hushes he some wail or remedies some ill,-
To bless the land which heaven gave him is his will.
Now every grievance he has heard and set aright

* Translated from Rueckert

And now that tinkling has been heard no more this night.
But scarcely did a gentle slumber o'er him creep,
When sudden ringing roused him roughly from his sleep.
What human being so inhumanly may ring?
A search is made and lo! an Ass has pulled the string.
A wretched ass from head to tail all covered o'er
With bruises and with cuts and many a woful sore.
'Tis clear as clear can be, he needs not to complain,
Too cruel were for him the burden and the strain.
The ass is healed and cared for by the king's command
And 'tis ordained abroad as law throughout the land:
That no man task his beast henceforth too grievously,
So that the king himself some time at rest may be:
Because he never can enjoy a short repose
While, though no men complain, yet beasts proclaim their woes

---

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

A dictionary of English and Bengallee language (ইংরাজী এবং বঙ্গভাষা অভিধান) এই পুস্তকের ছাপা ও কাগজ প্রভৃতি বাহ্য-দর্শন যেমন উত্তম, ভিতরেও সেইরূপ। আমরা একথা বলিতে অনুমাত্র ইতস্ততঃ করিনা যে, ইংরাজী বাঙ্গালায় যত গুলি অভিধান আছে, ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে শব্দের উচ্চারণ পদ্ধতি থাকিলে ও বঙ্গভাষার অর্থ গুলি আরও কিছু প্রমার্জিত হইলে এখানি যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত, তাহাতে আমরা অনুমাত্র সন্দেহ করি না।

আমরা ইহার ১৭ ফর্ম্মা প্রাপ্ত হইয়াছি।

কালীদাসের জীবনচরিত—বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত ও কলিকাতা ষ্ট্যানহোপ প্রেসে মুদ্রিত। এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটী পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

এই পুস্তক দেখিতে ক্ষুদ্র-কলেবর, কিন্তু কেবল সারপরিপূর্ণ। আমরা রামদাস বাবুকে অনুরোধ করি যে, প্রস্তাবটি দীর্ঘায়তঃ করিয়া পুনর্মুদ্রিত করেন। রামদাস বাবুর ন্যায় আর কয়েকটি গ্রন্থকর্ত্তা হইলেই "বাঙ্গালিরা কেবল অনুবাদপ্রিয় এই অপবাদ দূর হইবে। তথাপি এপুস্তক খানি ইংরাজি গন্ধ বিরহিত নহে।

ভারৎবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন—বাবু রামদাস সেন প্রণীত।

আমরা রামদাস বাবুর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার ন্যায় মহজ্জনের এরূপ সামান্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ সময়ের যথা অপব্যয় ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না।

কৃতজ্ঞতার সহিত পুঠিয়ার রাণী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবীর দান ১০০ টাকা স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবু তারানাথ চৌধুরী পুঠিয়া ২॥০
" " গোবিন্দচন্দ্র সেন ঐ ২॥০
" " প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার ঐ ২॥০
" " গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার ঐ ২॥০
শ্রীমতী রাম সখি দেবী ২॥০
" শ্রীসুন্দরী দেবী ঐ ২॥০
" মৃত্যুময়ী গুপ্তা ঐ ২॥০

উপর্যুক্ত ১৭॥ টাকা ও ১৫ টাকা (তাঁহার নাম আমরা প্রাপ্ত হয় নাই) আমাদের পুঠিয়ার এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি।

Anglo Vernacular Reading Club Dinajpore.

শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী মোহন চৌধুরী সেরপুর ২॥
রায় রাজীব লোচন রায় বাহাদুর কাশীমবাজার ২॥
" " লীলারাম দাস গোহাটী ২॥
" " নবীন চন্দ্র পালীত কলিকাতা ২॥
" মোহিনী মোহন রায় ঐ ২॥
" " হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর ২॥
" " হারাধন গোস্বামী নওখিলা ২॥
" " রমানাথ সেন তালাই মারি ২॥০
" " দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মালদা ॥৶১০
" " রাজকুমার সরকার বোয়ালিয়া ২॥০
" " কিসোরী মোহন রায় ঐ ২॥০
" " মহেন্দ্র লাল বসু ঐ ২॥০
" " মথুরা নাথ মৈত্রেয় ঐ ২॥০
" " নবীনচন্দ্র বসাক ২॥০
" " কৃষ্ণধন বাগছী ২॥০
" " সৈয়দ তফজ্জুল হোসেন ২॥০
" " কালীকমল রায় ১।০
" " শ্রী শিবচন্দ্র বাগছী ২॥০



Registered No. 109.

বিজ্ঞাপন।

১। জ্ঞানাঙ্কুরের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সহ ২॥০ টাকা প্রতি সংখ্যা।০।

২। এই পত্রে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে প্রথম তিন বার পর্য্যন্ত প্রতি পংক্তি ৵০ দুই আনা হিসাবে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপন দীর্ঘ স্থায়ী হইলে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

৩। যাঁহারা এই পত্রের গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা রাজসাহী বোয়ালিয়ায় জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিবেন।

৪। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত আর পত্র দেওয়া যাইবে না। গ্রাহকগণ মনে রাখিবেন যে তাঁহারাই পত্রের জীবন।

৫। ষ্টাম্প দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিতে হইলে প্রতি টাকায় (১০) অর্দ্ধ আনা অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৬। কলিকাতায় যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি, বাহির সিমলা মুক্তেশ্বরী ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত বাবু, রজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়কে পত্র লিখিবেন এবং তাঁহারই দস্তখত রসীদে মূল্য দিবেন।

রাজশাহী বোয়ালিয়া। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস।
জ্ঞানাঙ্কুর কার্য্যালয়। সম্পাদক।

JNA'NA'NKURA

OR

THE SEED OF KNOWLEDGE

A MONTHLY ANGLO-VERNACULAR MAGAZINE AND REVIEW

OF

LITERATURE, PHILOSOPHY, SCIENCE, HISTORY, BIOGRAPHY, ANTIQUITIES, AND RESEARCHES, POLITICS, ARTS, COMMERCE, &c. &c.

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয়
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

——:॥:——

সূচী।

কলিকাতা ঃ

বহুবাজার, হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিস্থিত ৫২ সংখ্যক ভবনে,
স্মিথ এণ্ড কোর যন্ত্রে, শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৭৯।

কলিকাতা।

বিডন স্কোয়ারের উত্তর ৯৬ নং বাটী

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক স্ত্রী পুরুষ ধাতু দৌর্ব্বল্য ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীরের শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা ও ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তিবিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত এবং ধারণাশক্তি বৃদ্ধি এবং শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছুক হইলে পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিয়া ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ (৫) পাঁচ টাকা পাঠাইতে হইবেক।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

হেয়ার প্রিজারভার।

(যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দ্বারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়)

হেয়ার প্রিজারভার কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণ বর্ণ ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থা হইবে।

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ,, ১ টাকা
ঐ ডাক মাসুল সহিত ,, ১৷৵

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, মধুমেহ, অর্শ, বহু মূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ বিক্রয়ার্থ এখানে প্রস্তুত আছে।

হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতিদিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূলগ্রস্থ রোগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ১ টাকা
ঐ ডাকমাসুল সহিত ১৷৵

কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি এক টাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৹ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেকের চারি আনা।

বিলাতি যত প্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী ও ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

জ্ঞানাঙ্কুর।

মাসিক পত্র

১ম খণ্ড চৈত্র ১২৭৯ ৭ম সংখ্যা

জন্ লক্ এবং আত্মপ্রত্যয়

সমালোচন।

প্রায় সর্ব্বদেশীয় দার্শনিক ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রবেত্তারা চেষ্টালব্ধ জ্ঞান ও ভাব ব্যতীত 'আত্ম প্রত্যয়' অর্থাৎ সহজ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। এই 'আত্ম প্রত্যয়' স্বতঃসিদ্ধ, অর্থাৎ প্রমাণ সাপেক্ষ নহে এবং সর্ব্ব প্রকার শিক্ষার পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে। সকল বিষয়ই সীমা বিশিষ্ট; আদি ও অন্ত বিহীন কিছুই দৃষ্ট হয় না। তবে আমাদিগের জ্ঞানের আদিই বা কোথায়? অন্তই বা কোথায়? ইত্যাকার প্রশ্ন উপস্থিত হওয়াতে দার্শনিকেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'আত্ম প্রত্যয়ই' আমাদিগের জ্ঞানের মূল, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রথম আরম্ভ; আর আমাদিগের অজ্ঞানতার সত্তার বোধই জ্ঞানের শেষ সীমা।

তবে এ স্থলে এই মাত্র জিজ্ঞাস্য যে, সহজ জ্ঞান ও শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, এই উভয়ের পার্থক্য কিরূপে অনুভূত হয়? জ্ঞান চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং উক্ত উভয়বিধ জ্ঞানের আকারগত প্রভেদ হইতে পারেনা। জ্ঞান অহম্প্রতীতি * গোচর, সুতরাং এক মাত্র অহম্প্রতীতি ব্যতীত তাহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না।

মনুষ্য মাত্রই নৈসর্গিক অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সম্পন্ন। হস্ত, পদ, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গাবলি আমাদিগের স্বাভাবিক, সুতরাং এ সকল প্রত্যেকেরই আছে। মনুষ্যকে না দেখিয়াই, আমরা তাহাকে হস্তসাধ্য বা চক্ষুসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি দেই। যদি কাহারও কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় বিশেষের অভাব দেখি, নিশ্চয়ই মনে করি, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তাহার তত্তৎ ইন্দ্রিয় বা অঙ্গের অপচয় হইয়াছে। জ্ঞান বিষয়েও ঠিক সেই রূপ; সামান্যাকারে মানব মাত্রই এক জাতীয় জ্ঞান বিশিষ্ট; এক ব্যক্তির জ্ঞানের কার্য্য দেখিয়া অপর ব্যক্তিতে সেই জ্ঞান অনুমান করা অন্যায় নহে। পূর্ব্বোক্ত শারীরিক অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় সাধ্য ব্যাপারের ন্যায় আমরা অজ্ঞাত মনুষ্যকে সহজ-জ্ঞান-

* Consciousness.

সম্পন্ন বিষয়ের অধিকারী মনে করিয়া থাকি। গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করিতে করিতে কোন অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিলে, পার্শ্বস্থিত বা পথস্থিত অজ্ঞাত-পূর্ব্ব লোককে আমরা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করি। এস্থলে আমরা মনে করি আমার ন্যায় ঐ ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে, কারণাভাবে কার্য্য হইতে পারে না। বাস্তবিক, কার্য্য কারণভাব স্বভাব জাত না হইলে কখনই এরূপ হইবার সম্ভব ছিল না।

এই সকল ভাব ও জ্ঞান নৈসর্গিক হইলেও তদুপযোগী বস্তু দর্শন ব্যতীত প্রস্ফুটিত হয় না। পুষ্পকলিকার পুষ্প রূপে পরিণতি স্বাভাবিক, কিন্তু বৃক্ষের উপর সূর্য্য-রশ্মি সম্মিলিত হইয়া সংস্থাপিত না হইলে কখন তাহা বিকসিত হয় না। রজ্জু দ্বারা সুদৃঢ়-রূপে বদ্ধ করিয়া রাখ, চিরদিন তাহা কলিকাই থাকিবে, সুতরাং সুরভি পরিপূর্ণ মনোহর কুসুম সন্দর্শনে চিরদিনই বঞ্চিত হইতে হইবে। এস্থলে সূর্য্য-রশ্মি সংযোগকে আমরা কখন পুষ্পের কারণ বলিনা; কেবল তাহার প্রস্ফুটনের আগন্তুক হেতু মাত্র বলিয়া থাকি। সেই রূপ পূর্ব্বোক্ত সহজ জ্ঞান ও ভাব স্বভাব জাত হইলেও, অন্য প্রকার অভিজ্ঞান সাহায্য নিরপেক্ষে প্রস্ফুটিত হয় না, সুতরাং জগতে তাহার সত্বাও অনুভূত হয় না। যথা কার্য্যকারণের ভাব স্বাভাবিক, কিন্তু কার্য্য না দেখিলে কারণের ভাব মনোমধ্যে উদ্রেক হয় না। পরন্তু ইহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে, সকারণ কার্য্য দর্শনই কার্য্য-কারণ-ভাবের মূল। পুষ্পাদি সম্বন্ধে যেরূপ সূর্য্য-রশ্মি বিকাশের হেতু 'কার্য্য-দর্শন' 'কার্য্য-কারণ' ভাব সম্বন্ধে সেইরূপ।

সহজ-জ্ঞানবাদী দার্শনিকেরা সহজ জ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যথা,—যে জ্ঞান বিশ্বজনীন, স্বভাব জাত, স্বতঃসিদ্ধ ও যাহার বিরুদ্ধভাব * আমরা মনোমধ্যে ধারণ করিতে পারি না, তাহাকেই সহজ জ্ঞান কহা যায়। অনেক পণ্ডিত ও দার্শনিক এই মতে আপত্তি করিয়াছেন। তন্মধ্যে ইংলণ্ড দেশীয় জন্ লক্রে আদ্যোপান্ত মত স্থূল স্থূল সমালোচনই আমাদিগের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

লক্ বলেন—কোন বিষয়েরই জ্ঞান বিশ্বজনীন নহে, এবং তর্ক স্থলে কোন কোন জ্ঞানের বিশ্ব-জনীনতা স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা তাহার স্বাভাবিকত্ব সপ্রমাণ হয় না। সুতরাং সহজ-জ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনা-সম্ভূত ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার পোষকার্থে তিনি বলেন, সহজ-জ্ঞান-বাদীরা "এক বস্তু এক কালে দুই পরস্পর বিরোধী গুণ বিশিষ্ট হয় না" এই কথা সর্ব্বজন-পরিচিত বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, অসভ্য ও মূর্খ লোকের মধ্যে অধিকাংশ কখন একথা ভ্রমেও মনে করে নাই এবং তাহারা এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

* Necessity.

লকের মত স্থূল-দর্শীর ন্যায় বোধ হইতেছে। কোন্ অসভ্য বা অজ্ঞান লোক এক বিশেষ বস্তুকে এক কালে শীতল ও উষ্ণ পরস্পর বিরোধী-গুণ-বিশিষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকে? সত্য বটে, একথা স্বীকার্য্য যে, তাহারা বস্তু সাধারণ সম্বন্ধে এই প্রকার ভাব ধারণ করিতে পারে না, কারণ বস্তু সাধারণের এইরূপ জ্ঞান লাভ করা বিশেষ বিশেষ স্থলে বহু দর্শন সাপেক্ষ। এবং একটি বিষয়ের জ্ঞান তদ্দর্শন মাত্রেই হইয়াছে, কেবল সাধারণ জ্ঞান বহু কালে ও বহু শ্রমে হইয়াছে। সুতরাং লকের এ তর্ক দ্বারা এই ভাবের বিশ্ব ব্যাপিত্বের কোন ক্রমেই অপ্রমাণ হইতেছে না।

দ্বিতীয়তঃ লক বলেন,—দার্শনিকেরা যে কএকটি বিষয় সহজ জ্ঞান-লভ্য সুতরাং স্বভাবজাত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহা কদাপি স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে না, কারণ বালকদিগের মধ্যে সে সকল জ্ঞানের লেশ মাত্রও দেখা যায় না। হস্ত, কর্ণ নৈসর্গিক; সুতরাং জন্ম কালীনই মনুষ্যগণ হস্ত কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ বিশিষ্ট। যদি এই সকল জ্ঞানও প্রাকৃতিক হইত, তবে বালকদিগকে ইহার অধিকারী দেখা যাইত।

এ স্থলে লক্ এবং তদীয় শিষ্যবর্গকে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য যে, বালক এ ভাববিশিষ্ট নহে, তাঁহারা কিরূপে জানিলেন? ভালরূপে ভাষা জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই আমরা বালকদিগকে কার্য্য-কারণ ভাব বিশিষ্ট দেখিতে পাই। শিশু কি জন্য অস্ফুটশব্দে পার্শ্বস্থিত লোককে সহস্র 'কেন' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। শিশু, হামিল্টনের কার্য্য-কারণ ভাব এবং তৎসম্বন্ধে মিলের সমালোচন, পাঠ করে নাই। তথাপি স্বভাববশতঃ তাহার মনে কার্য্যকারণ ভাব উদ্রেক হইয়াছে। তবে, নিতান্ত শৈশবাবস্থায় বা মাতৃগর্ভে বাস কালে আমাদিগের কার্য্যকারণের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা আমরা বর্ণনে সম্পূর্ণ অক্ষম। এক মাত্র সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্যতীত অন্য কেহই তাহা অবগত নহেন।

একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, গর্ভস্থিত শিশুর দর্শন ও গমনাগমন শক্তির অঙ্কুর ছিল। কিন্তু তখন কি সে দর্শন বা গমনাগমনে সক্ষম হইত? এই অক্ষমতাতে কখনও তাহার দর্শনের বা গমনাগমন শক্তির স্বাভাবিকত্ব অপ্রমাণ হয় না। কেবল এইমাত্র জানা যায় যে, তৎসমুদায় উপযোগী বিষয়ের অভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই। ভূমিষ্ট হইবার পর দর্শন গমন প্রভৃতি ভাবের উপযোগী বিষয় প্রাপ্ত হওয়াতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অন্ধকার গৃহে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না; কিন্তু পরক্ষণে, গৃহ আলোকিত করিলেই, সমুদায় দেখিতে পাই। এ স্থলে কি আলোককে আমরা দর্শনের কারণ বলিয়া থাকি? চক্ষু দর্শনের কারণ, আলোক আগন্তুক* হেতু মাত্র॥ তদ্রূপ প্রকৃতিও আত্ম প্রত্যয়ের কারণ, বাহ্য জগৎ কেবল উপস্থিত

* Occasion.

হেতু মাত্র। কার্য্য-কারণের ভাব স্বভাবজাত কিন্তু তথাপি তাহা চক্ষুর দর্শন ক্রিয়ার ন্যায় উপযুক্ত হেতু অভাবে কার্য্যকারী হয় নাই। সুতরাং নিতান্ত শৈশবাবস্থায় কার্য্য জ্ঞানের উদ্রেক অভাবে কারণের জ্ঞান জন্মে না। যখন কার্য্যের জ্ঞান জন্মে তখনই কারণের ভাব ও তৎসহ উদিত হইয়া থাকে।

লক আরও বলেন, জড়-বুদ্ধি-মনুষ্যের * (অর্থাৎ যাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় প্রখর নহে, অথচ নিকৃষ্ট জন্তু আদি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক) এই সকল জ্ঞান নাই; সুতরাং ইহা স্বাভাবিক নহে। তাঁহার একথা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে অন্ধের দৃষ্টি শক্তি নাই, অতএব দর্শন শক্তি স্বাভাবিক নহে? ইহাও বলা যাইতে পারে; ফলতঃ তাঁহার বাক্য ও আমাদিগের শেষোক্ত কথা উভয়ই সমযুক্তিসিদ্ধ।

লক বলেন-ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি দ্বারা এই সকল সত্য উদ্ভাবিত হইয়া মনের দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যুক্ত হয়, সুতরাং কেহ এ সকল জ্ঞান চেষ্টালব্ধ বলিয়া অনুভব করিতে পারে না। এই জন্যই দার্শনিকেরা তাহাকে সহজ জ্ঞান নামে অভিহিত করেন। সহজ জ্ঞান ত পূর্ব্বেই ছিল, তবে বুদ্ধি আবার কি আবিষ্কার করিল? ফলতঃ এস্থলেও লকের ভ্রম স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; কেননা প্রমাণ দুই ভাগে বিভক্ত মূল ও পোষক। বুদ্ধির দ্বারা বিচার করা সহজ জ্ঞান সিদ্ধ বিষয়ের পোষক প্রমাণ মাত্র। সহজ জ্ঞানসিদ্ধ বিষয়গুলি বিচার ব্যতীতও সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস্য। কালে বুদ্ধি দ্বারা ঐ সকল বিষয়ের সত্য সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হয় মাত্র। এটী তাহার পোষক প্রমাণ মাত্র। লক পোষক প্রমাণকে মূলরূপে গ্রহণ করিয়া বিপক্ষ বাদীকে পরাভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং পরিশেষে আপনাকে জয়ী জ্ঞান করিয়া অভিমান করেন। ইহাতে আমরা তাঁহাকে সাধারণ লোকের সহ এক শ্রেণী * ভুক্ত না করিয়া থাকিতে পারিনা। অর্থাৎ বিনা প্রমাণেও বোধগম্য হওয়া কেবল সহজ-জ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হয়।

লক বলেন, বস্তুর স্বতঃসিদ্ধতা† কখন তাহার স্বাভাবিকত্বের নিয়ামক নহে। দার্শনিকেরা যে কয়েকটী বিচার সহজ-জ্ঞানসম্পন্ন বলেন, তদ্ব্যতীত আমরা এখন অনেক বিষয় দেখিতে পাই, যাহা শ্রবণ করিবামাত্র মনের সহিত বিদ্ধ হয়। যথা এক এবং দুই যুক্ত হইয়া তিন হয়। এই অবশ্যম্ভাবী সত্য ‡ (অর্থাৎ যাহার কখন অন্যথা হইতে পারে না, যাহার অন্যথাচরণ আমরা মনে কল্পনাও করিতে পারি না) স্বাভাবিক, কিন্তু তাহার আনুসঙ্গিক বিষয়গুলি চিন্তাসাধ্য। এই অবশ্যম্ভাবী সত্য, স্বতঃসিদ্ধ হউক বা নাহউক তদ্দ্বারা সহজ জ্ঞান অপ্রমাণ

* Idiots.

* সার আর্থার হেলপ্‌স্‌ বলেন সাধারণ লোকের সহিত তর্ক স্থলে কখনও পোষক প্রমাণ উল্লেখ করিও না; কারণ তাহা খণ্ডন করিয়া সে আপনাকে জয়ী জ্ঞান করিবে।

† অর্থাৎ বিনা প্রমাণে বোধগম্য হওয়া।

‡ Necessity.

বা সপ্রমাণ কিছুই হয় না। সহজ জ্ঞান সূচক সত্য স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু একথাতে কখনই মনে করা উচিত নহে যে, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু মাত্রই সহজ জ্ঞান-লভ্য। কিন্তু তথাপি আমরা একথা নিশ্চিতই বলিতে পারি যে, অবশ্যম্ভাবী বিষয়মাত্র সহজ জ্ঞান-সম্পন্ন, অথবা অন্য বিষয় নিরপেক্ষে কেবল সহজ জ্ঞান দ্বারা সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হয়।

লক্ আরও বলেন, বস্তুর স্বতঃসিদ্ধতায় এই মাত্র বুঝায় যে তাহা মনের জ্ঞেয়। কিন্তু এস্থলে আমরা এই প্রশ্ন করি যে কঠোর শ্রম ও অনুসন্ধান লব্ধ সত্য কি মনের অতীত? পূর্ব্বোক্ত বিষয় যদি কেবল বুদ্ধিসাধ্য হয়, তাহা হইলে পরোক্ত বিষয়ের সহিত তাহার কি পার্থক্য আছে?।

উপসংহার কালে লক্ বলেন যে, সকলের বিশ্বাস্য জগতে কোন বিষয়ই নাই; সুতরাং সহজ জ্ঞানও নাই। আমরা একথার উত্তর পূর্ব্বেই করিয়াছি, সুতরাং এক্ষণে আর কিছু বলিলাম না।

লক্ বলেন; পূর্ব্বোক্ত সত্যের ন্যায় মনুষ্যের আনুষ্ঠানিকও কোন সহজ জ্ঞান-সম্পন্ন সত্য লক্ষিত হয় না। সাংসারিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এমন কোন ভাবই নাই, যাহাতে সকল লোক একমত প্রকাশ করে। মনুষ্য পরস্পর বিরুদ্ধগুণসম্পন্ন। রণক্ষেত্রে যে বীর নিষ্কোষিত অসি-হস্তে সহস্র সহস্র শত্রুর শিরশ্ছেদন করেন, আবার পরক্ষণেই তিনি তাহাদিগের জন্য শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বসুমতীকে প্লাবিত করিয়া থাকেন। জগতে সর্ব্বদাই দেখাযায় একজন অত্যন্ত ভোগাসক্ত, অপর জন ভোগবিরত ব্রহ্মনিষ্ঠ। একজন সাধু, ন্যায়পরায়ণ পরোপকারী; অপর জন দস্যুবৃত্তি-পরায়ণ, প্রতারক, পরদ্রোহী। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধগুণ বিশিষ্ট মানব প্রকৃতি সন্দর্শন করিয়া কে বলিবে যে সকলের মধ্যেই সাধারণ কতক গুলি বিশ্বাস্য আছে।

ধর্ম্মবিশ্বাসও ন্যায়পরতা সম্বন্ধে আমরা কতরূপ বিভিন্নতা দেখিতে পাই। একজন যাহাকে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, অপর তাহাকে সম্পূর্ণ অধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মবিগর্হিত বলিতে কিছু মাত্রও কুণ্ঠিত হন না। আমরা এক্ষণে নরবলি নিতান্ত ন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া থাকি; কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে এই বঙ্গ-দেশেই, নরবলি * যারপরনাই ঈশ্বরের সন্তোষকর কার্য্য বলিয়া বোধ ছিল।

এক্ষণে কোন স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত ও লোকের নিকট অপদস্থ হইতে হয়। কিন্তু কাপালিকদিগের মধ্যে কুমারীর সতীত্ব হরণ মোক্ষ লাভের অদ্বিতীয় উপায় বলিয়া প্রতীতি ছিল। এস্থলে কিরূপে স্বীকার করাযায় যে, সর্ব্বসাধারণের পরিগৃহীত অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় কতক গুলি স্থির ও অপরিবর্ত্তনীয় মত আছে?

লক্ বলেন যে, অনেকে বলিয়া থাকে "লোকে কার্য্য সম্বন্ধে পরস্পর বৈষম্য দেখায়, কিন্তু মুখে সকলেই ঐকমত্য স্বীকার করে। তিনিই (লক্) পূর্ব্বাপর বলিয়াছেন যে কার্য্য দ্বারাই

*তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে।

লোকের মনের ভাব ও হৃদ্গত বিশ্বাস জানা যায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ কার্য্যের বিপরীত কখন তাহাদিগের অন্তরের ভাব হইতে পারে না। লক্ সাহেবের এ বাক্যটি নিতান্ত বালকের ন্যায়। সত্য বটে, লোকে সর্ব্বদা যে বিষয় মনে আন্দোলন করে, কালে তাহা ভাব * সংসর্গ দ্বারা মনোমধ্যে বিদ্ধ হয় এবং দ্রষ্টব্য কার্য্যও তদনুযায়ী হয়। কিন্তু মনে কি কখন ইহার বিপরীত ভাব স্থান পায়না? দুষ্কর্ম্ম করিলে লোকে তাহা গোপন করিবার নিমিত্ত কি জন্য নানারূপ ছল প্রবঞ্চনা করে? ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে না যে, দুষ্কর্ম্মকে তাহার ন্যায় বিরুদ্ধ বলিয়া হৃদ্বোধ আছে? আমাদিগের একথাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, দোষী-ব্যক্তি লোকের নিকট অপদস্থ হইবার ভয়ে এরূপ করিয়া থাকে। এস্থলে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে দোষী ব্যক্তি লোকের নিকট আপন দুষ্কর্ম্ম গোপন হেতু নানা রূপ ছলনা করে, কিন্তু নিভৃত স্থলে আপনার গতকার্য্য অনুশীলন করিতে করিতে কেন আবার নানারূপ অনুতাপ ও প্রবোধ দেয়? স্বভাব ব্যতীত একমাত্র সংস্কার কখন এভাবের নেতা হইতে পারে না।

লক্ বলেন, যদিও আত্মপ্রত্যয় মূলক কোন সত্য থাকে, অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় সত্য গুলি কখন তদন্তর্গত নহে। যে সকল দার্শনিকেরা সহজ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতে সাহজ জ্ঞানিক বিষয় গুলি স্বতঃসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু, ন্যায়পরতার ভাব প্রভৃতি কখন স্বতঃসিদ্ধ নহে, যেহেতু সকলেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করে। একথা সম্পূর্ণ অপ্রামাণ্য। বাস্তবিক আমাদিগের গ্রন্থকার অপক্ষ-পাত দৃষ্টিতে দর্শন করিলে, বোধ হয়, কখন সাধারণ সত্যকে অতিক্রম করিয়া এরূপ উক্তি করিতেন না। সত্য বটে, "আত্মবৎ সর্ব্ব ভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ" এই মতটী আংশিক স্বভাব-জাত ও আংশিক শিক্ষালব্ধ। কিন্তু কে কোথায়, পরদ্রব্য অপহরণ করা, কেন ন্যায় বিরুদ্ধ, * জিজ্ঞাসা করে?।

অন্যায় ব্যবহার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা, যাহা আমার করা উচিত ছিলনা, আমি করিয়াছি; আর যাহা কিছু আমার করা উচিত ছিল, আমি তাহা করি নাই, অর্থাৎ অবৈধ কর্ম্ম করণ ও বৈধ কর্ম্ম অকরণ—। এতন্মধ্যে অবৈধ অনুষ্ঠান আমাদিগের প্রকৃতি বিরুদ্ধ; সুতরাং সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার পূর্ব্বে কখন আমরা তাহার ভাব বা অস্তিত্বের বিষয় মনে কল্পনা করিতে পারি না। এইজন্যই জনসমাজ যতই বিদ্যা-বুদ্ধি, সভ্যতা ভব্যতাতে উন্নত হয়, ততই তন্মধ্যে নানাবিধ নূতন নূতন পাপ প্রবেশ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্যের স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য্য করা ২।১ দিনের চেষ্টা-সাধ্য নহে। কালে অভ্যাস দ্বারা তাহা ভাব-সংসর্গ প্রাভবে মনের সহিত যুক্ত না হইলে, কখনই, মনুষ্য অসঙ্কুচিত চিত্তে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিতে পারে না। বালকের

* Association of Idias.

* যদি-ও সময়ে সময়ে ২।১ টি এইরূপ প্রশ্ন শুনা যায়, তাহা উদাসীন ভাবের প্রশ্ন।

মনে অনৃতের ভাব প্রবেশের পূর্ব্বে কখন কাহারও বাক্যে সন্দেহ হয় না। ঋজু-স্বভাব সরলতার আকর সুকুমার মতি-বালকের নিকট যাহাই কেন বর্ণন করা যাউক না, সে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। বোধহয় লক্ সাহেব এবিষয় কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই; অন্যথা কখনও এরূপ উক্তি করিতেন না। সাধারণ কার্য্য স্থলে লোকে ন্যায়-শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হয় না, কেবল প্রকৃতি হইতেই ন্যায়ানুগত কার্য্য করে।

লক্ বলেন, লোকে স্বার্থ বশতঃ ন্যায়ানুগত কার্য্য করে। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে মনুষ্য স্বার্থপর—স্বার্থই মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম। আপনার হিত ব্যতীত মনুষ্য অন্য কোন কঠোর শ্রমসাধ্য-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হয় না।

কিন্তু এটী পরিণত বয়সের ভাব। লোকে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, প্রভৃতির ভারগ্রস্ত না হইলে কখন স্বার্থ-প্রিয় হয় না। যুবকদিগের জীবনের প্রতি একবার দৃষ্টি কর, দেখিতে পাইবে, তাহাদিগের মনে স্বার্থ বা কুটিলতা অল্পই বর্ত্তমান রহিয়াছে। যুবকগণ যখন যৌবন-সুলভ-হাস্য-কৌতুক ও কামিনী সংসর্গে বাস করেন, তখন তাঁহাদিগের হৃদয় কি পবিত্র কি স্বার্থ শূন্য! বৃদ্ধ! আমি তোমার বহুদর্শন ও জ্ঞানে বিমোহিত হই, সময়ে সময়ে তোমার বাক্য যে বেদ বাক্য তুল্য গ্রহণ করিয়া থাকি; কিন্তু বল দেখি যৌবন সুলভ নিঃস্বার্থ উৎসাহ ও সরলতা তুমি কোথায় পাইবে?। পুনঃপুনঃ সংসারের অন্যায় আচরণ দৃষ্টিতে তোমার হৃদয় বারম্বার দগ্ধ হইয়া একেবারে পাষাণবৎ—পাষাণবৎ কেন? পাষাণাপেক্ষাও কঠিন হইয়াছে। কিন্তু যুবকের কোমল হৃদয়ে আজও তাদৃশ অঙ্কুশাঘাত হয় নাই। সুতরাং তাহার আশা তত নিষ্ফল হয় নাই এবং যুবকমনুষ্যের কুচরিত্রও তত প্রত্যক্ষ দর্শন করে নাই, সুতরাং তাহার হৃদয় অনেকাংশে কোমল ও নিঃস্বার্থভাবে অবস্থান করিতেছে।

যখন কোন উৎসাহী যুবার পরোপকারের-নিঃস্বার্থ পরোপকারের ভাব দেখি, তখন কিরূপে মনে করিব, যে লোকে স্বার্থ পরবশ হইয়াই সমুদার কার্য্য করিয়া থাকে। অধুনাতন প্রত্যক্ষ-দর্শন-বাদীদিগের নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধই আছে। সর্ব্ব প্রযত্নতঃ তাঁহাদিগের এইমাত্র উদ্দেশ্য যে স্বার্থ শূন্য হইয়া জন সমাজের হিতসাধন করিব। সম্পূর্ণরূপে কামনা বিরহিত হইয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিবার মতটী গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক মহানুভব এরিষ্টটেল প্রথম উদ্ভাবন করেন। অনন্তর উহা জর্ম্মেন দেশের বিখ্যাত দার্শনিক ইম্যানওয়েল ক্যাণ্ট দ্বারা সম্যকরূপে দৃঢ়ীকৃত ও প্রচারিত হইয়াছে। যদি স্বার্থই একমাত্র কার্য্যের নিয়ামক হয়, তবে এই সকল মত কোথা হইতে উপস্থিত হইল? এতদ্ব্যতীত কখন বা অন্যরূপন্যায়াচরণ সময় কয়জন মনে করিয়া থাকে যে, আমি এইরূপ আচরণ করিলে লোকের প্রতিষ্ঠাভাজন হইব, এবং তদ্দ্বারা আমার প্রকৃত হিতসাধন হইবে। মানব প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে অনেক সময়েই লোকে একমাত্র সংস্কারবশতঃ উদা—

সীনভাবে উদ্দেশ্য বিরহিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। এই সমুদায় যুক্তি ও প্রমাণ পরম্পরা দ্বারা সম্পূর্ণ স্থির হইতেছে যে লকের এই মতটি নিতান্ত যুক্তি-বিগর্হিত।

লক্ বলেন, প্রস্তার অস্তিত্বে কখন সহজ জ্ঞানের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না। বাল্যকালে আমরা যেরূপ মত শ্রবণ করি, কালে তাহা হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া বিশ্বাস্য হইয়া উঠে। শিক্ষা, সংসর্গ, দেশের আচার, ব্যবহার ইত্যাকার কারণে লোকের মনোমধ্যে একটী ভাব বিশেষরূপে বিদ্ধ হয়। কিন্তু এই ভাব সম্বন্ধে আমরা পরম্পর বিরোধ দেখিতে পাই। একজন অপরের স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণে ইতস্ততঃ করেন; অপর ব্যক্তি এরূপ কথা শ্রবণমাত্র "কি ভ্রাতার অপমান?" বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। এই সকল পরম্পর বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে আমারা কেমন করিয়া বলিতে পারি যে এভাব স্বভাবজাত?

আমরা ইহার উত্তরস্থলে এইমাত্র বলিতে পারি, অন্তঃসংজ্ঞা বিশ্বাসানুগ বিশ্বাস-জ্ঞানানুগ এবং জ্ঞান-স্বভাব, শিক্ষা, সংসর্গ প্রভৃতি কতক গুলি বিষয়ের অনুবর্ত্তী। সুতরাং শিক্ষা ও সংসর্গ প্রভৃতির বিভিন্নতা নিবন্ধন লোকের বিশ্বাস এবং পরিশেষে অন্তঃসজ্ঞার প্রকৃতিগত ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কিন্তু মূলে কিছুতেই অন্তঃসংজ্ঞাকে অপ্রমাণ করিতেছে না।

লক্ বলেন যে দার্শনিকেরা অন্তঃসংজ্ঞানি স্বাভাবিকত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তথাপি লোকে কেমন করিয়া সর্ব্বদা তদ্বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হয়?। মনে কর, একদল সৈন্য একটী নগর আক্রমণ করিল; তাহারা তথাকার সসহায়, অসহায়, বৃদ্ধ, বাল, বনিতা কাহারও প্রাণনাশে কুণ্ঠিত হয় না। লোকে কোনরূপ নিয়মাধীন না থাকিলে অসংখ্য নর হত্যা, সতীর সতীত্বনাশ, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। অতি সভ্য ও জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত জাতি মধ্যে কি আমরা শিশু* বিনাশ প্রভৃতি অপরাধ দেখিতে পাই না? এমন জাতি কি অদ্যাপি বর্ত্তমান নাই, যাহারা পিতা মাতা বৃদ্ধ হইলে তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকে? এসিয়ার স্থানে ২ এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা জীবনাশা-শূন্য-রোগীকে সজীব থাকিতেই ভূমিস্যাৎ করে। এমন অনেক স্থল আছে যথায় লোকেরা স্বীয় অপত্যের মাংসাহার করিয়া থাকে। এমন কোন ২ জাতি আছে যে সন্তান† ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাদিগকে পুষ্টিকর আহারাদি দ্বারা হৃষ্ট পুষ্ট করিয়া আহার করে। কোন একজন পর্য্যটক বলেন, পেরু দেশীয়জাতি বিশেষ উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তান আহার করে এবং এইরূপ আহার্য্য প্রাপ্তি হেতু তাহারা উপপত্নী রাখে। টয়াপিনাম্বোজাতি

*লোকের মনে একটি ভাব বিশেষ রূপে প্রবল হইলে অন্য বিষয় নিস্তেজ হয়। মান সম্ভ্রম রক্ষার্থে অনেকে এই কার্য্য করেন।

†তবে এজাতি কিরূপে নির্লোপ হইতে রক্ষিত হইল।

প্রতিহিংসা, শত্রুশিরশ্ছেদন প্রভৃতি বিগর্হিত কার্য্যই একমাত্র স্বর্গ লাভের অদ্বিতীয় উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিত। লকের এই তর্কটির উত্তর স্থলে আমরা এইমাত্র বলিতেছি যে, সংসর্গ সুতরাং অভ্যাস বশতঃ লোকে সম্পূর্ণ না হউক অনেকাংশে স্বভাব-জয়ী হইতে পারে। বংশের ঊর্দ্ধদিকে বর্দ্ধিত হওয়া নৈসর্গিক, কিন্তু চেষ্টা করিলে কি তাহাকে বক্র করা যায় না? হিংসা ও নৃশংসতা ব্যাঘ্রের স্বভাব, কিন্তু যত্ন দ্বারা তাহাকেও কথঞ্চিৎ বশ করা যায়।

অতএব মনুষ্যও যে, এইরূপ অবস্থায় স্বভাবের বিপরীত পথাবলম্বী হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অভ্যাস অনেক কারণ বশতঃ পরিবর্ত্তিত হয় এবং অপ্রাকৃতিক কারণের সত্ত্বা থাকিলেও যে লোকের স্বভাব ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

পরিশেষে লক্ বলেন এক জন বা দুই জন নীতি অতিক্রম করিয়া বিপথ গামী হইবে, তাহা সম্ভবপর, কিন্তু নীতি প্রাকৃতিক হইলে কিরূপে জাতি সাধারণের সকলেই তাহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়? সকলেই তাহা স্বীকার করেন সন্তানের প্রতি স্নেহ ও লালন পালন আমাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ কিন্তু পেরু নিবাসী দিগের ও প্রাচীন গ্রীক * ও রোমীয় দিগের আচরণ দৃষ্টে আমরা কিরূপে সিদ্ধান্ত করিব যে, ইহা প্রাকৃতিক। উভয় স্থলে এই বক্তব্য যে লোকে শিক্ষা দ্বারা স্বভাব অতিক্রম করে, কিন্তু তাহার বীজ কখনই উন্মূলন করিতে পারে না। একথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না যে, এক জন পেরুবাসী বা এক জন রোমীয় এরূপ আচরণে রত ছিলেন বলিয়া তত্তৎ জাতিসাধারণের সকলেই যে এরূপ কার্য্য করিতেন। তদ্রূপ অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্যই সে জাতি উৎসন্নিত হইত। "কাক কর্ণ লইয়া গিয়াছে" বলিলে কি কর্ণ স্পর্শন ব্যতীত কাকের অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত? লক্ পক্ষপাতী হইয়া আপনার মত পোষণের জন্য যেখানে যাহা পাইয়াছেন বিশ্বাস যোগ্য হউক বা না হউক সমুদায় সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমরা তাহা উচিত প্রমাণ ব্যতীত কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না।

অপত্য-স্নেহ স্বাভাবিক, এ কথা কি আমরা গ্রন্থ পাঠে শিক্ষা করিয়াছি? সন্তান প্রসব কালে মাতা কত যন্ত্রণা পাইয়া থাকেন। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আপনার ক্লেশের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া "ওকে কাঁদাস নে" বলিয়া ধাত্রীকে সাবধান করিয়া থাকেন। যে ক্লেশ এত যন্ত্রণাদায়ক যে, তাহা হইতে মুক্ত হইলে প্রসূতি পুনর্জন্ম লাভ বিবেচনা করেন, সেই ক্লেশ দূর হইতে না হইতেই ভূমিষ্ঠ শিশুর বদন নিরীক্ষণে সকল ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া সন্তান কিরূপে সুখে থাকিবে তজ্জন্যই ব্যস্ত হইয়া থাকেন। ফলতঃ যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহার আর সিদ্ধান্তের প্রয়োজন কি? হস্তের কঙ্কন নিরীক্ষণ করিতে কে দর্পণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে? ফলতঃ পূর্ব্ব-

* রাজশাসনে বাধ্য হইয়া করিত।

সংস্কারের বল এমনই প্রবল যে, তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া বহুজ্ঞ পণ্ডিতের ও সাধ্যায়ত্ত নহে। সাধারণ লোক দূরে থাকুক লকের ন্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং তীক্ষ্ণ মনীষা সম্পন্ন লোকও ইহার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

লক্, প্রথম পুস্তক, ৪র্থ অধ্যায়।

লক্ আত্মপ্রত্যয় বিরোধে অনেক রূপ তর্ক বিতর্ক ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া অবশেষে বলেন যে, কোন নীতিই সহজজ্ঞানজাত নহে; কারণ প্রোক্ত নীতি সকলের নির্ভর স্থল স্বরূপ যে কয়েকটি ভাব আছে, তাহার কোন ভাবই আত্মপ্রত্যয়-মূলক নহে। তদ্বিষয়ে তিনি যে কয়েকটি প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে সমালোচন সহ উদ্ধৃত করিলাম।

প্রথম—লকের উক্তি অনুসারে শিশু সন্তান এ ভাব বিশিষ্ট নহে। তাহাদিগের আকার ইঙ্গিতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, তাহাদিগের মনে সুখ দুঃখ প্রভৃতি দুই একটি ভাব ব্যতীত কথনই অন্য কোন ভাব নাই।

শিশুদিগের মানসিক ভাবানুভূতি দ্বারা কোন বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত এবং বালুকার উপর শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত বিচিত্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ উভয়ই সমান। যাহা হউক শিশু এরূপ ভাবান্বিত না হইলেও সহজজ্ঞানদ্বারা অপ্রমাণ হয় না। তদ্বিষয়ে পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিরুক্তি অনাবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ লকের বাক্যানুসারে * 'স্বরূপৈক্য' জ্ঞান স্বাভাবিক নহে। কারণ শিশু ও মূর্খলোক তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সত্য বটে সাধারণ লোকে আপনার বা সাক্ষাৎ পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ বা স্বরূপৈক্য জ্ঞান সম্বন্ধে কখন সন্দেহ করে না; তন্নিবন্ধন এবিষয়ের তর্ক বিতর্কও কদাপি তাহাদের মনে উপস্থিত হয় না। 'ঐক্য' জ্ঞান ইহাদিগের মনে কখন সাধারণ ভাবে বিদ্যমান নাই। তথাপি কেহই আপন শিশু পঞ্চম বর্ষীয় হইলেও সূতিকাগৃহের সেই ভূমিষ্ঠ শিশু কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ করে না।

তৃতীয়তঃ লক্ বলেন † স্বরূপানৈক্য জ্ঞান আপেক্ষিক ভাব সূচক, সুতরাং যুগল বস্তু ব্যতীত কখন মনোমধ্যে তাহার উদ্রেক হয় না। যে ভাবোদয় দুই বস্তু সাপেক্ষ, তাহাকে কিরূপে স্বাভাবিক বলা যায়?

লকের এই তর্কে বোধ হয় সহজজ্ঞান কাহাকে বলে তিনি তাহা যথোচিত মতে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, কেবল স্বরূপের ভেদ ও অভেদ জ্ঞান কেন আত্মপ্রত্যয় মূলক সকল ভাবেরই স্ফূর্তি অভিজ্ঞান সাপেক্ষ। তদুপযোগী বস্তু দর্শন মাত্রে উপস্থিত হয়, সুতরাং উপযোগী বস্তুকে আমরা কারণ না বলিয়া আগন্তুক হেতু মাত্র বলিয়া থাকি।

স্মরণশক্তিও বিচারশক্তি সাপেক্ষ, কিন্তু তাহাতেই কি তাহার স্বাভাবিকত্ব অপ্রমাণ হয়? উপচিকীর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ হেতু বুদ্ধির আবশ্যক হয় এবং

* Identity   †Nonidentity

তাহাতেই কি উপচিকীর্ষার স্বাভাবিকত্ব অস্বীকার করিতে পারা যায় ?

চতুর্থতঃ। লক্ বলেন ঈশ্বর-উপাসনার ভাব স্বাভাবিক নহে, যেহেতু উপদেশ ও শিক্ষা ব্যতীত কাহাকেও উপাসনাশীল দেখা যায় না। লকের এই কথায় কখন আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। অচিন্ত্য অব্যক্ত অনন্ত কৌশলাধার বিশ্বমধ্যে স্থাপিত হইয়া তৎপ্রতি মনোভিনিবেশ করিলে কেনা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিরসে বিগলিত-হয় ? একজন মূর্খ লোক একটি সামান্য ঘটিকা যন্ত্র * দর্শন করিলে কেন বিমোহিত হয় ? এমন কি কেহ কেহ তাহাকে স্বয়ং "ধর্ম্মের ভদ্রাসন' আখ্যাও প্রদান করে। এস্থলে মনে কর একজন মনুষ্য নূতন সৃষ্ট হইয়া পরিণতবয়োবুদ্ধিতে অবনী মধ্যে অবতরণ করিল এবং প্রথমতঃ বাল-সূর্য্যের মনোহর কান্তি, কিয়ৎকাল পরে তদীয় খরতর আতপ তাপে খেচর ভূচরগণের প্রপীড়ন প্রভৃতি বিশ্ব সংসারের মনোহর দৃশ্য ও আশ্চর্য্য নিয়ম শৃঙ্খলার পরস্পর "সামঞ্জস্য' দেখে, তখন সে কি একেবারে বিমোহিত হইয়া এই সকলের কারণ প্রতি ভক্তিতে গদ গদ না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে ? এই জন্যই মহাকবি মিল্টন আদামের মুখ হইতে এই কতিপয় স্তব নির্গত করাইছেন।

"These are thy glorious works, parent of good !
"Almighty ! Thine this universal frame,
"Thus wondrous fair. Thyself how wondrous then !
"Unspeakable, who sitt'st above these heavens,
"To us invisible; or dimly seen
"In these thy lowest works. Yet these declare
"Thy goodness beyond thought and power divine.'

* * * * * * * * *

Milton's Paradise Lost."

আত্মপ্রত্যয়নিবাস বিষয়ের উপসংহার কালে লক্ বলেন,—ধর্ম্ম ও ঈশ্বরাপেক্ষা লোকের কিছুই গুরুতর বিষয় নাই! সুতরাং যদি কোন সহজ-জ্ঞান থাকে তাহা হইলে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বিষয় প্রথম সম্ভবপর। অতএব যদি এ-কথা প্রমাণ করা যায় যে ঈশ্বরের ভাব সহজ-জ্ঞান সম্পন্ন নহে, তাহাহইলেই ইহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় যে আর কোন বিষয়ই সহজ-জ্ঞান মূলক নহে। একথার প্রমাণ স্থলে তিনি বলেন ঈশ্বরের ভাব সহজ জ্ঞানমূলক হইলে উহা অবশ্য বিশ্ব জনীন হইত কিন্তু যখন দুই এক জন মনুষ্য নহে এমন অনেক জাতি দেখা-যায় যাহাদের মধ্যে অনুমাত্র ও ধর্ম্মভাব এবং ঈশ্বরের জ্ঞান দৃষ্ট হয় না। বিশেষ কোন ঘটনাবশতঃ এক বা দুইজন মনুষ্য অপ্রাকৃতিক হইতে পারে; কিন্তু জাতি সাধারণ সম্বন্ধে কিপ্রকারে এবম্প্রকার ব্যাপার সম্ভবপর। পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থলে লক্ বলেন: সৃষ্টি অবধি এপর্য্যন্ত অনেক নাস্তিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তদ্ব্যতীত আমরা এমন অনেক জাতি দেখিতে পাই, যাহাদিগের মধ্যে অনুমাত্রও ঈশ্বর বা ধর্ম্মের

* সাধারণ লোকে ধর্ম্ম ঘড়ী বলিয়া থাকে

ভাবের লেশমাত্র নাই যথা ; সলাজনীয় উপসাগরতীর, ব্রেজিল, বোরণ্ডী এবং কারেবীয় দ্বীপবাসীগণ। উপর্য্যুক্ত দেশবাসীদিগের সকলেই অসভ্য। তাহারা অদ্যাবধি প্রাকৃতিক অবস্থাতেই বাস করিতেছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান বা দর্শন তাহাদিগের বুদ্ধির অনুমাত্র বিপর্য্যয় ঘটায় নাই। যেরূপ এই অসভ্যদিগের মধ্যে অনেক নিরীশ্বর ব্যক্তি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ আবার চীনদেশীয় সমগ্র না হউক শিক্ষিত লোক মাত্রেই ঈশ্বর বর্জ্জিত। এতদ্ব্যতীত সুশিক্ষিত সভ্যতম সমাজ মধ্যেও অতি অল্প সংখ্যক লোক ঈশ্বরের গুণ ধারণ করিতে পারে। অধিকাংশ লোকই ধর্ম্ম বর্জ্জিত। যদি লোকনিন্দা রাজদণ্ড প্রভৃতি ভয় দূরিত হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে স্বেচ্ছাচারিতা স্বীয় করাল বদন প্রসার করিয়া অধিকাংশকে গ্রাস করিতেছে এবং যে সকল লোককে আমরা নির্দ্দোষী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি তাহাদিগের মধ্যেও অধিক সংখ্যক লোমহর্ষণ কুকর্ম্মে রত হইয়াছে।

লকের এবাক্য কেবল তাঁহার ইতিহাস বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানের অভাব প্রমাণ করিতেছে। অবনীমধ্যে এপর্য্যন্ত এমন কোনই জাতি দৃষ্ট হয় নাই, যাহাদিগের ঈশ্বরের ভাব নাই। আমরা এত দ্বারা এই কথা বলিতেছি না যে লক্ অনুসন্ধান না করিয়াই এই সকল উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যে সকল লোকের কথা শুনিয়া বা লেখা পাঠ করিয়া এরূপ বলেন তাঁহারা ঐসকল অসভ্য জাতির ভাষা বিষয়ে অজ্ঞানতা নিবন্ধন বিকারী রোগের প্রলাপ এইরূপ অদ্ভুত মত প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের ভ্রমণ কারীরা স্পষ্টাক্ষরে বলেন, পূর্ব্ব-পর্য্যটকেরা যাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়াছেন তাহা সত্যমূলক নহে, কেবল তাহদিগের অজ্ঞানতা মূলক। প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের ভাব মনুষ্যের মনে এমনই বদ্ধমূল যে, কি প্রখর মার্ত্তণ্ড তাপে দগ্ধ কাফ্রি কি দারুণ দুর্বিসহ শীতকাতর গ্রীনলণ্ডবাসী কি নরমাংসাহারী অসভ্য অষ্ট্রেলীয় কি সুসভ্য জ্ঞানালোক ভূষিত ইঙ্গরেজ জার্ম্মন প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থাতে সকলেই ঈশ্বরের ভাব বিশিষ্ট ছিল। এবং কুদর্শন জালে আবদ্ধ হইলেও লোকে কখন ঈশ্বরের ভাব হৃদয় হইতে একবারে বিদূষিত করিতে পারেন। *

অতএব এতদ্দারা একরকম নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ঈশ্বরের ভাব বিশ্বব্যাপী সুতরাং সহজ জ্ঞান মূলক।

লক্ বলেন যে ঈশ্বরের ভাব বিশ্বজনীন হইলেও তদ্দারা তাহার স্বাভাবিকত্ব প্রমাণ হয় না। কারণ এক জন দ্বারা ঈশ্বরের ভাব সপ্রমাণ হওয়াতে সকলেই তাহা বিশ্বাস করে। এবাক্যের ন্যায় যুক্তি বিরুদ্ধ কথা আর কিছু শুনাযায়না। যুক্তির প্রমাণ কি কখন সর্ব্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হয় ?। ইতি-

---

*ফরাসী দেশীয় প্রসিদ্ধ নাস্তিক বল্টে পীড়িত হইলেই পরকালভীত হইতেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার পর লোক ভয় দর্শন করিয়া তদীয় শিষ্যবর্গ ও অন্যান্য লোক একেবারে বিস্মিত হইয়াছিল।

হাস অনুসন্ধান করিলে কখন ইহার প্রমাণ দেখা যায়না। অসভ্য লোকে দৈব প্রদত্ত না শুনিলে কখন একটী নূতন সত্য গ্রহণ করে না। লক্ বলেন—কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ঈশ্বর দয়াময়, তাঁহার দয়া বিশ্ব-ব্যাপিনী, সুতরাং মনুষ্যের প্রতি দয়া করিয়া তিনি আপনার স্বরূপ ও ধর্ম্মভাবাদি অবগতির জন্য যাহা প্রয়োজন সে গুলি স্বাভাবিক করিয়া দিয়াছেন ; তাহা না হইলে তাঁহাকে কিরূপে দয়াময় বলা যায়। একথা আমাদিগের নিকটেও যুক্তিসিদ্ধ বোধহয়, কিন্তু আমাদিগের জ্ঞান্ পূর্ণ নহে, সুতরাং ঈশ্বরের বিষয় ভালরূপ বিবেচনা করিতে পারি না। লক্ বলেন, তুমি কিরূপে বলিবে, ঈশ্বরের এই এই কার্য্য করা উচিত ছিল। তাঁহার এই বাক্য আমরা যুক্তিসিদ্ধ বলিতে পারি। কিন্তু এটী আমাদিগের পোষক প্রমাণ মাত্র। মূল প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের ভার্ব সহজ জ্ঞান মূলক প্রমাণ হইলে এইরূপ সহকারী প্রমাণ দ্বারা তাহার পোষকতা—* সম্পাদিত হয়। মূল প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র সহকারিকে আক্রমণ করিলে তাহা পরাভব করে--তাদৃশ দুঃসাধ্য নহে। এস্থলে অবিকল তাহা ঘটিয়াছে।

লক্ বলেন ঈশ্বরের ভাব স্বাভাবিক হইলে সকল লোকেরই ঈশ্বর সম্বন্ধে একমত হইত। কিন্তু কোন সময়ে তাহা দেখা যায়না। সকল সময়েই জগতে ঈশ্বর সম্বন্ধে মতবৈষম্য দেখা যায়। কেহ বা ঈশ্বরকে নিরাকার পূর্ণ ও পবিত্র স্বরূপ বলেন, কেহ বা তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় সুখ দুঃখাধীন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

আমরা ইহার উত্তর স্থলে পণ্ডিতবরকে জিজ্ঞাসা করি ; স্বভাব জাত হইলেই সকল একরূপ হইবে, তিনি কোথা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। সকল মনুষ্যদেহই স্বভাবজাত, সকল অশ্বত্থ বৃক্ষই এক স্বভাব হইতে উৎপন্ন ; কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে কেন প্রভেদ দেখাযায়? তবে তাহাদের মধ্যে এই মাত্র সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় যে, স্বাভাবিক বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকে না, কেবল প্রকৃতিগত সামান্য পার্থক্য থাকিতে পারে মাত্র।

(২) কারণের ভাব স্বভাবিক। ঈশ্বরের ভাব সামান্য চিন্তা দ্বারা এই ভাব হইতে প্রস্ফুটিত হয়।

লক্ বলেন—অহম্প্রতীতি ও স্মরণ শক্তি ব্যতীত আমরা অন্য কোন ভাব বিশিষ্ট নই। সুতরাং সহজজ্ঞান এই দুই ভাব ব্যতীত অন্যরূপে স্থায়ী হইতে পারে না। সহজজ্ঞান, বালকদিগের অহম্প্রতীতি বা স্মরণ শক্তি কিছুতেই দৃষ্ট হয় না, সুতরাং তাহার (সহজজ্ঞানের) অস্তিত্ব কাল্পনিক ব্যতীত আর কিরূপহইতে পারে?।

লকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ হয়, তিনি সহজ জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা ভালরূপ বুঝিতেন না। এ বিষয়ের উত্তর আমরা প্রথমেই দিয়াছি, সুতরাং প্রস্তাব বৃদ্ধির ভয়ে এক্ষণে বিরত হইলাম।

উপসংহার কালে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে, লক্ সাহেবের আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে মতবাদ পাঠ করিলে

নিশ্চয়ই বোধ হয়, তিনি যদিও অতি সুযোগ্য পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার শক্তির এটি ছিল বস্তুতঃ তিনি আত্মপ্রত্যয়ের বিরুদ্ধে যত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন সকলেরই মূলে একটী বৃহৎ ভ্রম দৃষ্ট হয়। তিনি আত্ম-প্রত্যয় কাহাকে বলে এবং আত্মপ্রত্যয় বাদীরা তাহার কিরূপ প্রকৃতি ও তৎ-সমর্থনার্থে কি কি প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তদ্বিষয় লক্ বোধহয়, অতিঅল্পই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, অন্যথা তাঁহার ন্যায় অসাধারণবুদ্ধিজীবী লোক এরূপ ভ্রমে কেন পতিত হইবেন? এবং অন্যকেও তদবস্থ করিতে কেন চেষ্টা পাইবেন?। আমরা সহজ জ্ঞানের এইমাত্র প্রকৃতি বলিয়া থাকি যে, অন্য সাহায্য নিরপেক্ষে উপযোগী বস্তু প্রত্যক্ষ করিবা মাত্র মনোমধ্যে উদ্রিক্ত হয়। সুতরাং বালকের মনে কিম্বা অন্যকোন লোকের মনে কিয়ৎ পরিমাণে তদন্যথাচরণ দেখিলে মূল সত্যে কোনই দোষ পড়ে না।

—:০:—

মহরম।*

প্রত্যেক জাতির পর্ব্বোপলক্ষে যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাদিগের কাব্যাদিতে যে সকল ভাব দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায় তাহাদের জাতীয় প্রকৃতি ও অব-লম্বিত ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহারের অবস্থা অনেকাংশে জানা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশের কাব্যাদির অধিকাংশই আদি বা করুণ রস প্রধান, এখানে পর্ব্বাহোপলক্ষে যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহাও নিতান্ত নিরীহ। যদিও কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি বীর-রস ব্যঞ্জক বটে। কিন্তু পূজার অনু-ষ্ঠান সকল প্রায়ই স্ত্রীবৎ আচরণে পরিপূর্ণ।

এতদ্দ্বারা বাঙ্গালীদিগের প্রকৃতি-গত কোমলতা এবং বীরবৎ আচরণে বিরাগ স্পষ্ট অনুভব হয়। পক্ষান্তরে পশ্চিম দেশীয়দিগের রামলীলা প্রভৃতির অবস্থা দেখিলে বোধ হইবে যে, তাহারা অদ্যাবধিও বীরোচিত আচরণে আসক্তি পরিত্যাগ করে নাই।

আমরা এস্থলে আরবীয় যুদ্ধপ্রিয় মুসলমানদিগের একটি পর্ব্বাহের বিষয় আমূল বর্ণন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কএক দিন হইল যে "মহরম" নামক পর্ব্ব হইয়া গিয়াছে তাহার অনুষ্ঠান গুলি যেমন উৎসাহপূর্ণ, উপাখ্যানটিও তদ্রূপ মনোরম।

প্রায় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইল, আরব-দেশের অন্তর্গতী মদিনানগরে আব-দুল মল্লাক নামা এক ব্যক্তির দুইটি যমজ সন্তান হয়। তাহারা উভয়ে পরস্পর পৃষ্ঠে সংলগ্ন ছিল; মল্লাক খড়্গ দ্বারা উভয়ের পৃষ্ঠের সংযোগ-স্থল কর্ত্তন করিলে তাহার পুত্রদ্বয় পৃথক ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই দুই পুত্রের নাম হাসেন ও উমিয়া। তাহারা উভয় ভ্রাতাই চিরজীবন কলহ করিত। উহাদের আবদুল মতলেব এবং হবর নামে এক একটি পুত্র জন্মে; তাহারও স্বীয় স্বীয় জনকের ন্যায় পরস্পর বিবাদ করিত। কাল ক্রমে আবদুল মত-

*জঙ্গ নামা হইতে সঙ্কলিত।

লেবের আলি নামক এবং হবের মাবিয়া নামা এক পুত্র জন্মে ; ইহাঁরা উভয়েই মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের অনুবর্ত্তী ছিলেন ; এবং আলী মহম্মদের জামাতা।

যদিও ইহাদিগের মধ্যেও পৈতৃক বিবাদ প্রবৃত্তি বিলক্ষণ ছিল, কিন্তু মহম্মদের ভয়ে কেহই কলহ করিতে সাহসী হইতেন না। আলির ঔরসে মহম্মদের কন্যা ফতেমার গর্ভে হাসেন ও হোসেন নামে দুই পুত্র জন্মে।

কথিত আছে একদিন মহম্মদ শিষ্য ও বন্ধু মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া বলিলেন (১) "আমি কোরস্তার প্রত্যাদেশ দ্বারা জানিয়াছি যে, আমার দৌহিত্রদ্বয় মদীয় বন্ধু মাবিয়ার পুত্র দ্বারা নিহত হইবে"। তাহাতে মাবিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "আমি কখনও দার পরিগ্রহ করিব না" তাহা হইলে পুত্র জন্ম হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

কাল ক্রমে মাবিয়ার পীড়া হইলে বিশেষ কারণ উপলক্ষে এক বৃদ্ধা দাসীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাহারই গর্ভে এজিদ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। এই সময়ে মহম্মদের পরলোক প্রাপ্তি হয়। কিয়ৎ কাল মধ্যেই আলি ও তৎপত্নী ফতেমার মৃত্যু হইল।

ক্রমে এজিদের যৌবন কাল উপস্থিত হইল। তখন তাহার পিতা দেমাস্কাসের রাজা ছিলেন। এক দিবস এজিদ জয়নব নাম্নী পরম সুন্দরী কামিনীকে দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। জয়নব আবদুল জোব্বারের পত্নী ছিলেন। এজিদ স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিবার কোন উপায় না দেখিয়া পিতার নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। মাবিয়া তাহার এই প্রার্থনা অসম্ভব ও অন্যায় বলিয়া, নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। এজিদ পিতার বিরক্তি দর্শনে মনোরথ পূরণের অভিলাষে স্বীয় জননীর শরণাপন্ন হইলেন।

এজিদের মাতা পুত্রের অভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্ত ক্রমশঃ মাবিয়াকে নানারূপে লওয়াইতে আরম্ভ করিলেন। পত্নীর অনুরোধে পুত্রের অন্যায় প্রার্থনা সফল করিতে তাহার রুচি ও তৎসম্পাদনার্থ এক জঘন্য ষড়যন্ত্র উপস্থিত করিল।

মাবিয়া আবদুল জোব্বারকে পত্র দ্বারা আনাইয়া বলিলেন যে, আমার এক কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে ; তুমি তাহার পাণিগ্রহণ করিলে, তোমাকে ভূরি ধন ও কিঞ্চিৎ রাজ্য প্রদান করিব। আবদুল জোব্বার বিনীত ভাবে বলিল যে "আমি নিতান্ত হীনাবস্থার লোক এবং আপনি রাজা, আমার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ

(১) মহম্মদ আপনার স্বাভাবিকী বুদ্ধি প্রভাবে যাহা সত্য অথবা সম্ভবপর বোধ করিতেন, তাহাই প্রত্যাদেশ মনে করিতেন। মনে করুন একজন ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করিল যে পরমেশ্বর এই বিষয়ে যাহা সত্য অথবা সম্ভব তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন। তাদৃশ আন্তরিক প্রার্থনার পর মনে যাহা উদিত হয়, তাহাকে প্রত্যাদেশ বলিয়া প্রতীতি হওয়া অসম্ভব নহে। মহম্মদকে আমরা প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে কখন বঞ্চক মনে করি না। আমরা বোধ করি তিনি বাস্তবিক ঐ প্রকার ভাবিতেন।

কি প্রকার সম্ভব হইতে পারে।' কপটাচারী মাবিয়া তাহাকে এই বলিয়া স্তোভ দিল যে "তুমি আমাদিগের পরম ভক্তিভাজন মহম্মদের প্রিয়পাত্র ছিলে, এই নিমিত্ত তোমাকে জামাতৃপদে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার ধনী ও রাজা জামাতার ইচ্ছা নাই।' এই সকল কথা বলিয়া দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা আনিয়া উপহার দিল। এই সময়েই বিবাহের লগ্নও স্থির হইল। বিবাহ দিনে এজিদ স্বয়ং * উকীল হইয়া দুই জন সাক্ষীর সহিত কন্যার অভিমত লইতে অন্তঃপুরে গমন করিল। তাহারা তথায় কিছুকাল থাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল যে কন্যা সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন যে, পাত্রের এক রূপবতী পত্নী গৃহে আছে, তাহাকে পরিত্যাগ না করিলে, আমি এ বিবাহে সম্মত হইতে পারি না, যদি তিনি পূর্ব্ব পত্নী পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার গৃহিণী হইতে পারি। এতৎ শ্রবণে আবদুল জোব্বার প্রথমতঃ অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। পরিশেষে এজিদের প্রলোভনে লোভ সংবরণে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্ব পত্নীকে 'তল্লাক' দিলেন।

অনন্তর এজিদ পূর্ব্ববৎ সাক্ষী সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর হইতে আসিয়া বলিল এবারও সম্মত হইলেন না, বলিলেন "যে ব্যক্তি এক পত্নীকে ধন ও রাজ্য লোভে পরিত্যাগ করিতে পারিল সে যে কালক্রমে অধিকতর লাভ প্রত্যাশায় আমাকেও পরিত্যাগ করিবে তাহাতে বিচিত্র কি! আবদুল জোব্বার এই রূপে নিরাশ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। রাজকন্যার বিবাহ বিষয়ে সকলই অলীক, কেবল আপনার ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ মাত্র লোভ পরতন্ত্রতার ফল হইল। এদিগে জয়নবও বিনাপরাধে পরিত্যাগ জন্য দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবিধ প্রকার তিরস্কার করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিল।

অনন্তর এজিদ জয়নবকে বিবাহ করিবার উদ্দেশে এক দূত প্রেরণ করিল। পথিমধ্যে আব্বাস নামা এক ব্যক্তির সহিত দূতের সাক্ষাৎ হইল। তিনিও উহাকে নিজ বিবাহের ঘটকতা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "যদি জয়নব এজিদকে স্বামী করিতে অসম্মত হন তবে আমাকে যাহাতে পাণি দান করেন তাহার চেষ্টা করিবে।" দূত স্বীকার করিয়া কিয়দ্দূর গেলে পরে আলির পুত্র হাসনের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। হাসনও অনুরোধ করিলেন, যদি এজিদও আব্বাসের আশা বিফল হয়। তবে আমার সহিত যাহাতে বিবাহ হইতে পারে তাহার

* মুসলমান দিগের বিবাহ সময়ে পাত্রকে আপন ভাবী পত্নীর সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়। প্রায় পরিণয় কার্য্য সমাহিত হইবার পূর্ব্বে বর, পাত্রীকে দেখিতে পায় না। সুতরাং একজন উকীল ও অন্ততঃ দুই জন সাক্ষী উপস্থিত থাকিয়া সম্মতি জিজ্ঞাসা করা হয়। উকীল জিজ্ঞাসা করিবেন তুমি অমুকের পুত্র অমুকের স্বামীত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা কর কি না? সম্মতি প্রদান করিলে পর পরিণয় সম্পন্ন হয়। এ বিবাহে হিন্দুদিগের ন্যায় ধর্ম্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠান অধিক হয় না।

চেষ্টা করিবে। দূত পূর্ব্ববৎ স্বীকার করিয়া জয়নবের সমীপে উপস্থিত হইল।

উপস্থিত হইয়াই প্রথমত নিজের বিবাহের কথা উপস্থিত করিল। জয়নব মধুর বচনে উত্তর করিলেন যে, আপনি পিতৃতুল্য বৃদ্ধ, আপনার সহিত কিরূপে সম্মিলন সম্ভবপর। অনন্তর এজিদের সহিত পরিণয় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বহুপ্রকার সুখভোগের আশা প্রদর্শন করিলেন। এতৎ শ্রবণে কামিনী উত্তর করিল যে, বাদসাহগণ প্রায়শঃ কুপথগামী ও অধার্ম্মিক হইয়া থাকে, অতএব তাদৃশ জনের সহিত বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইতে আমার ইচ্ছা নাই। ইহার পর আব্বাস ও হাসনের কথা উপস্থিত হইল। তখন রমনী আহ্লাদিত হইয়া বলিল, হাসন আমার প্রতি কৃপা করিলে আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিব। তাঁহার সহিত বিবাহ হইলে আমার ইহকালে ও পরকালে সদ্গতি হইবে। যেহেতু তিনি পরমেশ্বরের পরম প্রিয়পাত্র মহম্মদের স্নেহাস্পদ দৌহিত্র এবং ঈশ্বরের প্রিয়ভক্ত।

হাসন দূতের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া সেই দিবসেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

এজিদ এই বিবাহ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জয়নবের প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ ও হাসনের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল। "পিতার মৃত্যু হইলে আমি রাজা হইব, তখন যেরূপে পারি হাসনের শিরশ্ছেদন করিব। জয়নব যেমন আমাকে স্বীকার করিল না, তেমনই তাহাকে দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া ইহার প্রতিফল প্রদান করিব।"

তাহার পিতা মাবিয়া পুত্রের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তোমার এইরূপ কথা বলায় ঘোর পাপ হইয়াছে, অতএব এই মুহূর্ত্তে অনুতাপ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা কর।" দুরাত্মা এজিদ পিতৃ প্রবোধে আপনার দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিল না। মাবিয়া পুত্রের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া আবদুল্লা নামক এক ব্যক্তিকে হাসনের নিকট পত্র সহ প্রেরণ করিলেন। ঐ পত্রে হাসনকে অনুরোধ করিলেন যে 'তুমি শীঘ্র আসিয়া আমার রাজ্য গ্রহণ কর, আমি এজিদকে উহা প্রদান করিব না।' এজিদ পত্রবাহককে যাইতে না দিয়া গোপন করিয়া রাখিল। ইতি মধ্যে মাবিয়ার মৃত্যু হওয়ায় এজিদ রাজ-পদ প্রাপ্ত হইল, এবং অনতিবিলম্বে হাসনকে পত্র দ্বারা আদেশ করিল যে, তুমি আমার নিকটে অবিলম্বে উপস্থিত হইয়া অধীন রাজার ন্যায় কর প্রদানপূর্ব্বক অধীনতা স্বীকার কর। অন্যথা শীঘ্র প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। হাসন পত্রের মর্ম্ম অবগত হইলেন। সকলেই দুরাত্মা এজিদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া নানাপ্রকার ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। দূত মেদিনা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এজিদকে বলিল যে, পত্র পাঠ করিয়া হাসন আপনাকে অনেক তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, যদি তাহার শুভকামনা থাকে, তবে শীঘ্র আসিয়া আমার শরণাপন্ন হউক।

এজিদ পুনর্ব্বার দূত পাঠাইল, সে বারেও ঐরূপ ফল হইল। অনন্তর স্বীয় মন্ত্রিগণকে বলিল। আপনারা হাসন হোসেনের বিনাশ বিষয়ে কি পরামর্শ দেন'। প্রধান মন্ত্রী মেরবাঁ বলিল "হাসন ও হোসেন অতি বলবান্ বীর, তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বধ করা দুঃসাধ্য, অতএব কোন প্রকারে বিষ ভোজন করাইয়া মারিতে পারিলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন।" এইরূপ পরামর্শ সুস্থির হইলে, এজিদ মেদিনাস্থ ওলিদা নামক সেনাপতিকে পত্র লিখিল যে, তুমি কোন দুষ্ট স্ত্রীলোক দ্বারা হাসনের প্রাণবিনাশ চেষ্টা করিবে। ওলিদা প্রভুর আদেশসানুসারে ময়মনা নাম্নী এক বৃদ্ধাকে ঐ কার্য্যের ভার দিয়া দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিল; ময়মনা কদবানু নাম্নী হাসনের প্রধান পত্নীর নিকট গিয়া বলিল যে "তোমার স্বামী এক পরম রূপবতী স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিবেন। ঐ রমণীর নিকট তোমাদিগের সৌন্দর্য্য অতিতুচ্ছ"। কদবানু এই কথা শুনিয়া ময়মনাকে বলিলেন 'হাসন আমাকে যৎপরোনাস্তি প্রীতি করেন, তোমার কথা সম্ভবপর বোধ হইতেছে না।' দুষ্টা আগামী শুক্রবারে বিবাহ কার্য্য হইবে বলিয়া প্রস্থান করিল। এদিকে ওলিদার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল আমি হাসনের বধ বিষয়ে উৎকৃষ্ট উপায় করিয়া আসিয়াছি। তুমি বাদ্যকর প্রভৃতি আনাইয়া বিবাহের উপযুক্ত আড়ম্বর কর। ওলিদা তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে, ময়মনা বানুর নিকট গিয়া বলিল "তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর নাই, এইক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখ, বিবাহের সমুদায় আয়োজন হইতেছে এবং গীতবাদ্যও হইতেছে।" এই কথা শুনিয়া কদবানুর বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার স্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেন এবং তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ময়মনার সম্মুখেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পাপিষ্ঠা ময়মনা বলিল, 'কিছু চিন্তা করিওনা, আমি এক ঔষধ দিতেছি ইহা তোমার স্বামীকে খাওয়াইলে তিনি কখন বিবাহ করিতে পারিবেন না এবং তোমাকে প্রাণ সদৃশ প্রীতি করিবেন।' এই বলিয়া সদ্যঃপ্রাণসংহারক এক প্রকার বিষ দিয়া কহিল, সরবৎ সহকারে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনন্তর হাসন মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলপান করিতে চাহিলেন। ঐ সময় কদবানু নিকটে থাকাতে তাহাকে বলিলেন, 'প্রেয়সি! তোমার নিকট ভিন্ন পান ভোজন করিতে কোথাও সাহস হয় না। কারণ শত্রু দ্বারা মেদিনা নগর পরিপূর্ণ আছে। কখন কে বিষ দ্বারা প্রাণ নাশ করে বলা যায় না'। হতভাগ্য কদবানু ঐ সময়ে পূর্ব্বোক্ত গরলমিশ্রিত সরবৎ দিলেন। হাসন তাহার সমুদায় একেবারে পান করিলেন, কিছু কাল পরেই তাহার মরণ কাল উপস্থিত হইল। তখন পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতিকে আহ্বান পূর্ব্বক স্নেহপ্রদর্শন ও উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন। "পরমেশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যই হয় না। এমন কি, এক গাছি তৃণও স্থান

পরিবর্ত্ত করে না। আমার এইরূপ মৃত্যুও সেই সর্ব্ব নিয়ন্তার ইচ্ছাতেই হইতেছে। অতএব তোমরা আমার মৃত্যুতে কোন রূপে বিষণ্ণ হইবে না এবং আমার প্রাণ সংহারকের সহিতও কোনরূপ শত্রুতাচরণ করিবে না।'

তিনি এই কথা বলিতে বলিতে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। সমুদায় পরিবারের রোদনধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হাসনের পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র, ভ্রাতৃপুত্র প্রভৃতি সকলেই শোকে নিতান্ত অধীর হইল।

অনন্তর তাহাকে মহম্মদের সমাধি-স্থানে সমাহিত করিবার জন্য উদ্যোগ করায় এজিদের সেনাপতি আসিয়া বাধা দিল। সমুদায়ের পরামর্শে তৎকালে বিবাদ করা অনুচিত বোধে বিশেষতঃ হাসন মৃত্যু কালে বিবাদ করিতে নিষেধ করিয়া ছিলেন বলিয়া, অন্যত্র তাঁহার সমাধিস্থান স্থির করা হইল।

ইহার পর হইতে হোসেন মহম্মদের সমাধি ক্ষেত্রেই নিরত থাকিতেন। এক দিবস প্রাতঃকালে এজিদের সেনা নায়ক ওলিদ তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল "মহাশয়! আমি দুষ্ট এজিদের আজ্ঞা ক্রমে কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি, যদি তাঁহার আদেশমত অনুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সে আমার প্রাণ বিনাশ করিবে। কিন্তু আপনি যদি এইরূপে মহম্মদের সমাধি স্থানে উপবিষ্ট থাকেন, তবে বোধ করি কেহ আপনকার অনিষ্ট করিতে পারিবে না"। হোসেনের মৃত্যু কিরূপে হইবে তাঁহার নিকট হইতে সেই তত্ত্ব অবগত হওয়াই ওলিদের পূর্ব্বোক্ত বচন-বিন্যাসের নিদান। হোসেন ওলিদকে বলিলেন, "আমার মাতামহ জগদীশ্বরের পরম প্রিয় পাত্র মহম্মদ বলিয়াছেন, আমার মৃত্যু করবালায় হইবে। এখানে কি অন্য স্থলে আমার শত্রুরা কিছুই করিতে পারিবে না"।

ওলিদ এই সমাচার এজিদের নিকট প্রেরণ করিয়া লিখিল যে "যদি কোন প্রকারে হোসেনকে মহম্মদের সমাধি স্থান হইতে নির্গত করাইতে পারেন, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। অন্যথা সকল প্রয়াস বিফল। যদি কুফর নগরের অধিকারী আবদুল্লা জেয়াদকে হস্তগত করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহাকে কথঞ্চিৎ করবালায় উপস্থিত করাইতে পারা যায়। বিশেষতঃ আবদুল্লা জেয়াদের সহিত হোসেনের বিলক্ষণ প্রণয়ও আছে, তাহার কথা হোসেনের বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব নহে।"

আবদুল্লা জেয়াদ এজিদের অধীন ছিল। এজিদ সেনাপতির পত্র পাইয়া জেয়াদের সহিত প্রণয় করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, হোসেনের সহিত আমার অত্যন্ত বিবাদ আছে কিন্তু তাহাকে মহম্মদের সমাধি স্থান হইতে করবালায় আনিতে না পারিলে বিনাশ করা অসম্ভব। আপনি যদি সাহায্য করেন তাহা হইলে কথিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি।

জেয়াদ এজিদের প্ররোচনে ভ্রান্ত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অতি জঘন্য কৌশল প্রকাশ করিল। সে সমুদায় আত্মীয় বন্ধুদিগকে আ-

হ্বান করিয়া বলিল " আমি আর রাজ্য করিব না। এই রাজ্যের ভার হোসেনকে দিয়া উদাসীন ভাবে মসজিদে অবস্থিতি করিব।" এই সংবাদ পাইয়া হোসেন তথায় যাইতে অভিলাষ করিলেন। তাঁহার বান্ধবগণ তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া জেয়াদের আচরণ উত্তমরূপে জানিবার জন্য মোছলেম নামক একব্যক্তিকে সহস্র সন্যের সহিত দূত স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। জেয়াদ দূতকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, হোসেন অনুগ্রহ করিলেন না। যাহা হউক আমি তোমাকেই হোসেন জ্ঞান করিলাম; তোমাকেই এই রাজ্য দিতেছি।

মোছলেম এই অবস্থা বিশ্বাস করিয়া হোসেনের নিকট লিখিল।

হোসেন এই পত্র পাঠ করিয়া অবিলম্বে জেয়াদের আলয়াভিমুখে গমন করিলেন। সূর্য্যাতপে অন্তঃপুরিকাগণের কষ্ট হইবে বলিয়া জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে সৈন্যগণ লইয়া চলিলেন। করবালায় যাইবার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং অন্য পথ অবলম্বন করিলেন, কিন্তু ভ্রমবশতঃ করবালাতেই যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে আবদুল্লা জেয়াদ এজিদকে লিখিল " আমি কৌশল করিয়া হোসেনকে করবালায় আনিয়াছি, এবং প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মোছলেমকে সদ্ব্যবহার দ্বারা ভ্রান্তি জন্মাইয়া এক প্রকার বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ইহাকে বধ করিতে পারিলে হোসেনের বধ অনায়াসসাধ্য হইবে "

এজিদ পত্র পাইয়া আবদুল্লা ওমর নামা এক ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া বহু সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিল। এবং সেনাপতিকে বলিয়া দিল " বিপক্ষগণ যাহাতে জল ও ভক্ষ্য দ্রব্য পাইতে না পারে, তুমি প্রথমতঃ সেই চেষ্টা করিবে। অনন্তর হোসেনকে বধ করিবে।"

পক্ষান্তরে আবদুল্লা জেয়াদ যখন জানিতে পারিল যে, এজিদের সৈন্যগণ আগত প্রায়, তখন মোছলেমকে (এ ব্যক্তিকে হোসেন জেয়াদের নিকট দূত পাঠাইয়া ছিলেন) বলিল, দেখ দুরাত্মা এজিদ সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিতেছে। তুমি ইহাদিগকে দূর করিয়া দাও। তদনুসারে মোছলেম সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে নির্গত হইতেছে, এমন সময় সকলে বাহির না হইতে হইতেই দ্বাররুদ্ধ হইল। এই সময়ে মোছলেমের চৈতন্য হইল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আবদুল্লা জেয়াদ হোসেনের বন্ধু নহে, পরম শত্রু। যাহারা বাহির হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন " হে মুসলমানগণ! যদি সত্য ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জগদীশ্বরের প্রিয়সুহৃদ্ মহম্মদের প্রতি বিশ্বাস থাকে, যদি স্বর্গরাজ্যে বাস করিতে অভিলাষ কর, যদি সমুদায়-পাপ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ইমাম হোসেনের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন কর।" এই বলিয়া মোছলেম প্রাণ পণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎ কর্ত্তৃক অনেক বিপক্ষ সৈন্য বিনাশ হইল। পরিশেষে এজি-

দের সেনাপতি আবদুল ওমর এবং বিশ্বাসঘাতক আবদুল্লা জেয়াদ উভয়ে বহু যত্নে তাহাকে বিনাশ করিল।

অনন্তর এজিদের পক্ষীয় সেনাগণ ফেরাত নামক নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এদিগে হোসেনও ঐ স্থানে সৈন্য সহিত উপস্থিত হইলেন। হোসেন দেখিলেন, অস্ত্রাঘাতে বৃক্ষ হইতে রক্ত নিঃসরণ হইতেছে এবং হঠাৎ মৃত্তিকা মধ্যে অশ্বের পদ প্রোথিত হইয়া গেল, এই সকল দুর্লক্ষণ দেখিয়া মনোমধ্যে অশুভ শঙ্কা প্রবল হওয়াতে অগত্যা সেই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

দাস-গণ নদী হইতে পানীয় জল আনিতে গিয়া দেখিল, শত্রুগণ তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে, কোন রূপে জল লইতে দিবে না। হোসেন সমুদায় অবগত হইয়া এই ভয়ঙ্কর সময়ে আত্মীয় ও সৈন্যগণকে বলিলেন "তোমরা আমার নিমিত্ত বহু বিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছ, এইক্ষণে অনর্থক জীবন বিসর্জ্জন করিবার আবশ্যক নাই, আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার হউক, তোমরা স্ব স্ব আলয়ে গমন কর।" ইহা শুনিয়া সৈন্যগণ বিনীত ভাবে বলিতে লাগিল। "মহাশয়, এমন কথা বলিবেন না, আমরা প্রাণ থাকিতে মহম্মদের নিকট কৃতঘ্ন হইব না, যাহার কৃপায় স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হইবার আশা করিতেছি, তাঁহার প্রিয়দৌহিত্র হোসেনকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের সদ্গতির সম্ভাবনা কি? এবং এই ঘৃণিত জীবনেই বা কি প্রয়োজন? এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে এজিদের শিবির হইতে একজন মুসলমান আসিয়া হোসেনকে বলিল "আপনার প্রিয়পাত্র মোছলেম, যাহাকে আপনি আবদুল্লা জেয়াদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তিনি বিশ্বাস ঘাতক জেয়াদ কর্ত্তৃক সসৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছেন। মোছলেম বিপক্ষদিগের বহু সৈন্য নিপাত করিয়া শত্রু হস্তে নিহত হইয়াছেন। এখানে শত্রুগণ আপনার পানীয় বন্ধ করিয়াছে। ফেরাতের জল আর আপনকার পানীয় হইবেনা। হোসেন এই সকল সংবাদে বিশেষতঃ মোছলেমের মৃত্যু সংবাদে যৎপরোনাস্তি শোকাকুল ও হতাশ হইলেন। তিনি ভ্রাতৃবৎ স্নেহাস্পদ প্রিয়সুহৃৎ মোছলেমের মৃত্যু জন্য আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় অন্তঃপুর হইতে ভয়ঙ্কর রোদন ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। তিনি হঠাৎ ঐ প্রকার রোদনের কারণ অনুসন্ধানার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাহার পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ পিপাশায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মৃতকল্প হইয়া আছে। তাঁহার একটি পুত্র নিতান্ত শিশু ছিল, তিনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া এজিদের সৈন্যদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমার এই শিশুপুত্র তোমাদিগের সহিত কোন প্রকার বৈরাচরণ করে নাই, কিঞ্চিৎ জল দান করিয়া ইহার প্রাণ রক্ষাকর; এনিমিত্ত পরমেশ্বর অবশ্যই তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। হোসেনের এইরূপ বিনয়বাক্যেও শত্রুগণের অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হইল না। হোসেন জলপ্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া শত্রুদিগকে কাফর,

পাষণ্ড ইত্যাদি বলিয়া ভৎসনা করিতে লাগিলেন। হোসেনের ভৎসনায় শত্রুগণ ক্রুদ্ধ হইল এবং তাহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি এক বাণ ক্ষেপণ করিল। নিক্ষিপ্ত শর শিশুর হৃদয়ে বিদ্ধ হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। হোসেন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিয়ৎকাল পরেই মৃত পুত্রের দেহ সমাহিত করিলেন। এই সময়ে ওয়াহাব নামা এক ব্যক্তি হোসেনের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল। সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক শত্রু বিনাশ করিয়া পরিশেষে অস্ত্রাহত ও পিপাসায় কাতর হইয়া ভূপতিত হইল। হোসেন ওয়াহাবের পতন দর্শনে স্বয়ং শত্রু সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। জাবেরা নামা একজন শত্রুপক্ষীয় সৈন্য এমন সময় "মার মার" শব্দে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হোসেন জাবেরাকে বলিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি আমার মাতার স্তন্য পান করিয়াছ এবং আমার সহিত এক মক্তবে অধ্যয়ন করিয়াছ; কি আশ্চর্য্য এইক্ষণে তুমি আমার প্রাণ হননে উদ্যত হইলে। জাবেরা এই কথায় খড়্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় হস্ত বন্ধন করত বিনীতভাবে হোসেনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, মহাশয় আমি আপনকার নিকটে অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি; আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি শিবিরে গমন করুন, আমি একাকী মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনকার শত্রুগণকে বিনাশ করিতেছি। এইক্ষণে জাবেরা হোসেনের পক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং ওয়াহেবের ন্যায় বহুসংখ্যক শত্রু শিরঃ কর্ত্তন পূর্ব্বক পরিশেষে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইরূপে হোসেনের পক্ষীয় প্রধান ২ সেনাপতি সকল এবং তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ক্রমশঃ বহুল শত্রু নিপাত করত স্বীয় স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

অবশেষে হোসেন স্বয়ং সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইলেন। স্ত্রীগণ করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। হোসেন তাহাদিগকে তৎকালোচিত প্রবোধ দিয়া বলিতে লাগিলেন "যুদ্ধ না করিলেও আমাদের বাঁচিবার আশা নাই। জল অভাবে পিপাসায় প্রাণবিয়োগ হইবে, অতএব যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জনই উত্তম কল্প। যিনি সমুদায় জগতের একমাত্র রক্ষক, সেই বিশ্বপতি জগদীশ্বরের নিকট তোমাদিগকে সমর্পণ করিয়া চলিলাম। তিনি ব্যতীত এই বিষম সঙ্কটে তোমাদিগের উদ্ধারকর্ত্তা অন্য কেহ নাই। বিশ্বাসের সহিত তাঁহার প্রতি নির্ভর কর।"

হোসেন পরিবারবর্গকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া রণস্থলে যাত্রা করিলেন। তাঁহার শাণিত অস্ত্রাঘাতে শত শত শত্রু সৈন্য ইহলোক পরিত্যাগ করিল। হতাবশিষ্ট শত্রুরা হোসেনের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে আশ্রয় লইল। ইত্যবসরে হোসেন পিপাসাশান্তির আশয়ে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। খড়্গ চর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পানার্থ নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন। পরন্তু অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া পান করিবেন, ইতি মধ্যে স্মরণ হইল যে,

বহুসংখ্যক আত্মীয়, পুত্র ও ভ্রাতৃ-পুত্রগণ, যাহারা আমার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে আসিয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই যুদ্ধাহত হইয়া এই জলের নিমিত্ত হাহা কার করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, আমি এইক্ষণে কিরূপে জল পান করিব, এই বলিয়া সলিল সেবনে বিরত হইলেন।

হোসেন এইরূপে নদীগর্ভে দণ্ডায়মান হইয়া জল পান বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময় এজিদের সৈন্য মধ্যে আবদুল্লা জেয়াদ বলিয়া উঠিল "কে কোথায় আছে! এই সময়ে হোসেনকে বধ কর, উত্তম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।" তদনুসারে হোসেনের উপরে চতুর্দ্দিক হইতে তীর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু কেহই নিকটে যাইয়া হোসেনকে তরবারি প্রহার করিতে সাহসী হইল না। শরাঘাতে হোসেন জর্জ্জরিত হইলেন। কিন্তু তখনও কেহ তাঁহার মস্তক ছেদনে সাহস করিল না। পরিশেষে সেমর লইম নামা এক ব্যক্তি তাঁহার বক্ষোপরি উপবেশন করিয়া শিরশ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল। পুনঃ পুনঃ গলদেশে তরবারি ঘর্ষণ করিয়াও দেহ হইতে মস্তক পৃথক করিতে পারিল না।*

হোসেন পুনঃ পুনঃ আঘাত জনিত যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, আমার কটিবন্ধে যে মহম্মদের ছোরা আছে, তদ্দ্বারা আমার মস্তক চ্ছেদন কর। আমাকে হত্যা করিতে হইলে বিপর্য্যস্ত করিয়া লও। কারণ সম্মুখ দিকে আমার মাতামহ চুম্বন করিয়াছেন, সেই চুম্বিত স্থান সকলে কদাপি অস্ত্র প্রবেশ করিবে না। সেমর লইম হোসেনের কথানুসারে কার্য্য করিয়া ত্বরায় তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন।

অনন্তর সৈন্যগণ হোসেনের শিবিরে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। তাহারা স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্রালঙ্কারাদি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে লাগিল। পরিশেষে জেয়াদ প্রভৃতি বন্দীদিগকে ডেমাস্কাসে লইয়া চলিল। বন্দীদিগের মধ্যে সালেমা নাম্নী মহম্মদের এক পত্নী, হোসনের পত্নী, হাসনের পত্নীদ্বয়, হাসনের মাতৃস্বসা, হোসেনের কন্যা ফতেমা এবং পুত্র জয়নাল আব্দিন, এই কয় ব্যক্তি ছিলেন। ফতেমা পরমা সুন্দরী বালিকা। এক দিবস তাহাকে খোরমা ভোজন কর বলিয়া তাহার হস্তে পিতৃমস্তক সমর্পণ করিল। তদ্দর্শনে বালিকা শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল; এবং উক্ত মস্তক হস্তে করিয়া পিতার দেহে সংযুক্ত করিবার জন্য করবালা অভিমুখে

---

*হোসেনের বক্ষোপরি উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতে সমর্থ হইতেছে না, ইহা অসম্ভব নহে। কারণ যে ব্যক্তি কিছুকাল পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মের আদিগুরু স্বর্গপথের প্রদর্শক মহম্মদের দৌহিত্র, সদাত্মা হোসেনকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া হতবুদ্ধি এবং বলহীনের ন্যায় হইবে, বিচিত্র কি? সে কখন ভাবিতেছে এই মস্তক এজিদকে দিলেই বিলক্ষণ পুরস্কৃত হইব, কখনও ভাবিতেছে পরলোকে দোজোখ (নরক) হইতে নিস্তারের উপায় কি?

ধাবিত হইল। পথিমধ্যে ফেরেস্তা (অর্থাৎ স্বর্গীয় দূত) তাহা লইয়া গেল।

এইরূপে কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে পর, এক দিবস এজিদ জয়নাল আব্দিনকে (হোসেনের শিশুপুত্র) জিজ্ঞাসা করিল "তোমার পিতৃ-বিয়োগ হইয়াছে, এইক্ষণে মনের অভিলাষ কি?" জয়নাল বলিল "তোমাকে উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া ব্যতীত আমার অন্য কোন অভিলাষ নাই"। তখন এজিদ তাহাকে মধুর বচনে শান্তনা করিয়া কহিল, তুমি নমাজ অবসানে আমার নামে খোৎবা পড়। জয়নাল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "দাসীপুত্র তোমার নামে কে খোৎবা পড়িবে; তোমার এই আশা দুরাশা মাত্র"। তৎশ্রবণে এজিদ অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিতে লাগিল "তোর পিতা মরিয়াছে, এখন তোকে হত্যা করিলে কে রক্ষা করিবে!"

এজিদের মন্ত্রী মের্‌ঁয়া স্বীয় প্রভুকে ক্রোধ সংবরণ করিতে পরামর্শ দিয়া বলিলেন, "এই বালক পিতৃশোকে নিতান্ত অধীর হইয়াছে, এইক্ষণে ইহার বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ নাই, ইহার উপর ক্রোধ বৃথা। উহার মাতা ও পিতৃমাতামহীকে বলিয়া খোৎবা পড়াইব।"

অনন্তর রাজমন্ত্রী মের্‌ঁয়া মহম্মদের পত্নী সলেমার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বহু প্রকারে বুঝাইয়া পরিশেষে জয়-নালের দ্বারা খোৎবা পাঠের বিষয় উল্লেখ করিল। সলেমা বলিলেন, যদি আমাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না হয়, তাহা হইলে আমি আপনার কথানুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিব। এই কথার পর মন্ত্রী বিদায় হইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধা সলেমা জয়নালকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন। বৎস! তুমি সংপ্রতি এজিদের বাক্যানুসারে কার্য্য কর; নতুবা কোন রূপেই আমা-দিগের প্রাণ রক্ষা হইবেক না। সং-প্রতি আমরা কোন রূপ নির্ব্বিঘ্নে কাল কর্ত্তন করিতে পারিলেই হয়। কারণ শীঘ্রই তোমার পিতৃব্য হানিফ আম্বাজ নগর হইতে আসিয়া দুরাত্মার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাদিগের উদ্ধার করিবেন।

পরের শুক্রবার দিবস জয়নাল খোৎবা পড়িবে বলিয়া এজিদ তাঁহাকে কারামুক্ত করিলেন। জয়নাল কতি-পয় ঘটিকা স্বাধীনভাবে বিচরণ ক-রিতে লাগিলেন। কিন্তু এজিদের নামে খোৎবা পাঠ না করাতে পুনর্ব্বার কারাবদ্ধ হইলেন।

এদিগে হানিফ ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ মি-লিত হইয়া সমর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। হানিফ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ একে ২ এজিদের সকল সৈন্য দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ বিবরণ অতি আশ্চর্য্য। এজি-দের সেনাপতিগণ কখনও কাহাকে রুদ্ধ করিল, কিন্তু তাহারা অপূর্ব্ব ঐশী শক্তিতে মুক্তি লাভ করিয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক দিবস বিপক্ষগণ হানিফকে বদ্ধ করিয়া পর্ব্বতোপরি দগ্ধ করিবার নিমিত্ত লইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে হানিফের ভ্রাতৃগণ তথায় যাইয়া সমু-দায় আয়োজন লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিল। কথিত আছে, এক সময় হানিফের

বাহু ছিন্ন হইয়াছিল, তাহাও দৈববলে পুনর্ব্বার সংযুক্ত হয়। রিপক্ষগণ আলি-নামক (হানিফের ভ্রাতা) এক ব্যক্তিকে শূলে আরোহণ করাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও কৃত-কার্য্য হইতে পারিল না।

এইরূপে এজিদ কোন প্রকারে হানিফা ও তৎভ্রাতৃগণকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া হতাশ হইতে লাগিল। অবশেষে দুরাত্মা স্বীয় পাপের প্রতিফল স্বরূপ আত্মীয় বন্ধুর নিধন জন্য শোক সন্তাপ সহ্য করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এক্ষণে হাসনের অন্তঃপুরিকাগণ ও পুত্র কন্যা প্রভৃতি বহুবৎসর এজি-দের কারাগৃহে রুদ্ধ থাকিয়া মুক্তিলাভ করিলেন।

হানিফা কিছুকাল স্বীয় বৈমাত্র ভ্রাতার পুত্র জয়নাল আব্দিনকে রাজকার্য্য শিক্ষা দিয়া রাজ্য ভার অর্পণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

এই সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানটি মনো-হারিত্বাংশে অপকৃষ্ট নহে। কিন্তু আমাদিগের প্রস্তাবটি শুষ্ক ঘটনা সমূহে পরিপূর্ণ, সুতরাং পাঠকবর্গের নিকট তাদৃশ মনোরম না হইতেও পারে। হাসন ও হোসেন প্রকাণ্ড ঈশ্বরভক্ত এবং দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। মহম্মদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শিষ্যগণ অধিকাংশ যে বিশেষ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

হাসন যখন বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন, তখনও আততায়ীর প্রতি অত্যাচার করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন, ইহাতে কে না তাঁহাকে পরম সাধু বলিবেন। যদিও মুসলমান-দিগের যুদ্ধানুরাগ এবং ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা দেখিয়া অনেকে নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে এমত অনেক মহাপুরুষ ছিলেন যে, তাঁহারা সক-লেরই ভক্তির পাত্র হইতে পারেন।

আমাদিগের এই প্রস্তাবে লিখিত ঘটনা উপলক্ষে প্রচলিত মহরম নামক পর্ব্বের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

মুসলমানগণ মহম্মদকে মুক্তিলাভের অর্থাৎ অনন্ত স্বর্গ লাভের এক মাত্র সহায় বলিয়া জানেন। তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র পুন্যাত্মা হাসন হোসেন সাতিশয় নিষ্ঠুরাচরণ সহ্য করিয়া নিহত হইলেন ইহা অবশ্য বিশেষ দুঃখজনক তাহার সন্দেহ কি? এবং ঐ শোকা-বহ ঘটনা স্মরণ করিয়া বর্ষে বর্ষে একটি পর্ব্বের অনুষ্ঠান করা অনুচিত নহে।

যাহা হউক সংপ্রতি মুসলমান-দিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় * দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া প্রাধান্য লাভ করিতেছেন। তাঁহাদিগের মতে এতদুপলক্ষে তাজিয়া নির্ম্মাণ করা এবং সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা অতি গর্হিত বলিয়া স্থিরীকৃত হই-য়াছে। তাঁহারা বলেন হাসন হোসে-নের মৃত্যু ঘটনা অতি দুঃখজনক, অতএব শোক প্রকাশ কর। কিন্তু আমোদ করা অকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ তাজিয়া দ্বারা ধর্ম্মের মধ্যে পৌত্তলি-কত্ব প্রবেশ করিতেছে।

এই অভিনব সম্প্রদায়ে যে প্রকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে বোধ

* এই সম্প্রদায়কে এতদঞ্চলে হেদাদ বলিয়া থাকে।

written language from that current in the general body of the people in all the transactions of real life. The life blood of a language is force of habit and that reality of associations which practical life presents. Therefore if the language of literature of a country be converted into a holiday dress, it may amuse and be imposing and be good only as a plaything, but it fails to afford that manly and constant utility which the ordinary *dhootee* and *chaddur* afford.

What turned our attention to this subject is the fact that the Bengalee language of our printed books and papers is most often in the category of the holiday fashion, and pedantic language described above. When we say this we do not mean any conformity of views with our Lieutenant Governor. As to His Honor's views to speak the truth, we are to confess that we failed to understand on what principle they were founded or in what direction they ultimately tended—in short we did not understand what they were. We also do not mean to ignore the necessity and propriety of dealing with classic subjects in a classic style and with scientific subjects in a technical style in which words derived from Sanscrit roots must abound. We are also not unaware that however the spirit of written language be popularized and catholicised, there must ever remain a *stratum* of vulgarism and provincialism, which it must ignore except in dramatic writings. What we would condemn is the prevailance of a strong feeling of caste distinction in the world of language. Our religious reformers are making a worthy attempt to remove those narrow distinctions of caste which obstruct a free flow and a generous interchange of sympathies and fraternal love in the different orders of the society. But our literary reformers are not alive to a like duty of narrowing the width of the invidious caste feelings which prevail, with regard to words spoken by the different orders of the society composing the commonalty. There are persons, who throw off the sacerdotal thread—as an earnest, that they are above all Brahminical narowness. But occasions offer themselves when individual words and idioms of that perfect, beautiful and grand language of the Brahmins of old appear at disadvantage in competition with the rougher, but more telling and more vigorous elements of the current tongues. Sanscrit though noble, grand and beautiful is yet a dead language. It is certainly embalmed and has all the complexion of life, which it will never lose. But yet the life-blood is not coursing in its vein. It is therefore desirable that we abate a little in our prejudices against all that does not come within the sacred precincts of "Sadhu Bhasa." Why should we rather like প্রভু than মুনিব, ভৃত্য than চাকর, মক্ষিকা

than মাছি, গাভি than গরু, লঘু than পাতলা, বৃহৎ than বড়, ক্ষুদ্র than ছোট, কিঞ্চিৎ than কিছু, গাঢ় than ঘন, শ্বেত than সাদা, রক্তবর্ণ than লাল and so forth. Why should we rather দর্শন করিব than দেখিব, আহার করিব than খাইব, শ্রবণ করিব than শুনিব, নিদ্রা যাইব than ঘুমাইব, ভ্রমণ করিব than বেড়াইব. The first set of words are certainly of a more polished and harmonious association. But the second set are familiar to a larger number of persons and have a far greater significance. Each set has its advantages and its disadvantages. What we would insist on our authors to do is, that they look on both classes of words with an equal eye, giving each its due and not altogether outcast the words which are not in a classic guise. There are many ideas such as মুস্কিল. খাওয়া দাওয়া. which would be ill-expressed by words of Sanscrit origin ; but yet we would rather compromise the thought that we use in writing words in common usage. Again there are idioms which have a peculiar force of their own—which can scarcely be preserved in being converted into a classic shape. Idioms like প্রাণ পোড়ে, মাথা ধরে, আঁধার দেখিলাম, বাতিক চড়া can be but poorly rendered into classic equivalents. Yet we would rather mar the force of our meaning than introduce uncouth words into our writings. Some of our rude primitive writers were free from the vice. The literature of the Voishnabas is marked by a simplicity of style which did not refuse expressions—because of being not Sanscrit but in popular use. In England at present there is a reaction in favor of popular to classic expressions. And experience shows that such a taste greatly adds to the force of a language. Look for instance to the "Urdu," bastard as it is. The 'Chahar Darbesh' or 'Bagh-o-Bahar' produces by its language an expression which many of our Bengali books of the same class by our best authors, even fail to do. We are obliged to conclude this topic abruptly. But we conclude by requesting our authors to give some consideration to the subject.

—:o:—

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত বাবু বলদেবপালিত প্রণীত ভর্ত্তৃহরি নামক এক খানি অভিনব খণ্ডকাব্য আমরা উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই কাব্য আদি এবং শান্ত রস প্রধান।

যদি গ্রন্থখানি প্রচলিত প্রণালীতে রচিত হইত,তাহা হইলে আমরাও সম্পাদকদিগের প্রচলিত প্রথানুসারে যদৃচ্ছাক্রমে ২।৪ টি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া 'ভাল হইয়াছে, পাঠে প্রীতি লাভ করিলাম, অথবা গ্রন্থ উৎকৃষ্ট হয় নাই, পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না' ইত্যাকার ২।১ টি কথা বলিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতাম।

কিন্তু বলদেব বাবুর কাব্যে বিশেষ প্রকারের কিছু নূতনত্ব আছে। তন্নিবন্ধন কিঞ্চিৎ না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বতন বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি কোন কোন কবি স্বকীয় কাব্যের স্থানে স্থানে, সংস্কৃত চ্ছন্দের সন্নিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু বলদেব বাবুর কাব্য আদ্যোপান্তই সংস্কৃত চ্ছন্দে রচিত। এই অংশেই এ কাব্যের বিশেষ নূতনতা।

'রস ও ভাবের উদ্দীপন করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে।' একথা সত্য হইলেও ছন্দ ও পদ বিন্যাস বিষয়ে মনোযোগ করা কবিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। 'যেমন সৌরভ গ্রহণের পূর্ব্বেই দূর হইতে মালতী মালার শোভা দেখিয়া দর্শকদিগের আনন্দোদয় হয়; সেই প্রকার উৎকৃষ্ট কাব্যের ভাব এবং তাৎপর্য্যের প্রতি মনোনিবেশ করিবার পূর্ব্বে এক মাত্র তাহার ধ্বনিই শ্রোতার কর্ণে যেন মধু বর্ষণ করিয়া থাকে' এই প্রসিদ্ধ উক্তি নিতান্ত অযোগ্য বোধ হয় না। প্রসিদ্ধ মহাকবি-গণ স্বীয় স্বীয় কাব্যে এমনই আশ্চর্য্য কৌশলে শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন যে, তাহার একটি শব্দ পরিবর্ত্ত করিলে মনোহারিতার অনেক লাঘব হয়। ভাব-গত যথেষ্ট মধুরতা সত্ত্বেও রচনা প্রণালীর দোষবশতঃ কাব্যের প্রধান প্রয়োজন যে "পাঠক বর্গের মনোরঞ্জন" তদ্বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত হয়। এ নিমিত্ত কবি-গণ ভাষার উপর প্রচুর প্রভুতা লাভকরিয়া পদ বিন্যাস বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইয়া থাকেন। পরন্তু শব্দ প্রয়োগের ন্যায় ভাবোপযোগী ছন্দ বিষয়েও তাঁহারা বিলক্ষণ সতর্ক।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই পদ্য রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। ফলতঃ প্রকৃষ্ট প্রণালীতে বিরচিত ছন্দোনিবদ্ধ-প্রবন্ধ যে অপেক্ষাকৃত অধিক মনোরম, ইহা সহৃদয় মাত্রেরই স্বীকার্য্য। পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজেই কাব্য রচনা বিষয়ে গদ্য অপেক্ষা পদ্য অধিক ব্যবহৃত। বাস্তবিক ভাবোদ্দীপন বিষয়ে উভয়ের সমান উপযোগিতা থাকিলে ছন্দের এত আদর হইত না।

সত্য বটে অভ্যাস করিবার বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়া প্রাচীন কালে

পদ্যের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লিপি এবং ক্রমে মুদ্রা যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে এইক্ষণে অভ্যাসের তত আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। অতএব ছন্দের স্বাভাবিক বিশেষ মাধুর্য্য আছে বলিয়াই উহা জনসমাজে এইক্ষণেও এত আদৃত হইতেছে। যদিও সভ্যজাতির ভাষা মাত্রেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গদ্য কাব্য কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্তহওয়া যায়, তথাপি ছন্দোনিবদ্ধ রচনার অপেক্ষাকৃত মনোহারিতা আছে বলিয়াই অধিকাংশ কবি ছন্দ অবলম্বন করিয়া স্বকীয় কবিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ইহা বলা বাহুল্য যে, ছন্দোবিষয়ে সকল ভাষাকেই সংস্কৃতের নিকট নতমস্তক হইতে হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দে যেরূপ বাহুলতা, বিচিত্রতা, মধুরতা এবং তেজস্বিতা প্রভৃতি দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষার ছন্দঃ সকল যেমন সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতি অল্প ভাষাতেই এরূপ দৃষ্ট হইবে।

বলদেব বাবু সংস্কৃত ছন্দের মোহিনী মূর্ত্তিতে অনুরক্ত হইয়া, বাঙ্গলা ভাষায় তাহার বহুল প্রচলন নিমিত্ত বিশেষ ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহার বাসনা কত দূর ফলবতী হইবে বলা যায় না। আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহার আশার সফলতা বিষয়ে বিশেষ কয়েকটি ব্যাঘাত আছে।

প্রথমতঃ বাঙ্গালী কবিমাত্রের পক্ষে সকল সংস্কৃতচ্ছন্দে রচনা করা অনায়াস সাধ্য নহে। যে সকল কবি বলদেব বাবুর ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা কথঞ্চিৎ সুসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু সকল কবিই যে বিলক্ষণ পণ্ডিত অথবা সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন, এমত আশা করা যায় না। যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন মহেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও ২।১ জন লোক বিশিষ্ট কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হওয়া বিচিত্র নয়, তাদৃশ কবির রচনা ঈদৃশছন্দে সম্পূর্ণ নির্দোষ হইবে; এমন বোধ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা এই উভয় ভাষার প্রকৃতি এক প্রকার নহে। বাঙ্গলা একটি বিমিশ্র ভাষা, ইহাতে অধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ থাকিলেও প্রাকৃত, পারসী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার শব্দ ও নিতান্ত অল্প নয়। যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলায় প্রচলন আছে, তাহার পদ সাধন প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী বলিয়া প্রচলিত বাঙ্গলা ব্যাকরণের অধিকাংশ সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত ঐক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু রচনা বা কথোপকথন প্রণালী (যাহা ভাষা মাত্রের প্রকৃতি গত অংশের মধ্যে একটি প্রধান বিষয়) সম্পূর্ণ পৃথক ভাবাপন্ন।

যে সকল সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গলার প্রকৃতি অনুসারে গ্রহণযোগ্য, বলদেব বাবুর ন্যায় কবিগণ চেষ্টা করিলে তাহা বাঙ্গলায় গৃহীত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃতচ্ছন্দঃ মাত্রই বাঙ্গলায় গৃহীত হইবে, এরূপ বোধ হয় না। কারণ বিভিন্ন প্রকৃতি ভাষাদ্বয়ে একছন্দে বিরচিত কবিতা সকল স্থলে কখনও সুশ্রাব্য ও অনায়াসবোধ্য হয় না। সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গলা ভাষায় প্রলচন করিতে হইলে

ভাষার প্রকৃতি অনেক পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

যদি সংস্কৃত অভিজ্ঞ পণ্ডিত কবিরা এই প্রণালীতে কতক গুলি কাব্য প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে, পরবর্ত্তী কবিগণ স্বকীয় শক্তি অথবা ভাষার প্রকৃতি অনুসারে সময় ২, তাহা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় কিম্বা আবশ্যক মতে পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বাঙ্গলা পদ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারেন।

যাহা হউক আমাদিগের আলোচ্য কাব্য খানি ক্ষুদ্রায়তন খণ্ডকাব্য; সুতরাং উপাখ্যান গত সৌষ্ঠব বা বর্ণনীয় বিষয়ের বাহুল্য থাকিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু সুরচিত খণ্ড কাব্যে যাদৃশ প্রীতি লাভ করা যাইতে পারে, তাহা ইহাতে সম্পূর্ণই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা যদৃচ্ছাক্রমে নিম্নে কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

তোমা বিনা হে যত কাল আমি
সিংহাসনারূঢ় ছিলাম কান্তে।
অপ্রীতি দাত্রী ছিল রাজলক্ষ্মী
সংসারনিঃসার হতপ্রতীত॥
চতুর্দিগে বেষ্টিত রাজ ভোগ
বিলাস বাঞ্ছা ছিলনা তথাপি।
সভার মধ্যে রহিতাম একা
লোকালয়ে থাকি সদা বিরাগী॥

*   *

যোগী যথা প্রাপ্ত হলে মহেশে
দরিদ্র যেরূপ সুবর্ণ লাভে।
তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি সুমিষ্ট তোয়ে
তোমায় পেয়ে তত তৃপ্ত আমি॥

*   *

হাহা কি হেতু তুমি বিশ্বপতে বিধাতঃ
রামার রূপরচি রম্য রমার তুল্য।
রাত্রিঞ্চরীর খলতা হৃদয়ে দিলেহে
সংস্থাপিলে গরল ঈদৃশ রত্ন কুম্ভে।

অধিকাংশ স্থলেই কবিতা গুলি এইরূপ শ্রবণমধুর ও তাৎপর্য্যগ্রহে মনোরম হইয়াছে। পরন্তু স্থানে স্থানে রচনা নিতান্ত সমাসবাহুল্য হইয়াছে। বীররস বর্ণন স্থলে সমাসবাহুল্য হইলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু নায়িকার রূপবর্ণনায় কবি যে সকল সমস্ত পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের রুচি অনুসারে তত উৎকৃষ্ট বোধ হইল না। বাঙ্গলাতে রসভাবোদ্দীপন বিষয়ে বিশেষ অনুকুল না হইলে, সমাসবাহুল্য রচনা তত মনোরম হয় না। দুই এক স্থলের রচনা অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠকদিগের পক্ষে নিতান্ত দুর্গম হইয়াছে। ইহার উদাহরণ স্বরূপ গ্রন্থ হইতে দুইটী উৎকৃষ্ট কবিতা উদ্ধৃত হইল।

মহীধরাকারশরীরপীবর,
প্রমৃষ্টভিন্নাঞ্জনসন্নিভদ্যুতি।
অজস্র-আস্ফালিত কর্ণমণ্ডল
প্রকাণ্ডদন্ত ক্ষম বপ্রভেদনে॥
ইতস্ততশ্চালিতশুণ্ডভীষণ,
প্রচণ্ডবজ্রোপমবৃংহিতধ্বনি।
বিরাজিছে তোরণ পার্শ্ব শোভিয়া,
প্রভিন্ন যূথ প্রতিবদ্ধ শৃঙ্খলে॥

উপসংহার স্থলে আমরা অনুরোধ করিতেছি যে, বলদেববাবু এইপ্রকার সংস্কৃত চ্ছন্দে অথবা যথাসম্ভব কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ছন্দে এক খানি মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় পাঠকদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীমতী রাইকিশোরী দেবী
" ইচ্ছাময়ী দেবী
" রাধাসুন্দরী দেবী
শ্রীযুক্ত রাজা কেদার নারায়ণ রায়
" বৈকুণ্ঠ নারায়ণ রায়
" নীম নারায়ণ রায়
পুটিয়ার উল্লিখিত গ্রাহকদিগের নিকট প্রাপ্ত ১৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু কালিকান্ত রায় পাবনা ২॥ /১০
" রাধিকা নাথ সেন পুটীয়া ২।।০
" মহিম চন্দ্র চৌধুরী দিঘাপতিয়া ১।০
" মনোমোহন সেন ২।।০
" রজনীকান্ত দাস গুপ্ত ১।১০
" হরিলাল ঘোষাল ২।।০
" দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১।। /
" গিরিশ চন্দ্র মিত্র রাচি ২।।০
" চন্দ্রনাথ মৈত্রেয় বিয়াঘাট ২।।
" দুর্গাদাস মৈত্রেয় রঙ্গপুর ১।০
" মাধব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২।।
" উমানাথ সেন ত্রিপুরা ২।।০
" গোপী মোহন মজুমদার ইছলামপুর

J. M. Balandrean Esq. Calcutta ২॥
শ্রীযুক্তবাবু শিব চন্দ্র শীল চুঁচুড়া ২॥ /১০
H. A. R Alexander Esq.
M.B. Rochfort Esq.
O. Tlarte Esq. ২॥
শ্রীযুক্ত বাবু রাম যাদব বাগছি ২।।
" কালী নারায়ণ রায় ২৲
" রাধিকা নাথ রায় ১।
" শ্যামাচরণ খাঁ ১।
" মাধব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২॥
" হরি নাথ সাহা ৵
" কাশীনাথ সাহা ৵
" উদয় নারায়ণ ভাদুড়ী ২॥
রায় লক্ষ্মী পতি সিংহ বাহাদুর ২॥
শ্রীযুক্তবাবু শ্যামাচরণ মজুমদার বি এল ২॥
" দ্বারকানাথ মজুমদার ১৲
" রামচন্দ্র মজুমদার ২॥
" বৃন্দাবন বিহারী মজুমদার ২॥
মৌলবী এলাই উদ্দিন ২॥
শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব সেন ২॥

Registered No. 109.

JNA'NA'NKURA

OR

THE SEED OF KNOWLEDGE,

A MONTHLY ANGLO-VERNACULAR MAGAZINE AND REVIEW

OF

LITERATURE, PHILOSOPHY, SCIENCE, HISTORY, BIOGRAPHY, ANTIQUITIES, AND RESEARCHES, POLITICS, ARTS, COMMERCE, &c. &c.

জ্ঞানাঙ্কুর।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদিসম্বন্ধীয়
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—ঃ।ঃ—

সূচী।

কলিকাতা ঃ

বহুবাজার, ছিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিস্থিত ৫২ সংখ্যক ভবনে,
স্মিথ এণ্ড কোর যন্ত্রে, শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৭৯।

৬৪

জ্ঞানাঙ্কুর।

—:০।০:—

মাসিক পত্র।

১ ম খণ্ড। বৈশাখ ১২৮০ ৮ ম সংখ্যা।

স্বর্ণলতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

—:০০:—

এই বলিয়া শ্যামা ত্রস্তগতি অগ্রে চলিয়া গেল, বিধু পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর মধ্যে যাইতেছেন। দালানে ঠাকরুণদীদীকে দেখিতে পাইয়া হাস্যবদনে কহিলেন ঠাকরুণদীদী যে! "আজ্ কি সুপ্রভাত! কোন্ দিক্‌কার রবি কোন্ দিকে উদয়! কোন্ জন্মের পুণ্যবলে আজ্ তোমাকে দেক্‌তে পেলাম?" ঠাকরুণদীদীকে বিধুভূষণ এই প্রকারেই সম্বোধন করিতেন। ঠাকরুণদীদীও শুনিয়া আহ্লাদে আটখানা হইতেন। ঠাকরুণদীদী মনে করিলেন বিধুও তাঁর জালে পড়িয়াছে। কিন্তু বিধু বস্তুতঃ যে সে জালে পড়েন নাই, সেই কারণেই হউক্, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, ঠাকরুণদীদী কথা কহিলেন না। মুখ ফিরাইয়া রান্না ঘরের মধ্যে গেলেন। বিধুও ঠাকরুণদীদীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া রান্নাঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন ঠাকরুণদীদী রন্ধন করিতেছেন। পূর্ব্ববৎ হাস্যবদনে বিধু কহিলেন "কি সৌভাগ্যের বিষয়! আজি ঘরে স্বয়ং লক্ষ্মী উপস্থিত। ঠাকরুণদদী ইহাতেও কথা কহিলেন না। তখন বিধু কহিলেন "ঠাকরুণদীদী অনুগত ভৃত্যের উপর কি এত দয়াশূন্য হওয়া উচিত! কথা কও নইলে শাপ দেবো যেন জন্মান্তরে তুমি পুরুষ হও!"

ঠাকরুণদীদী তথাপি কথা কহিলেন না। তখন বিধুভূষণের সন্দেহ উপস্থিত হইল। ভাবিলেন ইহার কোন গূঢ় মর্ম্ম থাকিবেক সন্দেহ নাই। চিন্তাকুলচিত্তে নিজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন সরলা অধোবদনে বসিয়া রোদন করিতেছেন। যাহারা অধিক লেখা পড়া জানে না তাহারা শোক দুঃখে অত্যন্ত বিমোহিত হয়। ইতিপূর্ব্বে যাত্রার দলে বাজাইয়াছেন, বলিয়া বিধুর আর আনন্দের সীমা ছিল না। কিন্তু সরলাকে ক্রন্দন করিতে

দেখিয়া তাঁহার চিত্ত এককালে আর্দ্র হইয়া গেল। ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন 'সরলা তুমি কাঁদিতেছ কেন'?

বিধুভূষণকে দেখিয়া সরলার শোকাগ্নি দশগুণ প্রজ্বলিত হইল। কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাক্য নিঃসরণ হইল না।

বিধুভূষণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন 'গোপাল কোথায়, তার তো কোন অসুখ হয় নাই? আমাকে শীঘ্র বল কাঁদিতেছ কেন?' বিধুভূষণের আশঙ্কা হইয়াছিল পাছে গোপালের কোন অনিষ্ট ঘটিয়াছে। সরলা মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন 'গোপাল ভাল আছে সে খেলা করিতে গিয়াছে।'

বিধু। 'তবে তুমি কাঁদিতেছ কেন'?

সরলা উত্তর করিলেন 'আজি আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন।

বিধু কহিলেন 'পৃথক্! কে পৃথক্ করিয়া দিল?' বিধু স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, তিনি যে দাদাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, সেই দাদা তাহাঁকে পৃথক্ করিয়া দিবেন। এজন্য হঠাৎ পৃথক্ শব্দ শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল সরলা জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন।

সরলা কহিলেন 'হাঁ পৃথক্। প্রথমতঃ ঠাকুরুণদীদীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, পরে ঠাকুর কাছারি যাবার সময় নিজে বলিয়া গেলেন।'

"কি বল্লেন?"

সরলা। 'ঠাকুর বল্লেন, আজি গোয়ালে রেঁদে খাও, তার পর কাল একটা ঘর দেখে শুনে দেব।'

বিধু জিজ্ঞাসিলেন 'এর কোন কারণ আছে—না বিনা কারণে পৃথক্ করিয়া দিলেন?'

সরলা আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। বিধু শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু ভাবিলেন "দাদা এ সমস্ত না জানিতে পারিয়াই পৃথক্ করিয়া দিয়া থাকিবেন। অতএব দাদা বাটী আসিলেই সমুদায় তাঁহাকে জানাইব। তাহা হইলে আবার পূর্ব্ববৎ হইবেক।" কিন্তু দাদা যে গুরুমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তো বিধুভূষণ জানেন না।

ক্ষণকাল পরে দাদা আসিলেন। বিধুভূষণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। 'দাদা আজ এ নূতন বন্দবস্ত কেন?'

শশিভূষণ কহিলেন 'নূতন বন্দবস্ত কি'?

বিধু। 'শুনিলাম তুমি না কি আমাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছ?'

শশী। আমি তোমাদের পৃথক্ করিলাম-না তুমি আমাদের পৃথক করিলে?

বিধু। "সে কি দাদা স্বপ্ন দেখিতেছ না কি?" (বিধুভূষণ কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া উত্তর করিলেন) শশিভূষণ কহিলেন "তবু ভাল যে স্বপ্ন দেখিতেছি বলিলে, মাতাল বল নাই এই পরম সৌভাগ্যের বিষয়।"

বিধুভূষণ কহিলেন 'এমন করিলে আর তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিনা।'

শশিভূষণ। "কি কথা বলিবে বল।

বিধু। "এমন কিছু না, তবে কি না উভয় পক্ষ শুনিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য।"

শশী। "তাঁর মানে এই যে আমি যাহা শুনিয়াছি সব মিথ্যা।"

বিধু। "সুতরাং।"

শশী। "তোমারই কথা যে সত্য তারি বা প্রমাণ কি!"

বিধু। "যারা সেখানে ছিল তারাই বলিবে।"

শশী। "থাকিবার মধ্যে ঠাকুরুণদীদী সেখানে ছিলেন। তিনি যা বলিলেন সমুদায় আমি যা শুনিয়াছি তার সঙ্গে মিলে গেল।"

বিধু। 'তবে আর তার কথাই নাই, ঠাকুরুণদীদীর কথা তো আর মিথ্যা হবার নয়?,

—ঃ।ঃ—

সপ্তম অধ্যায়।

—ঃ—

'যেখানে ভাই ভাই সেখানে ঠাঁই ঠাঁই।'

শ্যামা যে যথার্থই বিধুভূষণকে ডাকিতে গিয়াছিল, বিধুর তাহা প্রত্যয় হয় নাই। তিনি মনে করিলেন শ্যামা যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল, পথে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে বলিয়া একটা কথা কহিল। আস্তে ব্যাস্তে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বাহির বাটীতে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ভিতরে প্রবেশ করিলেন কেহই নাই। রান্না-ঘরের দ্বারে দাড়াইয়া দেখিতে পাইলেন ঠাকরুণদীদী পাক করিতেছেন। বিধু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "আজি কি সুপ্রভাত! স্বয়ং লক্ষ্মী ঘরে বিরাজমান।" বিধু ঠাকরুণদীদীকে এই রূপেই সম্ভাষণ করিতেন। ঠাকরুণদীদীও তাহাতে কখন তুষ্ট ভিন্ন রুষ্ট হইতেন না।

আপাততঃ ঠাকরুণদীদী কথা কহিলেন না। বিধু কহিলেন 'তৃষিত চাতক বাক্য সুধা যাচিঞা করিতেছে; কথা কহিয়া তৃষ্ণাদূর কর"। ঠাকরুণদীদী তথাপি কথা কহিলেন না মুখ ভারি করিয়া রহিলেন। বিধু যাত্রার দলে বাজাইয়া সে দিবস পরমাহ্লাদিত ছিলেন। ঠাকরুণদীদীর মুখভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য না করিয়া করপুটে কহিলেন "দীন জনকে কষ্ট দেওয়া মহতের উচিত নহে। তবে যদি আমার কোন দোষ হইয়া থাকে, ব্যবস্থা তো পোড়েই আছে। অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজীর আছি, ভুজ-পাশে বাঁধি কর দণ্ড।"

ঠাকরুণদীদী তথাপি কথা না কহায় বিধুর মনে সন্দেহ জন্মিল। শ্যামা তাঁহাকে ডাকিতে গিয়াছিল তাহাও স্মরণ হইল। মনে করিলেন শ্যামার কথা কাল্পনিক নহে। অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নিজের গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরলা তাঁহার কথা শুনিয়াই দুঃখে ও ভয়ে অশ্রুপাত করিতেছিলেন। সরলাকে তদবস্থ দেখিয়া বিধুর যেন কণ্ঠা-বরোধ হইয়া আসিল। মুহূর্ত্ত অগ্রে হাসিতে ছিলেন, হাসি দূর হইল, সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "গোপাল কোথায়? গোপাল কোথায়? সে ভাল আছে তো"?

সরলা কহিলেন 'গোপাল পাঠশালায় গিয়াছে, ভয় নাই গোপাল ভাল আছে।'

বিধু। 'বিপিন, কামিনী?'

সর। "বিপিনও পাঠশালায় গিয়াছে। কামিনী কোথায় খেলা কর্‌ছে।'

বি। "তবে তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?'

সর। 'ঠাকুর আমাদের পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন।'

বিধু। "এই কথা? এরি জন্যে এত কাণ্ড? কে বোল্‌লে দাদা আমাদের পৃথক্ করিয়া দিয়াছেন।' বিধুর বোধ হইল যেন ইহা অপেক্ষা আর কিছুই বেশী অসম্ভব হইতে পারে না।

সরলা কহিলেন। 'প্রথমে ঠাকুরুণ-দীদীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, পরে কাছারি যাবার সময় ঠাকুর নিজে বলিয়া গেলেন।'

"কি বলিলেন।"

'কাছারি যাবার সময় আমাদের আজকার মতন গোয়ালে রাঁদিতে কহি-লেন, পরে কাল একটা ঘর দেখিয়া দিবেন।'

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসিলেন "কেন পৃথক করিয়া দিলেন?"

সরলা উত্তর করিলেন 'আমিতো আর কিছুই জানি না। বোধ হয় সেই মনহারীর দোকানের কাছে যে কথা হইয়াছিল তাহাতেই রাগ করিয়া-ছেন।' এই বলিয়া সরলা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বর্ণন করিলেন। বিধুভূষণ শুনিয়া হাসিয়া কহিলেন 'এর আর ভয় কি? দাদা বাড়ী এলেই চুকে যাবে। বোধ হয় তিনি সমুদায় কথা শুন্তে পান নাই। শুন্তে পেলে এমন কাজ তিনি কখনই করিতেন না। এর জন্যে আর ভাব্‌না কি?'

সরলা স্বামীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন 'মা দুর্গা করুন্ যেন তাই হয়। তোমার মুখে ফুল চন্নন পড়ুক।'

বিধু। 'ফুল চন্নন পরে পড়িবে আ-পাততঃ আমার মাথায় তো একটু তেল জল পড়ুক। কালি রাত জেগে বড় অসুখ হইয়াছে। তেল দাও স্নান করে আসি।'

বিধুভূষণ স্নান করিতে গেলেন। সরলা কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া ঠাকরুণ দীদীকে রন্ধন কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য রন্ধনশালায় গমন করিলেন। প্রমদা সরলাকে রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে দে-খিয়া শ্যামাকে ডাকিয়া উচ্চৈস্বরে জি-জ্ঞাসা করিলেন "শ্যামা সকলে মিলে আবার রান্নাঘরে কেন গেলেন? আমা-দের রান্নাঘরে আর কারুকে গিয়া কাজ নাই।" শ্যামা তৎকালে বাটী ছিল না। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি। প্রমদা যাহার উপর রাগ করিতেন তাহার সহিত কথা কহিতেন না, কিন্তু বলিতে হইলে শ্যামাকে সম্বোধন করিয়া কহি-তেন।

প্রমদার কথা শুনিয়া সরলা রান্নাঘর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নিজ গৃহে আসিলেন। শ্যামা বাটী আসিল এবং রান্নাঘরে ঠাকুরুণদীদীকে দেখিয়া সরলার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বলি আজ কি তোমার ছুটী? ঠাকুরুণদীদীকে একটীন দিয়াছ না কি?'

শ্যামার মুখে সদাই হাসি। হাসিতে২ সরলাকে উল্লিখিত প্রশ্ন করায় সরলা কহিলেন "শ্যামা তোর কি আর সময় নাই। যখন তখনি হাসি?"

" হাস্‌বো না, কি তোমার মতন বোসে কাঁদ্‌বো ? কার জন্যে আমি কাঁদবো ?" এই কথা কহিতে কহিতে শ্যামার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল এবং চক্ষে এক বিন্দু বারিও দেখা দিল। শ্যামা— যেন লজ্জিত হইয়া—মুখ ফিরাইয়া বসিল।

সরলা কহিলেন শ্যামা 'আমাদিগকে পৃথক্‌ করিয়া দিয়াছে, ঠাক্‌রুণদিদী ওদের জন্যে রাঁদছে। আমাদের আজি কি হবে ভাবিতেছি।'

শ্যা। 'পৃথক্‌ করিয়া দিয়াছেন ?'

স। 'হাঁ' এই বলিয়া শ্যামার নিকট প্রাতঃকালের ঘটনার পরিচয় দিলেন।

শ্যামা পুনরায় হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল 'তবে আমি কোন্‌ দিগে যাব ? ভাগ্যি আমি বাবুদের মা নই। মা হলে তো আমার গঙ্গা পাওয়া ভার হত। কিন্তু সাজার দাসীর কি হয় তাতো জানিনে। হাঁ খুড়ীমা জান কি কি হয় ?'

সরলা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন 'তোর আর হাসি আমার ভাল লাগে না। দুদণ্ডকাল কি তুই না হেসে থাক্‌তে পারিস না ?' সরলার কথা শেষ না হইতে হইতেই বিপিন ও গোপাল পাঠশালা হইতে বাটী আসিল। গোপাল আসিয়া সরলার নিকট 'মা কি খাব বলিয়া' উপস্থিত হইল। সরলা অঞ্চল দিয়া গোপালের মুখের কালি পুছিয়া দিয়া কহিলেন 'একটু দেরি কর খাবার দেব এখন।' বিপিন মায়ের নিকট একটি সন্দেশ পাইল। প্রমদা সন্দেশটি বিপিনের হাতে দিয়া কহিলেন 'এই খানে বসিয়া খাও। না খেয়ে বাইরে যাইও না।' বিপিন তাহা শুনিবে কেন ? সন্দেশ পাইবা মাত্রেই ঘরের বাহিরে আসিয়া গোপালকে ডাকিল। গোপাল বাহিরে আসিয়া দেখিল বিপিন সন্দেশ খাইতেছে সন্দেশটি দেখিয়া জিজ্ঞাসিল 'দাদা আমারে একটু দেবে ?'

বিপিন উত্তর করিল 'না ভাই, দিলে মা বক্‌বে।'

গো। 'মা কেন বক্‌বে। আমি যখন যা পাই তোমাকে দি তাতে তো আমার মা কিছু বলে না।'

বিপিন। "আমি ভাই এখন দিতে পারবো না। আমি বড় হলে দেবো।"

গো। 'আমিই কি চিরকাল ছোট থাক্‌বো। বড়ো হলে আমি তোমার কাছে আর চাব না।' এই কথা কহিতে কহিতে উভয়েই রান্নাঘরের নিকটে গেল। বিপিন এদিক্‌ ওদিক্‌ চাহিয়া দেখিল কেহ কোন খান হইতে দেখেতেছে, না তখন সন্দেশটি ভাঙ্গিয়া একটু গোপালের হাতে দিতে গেল। ঠাকরুণদিদী রান্নাঘর হইতে দেখিতে পাইয়া কহিয়া উঠিলেন বিপিন বিপিন, থাক। আমি দেখতে পাচ্ছি। মাকে বলে দেব এখন।'

বি। তুমি কি বলে দেবে, আমিতো কারুকে কিছু দিনাই। 'এই বলিয়া গোপালকে না দিয়া সন্দেশ টুকু নিজ মুখে নিক্ষেপ করিল। গোপাল ম্লানমুখে মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিল। শ্যামা ইত্যবসরে দোকান হইতে একটি সন্দেশ আনিয়াছিল। গোপাল আসিবা-মাত্রেই তাহার হাতে দিল। গোপাল

হৃষ্টমনে সন্দেশ খাইতে খাইতে বিপিনের সঙ্গে গিয়া মিশিল। বিধুভূষণ স্নান করিয়া বাটী আসিলেন। শশিভূষণও কাছারি হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া বিধু আপাততঃ তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। শশিভূষণ স্নানাহ্নিক সমাপন করিলেন। পাকশাক প্রস্তুত করিয়া ঠাকরুণদীদী স্নান করিয়া শশিভূষণকে আহার করিতে ডাকিলেন। অন্যান্য দিবস আহার করিতে যাইবার সময় শশিভূষণ বিধুকে ডাকিয়া যাইতেন, অদ্য একাকী গম্ভীর ভাবে আহার করিতে গেলেন। আহারান্তে নিজ গৃহে পান তামাক খাইতেছেন, এমন সময় বিধুভূষণ তথায় গিয়া বসিলেন। মনে করিলেন দাদাই অগ্রে কথা কহিবেন। এই ভরসায় ক্ষণেক বসিয়া রহিলেন। কিন্তু দাদার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না। তখন বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন 'দাদা আমাকে নাকি পৃথক্ হইতে বলিয়াছেন?

শশিভূষণ কহিলেন, 'হঁা আর একত্র থাকিয়া কলহ বিবাদ বরদাস্ত হয় না যদি পৃথক্ হইলে ঝকড়ার শেষ হয়, এই ভাবিয়াই পৃথক্ হইতে বলিয়াছি।'

বিধু। 'কাহার দোষে ঝগড়া হয় সেটা অনুসন্ধান করিয়া দেখ্‌লে ভাল হয় না কি?'

শ। 'তাহা না দেখিয়াই কি আমি পৃথক্ হইবার কথা বলিয়াছি?'

বি। 'তুমি কি শুনিয়াছ? আমি কি শুনিতে পাই?'

শ। 'পাবি না কেন? কাল এক জন মনহারী দোকান নিয়া আসিয়াছিল, ঠাকরুণদীদীর কাছ থেকে দুটা পয়সা ধার করিয়া বিপিনকে আর কামিনীকে দুটা বাঁশী কিনিয়া দেয়। ছোট বৌমা তাতে বল্লেন দীদী একটা পয়সা ধার দেবে আমি সুদ দেব। এটা কি ভাল কথা হইয়াছে? আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি।'

বি। 'আগে ভাল———'

শ। 'চুপ কর আগে আমার কথা শেষ হউক, পরে যা বলিবার থাকে বলিও। পয়সা ধার চাওয়ায় ওদের কাছে পয়সা ছিল না কিন্তু তা না বলে ও বল্লে একটা পয়সা ধার' তার আর সুদ কি? তার উত্তর হলো এই, কেন তুমিত মহাজনী করিয়া থাক। আমি একটা কথা বলি—আমি যে কারুকে লক্ষ্য করিয়া বলছি তা নয়—আমি দুজনকেই বলছি—এই যে, ধার কর্জ্জ করা হয় এর শোধ কি কেহ বাপের বাড়ী থেকে পয়সা আনিয়া দিয়াছেন?

বিধুভূষণের এতক্ষণ পুনর্ম্মিলনের আশা ছিল, কিন্তু শশিভূষণের শেষ কথা শুনিয়া সে সব আশা ভরসা দূর হইয়া গেল। তিনি কহিলেন 'তুমি যা বল্লে তা মিথ্যা নয় কেউ বাপের বাড়ী থেকে কিছু পয়সা আনে না। কিন্তু ঘটনাটী তুমি যেরূপ শুনিয়াছ তাহা সত্য নহে।' এই বলিয়া সরলার নিকট তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিলেন এবং কহিলেন "ইহাই সত্য।"

শশী। "তার প্রমাণ কি?"

বিধু। "প্রমাণ আবার কি? এতো

সকলেই জানে।

শশী। " সেখানে ঠাকরুণদীদী ছিলেন। আমি তাঁর কাছে সমুদায় শুনিয়াছি। তোমারি কথা মিথ্যা তাতে টের পাওয়া গেল।"

বিধু। 'কে বল্লে আমার কথা মিথ্যা?'

শ। "ঠাকরুণদীদী। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, ঠাকরুণদীদী তো আর দুমাস ছমাসের পথ তফাৎ নয়। রান্নাঘরে আছেন ডেকে জিজ্ঞাসা কর।"

বিধু। " আর আমার জিজ্ঞাসা করিবার দরকার নাই। " ঈষৎ হাস্য করিয়া " ঠাকরুণদীদী যা বলেছেন তা তো মিথ্যা হবার নয়। " এই বলিয়া বিধু উঠিয়া চলিলেন। দুয়ার পর্য্যন্ত না যাইতে যাইতে শশিভূষণ তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। কহিলেন 'আজতো পৃথক্ খাওয়া গেল। কালি তোমাদের একটা রান্নাঘর কেবল দেখ, আর বিষয় আশয় পাঁচজন লোক ডেকে ভাগ করিয়া দেব।'

বিধু। " লোক ডেকে দরকার কি? আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ করিব না। তুমিতো সব জান। যা আমাকে দেবে আমি তাই নেব। এই বলিয়া বিধুভূষণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রমদা এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। বিধুভুষণ চলিয়া গেলে কহিলেন "দেখেছ একবার অহংকারটা? তুমি এক কথা বলেছ, তা নয় দুট মিষ্টি করিয়া তোমার অনুনয় বিনয় করুক্। তা নয়।"

শশীভূষণ করিলেন। " ও অহঙ্কার আর কদিন থাকিবে। শীঘ্রই সব সারিয়া যাবে এই বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

—০ঃ০—

অষ্টম অধ্যায়।

—।ঃ—

"চিরদিন কখন সমান না যায়।"

ইংরাজি ১৮৫৫ সালের পৌষ মাসের ১৩ই তারিখে ঠিক দুই প্রহরের সময় যদি কেহ কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতার রাস্তায় হাঁসখালির নিকট উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষ মুলে একটী পথশ্রান্ত পথিককে দেখিতে পাইতেন। দূর হইতে পথিকের বয়স ৩৫ বৎসরের ন্যূন বোধ হইত না কিন্তু নিকটে গিয়া দেখিলে তদপেক্ষা অন্ততঃ ৭।৮ বৎসর ন্যূন নিশ্চয়ই বোধ হইত। মস্তকে দুটি একটি পক্ক কেশ দেখা যাইত, কিন্তু তাহা বয়োবৃদ্ধি হেতু নহে। মুখশ্রী ম্লান ও চিন্তাকুল। দেখিবা মাত্রেই জানিতে পারা যাইত, চিন্তায় পথিককে যৌবনেই বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। পথিকের পায়ে এক জোড়া ৫।৭ জায়গায় তালি দেওয়া জুতা। তাহাও ধুলায় আবৃত। পায়ের হাঁটু পর্য্যন্তও ধুলি। পরিধান একখানি অর্দ্ধ মলিন থানের ধুতি, গায়ে একটি তালি দেওয়া জামা। জামাটি পূর্ব্বে পশমি কাপড়ের ছিল, কিন্তু কালে দুর্দ্দশা বশতঃ লোমহীন হইয়াছে। জামার উপর

একখানি তেহাতা মার্কিনের চাদর। পথিকের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি জলশূন্য হুকা, একটি কলিকা ও একগাছি বাঁশের ছড়ি ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে।

'চিরদিন কখন সমান না যায়' বিধুভূষণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, তিনি কখন এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইবেন। পাঠকবর্গ! বৃক্ষমূলে আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত বিধুভূষণ তাহা কি আর বলার প্রয়োজন আছে? কিন্তু আপনারা যদি তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিতেন এবং পরে বৃক্ষমূলে তাঁহার সহিত দেখা হইত, ইহা হইলে এ ব্যক্তি যে সেই তাহা কখনই বুঝিতে পারিতেন না। বিধুভূষণের আর সে বাঁকা সিঁতি নাই, সে কম্ফরটার নাই, সে সব নূতন নূতন ফ্লানেল বা বনাতের জামা নাই, সে সালের জোড়া নাই ফরস্ ডাঙ্গার ধুতি নাই, সে পশমের হাপষ্টকীং নাই, সে মনূটীতের জুতা নাই, সে প্রফুল্ল মুখমণ্ডল নাই, সে মুহুর্মুহুঃ হাসিও নাই। পূর্ব্বের কিছুই নাই। সকলি গিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া আপনারা বিধুকে ঘৃণা করিবেন না। এখনও বিধুর যাহা আছে বোধ করি তাঁহার ন্যায় দুরবস্থায় পড়িলে অনেকের থাকে না। বিধুর অন্তঃকরণে সারল্য কোথাও যায় নাই। নির্ম্মল চরিত্রেও এত দুঃখেও কোন মলিনতা স্পর্শ হয় নাই।

পাঠকবর্গ! আর একটী কথা। এই কথাটা কি! আপনারা কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আপনারা আট আনা পয়সায় এই পুস্তকখানি খরিদ করিয়া অনেকেই মনে করিবেন যে আপনাদিগের বহু যত্নের তাম্রখণ্ডের বিনিময়ে খানকতক লেখা কাগজ পাইলেন মাত্র। কিন্তু সেটি যে কত দূর ভ্রান্তিমূলক তাহা বলা যায় না। ঐ আট আনার পয়সায় পুস্তকখানি পাইলেন এমন নহে, কিন্তু আমাদের মাথা কিনিয়া লইলেন। আমরা আপনাদের ক্রীতদাস হইলাম। আর জো কি যে আপনাদিগকে একটা কথা বলি। আমরা মানব প্রকৃতিকে নিন্দা করিব, মনুষ্য মাত্রেই মিথ্যাবাদী, রিপুপরতন্ত্র, স্বার্থপর ইত্যাদি বলিব কিন্তু পাঠকবর্গ আপনারা চিরকালই "সহৃদয়" "শান্ত" "গুণগ্রাহী" ইত্যাদি, যেন আপনারা অন্য কোন এক জগতের লোক এ জগতের মনুষ্যস্বভাব যেন আপনাদের স্বভাব নহে। "রজতের কি আশ্চর্য্য শক্তি" যদি আট আনায় এত খোসামদ পাওয়া যায় তবে কেন আপনারা সময়ে সময়ে সে আট আনা খরচ করিতে কুণ্ঠিত হন? পক্ষান্তরে সেই আট আনা পাইলে আমাদের যারপর নাই উপকার হয়। আর এই জ্ঞানাঙ্কুর তাহা হইলে তিন দিনেই জ্ঞান-অশ্বত্থ বৃক্ষ হইয়া উঠে। যাহা হউক সে সব কথার স্থান এ নহে। দুঃখের সময় হাসি ভাল লাগে না।

বিধুভূষণ বৃক্ষমূলে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন "কোথায় যাই?" "কার কাছে আমার দুঃখ জানাই? কেই বা আমার কথায় বিশ্বাস করিবে?"

শশিভূষণের সহিত পৃথক হইয়া দিন কতক সচ্ছন্দে ছিলেন। পরে, যখন দোকানে ধার বন্ধ হইল তখন

বন্ধুবর্গের নিকট কর্জ্জ করিলেন। দিন কতক পরে তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইল। তখন আজ ঘটীটি, কাল গহনাখানি, পর দিবস ভাল জামাটি বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে প্রত্যহ দুসন্ধ্যা আহার বন্ধ হইল। কি করেন? আর এক পয়সাও নাই। পরিবার ৪টি, নিজে, সরলা, গোপাল ও শ্যামা। পৃথক্ হইবার সময় শ্যামা বিধুভূষণের দিগে আসিয়াছিল। এক সন্ধ্যা আহার করিয়াও তাহার সরলার সহিত থাকিবার স্পৃহা নিবৃত্তি হয় নাই। এক দিবস মলিন বসন প্রযুক্ত বিধুভূষণ বাহির হইতে পারেন না। শ্যামাকে ধোপার বাটী পাঠাইয়া দিলেন। কাপড় আসিলে পরিয়া আহার অন্বেষণে যাইবেন। ধোপা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রমদাকে দেখিতে পাইল। দেখিয়া ক্ষণকাল তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন "চৈতন' 'কার কাপড়'? রজকের নাম চৈতন।

রজক উত্তর করিল "ছোট বাবুর কাপড়, কাপড় ময়লা হইয়াছে বাহির হইতে পারেন না, তাই তাড়াতাড়ি এই একখান ধুতি আর একখান চাদর সাজ করিয়া আনিলাম।

প্রমদা কহিলেন "কাপড় অভাবে বেরতে পারেন না, তবু বাবু, আর বেশি থাকিলে না জানি আর কি পদবী হতো।"

রজক। "সে সব আপনারা জানেন, আমি তার কি জানব?

প্রমদা। "চৈতন কত করে মাইনে পাও?"

চৈতন। "বৎসরে ছয় টাকা হিসাবে দেবার কথা আছে।"

প্র। "দেবার কথা আছে। আজু পাও নাই?"

চৈ। "কৈ আর পেলুম! আজি কালি করে এই এক বৎসর হলো, এই সময়ে ধান, চাল্ সস্তা ছিল, টাকা কয়টি পেলে কিছু কিনে রাক্তুম। যাই আজ আবার চাইগে দেখি কি বলেন।"

প্র। "চাবি সুদ্ধ না আদায় কর্বি?"

চৈ। "না দিলে কেমন করে আদায় করিব?"

প্র। "আমার পরামর্শ শুনিস্ তবে আদায় হয়।"

চৈ। "শুন্বো, বলুন।"

প্র। "তুই কাপড় হাতে করে রেখে গিয়ে বল আজি টাকা না পেলে কাপড় দেব না। যদি দেয় ভালই, নইলে বলিস্ যে কাপড় ধোয়াবার পয়সা দিতে পারে না তার এত বাবুয়ানা কেন?"

চৈ। 'তা বলিলে যদি রাগ করেন?!'

প্র। 'ওঁর রাগে তোর ভয় কি?' যদি তাতে টাকা না পাস্ যাবার বেলা আমার কাছ দিয়া যাস, আমি তোকে আপাতত দু টাকা ধার দেব এখন।

রজক প্রথমতঃ শঙ্কিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রমদার উৎসাহ বাক্যে তার শঙ্কা দূর হইল। একে ছোট লোক তাতে নগদ দুটাকা ধার পাইবার আশা রহিল। রজক বাটীর ভিতর গিয়া দেখিল সরলা দ্বারে বসিয়া আছেন।

চৈতন কহিল "এই কাপড়তো

আনিলাম, কিন্তু আজি আমাকে কিছু খরচ না দিলে চলে না।”

সরলা কাতরস্বরে কহিলেন ‘চৈতন তুমি আজি যাও, কালি আইস। রাজবাটীতে উনি আজ যাবেন সেখানে নিশ্চয়ই কিছু টাকা পাইবেন। কালি তুমি আসিলে কিছু খরচ পাইবে।’

চৈতন। “আজ আমার নৈলে নয়।”

সরলা। “চৈতন আজ হাতে কিছু ছিল না বলিয়া আমাদের সকালে খাওয়া হয় নাই, থাকিলে কি তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা কই?”

সরলার হাতে দুগাছা পিতলের বালা ছিল। রজক তাহা সুবর্ণ মনে করিয়া কহিল “যার পয়সা অভাবে খাওয়া চলে না, তার হাতে আবার সোণার গয়না কেন?”

চৈতনের কথা শুনিয়া সরলার মুখ চোক লাল হইল, কিন্তু তখনি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন “চৈতন! সেই আশীর্ব্বাদ কর যে, হাতের বালা সোণার হউক। সোণা কি আর আছে! একে একে সকলি বিক্রী হইয়াছে। এদুগাছি পেতলের। এই কথা কহিতে কহিতে সরলা আর চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না। অঞ্চল দিয়া চক্ষু পুঁছিয়া ফেলিলেন। রজক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাপড় খানি রাখিয়া তথা হইতে আস্তে ২ চলিয়া গেল। যাইবার বেলা আর প্রমদার কাছে গেল না।

ধোপা চলিয়া যাইতে যাইতে শ্যামা পাড়া হইতে ‘কৈগো ছোট গিন্নি কি করছো?” বলিতে বলিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সরলা কহিলেন “শ্যামা তোর কি হিসেব কিতেব নেই? অত চেঁচাচ্ছিস এখনি গোপাল জাগবে?

শ্যামা কহিল ‘জাগলেই বা, দিনে ঘুমান কেন?’

সরলা। ‘তুই যেন থেকে ২ অজ্ঞান হোস, এখন জাগলে সে যখন খাব খাব করিবে তখন কি দিবি?’

শ্যামা। ‘আমি তার যোগাড় করিয়া আসিয়াছি।’ এই বলিয়া শ্যামা কতক গুলি কলা, সসা, আর চারটি চাইল কাপড়ের ভেতর হইতে বাহির করিল।

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন ‘শ্যামা এ কোথায় পেলি?’

শ্যামা। ‘তাতে তোমার কাজ কি?’

শ্যামা যখন ঘরে কিছু না থাকিত পাড়ায় গিয়া কারু বাড়ী কোন কর্ম্ম কাজ করিয়া আসিবার সময় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহার্য্য জিনিস আনিত। এই রূপে বিধুভূষণের ঘরে কিছু না থাকা সত্ত্বেও গোপালকে কখন উপবাস করিতে হয় নাই। এবং সময়ে ২ সকলেরই খাবার আনিত। যদি কাহার বাটী কিছু না পাইত শ্যামার পূর্ব্বের সঞ্চিত বেতন হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ খরচ করিত।

গোপালের উপর শ্যামার স্নেহ দেখিয়া সরলা কহিলেন ‘শ্যামা তুমিই যথার্থ গোপালের মা?’

শ্যামা হাসিয়া কহিল ‘তবে তুমি কি হবে? গোপালের পিসি?’

সরলা সাশ্রুনয়নে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ‘শ্যামা ও আমার গর্ভে হয়েছিল বটে, কিন্তু তুমিই ওকে

বাঁচালে। শ্যামা আমার মাথায় যত চুল তুমি তত কাল বাঁচিয়া থাকিবে।'

শ্যামার সরলহৃদয় একেবারে দ্রব হইয়া গেল। উভয়ে সজলনয়নে গোপালকে গিয়া জাগাইলেন।

বিধুভূষণ বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজবাটী গেলেন। যে বাবু বিধুকে সাহায্য করিবেন বলিয়াছিলেন, তিনি আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। যে সমস্ত ভৃত্য নিকটে ছিল, তাহা দিগকে বাবুর নিকট খবর দিতে কহিলেন। কিন্তু কেহই বাবুকে জাগাইতে ভরসা করিল না। তাদের মধ্যে এক জনের নাম রামা। বিধুভূষণ তাহাকে আর আর দু এক জন অপেক্ষা একটু ভাল মানুষ জ্ঞানে কহিলেন 'রাম আজি আমার আহার হয় নাই। বাবুকে যদি একবার খবর দাও তবে বিশেষ উপকার হয়।'

রামা কহিল 'তুমি কে ঠাকুর একেবারে যে বিরক্ত করেই মারলে?

বিধু কহিলেন 'রাম, অদ্য আমার আহার হয় নাই।

রাম। 'তোমার আহার হয় নাই তার আমার কি? অমন কত লোকের আহার হয় না; আর একটি পয়সা পেলেই শুঁড়ির দোকানে যায়।'

বিধু ঈষৎ রাগ করিয়া কহিলেন 'হাঁরে আমাকে দেখে কি গুলিখোর বোধ হয়?'

রামা কহিল। 'তার আমি কি জানি। এখন বকাইও না ঠাকুর। গরজ থাকে ঐখানে বসে থাক। যখন বাবু উঠবেন তখন দেখা হবে। এখানে চোক রাঙ্গানি ভাল লাগবে না। তোমার ত কেউ চাকর এখানে নাই।'

রামার মিষ্ট কথা শুনিয়া বিধুভূষণের স্মরণ হইল আর সেকাল নাই। ছল ছল নেত্রে গৃহের এক কোণে একখান টুলের উপর বসিয়া রহিলেন। রামা ও অন্যান্য ভৃত্যগণ নিদ্রা যাইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা আগতপ্রায় হইল। রাজবাটী বিধুভূষণের বাটী হইতে ২॥ ক্রোশের কম নহে। অন্ধকার রাত্রি। সাত পাঁচ ভাবিয়া বিধুভূষণ চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গৃহের অভ্যন্তর হইতে 'রামা রামা' শব্দ হইল। বাবু জাগিলেন। বিধুভূষণ একটু অপেক্ষা করিলেন

রামা নিদ্রিত। কিন্তু অন্য এক জন চাকর জাগরিত ছিল। পাছে রামার উত্তর না পাইয়া বাবু তাহাকে ডাকেন এজন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সে রামাকে জাগাইয়া দিল। রামা চোক মুছিতে মুছিতে 'আজ্ঞা যাই' বলিল।

রাম যাইবার সময় বিধুভূষণ কহিলেন 'রাম বাপু আমার কথাটা বলো একবার।'

রামা গৃহের কোণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল 'তুমি এখনও আছ ঠাকুর.

বাবু রামাকে কহিলেন 'আজি শনিবার মনে আছে ত? শ্যাম বাবু, রাম বাবু আর আর সকলে আস্‌বেন তার যোগাড় আছে ত।'

যোগাড় আর কি? ওই পাঁচ বোতল পোর্ট আছে, আর এক বোতল সেরি আছে।'

বাবু। 'এক বোতল সেরি কিরে? তিন বোতল ছিল যে?' রামা তার দুবোতল পার করিয়াছে বাবু তার বিন্দু বিসর্গও জানেন না।

রামা 'ঐ জন্যেই তো আমি ওসব জিনিস রাখতে চাইনে। সে দিন যে পাঁচ বোতল গেল আপনি তো তার হিসাব রাখেন না।'

বাবু। 'সেদিন পাঁ—চ বোতল গেল?'

রামা। 'আজ্ঞা গেলই তো?'

বাবু। 'তবু তো শ্যাম বাবু বাপের ভয়ে আর মাথা মুড়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করার ভয়ে বেশি খায় না।' জানালা দিয়া বৈঠকখানার দিকে দৃষ্টি করিয়া ও আবার কে?

রামা। 'ও এক ঠাকুর এসেছে। আপনি নাকি ওকে কিছু দিবেন কথা ছিল, তাই নিতে এসেছে। বলছে ওর আজ খাওয়া হয় নাই।'

বাবু।' ওকে আজ যেতে বল' বল আমার ব্যামহ হইয়াছে। কালি যেন বৈকালে আসে।'

রামাকে আর আসিয়া বলিতে হইল না। বিধুভূষণ বাহিরে বসিয়াই সমুদায় শুনিতে পাইয়াছিলেন। শুনিয়াই প্রস্থান করিলেন।

বাবু বিধুভুষণকে আপনা হইতেই ভরসা দিয়াছিলেন। তাহার নিকট হইতে নিষ্ফল আসিতে হইবেক বিধু কখনই মনে করেন নাই এজন্য বাবুর কথা শুনিয়া তিনি একেবারে ভাবনায় ম্রিয়মান হইলেন। কি করেন দুঃখে বাটী ফিরিয়া আসিয়া সরলাকে সমুদায় পরিচয় দিলেন। সরলা কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্যামা যে চাউল কিঞ্চিৎ আনিয়াছিল সরলা তাহা খরচ করিলেন না। পরদিন গোপাল সকালে উঠিয়া কি খাইবে এই চিন্তা করিয়া সেগুলি প্রাতের জন্যে রাখিলেন, আপনারা উপবাস করিয়া রহিলেন।

প্রমদা কোনরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে বিধুভূষণের ঘরে সে দিবস উনন জ্বলে নাই। এজন্য সন্ধ্যার পর বারাণ্ডায় দাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ও শ্যামা, শ্যামা, বলি আজ তোদের কি রান্না হলো?"

শ্যামা উত্তর করিল, 'যা বিধি মাপিয়াছিলেন তাই হলো?'

প্রমদা। সে কি? এক দিন তো সাবেক মুনিব ব'লে চাট্টী খেতেও বল্লিনে?

শ্যামা। 'আমার বলতে হবে কেন কপালে থাকলে আপনিই হবে।'

বিধু জিজ্ঞাসা করিলেন কিরে শ্যামা?—কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস?

শ্যামা। বড়গিন্নি আমাদের কি রান্না হয়েছিল জিজ্ঞাসা করছেন?

বিধুভুষণ শ্যামার কথা শুনিয়া জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। সরলাকে কহিলেন 'দেখলে আচারটা দেখলে? চণ্ডালেরও এরূপ ব্যবহার নয়। যাই দেখি দাদার কাছে, তিনি কি বলেন শুনে তাই দেখি।'

সরলা কহিলেন 'না আর কোন খানে গিয়া কাজ নাই, ওঁর যা হয় বলুন। ওসব কথায় কাণ না দিলেই হলো।'

ঘরে গোল শুনিয়া প্রমদা জি-

জ্ঞাসা করিলেন 'ও শ্যামা তোমার ঘরে অত গোল কিসের। বলি কারুকে নেমন্তন্ন করেছিস নাকি।'

বিধু সরলার প্রতি। 'শুন্‌লে শুন্‌লে মাগির আক্কেল্‌টা শুন্‌লে?' এই বলিয়া 'বসিয়াছিলেন উঠিলেন।'

সরলা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন 'ছি ওসব কথা বলো না। হাজার হউক তবু গুরু লোক তো তার আর সন্দেহ নাই।'

বিধুভূষণ কহিলেন 'ও কিসের গুরুলোক? আমি চল্লাম। দাদাকে বলিগে দেখি তিনি কি বলেন।' এই বলিয়া সরলার হস্ত হইতে নিজ হস্ত জোরে মুক্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'দাদা দাদা' বলিয়া বিধুভূষণ শশিভূষণের ঘরের দিগে চলিলেন। প্রমদা কৃত্রিম ভয় প্রদর্শন করিয়া অগ্রে অগ্রে দৌড়িয়া গিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কহিলেন ওই দেখ তোমার ভায়া মদ খেয়ে আমাকে মার্‌তে আস্‌ছে।'

শশিভূষণ বিধুভূষণের কথা শুনিয়া কহিলেন "কেও?"

বিধু কহিলেন 'আমি। দাদা এর একটা বিচার করিতে হবে। বউ যা মনে আসে তাই বলে আমাদের ঠাট্টা করিতেছেন।'

প্রমদা। 'ঐ দেখ মদ খেয়েছে। মদ না খেলে অমন মাতালের মতন বক্‌বে কেন?'

শশিভূষণ রাগত হইয়া কহিলেন "ওসব মাতলামি আমার কাছে খাটবে না। যাও গে শুয়ে থাক, যদি কিছু বলিবার থাকে কালি শুনিব।'

বিধু। 'মাত্‌লামি টা আবার কি? আমি মাতাল না তুমি মাতাল?'

শশী। 'কি? তুই আমাকে মাতাল বল্লি। বেরো আমার বাড়ী থেকে। অমন করবি তো যে ঘর দিয়াছি তাও কেড়ে নেবো।'

বিধু। 'ঘর দিয়াছি-ই-ঘর ভিক্ষা দিয়াছেন আর কি?'

শশী। 'ক্রোধে কম্পমান হইয়া কহিলেন' তবু ওই খানে দাঁড়াইয়া মাত্‌লামি করিতে লাগ্‌লি? হ'রে এই মাতালটাকে নে থানায় দিয়ে আয়-তো।'

বিধু। 'হ'রে আসবে কেন, তুমি এস না?'

এই কথা শুনিবা মাত্র শশিভূষণ দ্বার উৎঘাটন করিয়া কাপড় পরিতে পরিতে বাহিরে আসিলেন। রাগ হইলেই তাঁহার কাপড় খুলিয়া যাইত। সরলা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া বিধুভূষণের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। তাহা না হইলে একটা হাতাহাতি হইত তার সংশয় ছিল না।

বিধুকে গৃহমধ্যে আনয়ন করিয়া সরলা গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বিধুভূষণ ক্ষণকাল আরক্ত-লোচনে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন 'সরলা আর এবাটীতে থাকার প্রয়োজন নাই। আমি আর এবাটীতে ত্রিরাত্রি বাস করিব না।'

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "কপালে যা আছে তা ভোগ করিতেই হবে। আর কোথায় যাবে? বাড়ী থাকিলেও আমার একটা ভরসা থাকে। সে যা হউক কালি হবে, এখন

কান্না ত্যাগ কর। চোক মুছিয়া ফেল। মিথ্যা কাঁদলে কি হবে।'

বিধুভূষণ কহিলেন "একটা কথা বল্‌ব সরলা বিশ্বাস করবে? আমি নিজের জন্যে একবিন্দুও দুঃখ করি না। আমার সকল কষ্ট তোমার জন্যে আর ঐ ছোঁড়ার জন্যে। যদি তুমি আমার হাতে না পড়তে তা হলে তোমার এত কষ্ট সহিতে হতো না।

এইকথা শুনিয়া সরলা পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণ দুঃখ পাইলেন। ঝর ঝর বাস্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কণ্ঠ রোধপ্রায় হইয়া আসিল। কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন বাক্য নিঃসরণ হইল না। নিজের অঞ্চলদ্বারা স্বামীর চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

বিধুভূষণ হস্ত ধরিয়া সরলাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন "সরলা আর কষ্ট বাড়াইও না। তুমি যদি অত ভাল না বাসিতে আমার দুঃখে অত দুঃখিত না হইতে, যদি অন্য স্ত্রীলোকের মত আমার সহিত বিবাদ করিতে, তাহলে আমার কখনই এত দুঃখ হইত না। এত দিন কিছু বলি নাই, এখন বলি। তুমি আমাকে নিজে থেকে এক একখানি গয়না যখন বিক্রী করিতে দিয়াছ, তখন আমার মনে হয়েছে যেন আমার এক এক অঙ্গ ছিঁড়িয়া গেল। কি করি না বেচিলে নয় তা বেচেছি। মাথার উপর ঈশ্বরই জানেন, সে গহনা বেচে ভাত খাওয়া আমার পক্ষে যেন প্রতি গ্রাসে কালকূট ভোজন করা হইয়াছে। কিন্তু যদি তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক গয়নাগুলি নিজে না দিতে, তা হলে বোধ হয় আমার কখনই এত কষ্ট হইত না। এখন এক কথা বলি সরলা তুমি বাপের বাড়ী দিন কতকের জন্যে যাও। আর শ্যামাও অন্যত্রে কোন খানে যাউক। এখানে থেকে সে গরিব কেন কষ্ট পায়?"

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন 'আমি বাপের বাড়ী গেলে যদি তোমার কষ্ট নিবারণ হতো তাহলে বাপের বাড়ী কেন আমি যেখানে ইচ্ছা সেই খানে যাইতে পারি। কিন্তু তোমাকে এ অবস্থায় রেখে আমি স্বর্গে গেলেও সুখী হবো না। যখন মনে হবে যে তুমি হয়তো অনাহারে আছ, তখন কেমন করে আমার মুখে অন্ন উঠ্‌বে। তবে গোপালের জন্যে মাঝে মাঝে যেতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু গোপাল তো আজ উপস করে নাই। ওর যতদিন উপস করিতে না হয়, ততদিন আমি তোমাকে ছেড়ে কোন খানেই যাব না। কিন্তু শ্যামার কথা যা বল্লে তা করা উচিত, ও কেন আমাদের সঙ্গে থেকে কষ্ট পায় আর গঞ্জনা সহ্য করে?

বিধুভূষণ শ্যামাকে ডাকিলেন। শ্যামা অন্য সময় এক ডাকে তিন উত্তর দিত, কিন্তু আজ কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে আসিল। শ্যামার চক্ষু লাল মুখ ভার।

বিধুভূষণ কহিলেন "শ্যামা আমরা বিবেচনা করিয়া স্থির করিলাম, তোমার আর আমাদের কাছে থেকে কষ্ট পাওয়া উচিত নয়। তোমার মাইনে পাওয়া দূরে থাকুক, দুসন্ধে খেতেও পাও না। অতএব তুমি অন্য কোনাস্থানে যাও। যদি পর-

মেশ্বর দিন দেন, তখন আবার আসিও। বিধুভূষণ আর কথা কহিতে পারিলেন না, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল অধোবদনে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল ‘আমি কি মাইনে চেয়েচি? না মাইনে নেবো বলে এসেছি, আমার টাকার দরকার কি। এক কথা এই আমি গোপালকে ছেড়ে থাক্‌তে পরবো না। আমি যদি ভার্‌ বোঝা হইয়া থাকি তোমাদের এখানে আমি খাব না, কিন্তু গোপালকে ছেড়ে আমাকে থাকতে বলো না

বিধু কহিলেন “শ্যামা কেঁদো না, স্থির হও। আমি যা বলচি ভাল করিয়া বুঝে দেখ। আমাদের সহিত থাকা আর উপবাস একই কথা। গোপালকে না দেখে তুমি থাকতে পার না সত্য, কিন্তু আর কোন বাড়ীগেলে সেখানেও ছেলে পিলে পাবে। আবার সেখানে একবার মন বসলে আর কোন জায়গায় যেতে ইচ্ছা হবে না।”

শ্যামা। ‘ছেলে পিলে পাব সত্য, কিন্তু আমার সেটির মতন আর কোন খানে পাব না।” শ্যামা এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

বিধু। “শ্যামা স্থির হও স্থির হও।”

শ্যামা কহিল ‘গোপালের মতন আমার একটি ছেলে ছিল। আদর করে আমিও তাঁর গোপাল নাম রেখেছিলাম। এখানে থাকলে আমার গোপাল যে নেই তা আমি ভুলে যাই। আমি এখান থেকে কোন খানেযাব না।”

বিধুভূষণ সজলচক্ষে সরলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন “ইহার উপায় ?” সরলা অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্যামা কহিল। “আমার কিঞ্চিৎ টাকা আছে। মনে করিয়াছিলাম গোপালকে দিয়া যাইব। কিন্তু আমার কথা যদি শুন তবে এক পরামর্শ আছে (বিধুর প্রতি) তুমি কোন যাত্রার দলে কাজ লইতে চেষ্টা কর। পাইবেই পাইবে তার আর সন্দেহ নাই। আর তত দিন আমরা ঘরে থেকে এই টাকায় চালাই। এর পর সচ্ছল হয় আমার টাকা দিও। দিলে গোপালেরি থাক্‌বে।

শ্যামার সকরুণ বচনে সরলা ও বিধু উভয়েই দ্রব হইয়া গেলেন এবং তাহারি পরামর্শ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন।

পর দিবস প্রাতে শ্যামার টাকা হইতে রাস্তার খরচ স্বরূপ ৫্‌ টাকা লইয়া বিধুভূষণ বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। কলিকাতায় যাইবেন স্থির করিয়া কলিকাতার রাস্তা ধরিলেন এবং মধ্যাহ্নকালে মার্ত্তণ্ডতাপে পীড়িত হইয়া গাছ তলায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন। বাদ্য গীত ভাল বটে, কিন্তু যাত্রার দলে থাকাটা বড় নীচ কর্ম্ম। বিধুভূষণ চিন্তা করিতেছেন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে কি না, এমন সময় এক জন পথিক তথায় উপস্থিত হইল।

নবম অধ্যায়।

মিত্রলাভ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে যে পথিকের কথা বলা হইয়াছে, সে কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, অপেক্ষাকৃত কৃশ। বয়স ৩২। ৩৩; বাম করে তামাকসাজা কলিকাসহ হুকা, বাম স্কন্ধ হইতে একখানি ময়লা বস্ত্রাবৃত একটি বেহালা ঝুলান, দক্ষিণ করে এক গাছি তলতা বাঁশের ছড়ি, পায়ে জুতা নাই, একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান। কটিদেশ হইতে গলা পর্য্যন্ত অনাবৃত, মস্তকে চাদর একখানি পাগড়ী করিয়া বাঁধা, কোমরে একটি ক্ষুদ্র বোচ্‌কা। এই অবস্থায় পথিক যখন বিধুভূষণের নিকট গিয়া ছড়ি গাছি রাখিয়া বসিলেন, তখন তাহার কলেবর উত্তম কালিতে লেখা একটি জীবিত ওয়ার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বিধুভূবণ অনন্যমনে নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, সুতরাং পথিকের অগ্রসর হওয়া ও নিকটে আসিয়া বসা টের পান নাই। কিন্তু হঠাৎ হুকার টান শুনিয়া সেই দিগে চাহিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন পথিক বৃক্ষ হইতে সেই দণ্ডে নামিয়া আসিল। চমকিয়া জিজ্ঞাসিলেন 'তুমি কে?'

পথিক, বিধুভূষণ ভয় পাইয়াছেন বুঝিয়া উত্তর করিল "আমি মানুষ ভয় কি? ব্যাচার খুড়ী যে বলেছিল রাত্রি নদী পার হয় দিনের বেলা কাগের ডাকে মূর্চ্ছা যায়, তুমি যে তাই কল্লে। একা বিদেশে আস্‌তে পার, আর মানুষ দেখে ভয় পাও

বিধুভূষণ পথিকের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "ঠিক কথা কিন্তু আমি তো ভয় পাই নাই। তোমার নাম কি?'

পথিক উত্তর করিল "আমার নাম নীলকমল, বাড়ী বাঘমারা, ফকীরচাঁদ জুগীর ছেলে আমি। আমরা শিবনাথ চৌধুরির ব্রহ্মোত্তরের প্রজা।'

নীলকমলের বেশি কথা কহা একটা রোগ ছিল। বিধুভূষণ তাহার কথা শুনিয়া তাহার বুদ্ধির দৌড় টের পাইলেন। আরও অধিক কথা শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসিলেন শিবনাথ চৌধুরি কে?'

নীলকমল বিস্ময়াত্মক স্বরে কহিলেন 'শিবনাথ চৌধুরি কে!' তাহার বিশ্বাস ছিল শিবনাথের মতন ধনী আর দ্বিতীয় নাই।

বিধু। 'হাঁ শিবনাথ কে? আমি তো জানি না।'

নীল। 'শীবনাথেরা আগে রাজা ছিল। বরগীর হ্যাংগামে রাজত্তি যায়, কিন্তু এখনও তাঁরা খুব বড় মানুষ। তুমি তাঁদের নাম শোন নি, এ বড় আশ্চর্য্য কথা।'

বিধু "হবে' বলিয়া চুপ করিলেন। নীল কমল অনেকক্ষণ হুকা টানিয়া, হুকাটীর মুখ বাম হস্ত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বিধুভূষণের পানে ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'তোমরা আপনারা?'

বিধুভূষণ হাসিয়া কলিকাটি লইয়া কহিলেন 'ব্রাহ্মণ।'

বিধুভূষণ তামাক খাইতে খাইতে

জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কোথায় যাইতেছ ?'

নীলকমল উত্তর করিল 'আর কোথায়! পয়সার চেষ্টায়! দুঃখের কথা কি কব? আমরা তিনি ভাই, আমার দাদার নাম মথুর,আমর ছোটভায়ের নাম টেনা। তারা কিছুই করে না। সকলেই আমি যা আন্‌বো তাই খাবে। একা মানুষ তাঁত বুনে আর সংসার চালাতে না পেরে এখন বিদেশে বেরুয়েছি। পাঁচকোড়ের মা বলতো দেশের কোণা আর বিদেশের সোণা। দেখি বিদেশে কত সোণাই আছে।'

নীলকমল বড় প্রবাদ বাক্য প্রয়োগ করিতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে গুলি প্রায়ই অসংলগ্ন হইত।

নীলকমলের কথা শুনিয়া বিধুর পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা অতি কষ্টকর হইল। কিন্তু নীলকমল দুঃখ করিয়া যাহা বলিতেছে তাহাতে হাসা অনুচিত মনে করিয়া কহিলেন, 'বিদেশে কত সোণা আছে দেখ্‌তে চাও কিন্তু দেখ্‌তে যে পাবে তাহার প্রমাণ কি?'

নীলকমল দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেহালাটি উঠাইয়া বিধুভূষণকে দেখাইয়া কহিলেন 'গুণ! গুণ না থাকূলে বলি। বাবুরামের আশীর্ব্বাদে আমার আর অন্নের চিন্তা নাই।'

বিধু জিজ্ঞাসিলেন 'বাবুরাম কে?'

নীলকমল। 'বাবুরাম আমার ওস্তাদ। ওস্তাদজীর আশীর্ব্বাদে আমার আর দুঃখ নেই। এখন বড় মানুষ হওয়াই বাকী।'

বিধু মনে করিলেন "হতেও পারে, নীলকমল একজন ভাল বেহালাদার; কিন্তু কথা বার্ত্তা শুনে তো তার কিছু বোধ হয় না। একবার পরীক্ষা করা যাউক। 'পরে প্রকাশে কহিলেন 'একবার বাজাও দেখি?'

নীলকমল অবিলম্বে বেহালাটি খুলিয়া দুই চারি বার তাহার কাণ মোড়া দিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। মাথা এমনি দুলিতে লাগিল যে, বিধুর বোধ হইতে লাগিল নীলকমলের মৃগী রোগ উপস্থিত হইল, চক্ষু ঘুরিতে লাগিল, এবং সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু অতিকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন 'তুমি গাইতে পার!'

নীলকমল হাঁ বলিয়া বোহালার গত ছাড়িয়া দিয়া, গান ধরিল, এবং বেহালার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও আরম্ভ করিল'

'পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে'
পদ্মবনে আমি যাব,
আনিয়ে নীলপদ্ম সে নীল পদ্ম চরণ-
পদ্মে দিব।'

গান শুনা দূরে থাকুক নীলকমলের হাব ভাব, মুখভঙ্গী দেখিয়া বিধু আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। নীলকমল তদ্দর্শনে রাগত হইয়া গীত বাদ্য বন্ধ করিয়া কহিল 'দাদাঠাকুর বলে ছিল নীলকমল! বেনা বনে মুক্তা ছড়াইওনা। তোমরা এর কি বুঝবে! থাক্‌ত যদি বাবুরাম ওস্তাদ কি কালীনাথ জুগী তবে তারা বুঝতে পারত। ছেলে মানুষের মত হাসলে হয় না। গোবিন্দ অধিকারী আমাকে ১০ টাকা

মাইনে দিতে চেয়েছিল, আমি যাই নি, কত খোসামোদ তা না।

প্রথম প্রথম নীলকমলের বেহালায় হাত মন্দ ছিল না। গোবিন্দ অধিকারী মনে করিয়াছিল ভাল শিক্ষা পাইলে নীলকমল ভাল হইতে পারে এজন্য পাঁচ টাকা বেতন দিয়া নিজের সঙ্গে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। নীলকমল তদবধি মনে করিল সে একজন তান সান হইয়াছে। আর কাহাকে তৃণজ্ঞান করিত না। যে সকল বোল শিখিয়াছিল তাহার মধ্যে নিজের টিপ্‌নি প্রবেশ করাইল, মাথা কাঁপান ধরিল, মুদ্রাদোষ সংগ্রহ করিল এবং অন্যান্য নানা কারণ প্রযুক্ত অল্প দিনের মধ্যেই একজন অসহনীয় বাদ্যকর হইয়া উঠিল। গোবিন্দ অধিকারী যে নীলকমলকে সঙ্গে রাখিতে চাহিয়াছিল সেই নীলকমলের শনি হইল। নীলকমল তদবধি লেখা পড়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল। ‘লেখা কি?’ নীলকমল কহিত, ‘লেখা কলম দিয়া আকর (অক্ষর) বের করা, আর বাজনা কাঠের ভেতর থেকে কথা বের করা। লেখা ইচ্ছা কল্লে সকলেই শিখ্‌তে পারে, কিন্তু বাজনা শিখতে মা সরস্বতীর বিশেষ করুণা চাই। ’ এই অবধি তাঁত বোনাও ত্যাগ করিল। পূর্ব্বে সন্ধ্যার পর একটু একটু বাজাইত, গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াবধি সমস্ত দিন বেহালা ভিন্ন আর কিছুই নীলকমলের সহিত দেখা যাইত না। মথুর পাড়ার লোকের গাভী দোহন করিত এবং প্রতি গরুতে দুই আনা বেতন পাইত। যে দিন বেতন গুলি আনিয়া বাটী রাখিত, নীলকমল অবিলম্বে চুরি করিয়া লইয়া একটী নূতন বেহালা কিনিত। উপায়ান্তর না দেখিয়া মথুর নীলকমলকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। নীলকমল গমন কালে বলিয়া গেল তোরা মুড়ী মিশ্রীর সমান দর কল্লি। কিন্তু আমি যে কত বড় একটা লোক তা তোরা টের পেলিনে এই দুঃখ। ভাল আমি চল্লাম আমি ফিরে এলে তোরা যদি আমার দুয়ারে বসে কাঁদিস তা একমুট অন্ন দেবে না।’

বিধুভূষণ নীলকমলকে সান্ত্বনা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার বিবাহ হইয়াছে নীলকমল?

নীলকমল অতি অহঙ্কার সত্ত্বেও মন্দ লোক ছিল না, এজন্য একটু হাসিয়া উত্তর করিল ‘না।’ একটা সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিতে পার?’

বিধু। ‘চেষ্টা না করিলে কেমন করে বলিব। কিন্তু আপাততঃ তুমি কোথায় যাইতেছ?

নীলকমল। ‘কলিকাতায় গোবিন্দ অধিকারীর কাছে যাইতেছি। সে ৪।৫ বৎসর হইল আমাকে ১০ টাকা করিয়া মাইনে দিতে চেয়েছিল। তার পর আমি কত শিকিছি। দু এক সময় বাবুরাম ওস্তাদও আমার কাছে এখন লজ্জা পান। এখন ২০ টাকা না হয় ১৫ টাকা মাইনে তো পাবই। তার ৫৲ টাকা খাব আর ১০ টাকা বাঁচাব। এক বৎসরের মধ্যেই বিয়ে করতে পারবো। কেমন পারবো না?’

বিধুভূষণ নীলকমলের প্রফুল্লতা দর্শন করিয়া প্রথমতঃ আহ্লাদিত

হইলেন। মনে করিলেন " পাগলের মনে সদাই সুখ বলে তা বড় মিথ্যা নয়। এর অবস্থা আমারি মতন দেখিতেছি, বেশীর মধ্যে আমি যথার্থই ভাল বাজাইতে পারি, এ নির্জ্জলা (undiluted) মূর্খ তবু কলিকাতায় গেলেই ১৫ টাকা বেতন পাইবে ইহার দৃড় বিশ্বাস আছে। হায়! আমি যদি এর মতন চিন্তাশূন্য হইতে পারিতাম। ' কিন্তু আবার এই ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। ' নীলকমল দেখিতেছি কখনই বাটীর বাহির হয় নাই। নৈরাশ কাকে বলে জানে না। ইহার যে চাকরি হইবে এ স্বপ্নের অগোচর। যখন টের পাবে যে চাকরি হইল না, তখন আর এর দুঃখের সীমা থাকিবে না। ক্ষণকাল এই প্রকার চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন 'নীলকমল তুমি আর কখন বিদেশে গিয়াছিলে ?

নীলকমল কহিল 'না' বিধুভূষণ জিজ্ঞাসিলেন 'তুমি কেমন করে তবে একা কলিকাতায় যাবে, কে রাস্তা বলে দেবে ?'

নীল। 'রাস্তার লোকে রাস্তা বোলে দেবে। ফটিক ঘরামী বল্‌তো অল্প খড় দিয়ে জল পড়া বেশী খড় দিয়ে বন্ধ কর্‌তে হয়। আমিও তেমনি করবো। পথের লোক দিয়ে পথ চিনে নেবো।'

বিধুভূষণ মনে করিলেন 'আমি একাকী ইহাকে সঙ্গে লইলে হয়, কিন্তু নিজের খরচের অপ্রতুল ইহাকে আমার খেতে দিতে হলে তো যাতে ৫ দিন চল্‌বে তা দুদিনে শেষ হইয়া যাইবেক।' কিয়ৎ কাল ভাবিয়া জিজ্ঞাসিলেন 'নীলকমল তুমি যে কলিকাতায় যাবে কিছু খরচ পত্র এনেছ।'

নীল। 'খরচ পত্রের মধ্যে এই বেহালা। সকলেই তো আর তোমার মতন বাজনা শুনে হাসে না। রাস্তায় যদি একজন গুণি লোক পাই তো ৫ দিনের যোগাড় করে নিতে পার্‌বো। যে পদ্মআঁখির গানটা শুনে তুমি হাসলে কত লোক উই শুনে কেঁদেছে।'

বিধু। 'আমি তো তোমার গানে হাসি নাই। তোমার মাথা নাড়া দেখে হাসি এলো।'

নীল। 'যদি তুমি গান বাজনা জান্‌তে, তবে অমন কথা বল্‌তে না। তালের সময় তাল না দিয়ে কি কেউ থাকুতে পারে? গেইয়ে বেজেয়ে লোকের সহিত দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে দেখো।'

বিধু। 'তা জিজ্ঞাসা করা যাবে। কিন্তু আমি আর এক কথা ভাবচি। আমিও কলিকাতায় যাইতেছি। চল দুই জনে একত্র হইয়া যাই।

নীল 'তা হলে তো ভালই হয়, কিন্তু একটা বন্দবস্ত আগে করা ভাল। আমি বাজারে গেয়ে যেখানে যা পাব তুমি তার ভাগ পাবে না।'

বিধুভূষণ সহজেই সম্মত হইলেন। অতঃপর উভয়েই বৃক্ষমূল হইতে প্রস্থান করিলেন, নীলকমল ঘুন ঘুন করিয়া পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে 'গাইতে গাইতে আর বিধুভুষণ ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে।

নীলকমল পদ্মআঁখির গানটা বড়ই ভাল বাসিতেন এবং এতই গাইতেন যে, যদি গানটী কোন জড় পদার্থ

হইত তবে পাষানের মত কঠিন হইলেও ক্ষয় হইয়া যাইত।

বিধুভূষণ অনেকক্ষণ নীরবে গমন করিলেন; পরে নীলকমলের ঘুন ঘুন স্বরে গান আর বর্দ্ধাস্ত করিতে না পারিয়া তাহার মন অন্য বিষয়ে সংযোগ করিবার জন্য জিজ্ঞাস্তা করিলেন 'নীলকমল তুমি কোন গল্প জান?'

নীলকমল। 'হাজার হাজার'।

বিধুভূষণ। 'একটা বল দেখি?'

নীল। 'সে সব ভূতের গপপ। 'এখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, এখন তাহা বলিবার সময় নয়। সন্ধ্যা ব্যালা ভূতের আর বাঘের গল্প কল্লে ওদের দৌরাত্তি বাড়ে।' এই বলিয়া নীলকমল বুকে থুথু দিয়া, পুনর্ব্বার কহিল চোগেও বাকই একথা বলেছে, সে সামান্যি লোক নয়। তার সঙ্গে ৩। ৪টা ভূত চাকর হয়ে ফেরে।'

বিধুভূষণ কহিল ভয় কি? তুমি তো একুলা নও আমি সঙ্গে আছি। দুজনের কাছে ভূত আইসে না।'

'না ঠাকুর, তুমি বোঝ না। ওসব কথা এখন বন্ধ কর।'

নীলকমল পুনরায় ঘুন ঘুন করিয়া 'পদ্মআঁখি' ধরিল। বিধুভূষণ নিরুপায় হইয়া কহিলেন "নীলকমল, আমি ব্রাহ্মণ আমাকে ভূতে কিছু করিতে পারবে না তা তো জান? তুমি আমার চাদর ছুঁয়ে একটা গল্প কর।"

নীলকমল তথাপি অসম্মত। ঘুন ঘুন করিয়া 'পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে' ইত্যাদি। বিধু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কিছু বলিতে পারেন না। পরিশেষে স্থির করিলেন ভয় দেখাইয়া নীলকমলকে চুপ করাইবেন। প্রকাশে কহিলেন 'নীলকমল চুপ করিয়া চল, এখানে বড় চোর ডাকাতের ভয়। মানুষ চলিতেছে টের পাইলে এখনি আসিয়া যা কিছু আছে কেড়ে কুড়ে নিয়ে যাবে।'

নীলকমল উত্তর করিল 'আমার আর চোরের ভয় কি? কি আছে যে নেবে। তোমার যদি কিছু থাকে তুমি সাবধান হও।' এই বলিয়া পুনরায় "পদ্মবনে আমি যাব" ইত্যাদি।

বিধু কহিলেন ' নীলকমল চোরের ভয় যদি না কর ঐ দেখ একটা কি আসছে। বোধ হইতেছে ওটা ভূত। '

রাস্তার অপর দিক্ হইতে লম্বা শাদা দাড়ী আওলা মুসলমান আসিতেছিল। নীলকমল দেখিয়া কহিল "তাও তো বটে। ওটা কি? ওর মাথারদিগে শাদা, নিচে কাল। রাম, রাম" বলিয়া বিধুর হাত ধরিল। নীলকমল আর এক পাও চলিবে না।

বিধু। "দাড়াইয়া থাকিলে কি হবে। চল যাই; ভূত যদি হয় তবে আমাকে দেখে চলে যাবে। আমি যেখানে আছি তোমার ভয় কি?'

নীল। "ও আগে চলে যাউক পরে আমরা যাব। আজ আর রাত্রে চলে কাজ নাই। চল এক বাড়ী গিয়া অথিত হই।" আর পদ্মআঁখি গাই।

'তোমার ইচ্ছা হয় গিয়া অতিথ হও, আমি বাজারে গিয়া থাকিব' এই বলিয়া বিধু নীলকমলকে ছাড়াইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

বিদ্যা বিড়ম্বনা।

-:০:০-

(*Contributed by a graduate of the Calcutta University*)

বিদ্যা বিড়ম্বনা এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? অনেকে পাঠ না করিয়াই অনাদর করিবেন। কিন্তু আমাদের একান্ত অনুরোধ একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ভাল হয়।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে সমতা এ পৃথিবীতে একটি সুখের প্রধান কারণ। যাহার অবস্থা প্রতিবেশিগণের তুল্য; প্রতিবেশীর মধ্যে থাকা কেবল তাহারই সুখ। বন্ধুত্ব সমকক্ষ লোকের মধ্যেই থাকিতে পারে। বিখ্যাত দার্শনিক বেকন্ লিখিয়াছেন যে, যদি এ পৃথিবীতে বন্ধুত্ব থাকে তবে তাহা কেবল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোকের মধ্যেই থাকিতে পারে; কিন্তু আমরা এ মতে অনুমোদন করিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোকের মধ্যে বন্ধুত্ব বিরল। ভয় এবং ঘৃণা উভয়ই বন্ধুত্বের বিনাশক। যিনি আমাদের অপেক্ষা উচ্চ তাঁহাকে আমরা ভয় করি; যে আমাদিগের হইতে নীচ তাহাকে আমরা ঘৃণা করি। সুতরাং উচ্চের সঙ্গে নীচের প্রণয় সম্ভব-পর নহে। হইতে পারে যে বৈষম্যই পৃথিবীর নিয়ম, সমতা তাহার ব্যভিচার মাত্র; কিন্তু বৈষম্য সুখের কারণ নহে সমতাই সুখ। এই কারণেই পৃথিবীতে সুখের ভাগ এত অল্প।

যদি সমতা সুখের কারণ হয়, তাহা হইলে অন্যের অপেক্ষা বিদ্বান্ হওয়া অসুখের কারণ। প্রকৃতি তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় করেন নাই বলিয়া বিখ্যাত কবি পিট্রার্ক দুঃখ করিয়াছেন। তাঁহার দুঃখ নিতান্ত অমূলক নহে। তুমি যদি বিদ্বান্ হও, তাহা হইলে তোমাকে প্রতিপদে ভয় করিতে হইবে, উৎপীড়িত হইতে হইবে, কেহ বিশ্বাস করিবে না, এবং অবসর পাইলে অহিত সাধনেরও ত্রুটি হইবে না।

বিদ্যার প্রধান অসুখ এই যে, সাধারণ লোকে তোমার কথা বুঝিতে পারে না। তুমি যে ভাষায় আপনার মনের ভাব ব্যক্ত কর তাহা সাধারণের ভাষা নহে। তুমি যে বিষয়ে কথা কহিতে ভাল বাস তাহা সাধারণের জ্ঞানাতীত এবং অনেক সময়ে অশ্রদ্ধেয়। তোমার কথা তাহাদের পক্ষে হিব্রু; তোমার ভাব তাহাদের পক্ষে প্রহেলিকা। এই সকল দুর্গম ভাববিশিষ্ট লোকে তোমাকে এক প্রকার নূতন আশ্চর্য্য জীবের মধ্যে পরিগণিত করে, এই সকল দুর্গম ভাব লইয়া সাধারণের মধ্যে যাওয়াতে তুমি উপহাসাস্পদ হও। তোমার বহু যত্ন-সংগৃহীত ভাব, পরিপাটী, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শব্দ বিন্যাস, লোকের মনোরঞ্জনের অভিলাষ, লোককে শিক্ষা দিবার প্রাণপণ যত্ন, সকলই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ হয়। হয়েইত ইহা যে তুমি বুঝনা, অথবা বুঝিয়াও তদনুরূপ কার্য্য করিতে পার না, এই

তোমার অন্যায়। তুমি পৌষের সুদীর্ঘ রজনীতে একাকী নিভৃত স্থানে বসিয়া মস্তকের বেদনা উপেক্ষা করিয়া নিদ্রার অনুরোধ অবহেলা করিয়া প্রাণপণে শঙ্কর, সক্রেটিস, মিল ও মিল্‌টন্ প্রভৃতির নিকট হইতে যে সকল মনোহর কুসুম সংগ্রহ করিয়াছ, তাহা তোমার নিকট মধুপরিপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সাধারণের নিকটে রসহীন হইতে পারে যে তাহাতে তোমার চক্ষে জল আইসে, শরীর পুলকিত হয়, মানস উন্মত্ত হয়; কিন্তু স্বল্পাক্ষর লোকের পক্ষে তদ্রূপ নহে। সাধারণের নিকট সে সকল ব্যক্ত করিলে, তাহারা স্থির দৃষ্টিতে তোমার মুখপানে চাহিবে, সঙ্গীর প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টি করিয়া সস্মিত-মুখ হইবে, ক্রমশঃ তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে ও একটু দূরে গিয়ে বলিবে 'পাগল নাকি?' এই কি তোমার আজীবন পরিশ্রমের পুরস্কার! তুমি হয় তো আশৈশব সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, একখানি মোটা গুণচট পরিধান করিয়া, আতপ চাউল এবং কাঁচা কলা ভক্ষণ করিয়া, উগ্রস্বভাব অধ্যাপকের টোলে তিরস্কার সহ্য করিয়া সাংখ্য ও পাতঞ্জলের সূত্র অভ্যাস করিয়াছ, হায় সেই ক্লেশের প্রতিদান এই! তুমি ন্যায়, দর্শন ও সাহিত্য সাগর হইতে যে রত্ন-সংগ্রহ করিয়াছ তাহা তোমার নিকট স্পর্শমণি হইতে পারে, সে রত্ন স্পর্শে সকল ধাতুই তোমার চক্ষে সুবর্ণ হয়, কিন্তু সাধারণের পক্ষে সেরূপ নহে। তাহারা ঈশপের কুক্কুট—তোমার এদুর্লভ মহামূল্য রত্ন অপেক্ষা একটি শস্যবীজ তাহাদের চক্ষে অধিক আদরণীয়।

মনুষ্য চরিত্রের নিয়ম এই যে, যে যাহাতে বঞ্চিত সে তাহার প্রশংসা করিতে চাহে না। তুমি যাহাতে পটু, অন্যের অপেক্ষ তোমার যে বিষয়ে অধিক নৈপুণ্য আছে, তোমার চক্ষে তাহাই প্রশংসার উপযুক্ত। বিদ্যায়, ব্যবসায়ে, ক্রীড়ায়, প্রণয়ে, সকল বিষয়েই এই নিয়ম। তুমি যদি কোন সুন্দরীর প্রণয়াকাঙ্খা করিয়া বহু যত্নেও কৃতকার্য্য না হও, অথচ অপরে সে রত্ন লাভ করে, তাহা হইলে, তুমি অবশ্য আপনার মনকে প্রবোধ দিবার জন্য তাহার একটা না একটা দোষোদ্ঘাটন করিবে। নিজের অযোগ্যতা অন্যের কাছে দূরে থাক্ আপনার কাছেও কেহ স্বীকার করিতে চাহেনা। সুতরাং তুমি কোন প্রকারে প্রতিপন্ন করিবে যে, তুমি যাহার প্রণয় লাভ করিতে পার নাই, সে তোমার প্রণয় গ্রহণের যোগ্য নহে। বিদ্যার্থীর পক্ষেও তাহাই। যে রত্নলাভ করিতে পারিলাম না তাহা রত্ন নহে, জোতি-হীন, মূল্যহীন, প্রস্তর খণ্ড মাত্র, সুতরাং তাহা গ্রহণের অযোগ্য। যাহারা তোমার বিদ্যাকে মূল্যহীন মনে করে তাহারা তোমাকে প্রশংসা করিবে কেন?

সাধারণ লোকে বিদ্বানের সংসর্গ ভালবাসে না। যাহাদিগের মধ্যে আমাদের চিত্তবৃত্তি সকল স্বাধীন ভাবে ক্রীড়া করিতে পারে, মানসকে চিন্তা ভরে অবনত করিতে না হয়, রসনাকে শৃঙ্খল পরাইতে না হয়, তাহাদের সংসর্গই

লোকের আদরণীয়। যে সংসর্গে কথায় কথায় পদে পদে সাবধান হইতে হয়, সে সংসর্গ লোকের ঈপ্সিত নহে।

বিশেষতঃ সাধারণ লোকে বিদ্বানের সংসর্গে আমোদ পায় না। আমোদের নিয়ম এই যে আমরা যাহাদের আমোদ-বর্দ্ধন করিতে না পারি এবং যাহাদিগকে আমোদবর্দ্ধনে অশক্ত বলিয়াজানি, তাহাদের দ্বারা আমরাও অল্পামোদিত হই। আমার রসিকতায় যদি তুমি আমোদিত না হও, তাহা হইলে তোমার রসিকতায়ও আমি আমোদিত হইব না। যাহাদের সংসর্গে আমোদ নাই তাহাদের সংসর্গ কে চায়? প্রধান হওয়া কাহার না ইচ্ছা? মিল্‌টনের সেটান্ স্বর্গে দাসত্ব অপেক্ষা নরকে রাজত্ব ভোগ ভাল ও আদরণীয় বোধ করিয়াছিল। জুলিয়স্ সিজর রোমে দ্বিতীয় ব্যক্তি হওয়া অপেক্ষা স্পেনে প্রধান ব্যক্তি হওয়াতে অধিক সম্মান বোধ করিয়াছিলেন। এ কথা মনে মনে কে না বলে? প্রধান হইতে কাহার না ইচ্ছা? সাধ করিয়া অকিঞ্চিৎকর হইতে কে চায়? যে সংসর্গে আদর পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই, সে সংসর্গে কেহই যাইতে ইচ্ছা করেনা। উচ্চ সংসর্গে আপনার নীচত্বই সপ্রমাণ হয়, অথচ এ প্রমাণ কাহারও ঈপ্সিত নহে; সুতরাং উচ্চসংসর্গও আমাদের অভিলষিত নহে।

অনেক বিদ্বানব্যক্তি লেখনি ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, কিন্তু কথাবার্ত্তায় তাদৃশ পটু নহেন। এমন কি অনেকের কথাবার্ত্তা একেবারে নীরস, অনেকের বিরক্তিজনক, অনেকের জনসমাজে বাক্যস্ফূর্ত্তিই হয় না। পিটর কর্নেইলির কথা শুনিলে শ্রোতা বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিত না। এডিসন্ এবং ডেকার্টের ন্যায় লোকও বিরল নহে।

অন্যের ভাবগ্রহ করিতে না পারা একটি ভয়ের কারণ। যাহার স্বভাব, চরিত্র, প্রকৃতি আমরা বুঝিতে পারি না, যাহার বাক্য আমাদের বোধাতীত, তাহাকে অবশ্য আমরা ভয় করি। প্রেতের নামে আমরা যে কম্পিত হই, তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহাদের স্বভাব ও প্রকৃতি আমরা কিছুই জানিনা। যদি ইহা সত্য হয়, তবে সাধরণের মধ্যস্থিত বিদ্বানের পক্ষে ইহা কতদূর সত্য। তুমি যদিও মাতৃভাষায় কথা কও তথাপি তোমার ভাব গ্রহণ করা সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং তাহারা তোমাকে ভয় করে। তুমি লোকের সঙ্গে মিশিতে ভাল বাস না, সর্ব্বদা উপস্থিত বিষয়ে অমনোযোগী এবং অন্য বিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত ভাবনা-প্রবাহে মগ্ন ও তোমার অনেক কথার অর্থ নাই, অনেক কার্য্যের কারণ দুষ্প্রাপ্য; ইহাও ভয়ের কারণ, এবং ভয় ও ঘৃণার আকর।

সাধারণ লোকের সহিত তোমার রুচির অনেক প্রভেদ। তাহারা যাহা ভাল বলে, তাহা তোমার চক্ষে অকিঞ্চিৎকর এবং অসার। তুমি যাহা ভাল বাস তাহার ঔৎকর্ষ্য তাহারা বুঝিতে পারে না। সুতরাং সাধারণ লোক

তোমার বিপক্ষ। যদি তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাদের হাসিতে হাসিয়া, কান্নায় কাঁদিয়া, বিপক্ষতা নিরাকরণ করিতে যাও, তাহা হইলে তোমার পক্ষেই অমঙ্গল। আপনার বিদ্যা রাখিয়া যদি তাহারা যাহাতে বুঝিতে পারে তাহার চেষ্টা পাও, তাহা হইলে তোমারই অনিষ্ট। তাহাদের ঘৃণা কমিবে না অথচ ভয় কমিয়া গেল। তোমার নম্রতা তাহাদের চক্ষে কিছুই নহে। নম্রতা কাহাকে বলে তাহারা জানে না। তাহাদের নিকট নম্রতার অর্থ মানসিক দৌর্বল্য অথবা নির্বুদ্ধিতা। তাহাদের যে পরিমাণে ক্ষমতা আছে, তাহা তাহারা সাধ্যমত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে না, সুতরাং ক্ষমতা সত্বে অপ্রকাশের কারণ বোধাতীত। তাহাদের তর্ক এই রূপ:- যাহার ক্ষমতা থাকে সে প্রকাশ করিতে যত্ন করে, ইহার সে যত্ন নাই সুতরাং সে ক্ষমতাও নাই। এ সিদ্ধান্তে তাহাদের ভয়ের কারণ হ্রাস হইল, কিন্তু ঘৃণার কারণের হ্রাস হওয়া দূরে থাক্ বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এতদিন তুমি তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছ। যাহার কৌশলে আমরা প্রতারিত হইয়াছি, তাহাকে সাতিশয় ঘৃণা করি 'ঠকাইলে' কি প্রতীয়মান হয়? এই মাত্র যে যিনি ঠকাইলেন, তিনি চতুর ও বুদ্ধিমান। আর যিনি ঠকিলেন তিনি নির্ব্বোধ। তুমি যাহাকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন কর, সে তোমাকে ঘৃণা করিবে বই আর কি?

অন্তরের ভাব অবগত হইবার উপায় বাহ্যলক্ষণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে! বাহ্য আড়ম্বরই আভ্যন্তরীণ ভাবের, সামাজিক অবস্থার, ও অন্যান্য সকল বিষয়েরই সূচীপত্র। কোন অপরিচিত রাজপুত্র যদি সামান্যভাবে আমাদিগের মধ্যে আগমন করেন তবে কে তাঁহাকে সামান্য লোক না বলিয়া রাজপুত্র বলিবে! তুমি যে সম্মানে আপনার "স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে চাও তাহার দলিল কই"! সাধারণের কাছে নম্র হইলে চলিবে না। তোমার বিদ্যা কেহই দেখিতে পায়না, তোমার বাহ্যলক্ষণ সকলেই দেখে এবং লোকে যেমন দেখে তেমনি বিচার করে। স্পষ্ট জাজ্বল্যমান প্রমাণ সত্তেও অপরের গুণ কেহ দেখিতে চাহে না। আমার অপেক্ষা অন্যে শ্রেষ্ঠ ইহা স্বীকার করা মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর, তবে যেখানে স্বীকার করিবার কোনই কারণ নাই, সেখানে কেন তোমার মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া আপনার খর্ব্বতা প্রতিপাদিত করিব?

যিনি অন্যের অপেক্ষা অধিক চিন্তাশীল ও অধিক জ্ঞানী, তিনি অনায়াসেই আপনার ও অন্যের মহত্ব বুঝিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা পারে না, মহত্ব তাহাদের বোধগম্য নহে। তাহাদের বিচার-আড়ম্বর দেখিয়া তুমি ভুলিতে পার যে তুমি বিদ্বান্, কিন্তু তাহারা আপনাদের মূর্খত্ব ভুলিবে না; বিশেষতঃ তোমার সংসর্গে। সুতরাং তুমি যদি মনে কর যে, সামান্য ভাব গ্রহণ করিয়া সাধারণের মধ্যে তুমি উত্তমরূপে চলিতে পার, তবে সে তোমার ভ্রম।

সামান্য ভাব গ্রহণের এই ফল হইবে যে, তাহারা তোমাকে আপনাদের মতন প্রমাণ করিতে নিরন্তর যত্নবান্ থাকিবে। সামান্য বিষয় লইয়া তোমাকে উপহাসাস্পদ করিবার চেষ্টা করিবে। হয় ত কোন একটি বিশেষ শব্দ তুমি পুনঃ পুনঃ ব্যবহার কর—হয় ত বাক্যের সঙ্গে কোন বিশেষ অঙ্গ সঞ্চালন কর—এইরূপ অন্যান্য সামান্য বিষয় লইয়া তোমাকে উপহাস করিবে। তুমি তাহাদের রসিকতার শাণ হইলে। এদিকে তোমার গুণ কোন কাজেই লাগিল না—এ বাজারে ও দ্রব্যের দর নাই।

হিংসা, ঘৃণা, পরের ঔৎকর্ষ্যে ঔদাস্য পৃথিবীতে বিরল নহে। বিদ্যার বাহ্য সজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার অপনয়ন করিতে গিয়া, আপনার অনিষ্ট আপনি করিতেছ। যাহার যাহা কিছু আছে, সে তাহার সজ্জা করে। যাহার উত্তমবস্ত্র ও উত্তম অলঙ্কার আছে, সে তাহা অবশ্য সময়ে সময়ে পরিধান করিয়া লোককে দেখায়। তোমার থাকিলে তুমিও দেখাইতে। তুমি না দেখাও—তার অর্থ তোমার নাই।

এখন দেখা যাইতেছে যে, উভয় দিকেই বিপদ। বিদ্যা প্রকাশ করিলে তুমি অহঙ্কারী—না করিলে মূর্খ—সুতরাং বলিতে হইল বিদ্যা বিড়ম্বনা। মানসিক শক্তি শারীরিক শক্তির ন্যায় নহে। তোমার শরীরে অধিক বল থাকিলে তোমার অপেক্ষা হীনবল ব্যক্তিকে আপন আয়ত্ত করিতে পার। কিন্তু চিত্তসম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। এসম্বন্ধে যাহারা দুর্ব্বল, সবলের উপর তাহাদের কোনই ক্ষমতা নাই। যাহারা তোমার সদৃশ তাহাদের উপরই তোমার ক্ষমতা। তুমি সাধারণ লোক অপেক্ষা এত অধিক জান যে, তুমি কোন প্রকারেই তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিবে না। তোমার কথা তাহারা না বুঝিলে তোমার বশবর্ত্তী হইবে কেন? তবে তাহাদের উপর তোমার ক্ষমতা জন্মিল কই? তুমি যে পরিমাণে বিদ্বান্, সাধারণের সহিত তোমার সেই পরিমাণে প্রভেদ। এড্‌মণ্ড্ বর্ক যে বক্তৃতা করিতেন, তাহা সুতীক্ষ্ণ যুক্তি পরম্পরাসম্বদ্ধ এবং বিলক্ষণ সারবতী। কিন্তু তাঁহার প্রখরতার ফল কি? এই মাত্র যে, তাঁহার বক্তৃতার সময় শ্রোতৃবর্গ আসন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেন। তিনি শূন্য আসনের নিকট আপনার বক্তৃতাচাতুর্য্য প্রকাশ করিতেন। প্রথম পিটের বক্তৃতায় সকলে উন্মত্ত হইত, অথচ তাহা অন্তঃসারবিহীন। তবে বিদ্যায় তোমার লাভ হইল কি?—অনাদর।

আবার বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে পরস্পরের ঔৎকর্ষ্য বিষয়ে পরস্পরের মতবৈষম্য এবং অবহেলা। ইহার কারণও আছে। সকল বিষয়ে সমান উন্নত হওয়া মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। মনুষ্য কেবল এক বিষয়েই বিশেষ ঔৎকর্ষ্য লাভ করিতে পারেন।

"One science only will one genius fit
So vast is art, so narrow human wit."
Pope

যাঁহারা কোন বিষয়ে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অন্যান্য বিষয়ে অযত্ন করিয়া সেই বিষয়ের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন। প্রিয় বৃত্তির বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে গিয়া

অন্যান্য বৃত্তির অনুশীলন হয় নাই। আপনার উৎকর্ষ সাধন করিতে হয় ত অন্যের উৎকর্ষ বিচারের ক্ষমতা জন্মে নাই। পরের দোষগুণ বিচার করিতে হইলেই ভ্রমে পতিত হইতে হয়। এই কারণেই অনেক প্রধান ব্যক্তির মুখ হইতে ব্যক্তি বিশেষের অথবা পুস্তক বিশেষের অন্যায় নিন্দা অথবা অন্যায় প্রশংসা শ্রুত হওয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাবলে আমাদের দেশের পূজ্য, অথচ ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছিলেন।

"সাগর ডাগর বটে কিন্তু রত্নহীন"

'বঙ্গদর্শন' তাঁহার রসগ্রাহিতার অস্তিত্বেই সন্দেহ করেন। কলঙ্কের ভার মস্তকে করিয়া, নবীন বয়সে, বিদেশে, অপরিচিত লোকের মধ্যে, সংসারের অত্যাচার দগ্ধহৃদয়কে চিরদিনের মত শান্তির উৎসঙ্গে নিহিত করিলেন। মৃত্যু শয্যায় এমন কেহ নিকটে নাই, যাহাকে আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন। এমন কিছুই রাখিয়া গেলেন না, যাহা রাখিয়া যাইতেছি বলিয়া দুঃখ হয়। একি সাধারণ দুঃখ! এখন তুমি তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া হাস্যই কর আর রোদনই কর; প্রথম প্রণয়োচ্ছ্বাসের ন্যায়, সমাধিগত প্রণয়ের স্মৃতির ন্যায় মধুরই বল অথবা তুমি যাহাকে দেখিতে পারনা, তাহার প্রণয় প্রকাশের ন্যায় কর্কশই বল তাঁহার সকলই সমান। এখন যদি তুমি মেডোরার দুঃখে দুঃখিত হও, তাহা তিনি জানিবেন না—এখন যদি হেইডির বিরহে অশ্রুপাত কর, তাহা তিনি দেখিবেন না। এখন ইংলণ্ড তাঁহার নাম করিয়া গৌরব করুক্—তুমি তাঁহার লেখা পড়িয়া রোদন কর, কিন্তু তিনি কোন ফলই পাইলেন না। যে কয়দিন লোকের আদর পাইলে, তাঁহার লাভ হইত, সুখ হইত; সেই কয় দিন কেহ আদর করিল না। আর এখন আদর অনাদর তাঁহার পক্ষে সমান। অতএব স্বীকার কর যে

"The tree of knowledge is not the tree of life."

সরস্বতীর সেবকদিগের উপর লক্ষ্মীর প্রায়ই কোপদৃষ্টি দেখা যায়। এক জন কবি ব্রাহ্মণের নির্ধনত্বের কারণ স্থির করিয়াছিলেন।

"নাথে কৃতপদঘাতশ্চ লুকিত
স্তাতঃ সপত্নিকাসেবী।
ইতি দোষাদিব রোষাণ্ণাধবযোষা
দ্বিজং ত্যজতি ॥"

কারণ যাহাই হোক কথা ঠিক বটে। এই নির্ধন ব্রাহ্মণ দিগকে লইয়াই ভারতবর্ষের গৌরব। কাব্য, দর্শন, ন্যায় সকলই ইঁহাদিগের লেখনীনিঃসৃত। অন্যান্য দেশেও যাঁহারা মানসিক প্রখরতার বলে, বিদ্যার প্রভাবে পৃথিবীর পূজ্য হইয়াছেন—পৃথিবীর হিতসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয় জন সম্পন্ন লোক ছিলেন, উদরে আহার নাই—গাত্রে বস্ত্র নাই—অতি দুঃখে তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ইউরোপে কিছুদিন পূর্ব্বে কবি শব্দের অর্থ জীর্ণবস্ত্রপরিহিত আহারাভাবে শীর্ণকায় ব্যক্তি বিশেষ বুঝাইত। এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য কবিকুলগুরু হোমর নগরে নগরে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ডিসরেলি বলেন যে, ফরাসিস দেশের নৃপতি চতুর্দ্দশ লুই এক দিন

জিজ্ঞাসু হইয়া ছিলেন যে সাহিত্য সাম্রাজ্যের কোন নূতন সংবাদ আছে কি না? রেসাইন্ উত্তর করেন যে, তিনি কর্নেইলির বাটীতে এক হৃদয়বিদারক ঘটনা দেখিয়া আসিয়াছেন। কর্নেইলি মৃত্যুশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, অথচ একটু ব্রথ (Broth) পর্য্যন্ত নাই যে পান করেন। এই কর্নেইলি ফরাসিস্ দেশের একজন প্রধান কবি। এ বিষয়ে বোধ হয় অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের আবশ্যকতা নাই। জাইলগুর, সরভান্টিস, ট্যাসো প্রভৃতির নামোল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইঁহাদের দুঃখের কথা কে না জানে? এই কারণেই প্রাচীন কবিগণ পরের উপাসনা করিতে বাধ্য হইতেন। যে সময়ে পাঠার্থী লোকের সংখ্যা অল্প ছিল, সে সময়ে সম্পন্ন লোকের উপাসনা ব্যতীত লেখকদিগের আর কি উপায় দৃষ্ট হয়? অথচ বিদ্যোৎসাহীর সংখ্যা অতি অল্প—প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী বিরল। বিক্রমাদিত্য এবং মেসিনাসের ন্যায় লোক পৃথিবীতে কয় জন জন্মিয়াছেন? আবার পরের উপাসনায় কত জ্বালা। স্পেনসারের কথাগুলি মনে করুন্।

"Full little knowest thou that hast not try'd
What Hell it is in suing long to abide."

প্রভু কতদিনে কৃপাকটাক্ষ করিবেন ভাবিতে ভাবিতে মস্তক ঘুরিয়া যায়। যদি অনুগ্রহ না করেন? এই বার শোণিত শুষ্ক হইল। আবার সে অনুগ্রহের মূল্য কত।

"To fawn, to crouch, to wait, to ride, to run
To speed, to give, to want, to be undone"—Spenser.

যে হৃদয় হইতে এ কথা নির্গত হইয়াছিল সে হৃদয়ে কত দুঃখ। ধনবান লোকে যদি অনুগ্রহ করেন তাহা হইলে তাহাও অস্থির। প্রতি মুহূর্ত্তে কৃপা-রশ্মি সম্বরণ করিতে পারেন। হীরা মালিনীর কথা কি মনে লাগেনা?

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ"

যাহারা প্রাণপণে পৃথিবীর উপকার করিতে যত্ন করিয়াছেন, পৃথিবীর লোকে তাঁহাদিগকে ততই যন্ত্রণা দিয়াছে। নূতন কিছু উদ্ভাবিত করিতে না পারিলে-সমাজ মধ্যে নূতন কিছু প্রচলিত করিতে না পারিলে সমাজের উপকার করা হয় না। যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহার ফল তো পাইতেছি। যদি তাহার পরিবর্ত্তে এমন কিছু প্রচলিত করা যায় যাহার দ্বারা অল্পায়াসে অপেক্ষাকৃত অধিক ফল পাই, তাহা হইলে, সেই পৃথিবীর উপকার। অথচ মানবজাতি নূতন কিছু গ্রহণ করিতে ও আপনার ভ্রম সংশোধন করিতে এতদূর অনিচ্ছুক যে, যিনি সে ভ্রম দূর করিতে অথবা অভিনব কিছু চালাইতে উদ্যত, তাঁহার বিরুদ্ধে সকলেই খড়্গহস্ত। যাহা এতদিন সঙ্গে রহিয়াছে, তাহার প্রতি বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে; বন্ধুত্যাগ করিতে কে চায়? যাহাকে চিরদিন আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছি তাহার প্রতি মমতা জন্মিয়াছে। মমতার ধন ভাল কি মন্দ তাহা কেহ বিচার করেনা—প্রণয় বিবেচনাধীন নহে। আবার যিনি ভ্রম সংশোধন করিতে উদ্যত

তাঁহার কথা গ্রহণ করিলে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয় অথচ তাহা স্বীকার করাও ক্লেশকর। এই সকল কারণে যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা কেহ ত্যাগ করিতে চাহে না। যিনি ত্যাগ করিতে বলেন তিনিও শত্রু হইয়া উঠেন। লোকের উপকার করিতে গিয়া সক্রেটিস্ হেমলক্-রস্ পুরস্কার পাইলেন। আরিষ্টটল্ বহুকাল উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে বিষ পান করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। আনাক্সাগোরাস্ ঈশ্বর সম্বন্ধে যথার্থ মত প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়া কারাবাস লাভ করিলেন।

বিখ্যাত কবি লর্ড বায়রন্ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সেক্‌সপীয়ার অপেক্ষা পোপের কবিত্বশক্তি অধিক। জন্‌সন্ বলিতেন 'বার্ড' কাব্যে কোনই গুণ লক্ষিত হয় নাই। গ্রে বলিতেন রাসেলাস নির্গুণ। হইতে পারে যে হিংসাই ইহার কারণ। কিন্তু যদি অন্য কোন উপযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যকে এত দূর হিংসাপরবশ স্থির করিবার আবশ্যকতা কি? যে কারণেই হউক ইহা কিন্তু নিশ্চয় যে বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে এরূপ মতবৈষম্য লক্ষিত হয়। সাধারণ লোকে কি করিবে? তাহাদের নিজের বিচারের ক্ষমতা নাই। যাহাদের মতের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা চলে, তাহাদের মতের এরূপ বৈষম্য দেখিলে তাহারা কাহার মত গ্রহণ করিবে? যিনি প্রশংসা করিলেন তাঁহার—না যিনি নিন্দা করিলেন তাহারই? যে মত গ্রহণে তাহাদের সুবিধা এবং লাভ সেই মতই তাহারা গ্রহণ করিবে। আপনার অপেক্ষা অন্যে উন্নত ইহা স্বীকার করিতে সকলেরই কষ্ট বোধ হয়। সে কষ্ট স্বীকার করিবার পথ না থাকিলে কেন করিবে? সুতরাং তুমি বিদ্বান্ হইয়া মনের মত ফল পাইলে কই? বলিতে পার যে প্রশংসা না পাইলাম—দেশের পূজ্য হইতে না পারিলাম তাতে ক্ষতি কি? গ্রন্থ প্রণয়ন ও আপনার মত প্রকাশ দ্বারা পরের উপকার করিতে হইবে। মুখে বলিলে কিন্তু অন্তরের ভাব ত সেরূপ নহে। এ তোমার মনকে চোক্ ঠারা হলো। পরের উপকার করা তোমার উদ্দেশ্য নহে। তোমার উদ্দেশ্য খ্যাতিলাভ। এ পৃথিবীতে এমন লেখক কয় জন আছেন যাঁহাদের উদ্দেশ্য পরোপকার। কয়জন আপনাকে ভুলিয়া কেবল পরের লাগিয়া অমানুষিক পরিশ্রম সহকারে গ্রন্থপ্রণয়ন করেন? আমার মতে কেহই না। এরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকারাভিলাষ গ্রন্থকারের ভূমিকায় পাঠ করা যায়—অকৃতকার্য্য অসিদ্ধ মনোরথ গ্রন্থকারের মুখে শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু যদি লোকের অন্তর দর্শন করিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখা যাইত যে অন্তরে সে ভাবের অভাব। আমরা বলি না যে বিখ্যাত মহাত্মাদিগের গ্রন্থ হইতে আমরা কোনই উপকার প্রাপ্ত হই না। তাঁহারা আমাদের বিজনে বিন্ধু, বিপদে সহচর, কার্য্যে উপদেষ্টা, দুঃখে সান্ত্বনাদাতা। আমরা যে এই অকিঞ্চিৎকর দুটো কথা 'জ্ঞানাঙ্কুরে' লিখিতেছি ইহা তাঁহাদেরই কৃপায়। তাঁহাদিগকে যে স্বার্থপরায়ণ

বলিয়া গালি দিতেছি ইহাও তাঁহাদেরই বলে; যাঁহাদিগের হইতে এত ক্ষমতা, তাঁহারা কি আমাদের উপকার করেন নাই? কেন করিবেন না?—যথেষ্ট করিয়াছেন; কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—লোকে তিরস্কার করে করুক, তবু বলিব, তাঁহারা উপকার করিব বলিয়া করেন নাই—পরোপকার কখনই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বেকন্ আমাদের কত উপকার করিয়াছেন। ঐ যে যোদ্ধা নূতন২ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে—ঐ যে নাবিক অকুতোভয়ে অপার জলধি হৃদয়ে তরী ভাসাইতেছে ঐ অস্ত্র, ঐ সাহস ইহাদিগকে কে দিল? বেকন্। কিছু দিন পূর্ব্বে যে পীড়া হইলে কোন প্রকারেই বাঁচিতাম না আজ সে পীড়া হইলে অনায়াসে আরোগ্য লাভ করিতেছি—লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে সূর্য্যমণ্ডলে আগ্নেয় বিপ্লব হইতেছে তাহা দেখিতেছি—আকাশ হইতে অগ্নিময় বিদ্যুৎ ধরিয়া সেই বিদ্যুৎকে দাসের ন্যায় খাটাইতেছি—অল্প সময়ে কতদূর যাইতে সক্ষম হইতেছি। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কাশী যাইতে হইলে বন্ধু বান্ধবের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে হইত-পরিবারের মধ্যে রোদনের ধূম উঠিত, আজ সেই তোমার পক্ষে কাশী কেন দিল্লীও এপাড়া ওপাড়া হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল কাহার প্রসাদে? বেকনের। সকলই স্বীকার-কিন্তু বেকন্ যখন 'নোভম্ অরগানম্' লিখিয়াছিলেন তখন কি ইহাই মনে করিয়া লিখিয়াছিলেন-অথবা দেশের পূজ্য হইবেন-নাম পৃথিবীবিখ্যাত হইবে-কেহ পত্র লিখিয়া 'পৃথিবী' এই মাত্র ঠিকানা দিলেই তাঁহার নিকট পৌঁছিবে-আর বিদ্যাসাম্রাজ্যের সম্রাট আরিস্টটল্‌কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসনে আপনি বসিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য ছিল? আমরা বলি শেষোক্তই তাঁহার উদ্দেশ্য। পরোপকারার্থে লেখনীধারণ 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যার' ন্যায় কথা। শাস্ত্র তাই বটে, কিন্তু পাঠক! হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া বল দেখি তুমি কি পুত্রার্থে ভার্য্যা করিয়াছ অথবা আপনার সুখের জন্য করিয়াছ? যদি প্রশংসা লাভেচ্ছা এবং গৌরবের আকাঙ্খাই তোমার লেখনীধারণের প্রধান কারণ হইল, তবে পূর্ব্ব যুক্তি অনুসারে তুমি ইষ্টধন কই পাইলে?—তুমি অসিদ্ধমনোরথ হইলে বিদ্যায় তোমার সুখ হইল না।

তবে এক কথা বলিতে পার যে, জীবিতাবস্থায় গৌরব পাইলাম না বটে, কিন্তু সময়ে সকল ভ্রমই দূর হইবে। ইহার পর লোকে গুণকীর্ত্তন করিবে। সত্য, আমরাও ইহা স্বীকার করি যে, তুমি মরিলে তোমার শরীরের সঙ্গে লোকের শত্রুতাও চিতানলে ভস্মীভূত হইবে—মৃত ব্যক্তির সহিত কাহারও শত্রুতা থাকে না। কিন্তু তাহাতে তোমার লাভ কি? তখন তোমার পক্ষে লোকের নিন্দা, প্রশংসা, আদর, অনাদর সকলই সমান। যখন লোকেরশত্রুতায় ক্ষতি নাই—তখন লোকের অনুকূলতায় লাভ কোথায়? আজ আমরা বায়রনের নাম করিয়া পুলকিত হইতেছি—কালিদাসের ন্যায় কবি বলিয়া অন্যের প্রশংসা করিতেছি; তিনি উপমাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু এত সম্মান এত আদরে তাঁহার কি লাভ হইতেছে? তাঁহার জীবন তো দুঃখেই গিয়াছে। তিনি লোকনিন্দার বহির্ভূত হইবার জন্য 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জন্মভূমি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে পদার্থ বিদ্যায় যাঁহার কিছু পারদর্শিতা থাকিত তাঁহাকে লোকে মায়াবী মনে করিত। কাডানকে লোকে মায়াবী বলিয়াই বিশ্বাস করিত। আগ্রিপার প্রেত সাহচর্য্য আছে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। অরবান্ গ্রেনেডিয়ারের বধের প্রাক্‌কালে একটি বৃহৎমক্ষিকা

তাঁহার মস্তকোপরি বসিয়াছিল। একজন ধর্ম্মযাজক ইহা দেখিয়াছিল এবং কাহার নিকট শুনিয়াছিল যে, হিব্রু ভাষাতে 'বিএলজিবব্' শব্দের অর্থ 'মক্ষিকার দেবতা'। তাঁহার মৃত্যুর পর সে প্রচার করিল যে, বিএলজিবুব তাঁহাকে আপন আয়ত্ত করিতে আসিয়াছিল, ইহা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। অজ্ঞ লোকে তো এরূপ বিশ্বাস করিতেই পারে—বিদ্বানদিগকেও এরূপভ্রমে পতিত হইতে দেখা যায়। আলবার্ট দি গ্রেট্ একটি আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই যন্ত্র হইতে মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত শব্দের ন্যায় স্পষ্ট শব্দ নির্গত হইত। টমাস্ আকুইনাস্ যন্ত্রোত্থিত শব্দ শুনিয়া এতদূর ভীত হইয়াছিলেন যে, হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা তাহাতে আঘাত করিয়া আলবার্টের ত্রিশ বৎসরের পরিশ্রম বিফল করিয়া ফেলেন। গ্যালিলিওরও দুরবস্থার কথা কে না জানে? এইরূপে দেখা যায় যে, ভ্রম দূর করিতে গিয়া এবং হিতসাধনে উদ্যত হইয়া অনেকেই দুঃখভোগ করিয়াছেন।

বিদ্বান্ লোকে সংসারের অন্য কোন কাজে লাগেন না। সামান্য বিষয়েরও ভার লইতে তাঁহারা অক্ষম। ইহাই বলিয়া অনেকে তাঁহাদিগকে তামাসা করিয়াছেন। আমাদের বিদ্রূপ করিবার ইচ্ছা নাই। যাহা সত্য তাহাই বলিব। এক্ষণে এ অপটুতার কারণানুসন্ধান করা উচিত। দেখিতে হইবে যে অন্যের অপেক্ষা যাঁহাদের শিক্ষা এত অধিক—যাঁহাদের মনোবৃত্তি সকল উত্তমরূপে অনুশীলিত হইয়াছে, তাঁহারা এসকল সামান্য লোকসাধ্য সামান্য বিষয়ে এত অপটু কেন? অশিক্ষিত লোক অপেক্ষা সুশিক্ষিত লোকে সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবেন ইহাই লোকে ভরসা করে। কিন্তু আমাদের মত এই যে, এ ভরসা ভ্রান্তিমূলক। বিদ্যাই তাঁহাদের কাল—বিদ্যাই এ অনর্থের মূল। তাঁহারা যে অন্যের অপেক্ষা এত অধিক শিক্ষিত-অন্যের অপেক্ষা অধিক ভাবেন—অধিক জানেন—ইহাই তাঁহাদের অপটুতার কারণ। আরিস্টটল এ অপটুতাই বিদ্বান্দিগের গৌরবের কারণ দেখিয়াছেন। তিনি বলেন যাহাদিগকে অধিক বিষয় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহাদিগের কার্য্য করিতে অধিক সময় লাগে। করা না করা উভয় পক্ষের সমস্ত কারণ দেখিয়া মীমাংসা করিতে হয়, সুতরাং মীমাংসা করিতে বিলম্ব হয়। যাহাদের বিবেচনা করিবার শক্তি তত প্রখর নহে—যাহারা অধিক কারণ দেখিতে না পায়—তাহাদের সুতরাং বিলম্ব হয় না। আরিষ্টটলের কথা আমাদের শিরোধার্য্য, কিন্তু আমরা আরও কিছু বলিতে চাই। আমাদের বিশ্বাস এই যে, বিদ্বান্ লোকের অনেক সময়ে মীমাংসাই হইয়া উঠে না। হয়তো করা না করা উভয় পক্ষেই তুল্য কারণ রহিয়াছে। বিবেচনা করিতেই সময় অতিবাহিত হইল—কিছুই করা হইল না। অধিক বিবেচনাশীল বলিয়াই হউক বা মানসিক প্রখরতার জন্যই হউক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বিদ্বানলোক সাংসারিক কার্য্যে একরূপ অকর্ম্মণ্য। তাঁহারা সকল বিষয়ে সুদীর্ঘ সমাসপরিপূর্ণ সুদীর্ঘায়ত রচনা করিতে পারেন-সুদীর্ঘ শব্দ বিন্যাস করিয়া বক্তৃতা করিতে পারেন, কিন্তু সেই বিষয় আবার কার্য্যে পরিণত করিতে দাঁড়াইলে একজন সামান্য অক্ষর বিবর্জিত লোকে তাঁহাদের অপেক্ষা উত্তম করিবে। তাঁহারা চিরকাল বিবেচনা করিতেছেন-চিরকাল বিবেচনাই করিবেন। কখন কার্য্য করেন নাই—কখন কার্য্য করিতেও পারিবেন না। একদা অ্যাডিসন একখানি পত্র লিখিতে পারিলেন না সেই পত্র একজন সামান্য কেরাণী লিখিয়া দিল। আমরাই দেখিয়াছি এক দিবস অপরাহ্নে দুইজন কৃতবিদ্য যুবক বেড়াইতে যাইবার

প্রসঙ্গ করিলেন। একজন একদিকে যাইবার প্রস্তাব করিলেন, অন্যজন অপর দিগে যাইবার কথা বলিলেন। ক্রমশঃ গন্তব্য স্থান লইয়া তর্ক আরম্ভ হইল। উভয়েই নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আপন পক্ষ সমর্থন করিতে লাগি- [illegible] করিতে সন্ধ্যা [illegible] হইয়া গেল কোন দিকেই যাওয়া হইল না। এরূপ ঘটনায় বিদ্যার অথবা বুদ্ধির প্রখরতার পরিচয় হইতে পারে, কিন্তু এ প্রখরতা যে বিড়ম্বনা তাহাতে আমাদের তিল মাত্র সন্দেহ নাই।

বিদ্বানের সম্মান করি, প্রকাশ্যে আদর করি, মনে মনে হিংসা করি, কিন্তু তাঁহাদের সংসর্গ কোন প্রকারেই মনোনীত নহে। ইহাই মনুষ্য চরিত্রের ধর্ম্ম। রোদনই কর আর দুঃখই কর, প্রকৃতির নিয়মের পরিবর্ত্তন হইবে না। যদি রমনীর প্রণয় তোমার এত আদরের ধন, তবে কেন বিদ্যালাভ করিয়া আপনাকে সে ধন পাইবার অনুপযুক্ত করিয়াছ? তুমি বলিবে 'অনুপযুক্ত কিসে'—কিসে আবার! তুমি অকারণে হাসিতে পার না, অকারণে অশ্রুপাত করিতে পার না, অকারণে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে পার না; তোমার সকল কার্য্যেরই উপযুক্ত কারণ আছে। আপনার সাহসের পরিচয় দিতে গিয়া কথায় কথায় লোকের 'মস্তক ছেদ' করিতে পার না, তুমি পরিচিত এবং অপরিচিত অর্দ্ধেক স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ করিয়াছ তাহা বলিতে পার না; কত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কুলবধূ তোমার জন্য সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বনবাস সার করিয়াছে—কত জন তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাও বলিতে পার না-কিছুই পার না, আবার বল অনুপযুক্ত কিসে? তোমার অধ্যবসার নাই, তোমার যত্ন নাই। নূতন পুস্তক পাইলেই সুন্দরী ভুলিয়া তাহাতেই মজিয়া যাও। তোমার বুদ্ধি নাই—একবার 'না' করিলেই আর সে দিকে যাইতে সাহস হয় না। প্রণয়ের ভাষায় 'না' যে সম্মতিসূচক ইহা বুঝ না—অপাঙ্গে দৃষ্টি করিতে জান না—আবার বল অনুপযুক্ত কিসে? আবার প্রণয় তোমার হৃদয়ের সার সর্ব্বস্ব নহে—প্রণয় তোমার মনের প্রধান বৃত্তি নহে। প্রণয়ের অপেক্ষা তোমার লজ্জা অধিক, লোকাপবাদ ভয় অধিক। লজ্জাকে বৈতরণী পার করিয়া দাও, লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান কর, তবেতো স্ত্রীলোকের আদর পাইবে। তুমি মনে মনে বলিতেছ তাহাত পারিব না। তবে আবার বল কেন অনুপযুক্ত কিসে? 'কুরঙ্গনয়নীই' আর 'চারুহাসিনীই' বল, এসকল গুণ না থাকিলে চলিবে না। তোমার প্রণয়িনী হয়তো কুরঙ্গনয়নীর অর্থ জানেন না, হয়তো শুনিয়া থাকিবেন 'কু' মানে 'মন্দ'। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ—আর কখন ওপথেও হাটিবে না। আবার হয়তো তোমার কিঞ্চিৎ কবিত্ব শক্তিও আছে-কোমল কথা কোমল ভাবের ব্যবসায়কর-নিজের না থাকে, প্রাচীন কবিদিগের নিকট বিনাসুদে পাও। কিন্তু এবাজারে ও দ্রব্য বিকায় না। যদি কল্যাণচাও তবে ও সকল তুলে রাখ, আবার স্ত্রী চরিত্র মনে কর—বায়রনের কথা কি ভুলে গিয়েছ?

'Maids like moths are ever
caught by the glare
And Mammon wins his way where
seraphs might despair.'

যদি ঘৃণা না হয় তবে আমাদের কথাটাও শুন।

স্ত্রীচরিত্র পুরুষের চরিত্রের ঠিক বিপরীত। পুরুষেরা যাহার আদর করে স্ত্রীলোকে তাহা ঘৃণা করে। পুরুষ যাহা ঘৃণা করে রমণীর কাছে তাহা আদরনীয়। রমণীদলের যে প্রিয়পাত্র, রমণী মণ্ডলে যাহার আদর, নিশ্চয় জানিবে

যে, সে কান্তাকান্ত বিবেচনা রহিত, হ্রস্ব দীর্ঘ বোধ বিবর্জিত, ঘোর মূর্খ। তুমি কিন্তু তাহার আদরের সঙ্গে তাহার মূর্খতা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছ? না। তবে কেন তাহার জন্য দুঃখ কর? পোড়া মন যে বুঝে না। তবে বল দেখি তোমার বিদ্যা তোমার পক্ষে বিড়ম্বনা কি না?

আমাদের রচনার কলেবর অধিক বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। আরো দুই একটি বলিবার কথা থাকিলেও উপসংহার করাই কর্ত্তব্য। ‘সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং’ বড় মন্দ কথা নহে। তবে উপসংহার কালে এ সম্বন্ধে আর একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের বক্তব্য বিদ্যা বিড়ম্বনা। পুরুষের পক্ষে এ কথা কতদূর সত্য তাহা যথা সাধ্য দেখাইয়াছি, কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহার শতগুণ। পুরুষ স্বভাবতঃ কঠিন-প্রকৃতি, শিক্ষার দ্বারা তাহার আরও বৃদ্ধি হয়। সেই প্রকৃতিগত শিক্ষা-সংবর্দ্ধিত কাঠিন্যকে কোমল করিবার জন্য রমণীর বিশেষ আবশ্যক। ইহা যে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাতে আমাদের অনুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু স্ত্রী বিদ্যাবতী হইলে সে উদ্দেশ্য সংশাধিত হয় না। যাহার ঘরে বিদ্যাবতী স্ত্রী তাঁহার কঠোর ভাব দূর হওয়া দূরে থাক বরং আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক বিদ্যাবতী হইলে তৎসহবাসে আর সুখ থাকে না। কোমলতা, সরলতা, লজ্জা যাহা কিছু রমণীর শোভা সে সকলই বিদ্যার দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। আবার যে ব্যক্তি সকল বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে—কার্য্য দেখিয়া মনের ভাব স্থির করিতে পারে তাহার প্রণয়েও তত সুখ নাই।

আমাদের অভিলাষ এই যে পরিশ্রমের পর সুখময় ভবনে স্ত্রীর সহিত দুটো কোমল কথা কহিয়া সংসারের জ্বালা ভুলিব—মানসকে চিন্তাভার হইতে মুক্ত করিয়া যথেচ্ছা ক্রীড়া করিতে দেব। কিন্তু যার বামে সরস্বতী তাঁহার পক্ষে তাহা অসম্ভব। সমস্ত দিন মিল্ আর কম্‌টী লইয়া মস্তক ঘুরাইয়া আবার ঘরে গিয়া ‘বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার’ কর। ইহার অপেক্ষা যমযন্ত্রণা ভাল। হয়তো লোকে আমাদিগকে ইহার জন্য মূর্খ এবং নির্ব্বোধ বলিবে কিন্তু লোকে যাহাই বলুক, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, কোমল প্রকৃতি রমণীর কোমল মুখে কোমল প্রণয়ের কোমল কথাই ভাল লাগে, দর্শনের কঠিন কথা যেন কর্ণে অগ্নি বর্ষণ করে।

প্রকৃতি আমাদিগকে যতদূর কঠিন করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। তাহা বৃদ্ধি করা আর সদ্‌যুক্তি নহে। এ বিষয়ে আমরা কম্‌টীর মতই গ্রহণ করি-বঙ্গীয় নব্য ব্রাহ্মসম্প্রদায় যাহাই বলুন; তবে আমরা স্ত্রী শিক্ষার একেবারে প্রতিবাদী নহি। কিন্তু অযথা শিক্ষা চাহি না। স্ত্রীলোকের অল্পশিক্ষাই ভাল, তাহাতে সুখও আছে। বিদেশস্থ স্বামীকে স্ত্রী যে ‘প্রাণেশ্বর’ ‘জীবিতসর্ব্বস্ব’ বলিয়া পত্র লেখেন সে পত্র বড় মধুর- সেই পত্র প্রণয়ীর বিচ্ছেদ সন্তপ্ত হৃদয়ের পক্ষে অমৃত সিঞ্চনকর হয় এবং গৃহে অন্য কেহ না থাকিলে তদ্দ্বারা বিপৎপাতের সংবাদও পাওয়া যায়! কিন্তু পত্র লিখিতে যত টুকু বিদ্যার আবশ্যক তাহার অধিক বিদ্যা আমরা স্ত্রীলোককে দিতে চাহি না। স্ত্রীলোকের বর্ণ পরিচয় না থাকে সেও ভাল, তবু যেন বিদ্যাবতী না হয়। বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকের সংসর্গ অপেক্ষা নরক বাস বরং ভাল।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
খাগড়া বহরমপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি

(২৪এ আপ্রিল্ পূর্ব্বাহ্ন পর্য্যন্ত মূল্য আদায় ও প্রকাশিত হইল। কমিসন বাদ দেওয়া হইয়াছে।)

শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দত্ত ১৸০
শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী পুটিয়া ২॥০
শ্রীযুক্ত বাবু শারদা গোবিন্দ সেন
কৃষ্ণপুর
" " অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য ১।০
ভবানীকিশোর চক্রবর্ত্তী
" " গণপতি ঘোষাল ২॥০
" " বিশ্বম্ভর বন্দ্যোপাধ্যায় ২॥০
" " পরশুরাম মুস্তফী ২॥০
" " প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২।৵১০
" " জনার্দ্দন মহাপাত্র ১॥০
" " জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্ত ২॥০
" " নিবারণচন্দ্র রায় ২॥০
" " মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ২॥০
" " মুকুন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২॥০
" " মহিমচন্দ্র ঘটক ২৶১০
" " কৈলাসচন্দ্র বসু ২॥০
" " শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২।৵১০
" " গোবিন্দলাল রায় চৌধুরী
২॥০
" " মহেশচন্দ্র চৌধুরী ২।৵১০
" " শ্রীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বোয়ালিয়া ২॥০
" " দেবেন্দ্র নাথ সিংহ ঐ ।৷০

শ্রী যুক্ত বাবু রাসবিহারী চৌধুরী
কাশিমপুর ২॥০
" " রাখালচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা ১।০
" " ভগবতীচরণ কুণ্ড ঐ ১।০
" " গিরীন্দ্র নাথ মিত্র ১।৵১০
" " উবারাম দাস ১৵১০
" " চন্দ্রকুমার রায় ২।৵১০
" " শ্রীনাথ সেন ২।৵১০
" পণ্ডিত হরেন্দ্র নারায়ণ রায় ১৵১০
" বাবু জয়চন্দ্র দাস ২।৵১০
" " বিহারী লাল মিত্র ২।৵১০
" " বিপিনবিহারী প্রামাণিক ১।০
" " অমৃতনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী
২।৵১০
" " কেদার চন্দ্র শান্যাল ২।৵১০
" " চন্দ্রকান্ত লাহিড়ী ২।৵১০
" " প্রসন্নকুমার আচার্য্য ১৵১০
" " গিরিশচন্দ্র বাগছী ১৵১০
" " দীননাথ মজুমদার ২॥০
" " কৃষ্ণচৈতন্য ভৌমিক ২॥০
" " শশিমোহন রায় ২॥০
" " জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২॥০
" " শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ১
" " মনোহর দাস ২৶১০
" আজিমুদ্দিন আহম্মদ ১৵১০
" মহম্মদ খুসী সেখ ১।০
" আবদুল রেজ্জাক ২॥০

Registered No. 109.

এবার স্থানাভাবে ইংরাজী প্রবন্ধ মুদ্রিত হইল না। ‘স্বর্ণলতা’ এই বৎসর মধ্যে শেষ করা অত্যাবশ্যক হওয়ায় আমরা অন্যান্য বিষয়াপেক্ষা তাহাই অধিক পরিমাণে মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইতেছি। পাঠকগণ! মনে করিবেন না যে, কঠিন, শ্রম ও চিন্তা-সাধ্য বিষয় লিখিতে ক্লান্তি বোধ হওয়াতে আমরা অল্পশ্রমে কার্য্য নির্ব্বাহের এই সহজ পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। জ্ঞানাঙ্কুরের কদাপি এরূপ উদ্দেশ্য নহে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস
জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদক।

JNA'NA'NKURA

OR

THE SEED OF KNOWLEDGE,

A MONTHLY ANGLO-VERNACULAR MAGAZINE AND REVIEW

OF

LITERATURE, PHILOSOPHY, SCIENCE, HISTORY, BIOGRAPHY, ANTIQUITIES, AND RESEARCHES, POLITICS, ARTS, COMMERCE, &c. &c.

জ্ঞানাঙ্কুর।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদিসম্বন্ধীয়
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—:।:—

সূচী।

কলিকাতা ঃ

বহুবাজার, স্মিথ এণ্ড কোর যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮০

কালকাতা

বিডন স্কোয়ারের উত্তর ৯৬ নং বাটী।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক স্ত্রীপুরুষ ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীরের শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা ও ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তিবিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি এবং শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছুক হইলে পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিয়া ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ (৫) পাঁচ টাকা পাঠাইতে হইবেক।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

হেয়ার প্রিজারভার।

(যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।

হেয়ার প্রিজারভার কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণ বর্ণ, ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থা হইবে।

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ,, ১ টাকা

ঐ ডাক মাসুল সহিত ,, ১।।৵

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, মধুমেহ, অর্শ, বহু মূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ বিক্রয়ার্থ এখানে প্রস্তুত আছে।

হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতিদিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূলগ্রস্থ রোগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ১ টাকা

ঐ ডাকমাসুল সহিত ১।।৵

কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি এক টাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১।০ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেকের চারি আনা।

বীলাতি যত প্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী ও ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

জ্ঞানাঙ্কুর।

—ঃঃ—

মাসিক পত্র।

১ ম খণ্ড　　জ্যৈষ্ঠ ১২৮০　　৯ ম সংখ্যা।

সভ্যতার ইতিহাস।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

১—অধ্যায়ের উদ্দেশ্য—২ প্রাচীন ইতিহাসাদি সম্বন্ধে অভিপ্রায়—৩ নায়র জাতি—৪ আবিসিনীয় জাতি—৫ কানেডা নিবাসী—৬ আসাম প্রদেশ—৭ নিউকুইন্স্ দ্বীপ—৮ তৎসম্বন্ধে উপসংহার—৯ প্রাচীন কালের ব্যভিচার—১0 গান্ধর্ব্ব বিবাহ—১১ রাক্ষসী বিবাহ—১২ ক্ষেত্রজ সন্তান—১৩ প্রাচীন কালে ব্যভিচার দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত নহে—১৪ প্রাচীন য়িহুদীজাতি—১৫ গ্রীক ও রোমজাতি—১৬ স্পার্টা—১৭ আরবজাতি—১৮ বহুবিবাহ ও মুসলমান—১৯ উপসংহার।

১অধ্যায়ের উদ্দেশ্য　পঞ্চম অধ্যায়ে বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল অভিপ্রায়—তৎ সমর্থনার্থে যে সকল যুক্তি ও তর্ক প্রদর্শিত হইয়াছে, এই অধ্যায়ে তদ্বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে।

সামান্য কথায় বলিয়া থাকে "প্রত্যক্ষের উপর সিদ্ধান্ত কি?" আমাদিগের উক্তিতে যদিও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবার উপায় নাই, তথাপি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিতে পারিলে, বোধ হয়, বিরুদ্ধবাদীদিগের জটিল অনুমানপ্রবন্ধের ও তর্করাশির উত্তর দানের বিশেষ আবশ্যকতা নাই।

যখন পার্শ্বস্থ গৃহে, মুহূর্ত্ত মাত্র পূর্ব্বে সংঘটিত ঘটনাবলীর আমূল তত্ত্ব নিরূপণে আমরা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিনা, তখন বহুবর্ষ পূর্ব্বের ঘটনাবলীর--বিশেষতঃ স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধীয় ঘটনার, যাহা জনসমাজে প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, দম্পতির মধ্যেও সময় বিশেষে ঘটনাবিশেষ গুপ্ত থাকে, তাহা বিশদরূপে প্রমাণ করিবার আশা করাও যায় না। বিশেষতঃ বক্তব্য বিষয়গুলি বিশদরূপে বলিতে গেলে নিতান্ত অশ্লীল হইয়া উঠে। সুতরাং সুনীতির অনু-

রোধে বিশেষ সাবধানতার সহিত সংক্ষেপ বর্ণন করাই কর্ত্তব্য।

২ প্রাচীন ইতিহাসাদি সম্বন্ধে অভিপ্রায়

যে সকল ইতিহাস হইতে আমরা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম, তাহার সমুদায় অংশই যে সত্য, কখনই এরূপ বলা যায় না। কোন্ অংশ সত্য, কোন্ অংশ মিথ্যা, তাহা নিরূপণ করাও সুকঠিন। যাহা হউক জন প্রবাদ মাত্রই কোন বিশেষ কারণে সম্ভূত হইয়া থাকে। এই সকল জন প্রবাদ দ্বারাও তত্তৎকালীন লোকের অবস্থার কিয়ৎ পরিমাণে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ফলে, যে কথায় লোকের বিশ্বাস নাই, তাহা কখনই জাতি সাধারণে প্রচারিত হইতে পারেনা।

প্রমাণ সম্বন্ধীয় দৃষ্টান্তগুলি নিম্ন-লিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল।

(১) অদ্যাবধি কোন কোন জাতির মধ্যে স্বেচ্ছাচার ও সাময়িক দাম্পত্য প্রচলিত আছে।

(২) প্রাচীন কালে কোন কোন জাতির মধ্যে ব্যভিচার বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীলোক পুরুষের উপভোগ্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইত। পুরুষদিগের ব্যভিচার তাদৃশ দোষাবহ বলিয়া জ্ঞান করা হইত না। এখনও যে দেশবিশেষে এই সকল সংস্কার নিতান্ত বিরল, তাহা নহে।

(৩) বর্ত্তমান সময়েও দেশবিশেষে বা জাতিবিশেষে ইচ্ছানুরূপে স্বামী এবং পত্নী পরিত্যাগ প্রথা দেখা যায়।

(৪) প্রাচীন কালের কঠোর রাজনিয়ম বিবাহিতের পক্ষে অনেকাংশে শিথিল ছিল, অর্থাৎ এমন অনেক অপরাধ ছিল, যাহাতে অকৃতদার ব্যক্তির অপেক্ষা কৃতদারকে লঘু দণ্ড ভোগ করিতে হইত। প্রজা বৃদ্ধি নিমিত্ত সংহিতা-কর্ত্তারা বিবাহিতের লঘু দণ্ড, ও সন্তান জন্য ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভের প্রত্যাশা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই।

(৫) বিধবা বা মৃতপত্নীকদিগের বিবাহ ব্যতীত এখনও বিশেষ কারণ দেখাইয়া পতি পত্নী মধ্যে একে অপরকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যান্তর বা পত্যন্তর গ্রহণ প্রথা সভ্য জাতিদিগের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত আছে।

৩ নায়র জাতি

ভারতবর্ষে বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী মলবার নিবাসী নায়রজাতির মধ্যে, অধুনাও বিবাহ প্রথা নামে মাত্র প্রচলিত আছে। এই জাতির মধ্যে বিবাহের পর স্ত্রীপুরুষে আরকোন সম্বন্ধ থাকে না। স্ত্রী চিরজীবন আপন পিত্রালয়ে বাস করে এবং স্বেচ্ছানুরূপ অন্য পুরুষকে অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাতে তাহার যে সকল সন্তান হয়, তাহারা বিবাহকর্ত্তার সন্তান নহে। সুতরাং তাহার সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহারা স্ব স্ব মাতুলালয়ে বাস করে এবং মাতুল কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয়। এই জাতির মধ্যে উত্তরাধিকার ব্যবস্থা যে অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক্ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ফলতঃ মাতুলের মৃত্যু হইলে ভাগিনেয়ই প্রধান উত্তরাধিকারী।

৪ আবিসিনীয় জাতি — আফ্রিকাখণ্ডে আবিসিনীয় জাতির (১) মধ্যে বিবাহ প্রণালী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে সমুৎসুক হইলে বিবাহ হয় বটে, কিন্তু এক জন ইচ্ছা করিলেই তাহা ভগ্ন করিতে পারে। পতি-পত্নীভাবে অবস্থান সময়ে তাহাদের যে সকল সন্তান উৎপত্তি হইয়া থাকে, বিচ্ছেদ সময়ে তাহা বিভাগ করিয়া লয়। মাতা জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং পিতা জ্যেষ্ঠ কন্যা পাইয়া থাকে। বিভাগ সময়ে সন্তানের সংখ্যা বিষম হইলে, বিশেষ কোন দৈবী ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া অংশ স্থিরীকৃত হয়।

একজন ইউরোপীয় পর্য্যটক লিখিয়াছেন যে "আমি একদা আবিসিনীয়ার রাজধানীতে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণীর সম্মুখে সাত জন পুরুষকে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়াছিলাম। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, তাহারা সকলেই পর্য্যায় ক্রমে ঐ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু এইক্ষণে ঐ সাত জনের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তাহাকে স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে না।" এই জাতির মধ্যে রাজ পদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সন্দেহ নিবারণ নিমিত্ত পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ নৃপতির গর্ভধারিণী মনোনীত হইয়া থাকে।

৫ কানেডা নিবাসী — ব্রীটিস্ আমেরিকা অথবা কানেডার আদিম অধিবাসীদিগের (১) মধ্যে এখনও সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচার ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। জননেন্দ্রিয়ের পরিচালন সম্বন্ধেও ইহাদিগের স্বেচ্ছাবিহারের ত্রুটি নাই। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন "কোন সময়ে একজন কানেডাবাসী স্বীয় পত্নীকে গৃহে রাখিয়া দেশান্তরে গমন করিয়াছিল; গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখে ভার্য্যা পুরুষান্তর অবলম্বন করিয়াছে। অনন্তর উভয় স্বামীই তাহাকে নিজ পত্নী বলিয়া দাবী করিতে লাগিল। প্রতিবাসীদিগের মধ্যে এই রমণী কাহার হইবে বলিয়া ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হইল। অনেক বিচারের পর পরিশেষে বাদী-প্রতিবাদীর সম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে, ঐ স্ত্রীকে মধ্যে রাখিয়া উভয়েই সমদূর হইতে তদভিমুখে ধাবমান হইবে। যে ব্যক্তি অগ্রে তাহার নিকট উপস্থিত হইবে, রমণী তাহারই গৃহিণী হইবে।"

৬ আসাম প্রদেশ — "সধবা বিধবা নাস্তি নাস্তি নারী পতিব্রতা"

আসামে এই জনপ্রবাদ এখনও বহুল পরিমাণে প্রচলিত—কেবল প্রচলিত নহে, ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে কোন কামরূপীয়ই নিঃসন্দেহরূপে স্বীয় জনকের নাম নির্দ্দেশ করিতে পারিত না। তথায় এখনও স্ত্রীলোকদিগের বিলক্ষণ প্রভাব। তন্নিবন্ধন তাহাদের স্বেচ্ছা বিহার সমাজ মধ্যেও নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত নহে। এখনও সেখানে সহধর্ম্মিণী, সহোদরা বা পরিবারস্থ অপর কোন স্ত্রীলোককে মহাজনের নিকট বন্ধক স্বরূপ

(1) History of Abyssinia, Edinburgh Cabinet Library.

History of Canada, Edinburgh Cabinet Library.

রাখিয়া ঋণ গ্রহণ প্রথা একেবারে লোপ পায় নাই। ঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে রমণী সন্তানবতী হইলে, ঋণ শোধের সময় মহাজন সন্তানগুলি সুদের পরিবর্ত্তে পাইবে। অধমর্ণ যাহাকে বন্ধক দিয়াছিল তাহাকে মাত্র পাইবে।

৭ নিউকুইন্‌স্‌ পত্নী (১) নিউকুইন্‌স দ্বীপে গৃহে রাখিয়া দেশান্তর গমন করিলে, তাহার পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে প্রায়শঃ নিরাশ হইতে হয়। তথায় এরূপ ব্যবহার অনুমাত্রও বিস্ময়াবহ নহে।

তিব্বতদেশ তিব্বতদেশে সকল সহোদরে মিলিত হইয়া এক রমণীর পানি গ্রহণ করিয়া থাকে; পত্নী মনোনীত করিবার ভার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর। সকল ভ্রাতাই ঐ স্ত্রীকে বিবাহিত পত্নী জ্ঞান করিয়া থাকে। এই ব্যবহারকে তাহারা দুষ্য ও লজ্জাকর জ্ঞান করে না।

৮ তৎসম্বন্ধে উপসংহার বর্ত্তমান কালেও হিন্দু, আরব, মরমন প্রভৃতি জাতির মধ্যে বহু বিবাহ দোষাবহ নহে। তবে গার্হস্থ্য বা সামাজিক অসুবিধা নিমিত্ত লোকে প্রচুর পরিমাণে, যে, বহু বিবাহ করে না, সে স্বতন্ত্র কথা। ফলতঃ মানব সমাজের অধিকাংশ জাতির আচরণ দৃষ্টে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, ব্যভিচার দোষ বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহার অনুষ্ঠান নিতান্ত অল্প নয়।

History of Canada, Edinburgh Cabinet Library.

৯ প্রাচীন কালের ব্যভিচার যে কোন জাতির প্রাচীন বিবরণ পাঠকর তাহার অধিকাংশ, এমন কি প্রায় সমুদায় স্থলেই ব্যভিচার প্রাবল্যের স্পষ্ট প্রমণ প্রাপ্ত হইবে। লোকে যে সকল গ্রন্থ ঈশ্বরপ্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, তৎপাঠেও আদিম জনগণের ব্যভিচারিতার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্য্য, আরব, গ্রীক্, ও রোম প্রভৃতি জাতির ইতিহাস এবংধর্ম্ম শাস্ত্র উভয়ই এই উক্তির প্রমাণ দিতেছে।

অতি পূর্ব্বে হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা ছিল কি না সন্দেহ স্থল (১) ওতথ্য ঋষির স্বীয় ভ্রাতৃজায়ার প্রতি ব্যবহার ও উদ্দালক (২) নিজ পুত্র শ্বেতকেতুকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎ

(১) অনাবৃতাঃ কিল পুরাস্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥
তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারাৎ শুভগে পতীন্।
না ধর্ম্মোভূদ্বরারোহে, সহিধর্ম্মপুরাভবৎ॥
মহাভারত আদিপর্ব্ব একশত দ্বাবিংশতি অধ্যায় ৪।৫ শ্লোক।

(২) শ্বেতকেতোঃ কিলপুরা সমক্ষংমাতরংপিতুঃ
জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পাণৌ গচ্ছাব ইতিচাব্রবীৎ॥
ঋষিপুত্রস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচোদিতঃ।
মাতরং তাং তথা দৃষ্ট্বা নীয়মানাং বলাদিব॥
ক্রুদ্ধন্তন্তু পিতা দৃষ্ট্বা শ্বেতকেতু মুবাচহ।
মা তাত, কোপং কার্ষীস্ত্বংমেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি।
যথা গাবঃস্থিতা স্তাত, স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজা॥
ঐ অধ্যায় ১১—১৪ শ্লোক।

পাঠে আদিম আর্য্যদিগের স্বেচ্ছা বিহার বিলক্ষণ অনুভব হয়।

মনুসংহিতাতে আট প্রকার (১) বিবাহ দেখা যায়, তন্মধ্যে গান্ধর্ব্ব (২) রাক্ষস (৩) পৈশাচ (৪) এই ত্রিবিধ বিবাহের ব্যবস্থা দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, তৎকাল (মনুর সময়) পর্য্যন্তও আর্য্য-সন্তানদিগের মধ্যে বিবাহ প্রথা দৃঢ়মূল হয় নাই।

১০ গান্ধর্ব্ব বিবাহ — পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে "বোধ হয় আদিম সময়ে কোন কারণ বশতঃ স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সাক্ষাৎ মাত্রই তাহাদিগের মধ্যে কামোদ্রেক হইত।" গান্ধর্ব্ব বিবাহ এই উক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা গান্ধর্ব্ব বিবাহের এই মাত্র অর্থ বুঝি যে, স্ত্রীপুরুষ পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে যে উভয়তঃ জিজ্ঞনবিষারৃত্তি চরিতার্থ করিত, শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিয়াছেন।

পুরাণাদিতে অনেক গান্ধর্ব্ব বিবাহের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের এবং শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যযাতির বিবাহই আমাদের এস্থলের দৃষ্টান্ত।

১১ রাক্ষস বিবাহ — পুরাণাদিতে রাক্ষস বিবাহ অথবা কন্যাহরণের বিবরণ ভূরি পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভীষ্ম কাশীরাজ তনয়াদিগকে স্বয়ম্বর সভা হইতে হরণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত ভূপতির স্থাবরাস্থাবর অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় মহিলাগণও যে বিজেতার ভোগ্য হইত, এ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

আর্য্যদিগের মধ্যে এক স্ত্রীর বহু পুরুষ অথবা এক পুরুষের বহু স্ত্রী বিবাহ প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। শান্তনু, বিচিত্রবীর্য্য, দশরথ, জরাসন্ধ প্রভৃতি কোন রাজাই একমাত্র কামিনীর পতি ছিলেন না। এদিকে অশ্বিনীকুমার নামা ভ্রাতৃদ্বয় উভয়ে এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে পাণ্ডব পক্ষ হইতে অনুরোধ করেন, তখন তিনি তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়া ছিলেন যে, দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের ন্যায় তোমারও সহধর্ম্মিণী হইবেন

১২ ক্ষেত্রজ সন্তান — এতদ্ব্যতীত বিবাহিত দিগের মধ্যেও ব্যভিচার দোষ বিলক্ষণ ছিল। ক্ষেত্রজ পুত্রোৎ-

---

১ ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমাধমঃ॥
মনুসংহিতা।

২ ইচ্ছয়ান্যোন্যসংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্যচ
গান্ধর্ব্বঃ সতু বিজ্ঞেয়ো মৈথুনঃ কামসম্ভবঃ।
মনুসংহিতা।

গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ।
যাজ্ঞবল্কসংহিতা

৩ হত্বা ছিত্ত্বাচ ভিত্ত্বাচ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে॥
মনুসংহিতা।

রাক্ষসো যুদ্ধ হরণাৎ।
যাজ্ঞবল্কসংহিতা

৪ সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহোযত্রোপ গচ্ছতি।
সপাপিষ্ঠোবিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোধমঃ
মনুসংহিতা।

পৈশাচঃ কন্যকাস্থলাৎ।
যাজ্ঞবল্ক সংহিতা।

পাদনপ্রথাই তাহার প্রচুর উদাহরণ(১) সূর্য্যবংশীয় কোন রাজা স্বীয় মহিষীর গর্ভে সন্তানোৎপাদন নিমিত্ত বৃহস্পতি তনয়কে নিযুক্ত করেন। বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর বেদব্যাস বিধবা রাজমহিষী দিগের গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম দান করেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবও ক্ষেত্রজ সন্তান এইরূপ ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন প্রথা সমাজ মধ্যে অনুমাত্রও লজ্জাকর ছিল, এরূপ বোধ হয় না। বরং পুত্রহীনের সদ্‌গতি হয় না বলিয়া ক্ষেত্রজ সন্তানদিগের বিলক্ষণ আদরই ছিল। মহাভারতের লিখনানুসারে স্পষ্ট বোধ হয় যে, পাণ্ডু স্বীয় ক্ষেত্রজ পুত্রপঞ্চকে ঔরসজাত সন্তানবৎ জ্ঞান করিতেন। দেশস্থ কেহই পাণ্ডবদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিত না। ফলতঃ তৎকালে ঔরস ও ক্ষেত্রজ সন্তান উভয়কেই লোকে সমভাবে দেখিত। পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংশ হইলে প্রায় সকল ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ ঔরসে স্ব স্ব স্বামীর বংশ রক্ষা করিয়াছিলেন। মনুসংহিতায় যে দ্বাদশ বিধ পুত্রের লক্ষণ দেখা যায়, তন্মধ্যে ক্ষেত্রজ সন্তান দ্বিতীয় স্থলে পরিগৃহীত হইয়াছে।

ক্ষেত্রজ সন্তানের বিধি এখনও ভারতবর্ষে একেবারে অপ্রচলিত নাই। ছোট নাগপুর প্রদেশে ভূম্যাধিকারিদিগের মধ্যে (১) এখনও এই প্রথা বিদ্যমান দেখা যায়

১৩ প্রাচীনকালে ব্যভিচার দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত নহে

এইপর্য্যন্ত বিবাহিত দিগের ব্যভিচার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা এবং ক্ষেত্রজ প্রভৃতি পুত্র লক্ষণ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, আদিম আর্য্যগণ ব্যভিচারকে তাদৃশ দোষাবহ জ্ঞান করিতেন না পুরাণাদিতে ক্ষেত্রজের ন্যায় কানীন পুত্র পদ্ধতিও বিলক্ষণ দেখা যায়, বেদব্যাস এবং কর্ণের জন্ম বিবরণই আমাদের উক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদি বল অনেক স্থলে গোপনে এইরূপ ব্যভিচার হইয়া থাকে, তাহা সমাজ মধ্যে দোষাবহ নহে; কখনই এরূপ হইতে পারে না। এস্থলে ইহাই পর্য্যাপ্ত প্রমাণ যে, পরদার বা পরপুরুষ গমন গর্হিত কার্য্য বলিয়া বোধ থাকিলে, ব্যাসজননী কখনই স্বপত্নীতনয় ভীষ্মের নিকট পরাশর সমাগম বিবরণ অসঙ্কুচিতচিত্তে বর্ণন করিয়া তাঁহাকে নিজ পুত্র-বধুদিগের গর্ভে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করিতে অনুরোধ করিতেন না। এবং কুন্তীও কদাপি যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের প্রেতকৃত্য করিতে অনুরোধ করিতেন না। বিশেষতঃ কর্ণের প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইলে পাণ্ডবগণ মাতার ব্যভিচার নিবন্ধন লজ্জিত না হইয়া বরং জ্যেষ্ঠের

(১) কেবল ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন কেন ভ্রাতার মৃত্যু হইলে ভ্রাতৃজায়ার পাণিগ্রহণ প্রথাও বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। এই প্রথা এখন ভারতবর্ষে নিকৃষ্ট বর্ণের মধ্যে চলন আছে।

(১) ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ
গূঢ়োৎপন্নোপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চষট্।
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ং দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদ-বান্ধবাঃ ॥

মৃত্যু জন্য বিশেষ শোকাকুল হইয়াছিলেন।

শাস্ত্রে যে ব্যভিচার ভয়ানক পাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এ শাসন তৎকালে পুস্তক-গত ছিল। বর্ত্তমান বৈষ্ণবদিগের মধ্যে মৎস্যাহার নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রায় সকল বৈষ্ণবই মৎস্যাহার করিয়া থাকেন; মৎস্যাহারী বলিয়া সমাজ মধ্যে পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করেন না। পুরাকালে ব্যভিচার সম্বন্ধেও এইরূপ আচরণ ও ব্যবস্থাগত পার্থিক্য থাকা বিলক্ষণ অনুভব হয়।

১৪ প্রাচীন য়িহুদীজাতি বাইবেল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এব্রাহেম স্বদেশে দুর্ভিক্ষ হইলে অগত্যা দেশত্যাগ করিয়া মিসর দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এব্রাহেমের পত্নী সারা পরমা সুন্দরী। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, সারা আমার পত্নী. মিসররাজ একথা অবগত হইলে সারাকে রক্ষা করা দূরে থাকুক, আত্মজীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য। অতএব সারার আশা পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-জীবন রক্ষার্থই সতর্ক হওয়া উচিত। যাহা হউক মিসর রাজের প্রশ্ন ক্রমে তিনি সারাকে সহোদরা বলিয়া পরিচয় দিলেন। রাজাও নিঃসঙ্কোচে সারাকে স্বীয় মহিষী করিলেন। সারাও এব্রাহেমের প্রতি স্নেহ বশতঃ গুহ্য কথা ব্যক্ত করিলেন না। কালে রহস্য ভেদ হইলে মিসররাজ সারাকে ত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার এবাহেমের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এব্রাহেমও তাঁহাকে অসঙ্কোচভাবে গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার পতিপত্নী ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

এপর্য্যন্ত এব্রাহেমের সন্তানাদি হয় নাই। হাগার নাম্নী সারার একটি পরিচারিকা ছিল। তিনি এব্রাহেমকে হাগারেতে উপগত হইয়া সন্তানোৎপাদন করিতে অনুরোধ করেন। এব্রাহেম পত্নীর অনুরোধে হাগারের গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন।

লট নামা অপর এক ব্যক্তির কন্যাদ্বয় ব্যতীত আর সন্ততি ছিল না। দুহিতারা পিতাকে সুরাপান করাইয়া তৎসহযোগে গর্ভ সম্ভব করে। লটের বৃদ্ধ বয়সে স্নেহময়ী আত্মজা দৃষ্টে কামোদ্ভব হওয়া অপেক্ষা যৌবনোন্মত্তা দুহিতাদিগের অন্য সুযোগাভাবে ছলক্রমে স্বীয় জনককে রমণে প্রবৃত্ত করাই অধিক সম্ভব পর বোধ হয়। বাইবেলে লিখিত আছে কন্যাগণ এক মাত্র পিতৃবংশ রক্ষার্থই এই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

আইজাক্ নামা অপর একজনও স্বদেশের দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন মিসর দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার পত্নী সম্বন্ধে অবিকল এব্রাহেম ও সারার ন্যায় ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

কোন সময়ে আইজাক্ স্বীয় পুত্র যাকুবকে বলিয়াছিলেন, তুমি তোমার মাতুল গৃহে যাইয়া তাহার এক তনয়াকে বিবাহ কর। তদনুসারে যাকুব কিছু দিন মাতুল গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক লীয়ন ও বিকেল নাম্নী মাতুলতনয়াদ্বয় সহ আশক্ত হইলেন। তাহার মাতুল ভাগিনেয়ের এই আচরণে বিরাগ

প্রকাশ করা দূরে থাকুক বরং সানন্দচিত্তে ভাগিনেয়কে কন্যা দান করিলেন।

কোন সময়ে জাদা কোন দেশীয় একটি স্ত্রীলোককে দর্শন মাত্র কামোপহতচিত্ত হইয়া তাহার প্রতি বলপ্রকাশ করে। জাদা পরিশেষে ঐ রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জুদা নামা একজন লোকের আর, আনান ও সেনার নামা তিন পুত্র ছিল। আর পরলোক গমন করিলে, জুদা দ্বিতীয় তনয় আনানকে আরের বংশ রক্ষার্থ তাহার পত্নীতে উপগত হইতে অনুরোধ করেন। আনান ভ্রাতার বংশ রক্ষায় সম্মত ছিলেন না, কিন্তু ভ্রাতৃপত্নীসহবাস লোভ সংবরণেও অসমর্থ ছিলেন। সুতরাং যাহাতে গর্ভ সঞ্চার না হয় তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকিয়া ভ্রাতৃজায়াকে উপভোগ করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে জুদার সহধর্ম্মিণী প্রাণত্যাগ করে। তদীয় পুত্র বধু মৃত আরের পত্নীর নিতান্ত ইচ্ছা ছিল শ্বশুরের দ্বারা স্বকীয় জিজনবিষা বৃত্তি চরিতার্থ করে। এদিগে জুদাও পত্নীহীন হওয়াতে নিতান্ত স্মরপীড়িত হইতে ছিলেন। একদা ঐ রমণী পথি মধ্যে শ্বশুরকে আসিতে দেখিয়া স্বীয় মনোভিলাষ পরিপূরণ বাসনায় ছদ্মবেশে দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময় জুদাও আসিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। পরিশেষে এই ঘটনা সমাজ মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল। জুদাও নিরুদ্বেগে সমাজ মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা অনুমাত্রও নিন্দিত হইয়াছিলেন না।

১৫ গ্রীক ও রোম জাতি গ্রীক ও রোম জাতির ইতিহাস পাঠ করিলেও এবিষয়ের বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আদিম গ্রীক অথবা রোমদিগের মধ্যে অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেবৌরসে মানবী গর্ভে, অথবা মানবৌরসে দেবীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে বিধবা বা কুমারী গর্ভবতী হইলেই ঐগর্ভ দেবসম্ভূত বলিয় প্রচারিত হইত। এবং পরিত্যক্ত জারজ সন্তান পিতৃ প্রতিপালিত হইলেই ঐ সন্তানকে দেবীগর্ভসম্ভূত বলা যাইত। জনসাধারণও মূর্খতা নিবন্ধন ঐ সকল উক্তিতে বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিত না।

১৬ স্পার্টা স্পার্টানিবাসীদিগের সহিত মেসিনাবাসীদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে (২) বিশেষ কারণ বশতঃ স্পার্টা বাসীদিগকে বিংশতিবর্ষ কাল শত্রুরাজ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। এদিগে পুরুষের অভাবে স্পার্টা নির্ম্মনুষ্য হইবার আশঙ্কায় স্ত্রীলোকেরা বারংবার পুরুষদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিতে লাগিল। জন্মভূমির গৌরব রক্ষায় তৎপর স্পার্টাবাসীরা সন্তানোৎপাদন নিমিত্ত আপনাদিগের

---

(১) এই ঘটনা অস্মদ্দেশেও নিতান্ত অপ্রচলিত নহে। আমাদিগের দেশেও অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেবৌরস বা দেবীগর্ভ জাত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২ এই যুদ্ধকে ইতিহাসে প্রথম মেসেনীয় সংগ্রাম বলে।

মধ্য হইতে পঞ্চাশ জন সবল যুবাকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। এই বিংশতি বর্ষকাল মধ্যে স্পার্টাতে কুমারীদিগের গর্ভে যত লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিল, সমুদায়ই যে ঐ পঞ্চাশৎ ব্যক্তির সন্তান তাহা বলা বাহুল্য।

১৭ আরব জাতি — পূর্ব্বতন আরবদিগের বিবাহবন্ধন অধুনাতন আবিসিনীয়দিগের ন্যায় শিথিল ছিল। দম্পতীর মধ্যে একজন ইচ্ছা করিলেই বিবাহ ভঙ্গ হইত। এইমাত্র বিশেষ ছিল যে, পত্নী ইচ্ছা পূর্ব্বক পৃথক্ হইলে ভর্ত্তার প্রতিশ্রুত স্ত্রীধন (যাহা প্রাপ্ত হয় নাই তাহা) পাইতনা।

১৮ বহুবিবাহ ও মুসলমান — বহুবিবাহ প্রথা কেবল আর্য্য জাতির মধ্যে চলন ছিল এমন নহে। মধ্য সময়ের মুসলমানদিগের মধ্যেও এই প্রথা বিলক্ষণ ছিল এবং এখনও আসিয়াখণ্ডের অনেক দেশেই বহুবিবাহ প্রথার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অধুনাতন হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যেও এই প্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত আছে। বিশেষতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহবন্ধন এখনও শিথিলভাবাপন্ন (১) ইচ্ছা করিলেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া পরস্পর পৃথক্ হইতে পারে।

১৯ উপসংহার — পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে "স্বেচ্ছাবিহার অতি অল্প কাল মাত্র প্রচলিত ছিল। স্বেচ্ছাবিহারের প্রতিবন্ধকস্বরূপ বিলাসিনীতে স্নেহ উপস্থিতি স্বাভাবিক। স্নেহ বশতই লোকে প্রথমত সাময়িক দাম্পত্যে পরিশেষে চিরদাম্পত্যে বদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও ব্যভিচারের স্রোত বন্ধ হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাবলীতে ইহাই স্থিরীকৃত হইল। বাস্তবিক সন্তানাদি লালন পালন প্রভৃতি কষ্টসাধ্য বলিয়া লোকে সহসা বিবাহ করিতে সম্মত হইত না। দেশীয় সংহিতাকারগণও এই নিমিত্তই নানা রূপ প্রলোভ দেখাইয়া লোককে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতেন। আর্য্যদিগের মধ্যে পুত্রোৎপাদন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া (১) স্বীকৃত হইয়াছে। সোলনের ব্যবস্থা ও বিবাহিতের পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল। মুসার ব্যবস্থানুসারে বিবাহিত ব্যক্তি এক বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধে গমন করিত না। ফলতঃ সর্ব্বদেশীয় সংহিতাকারগণই সমাজ স্থিতির প্রধান বিপক্ষ ভয়ঙ্কর পাপজনক

(১) অল্প দিন হইল, আমাদিগের পরিচিত এক জন ভদ্র মুসলমান ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময় তাঁহার পত্নী অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন। পত্নীর পিতা ও অপর আত্মীয়গণ বিধর্ম্মীর সহিত সম্পর্ক উচ্ছেদ আবশ্যক ভাবিয়া, জামাতাকে স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। তিনিও মাহাম্মদীয় আইন অনুসারে, অপ্রাপ্তবয়স্কা পত্নী রাখিতে পারিবেন না বলিয়া অগত্যা পরিত্যাগ করিলেন।

(১) অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বাচ শক্তিতো যজ্ঞৈর্ম্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥
অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥
মনুসংহিতা।

ব্যভিচার দোষ বিদূরণার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পর্য্যায় ক্রমে বিজ্ঞান (১) শাস্ত্রের ন্যায় বিবাহও তিন অবস্থায় অবস্থিতি ছিল। যথা স্বেচ্ছাচার, সাময়িক ও চিরদাম্পত্য।

মানব জাতি উন্নতিশীল, তাহারা চিরকাল কখনই এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন শোচনীয় অবস্থায় অবস্থিত থাকিতে পারে না। তাহাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির যত উন্নতি হইবে, স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি পাপ প্রবৃত্তিও তত দুর্ব্বল হইতে থাকিবে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হেনরী টমাস বক্‌লস্‌ বলেন "নীতি সম্বন্ধে মানবজাতি কখনই উন্নতি করিতেছেনা। মানবজাতির নীতিজ্ঞান পূর্ব্বে যত দূর ছিল, এখনও ততদূর আছে মনুষ্য নীতি ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই উন্নত হইতেছে।" কিন্তু আমরা এই মতের সম্পূর্ণ প্রতিকূলবাদী। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মানবজাতি নীতি সম্বন্ধেও প্রচুর উন্নত হইতেছে, এবং সেই উন্নতি প্রভাবেই বর্ত্তমান বিবাহ প্রণালী সমাজ মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে।

প্রাচীন আর্য্যজাতির মধ্যে ন্যায়পরতার ভাব অপেক্ষা দয়ার ভাগই অধিক ছিল, তন্নিবন্ধন অধুনাতন হিন্দুদিগের মধ্যে দয়ার ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা যায়। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও ইংরেজ জাতির সংসর্গ প্রযুক্ত আমাদিগের সেই চিরন্তন অভাব বিদূরিত হইয়া ন্যায়ের ভাব ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

একথা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে যে, স্বেচ্ছা বিহার সামাজিক দোষের আকর। যত প্রকার ভয়ঙ্কর পাপ আছে সমুদায়ই এই পাপের সহচর। জনসমাজের বুদ্ধিবৃত্তি কিঞ্চিৎ উন্নত হইলেই তাহারা স্বেচ্ছা বিহারের দোষ ক্রমশঃ দেখিতে পাইল, এবং সেই দোষ দূরীকরণার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টাও করিতে লাগিল। আর বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা দেখিলে মনুষ্য সমাজের অবস্থা কত উন্নত হইয়াছে তাহাও অনায়াসে উপলব্ধি হইতেছে।

মানব জাতির শারীরিক ও মানসিক অবস্থাদি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহায্যে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিবে এবং সকলেই পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিবে ও সকলেই পরস্পর প্রণয় পূর্ব্বক সংসারে অবস্থান করিয়া ব্যক্তি বিশেষে জগৎপিতার নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া বিশেষ সফল করিবে। এই উদ্দেশেই তাহারা সংসারে আগমন করিয়াছেন এবং সকলে সমবেত হইয়া পরমপিতার উদ্দেশ্য সফল করিয়া তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিবেন। ব্যভিচার প্রভৃতি পাপগুলি ঐশিক নিয়মের বিরোধী, অতএব সর্ব্বতোভাবে তাহা পরিত্যজ্য। অন্যথা বিরুদ্ধ আচরণ করিলে ভগবানের নিকট বিশেষ দায়ী হইতে হইবে।

(১) দৈব, পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ।

উষা

(ঋগ্বেদ হইতে।)

পরিণেতা যোষা সমদীপ্তি দান
মোদের হৃদয়ে-সুখের নিদান,
তোমার কৃপায়, অয়ি উষা দেবি!
ঘোর অন্ধকার হইল নাশ।
উঠিল মানব তব পদ সেবি,
তব কান্তি চ্ছটা হ'লো প্রকাশ ॥ ১

দূরে বা নিকটে করিয়া গমন
চেতাইলে যত জীব অগণন,
সবে স্বীয় কার্য্যে হলো ধাবমান
হেরিয়া তোমার মধুর বেশ,
ধন প্রসবিতা কৃপার নিদান
সুবর্ণ বরণ শোভা অশেষ ॥ ২ ॥

দ্যুদেবতা পুত্রী কমনীয়া উষা
অঙ্গে শোভে সদা রমণীয় ভূষা,
স্তুতিপ্রিয় অতি, মরণ-রহিত,
এস যজ্ঞ স্থানে ডাকি তোমায়।
কর দেব বালা আমাদের হিত
নিয়োজিত মোরা তব পূজায় ॥ ৩।

যথা প্রভাতের হইলে আলোক,
তোমার আজ্ঞায় যত দেব লোক
সোমরস পানে আনন্দ অন্তরে
যজ্ঞস্থানে সবে করে গমন।
গো, অশ্ব, অন্ন আমাদের ঘরে
তেমতি কৃপায় কর স্থাপন ॥ ৪ ॥

দুর্ব্বল হউক বিপক্ষের বল,
তব জয়ধ্বনি আমরা সকল
পবিত্র হৃদয়ে করিব প্রদান।
বিচিত্র বসনা মঙ্গলময়ি!
সতত করিব তব যশঃ গান
হই যেন মোরা বিপক্ষ জয়ী। ৫ ॥

— ০ঃ —

মৃত্যুকালে মিবারাধিপতি রাণা প্রতাপ সিংহের তৎপুত্র উমরার প্রতি উক্তি। *

"এই ক্ষুদ্র হীনবাসে, বিমলিন দীনবাসে,
মরণ শয্যায় আমি শয়ান এখন।
চিন্তায় শরীর শীর্ণ, জ্বরেতে হয়েছে জীর্ণ,
বধির হতেছে কর্ণ, নিস্পন্দ নয়ন ॥

এতদিনে ভগবান, হইলেন কৃপাবান,
ঘুচিল আমার আজি মর্ত্ত্যকারাবাস।
কি করিতেপারে আর মুসলমান দুরাচার?
এড়ালাম আমি তার অধীনতা-পাশ ॥

জীবনে স্বাধীন রয়ে, এখন অকুতোভয়ে,
মরণে অমরালয়ে করিব গমন।
এই মাত্র খেদ মনে, আমি গেলে প্রাণপণে
বিদেশী শৃঙ্খল কেবা করিবে ছেদন?

হইয়া দুর্দ্দিনগ্রস্ত, যদিও ছিলাম ব্যস্ত,
করি নাই কভু আমি আশা বিসর্জ্জন।
গিরিগুহা করি বাসা, জয়করি ক্ষুৎপিপাসা
বাঁচায়েছি এত দিন স্বাধীনতা ধন ॥

হয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ, কুলগর্ব্বঅভিমান
রাখিয়াছি বনে বনে করিয়া ভ্রমণ।
বসি শুষ্ক তৃণাসনে, ভাবিতাম তবু মনে,
কিছার যবনাধীনে রাজ-সিংহাসন?

সোণার পিঞ্জরে পাখী যদিও ধরিয়ারাখি,
সুধাময় ফল যদি নিত্য দিই তাকে,
তথাপি তাহার মন, উড়ু উড়ু প্রতিক্ষণ,
পলাতে পারিলে পর আর সেকি থাকে?

* কার্থেজিনীয় সেনাপতি হেমিল্কার তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যে প্রকার স্বীয় পুত্র হেনিবলকে প্রবল রোমক দেশীয়দিগের প্রতি বৈরভাব উদ্দীপ্ত রাখিবার নিমিত্ত শপথ করাইয়াছিলেন, সেই প্রকার প্রতাপ রাণাও মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়া তাঁহার পুত্র উমরাকে ডাকাইয়া যাবজ্জীবন যবনের প্রতি বৈরাচরণ করণার্থ শপথ করাইয়াছিলেন।

অধীনতা চেয়ে হায়! কষ্ট কিবা এ ধরায়?
স্বাধীনতা চেয়ে আর আছে কিবা সুখ?
মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গসম, স্বাধীনতা মনোরম;
নাই যার তার প্রতি বিধাতা বিমুখ।।

অধীনতা নাম শুনি, শৃঙ্খলের ঝন ঝনি
কার না শ্রবণে পশি, শান্তি করে দূর?
ঐ নামের বিপরীত, সর্ব্বজন মনোনীত,
স্বাধীনতা নাম আহা! কিবা সুমধুর।।

কোথা হায় হিন্দুসূর্য্য* বাপ্পা রাও মহাবীর্য্য?
†বাহ্লিক ‡ গান্ধারে যাঁর ছিল অধিকার।
যবনের রাজ্য নিয়া, যবনী করিয়া বিয়া,
স্বনামে পাঠান-বংশ স্থাপিত যাহার।।

কোথা পৃথুরাজপ্রিয় যোগী যোদ্ধা জিতেন্দ্রিয়
রাজর্ষি ॥ সমর্ষি বীর দেশ হিতে রত?
বনে করিতে ক্ষয়, ত্যজি নিজ শৈলালয়
কাগার ক্ষেত্রেতে যিনি হইলেন হত।।

কোথা সেই § কাংড়াবতী? জিনিয়া অমরাবতী
মিবার শৈলের সিরে কিরীট ভূষণ!
কপিগণে যে প্রকারে লঙ্কা দিল ছারে খারে
যবনে সে পূরী হায়! করেছে দহন।।

বাপ্পাকুলে জনমিয়া করিলাম কোন্ ক্রিয়া
নারিলাম খেদাইতে নিষ্ঠুর যবনে।

গৃহনির্ব্বাসিত হয়ে, শৈলে শৈলে ভয়ে ভয়ে
এতদিন এতকষ্টে ছিলাম জীবনে।।

তুমি যদি, হে উমর, হও মম বংশধর,
মম রক্ত থাকে যদি ও দেহে কিঞ্চিৎ
স্পর্শিয়া আমার মাথা, শপথ করহ হেথা
সন্ধি করিবে না কভু যবন সহিত।।

যদ্যপিও মুসলমান দিতে চায় ধন মান,
তার কাছে তবু নাহি করিবে গ্রহণ।
লহ এই তলবার ইহারে করিয়া সার,
কর গিয়া রিপু সঙ্গে আমরণ রণ।

এই তলবার বলে, দেবীরে * যবন দলে
দলিয়াছি তাহাদের শিবিরে পশিয়া।
এই তলবার খান † আবদুল্লা রক্তপান
করিয়াছে ভয়ঙ্কর রণে বিলসিয়া।

লয়ে এই তলবার, কর গিয়া মহামার,
নতুবা সমরে পড়ি যাও স্বর্গধাম।
যতদিন প্রাণ ধরি, রবে একজন অরি,
তত দিন এই অস্ত্রে দিওনা বিশ্রাম।।

তুমি যদি শত্রুগণে, নাশিতে না পার রণে
মৃত্যু কালে পুত্রদিগে দিবে এই ভার।
সূর্য্যতেজা সূর্য্যবংশ, অচিরে ওদিগে ধ্বংশ
অবশ্য করিবে, এই বিশ্বাস আমার।।

এ জীবন দিন-ক্ষয়ে, দেখিতেছি অসংশয়ে
দূরস্থ আগন্তু ভাবী ঘটনার ছায়া।
নিদ্রা হতে আর্য্যজাতি, উঠিয়া বীরত্বে মাতি,
ছিঁড়িতে দাসত্ব পাশ ঝাড়া দিয়া কায়া।।

ভয়েতে বিজাতিগণ করিতেছে পলায়ন;
প্রতিদিকে প্রতিধ্বনি 'ভারতের জয়'।
বিদ্যাধর ললশয়, 'ভারতের জয় গায়;
পুষ্প বৃষ্টি করে সুরে হইয়া সদয়।।

---

* বাপ্পা রাও প্রমর কুলান্তর্গত মোরি বংশ লোপ করিয়া চিতোর অধিকার করেন। ইনি হিন্দুসূর্য্য নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি মিবার বা উদয়পুর রাজকুলের আদিপুরুষ।

† অধুনা বল্‌খ নামে বিখ্যাত।

‡ কান্দাহার।

॥ মহমুদ গজনবী কর্ত্তৃক ভারতাক্রমণ সময়ে রাওল সমর্ষি চিতোরের অধিপতি ছিলেন। বিখ্যাত কবি 'চন্দ' ইহাকে পরমজ্ঞানী ধার্ম্মিক এবং যোদ্ধা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইনি দিল্লীশ্বর পৃথুরাজের ভগিনীপতি ছিলেন।

§ দুর্গবতী কাংড়াবতী বা কাংড়ারাণী চিতোরের নাম।

* দেবীর নামক স্থানে রাণা প্রতাপসিংহ মোগল সেনাপতি সাহবাজের সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

† আবদুল্লা আকবর সাহের আদেশানুসারে কোমল মেরু নামক দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। সেইখানেই তাহাকে প্রতাপ সিংহ নিহত করেন।

লক্ষ্মী আর বাগীশ্বরী, স্বর্গ হতে অবতরি,
ভারতের হৃদিপদ্মে করিলা আলয়।
বাল্মীকি ও বেদব্যাস, চন্দ আর কালিদাস,
গাইছেন সুধা স্বরে 'ভারতের জয়'॥

এইমত বাক্য বলি, নীরব হলেন বলী
আসন্ন মরণে মনে উৎসাহ প্রবল।
অমরা দেখিয়া তাঁরে, ভাসে শোকপারাবারে
নয়ন হইতে ঝরে ধারা অনর্গল॥

স্পর্শিয়া পিতার শির, শপথ করিলা বীর,
যুঝিব যবন সঙ্গে করি প্রাণপণ।
শুনিয়া সুতের কথা, দূরে গেল মৃত্যু ব্যথা,
আহ্লাদে প্রতাপসিংহ ত্যজিল জীবন।

—ঃঃ—

ভারতের প্রাচিন সমাজ।

(পাপ্ত।)

ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যদিগের অধিকাংশ কীর্ত্তি লুপ্ত হইয়াছে এবং জ্ঞান ও বিদ্যালোচনার অভাবে অদ্যাপি তাঁহাদিগের অনেক কীর্ত্তি খনিগর্ভস্থ কাঞ্চনের ন্যায় মলিন ও আবৃত হইয়া আছে, এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। এই অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সভ্যতার শ্রেণীতে তাঁহারা কোন্ পদবীতে উঠিয়াছিলেন, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত করা দুরুহ, আর কেবল এই অজ্ঞতার ফলেই আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, গ্রীক এবং রোমীয়দিগের তুলনায়, প্রাচীন আর্য্যদিগকে অধঃস্থান প্রদান করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিতেরা ঐ দুই জাতির উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত ছিলেন, অথচ ভারতের সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। পরন্তু তাঁহাদিগের ভালমন্দ-বিচার, বাসনা, রুচি প্রভৃতি মনের গতিও ঐ গ্রীক এবং রোমক দিগের আদর্শানুসারে গঠিত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহারা প্রাচীন আর্য্যদিগকে অধস্থ করিবেন আশ্চর্য্য কি। এ কথাও স্মরণ করা আবশ্যক যে, স্বজাতীয় গৌরব বৃদ্ধি কামনা মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ। আসিয়ার তুলনায়, গ্রীক ও রোমের গৌরব ইউরোপীয় সকল জাতিরই গৌরবের কারণ। অতএব ঐ পণ্ডিতগণের তাহাদিগের সহিত ভারতের তুলনায় এই আত্ম গৌরবের বাসনা বশতঃ জ্ঞানতঃ না হউক অজ্ঞানতঃ কিঞ্চিৎ পক্ষপাত করাও সম্পূর্ণ সম্ভব।

প্রাচীন ভারতের এই অগৌরবের আর একটি কারণ আছে। তাহা স্মরণ করিতে আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এবং বোধ হয় মাতৃভক্ত এমন ভারতবাসী নাই, যাহার হৃদয়ও তাহা স্মরণ করিলে আমাদিগের ন্যায় বিদীর্ণ না হইবে। আমরা প্রাচীন আর্য্যদিগের সন্তান বলিয়া পরিচিত না হওয়াই ভারতের গৌরব রক্ষা-পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল। বিদেশীয়েরা আমাদিগের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদিগের প্রাচীন আর্য্য পুরুষদিগের তেজস্বীতা এবং সভ্যতার প্রতি সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপনে শঙ্কা করেন। তাঁহারা অনুমান করেন, যে ভারতবাসী দিগকে এইক্ষণে ঈদৃশ হীন ও নিস্তেজ দেখিতেছি, তাহাদিগেরই প্রাচীন পুরুষেরা তেজস্বী গ্রীক ও রোমীয়দিগের সমকক্ষ কদাচই হইতে পারে না। তাঁহারা স্ফুট বাক্যের দ্বারা এইরূপ তর্ক অনেক স্থলে না করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রত্যেক তর্কেই চিত্তের এইরূপ গতির

ফল অবশ্যই মিশ্রিত থাকে। আমাদিগের মধ্যে প্রকৃত তেজস্বীতার কলিকা মাত্রও লক্ষিত হয় না। অতএব বিদেশীয়েরা আমাদিগের দৃষ্টান্তে প্রাচীন আর্য্যদিগের ক্ষমতা সম্যক্ বিশ্বাস না করাই বা আশ্চর্য্য কি ?।

সৌভাগ্য ক্রমে দেশ বিদেশে প্রাচীন ভারতের আলোচনা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে এবং তদ্দ্বারা তাহার দীপ্তিও ক্রমেই প্রকাশ ও ব্যাপ্ত হইতেছে। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, শ্রদ্ধাস্পদ আর্যগেণের অনেক কীর্ত্তি লুপ্ত হওয়া সত্বেও যে সকল কীর্ত্তি অদ্যাপি অজ্ঞতার গর্ভে আবৃত রহিয়াছে, সম্যক্ আলোচনা দ্বারা প্রকাশিত হইলে প্রাচীন ভারত, গ্রীক ও রোমের সমকক্ষতা কেন, পূর্ব্বতন সভ্য পৃথিবীর মস্তকে শিরোমণি স্বরূপে প্রদীপ্ত হইবে। আর্য্য সন্তান বর্ত্তমান ভারতবাসীদিগের কর্ত্তব্য, তাঁহারা একান্ত মনে প্রাচীন আর্য্য দিগের কীর্ত্তি ও ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করেন। তদ্দ্বারা জাতীয় গৌরব প্রকাশই একমাত্র বা প্রধান ফলও নহে। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তদ্দ্বারা ইউরোপের সমুন্নত বর্ত্তমান সভ্যতার অনেক দোষ সংস্কার হইতে পারিবে এবং প্রাচীন পুরুষদিগের তেজস্বীতা দর্শনে আমাদিগেরও অন্তরে তেজস্বীতা জন্মিবে। এই অভিপ্রায়ে মহর্ষিদিগের গ্রন্থ পাঠই যথেষ্ট নহে। পাঠান্তে গ্রন্থ বন্দ করিয়া তাহাদিগের গঠিত সমাজের প্রকৃতি বিশেষ চিন্তা ও অনুশীলন করিতে হইবে। আধুনিক সভ্যতার মূলে, ইউরোপে যে প্রণালীতে সমাজ স্থাপিত হইতেছে, তাহাতে এমন অনেক দোষ লক্ষিত হইতেছে, যাহা প্রাচীন আর্য্যসমাজে দৃষ্ট হইত না। নানা দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সমাজের প্রকৃতি অনুশীলন যেরূপ মঙ্গলজনক, আর কোন অধ্যয়নই তদ্রূপ ইষ্টকর কি না সন্দেহ স্থল। এবং সুযোগ্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণ মহর্ষিদিগের গঠিত প্রাচীন আর্য্যসমাজ যতই অনুশীলন করিবেন আধুনিক সমাজ সংস্কারের ততই উপায় দৃষ্ট হইবে। এই বিষয়ে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ অপেক্ষা দেশীয় পণ্ডিতেরা বেশি ক্ষমবান হইবেন। প্রথমোক্ত পণ্ডিতেরা আধুনিক সমাজের একরূপ নির্ম্মাতা, সুতরাং তৎপ্রতি তাহাদিগের স্নেহ সর্ব্বদাই থাকে তাঁহারা আবার ঐ সমাজ কর্ত্তৃকই লালিত পালিত হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের রুচিও অনেক অংশে ঐ সমাজের অনুবর্ত্তী এই স্নেহ ও রুচি বিষয়ে সানুকূলতা ইউরোপীয় সমাজের অনেক দোষের প্রতি তাহাদিগের নয়নকে অন্ধ করে, এবং অন্য জাতির সমাজে তত্তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলেও তাহা অনুভব করিতে দেয় না। ভারতের প্রাচীন সমাজ অনুশীলনে দেশীয় সুশিক্ষিত পণ্ডিতদিগের প্রতি এইরূপ আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই। কারণ ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষার, এবং ইউরোপীয় রীতি প্রকৃতি সতত দৃষ্টে উক্ত পণ্ডিতদিগের চিত্তে স্বদেশীয় রুচির ইদৃশ গাঢ়ত্ব নাই, যদ্দ্বারা বিদেশীয়দিগের শ্রেষ্ঠত্ব দর্শনে নয়ন অন্ধ হইতে পারে। বিশেষ আমাদের বর্ত্তমান সমাজ ভারতের প্রাচীন সমাজ হইতে অনেক বিভিন্ন। শেষোক্ত

সমাজের প্রতি প্রাচীনত্ব জন্য যে শ্রদ্ধা আছে, তদতিরিক্ত শ্রদ্ধা এইক্ষণে সুশিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রায় নাই। এ অবস্থায় রুচি বা পক্ষপাতিত্বের দ্বারা অন্ধ হওয়া বিরল সম্ভব। আমরা ভারতের প্রাচীন সমাজ সবিশেষ আলোচনা করার মানস করিয়াছি। এই গুরুতর বিষয়ের যোগ্যতার প্রতি আমরা দাবি রাখিনা। আমাদিগের ক্ষুদ্র চেষ্টা দৃষ্টে সুযোগ্য ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন, এই প্রধান ভরসা। আমরা বিবেচনা করি এই বিষয়ের নিমিত্ত বিশেষ অভিনিবেশ ও চিন্তা সহকারে আদ্যোপান্ত মহাভারত, রামায়ণ ও মনু পাঠ নিতান্ত প্রয়োজন এবং আমরা ঐ তিন গ্রন্থকে প্রধান অবলম্বন করিয়া এই প্রস্তাব লিখার মানস করিয়াছি।

মুসলমান কর্তৃক পরাজয়ের পূর্বস্থ সমুদায় কালের ভারতই প্রাচীন ভারত বলিয়া গণ্য হয়। এই কাল কত বৎসর ব্যাপী তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। হিন্দুদিগের গণনানুসারে প্রায় ৪,৩২,০০,০০,০০০ বৎসর হইবে, এবং ইউরোপীয় গণনানুসারে কেবল ৪০০০ বৎসর, বা প্রায় তত্তুল্য কোন সংখ্যক বৎসর হইবে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত কোন কোন ঘটনার সময়ে গ্রহ নক্ষত্রাদির যোগ বিয়োগ এবং স্থিতি সঞ্চারাদি সম্বন্ধে যে দুই একটি আভাস দৃষ্ট হয়, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তদ্দ্বারা জ্যোতিষ গণনা করিয়া তাহার সহিত নানা প্রকার যোড়া তালি দিয়া উপরোক্ত কাল নির্ণয় করেন। নষ্টোদ্ধার সম্বন্ধে তাঁহাদিগের এইরূপ অধ্যবসায় ও অনুশীলন অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁহাদের লব্ধ ফলের প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস নাই। বস্তুত ভারতের অভ্যুদয় কোন সময় হইতে আরম্ভ হয়, অদ্যাপি স্থূলরূপেও তাহার কিছুই স্থির হইতে পারে নাই। কিন্তু এই অভ্যুদয় যে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়াছিল এবং গ্রীক ও রোমীয় প্রভৃতির স্থায়িত্ব যে অনেক অংশে তাহার ন্যূন ছিল, তৎসম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ আছে এবং বোধ হয় তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। এস্থলে আমরা সংক্ষেপে বলিতেছি যে প্রাসাদ আদির ন্যায় উন্নত কোন সমাজের স্থায়িত্ব দৃষ্টে নির্ম্মাণ কৌশল প্রকাশ পায়। অসার নিয়মের উপর স্থাপিত সমাজ কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। এবং যে সমাজ কয়েক দিনমাত্র উন্নত থাকিয়া ভূমিসাৎ হয়, তাহার মূলগত নিয়ম অসার থাকাও সহজেই অনুমান হইতে পারে। ইহার বিস্তার প্রয়োজন মতে স্থানান্তরে; বিবৃত হইবে।

কেহ মনে করিবেন না যে আর্য্যসমাজ, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, চিরকাল এই অবস্থায় ছিল। অনেক লেখকেরা এই স্থূল বৃত্তান্তটির প্রতি প্রণিধান করেন নাই। মনুর বর্ণিত নিয়ম ও রীতি নীতি সমুদায়ই এক সময়ে প্রচলিত ছিল না। মনুতে "ব্রাহ্মণ কর্তৃক শুদ্রবধ ও বিড়াল বধ তুল্য" নির্দ্দেশ আছে বলিয়া কেহ অনুমান করিবেন না যে, ব্রাহ্মণেরা কোন কালেও শূদ্র হত্যাকে নর হত্যার মধ্যে গণ্য করেন নাই। যত কাল মনুর নির্দ্দিষ্ট এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, সে সময়ে "অহিংসা

পরমো ধর্ম্ম” প্রভৃতি গরীয়ান্ মত সকল উদ্ভাবিত হইয়াছিল না। মুসলমানদিগের মধ্যে যে প্রকার হকসকা অর্থাৎ অগ্র ক্রয়াধিকার আছে, পূর্ব্বকালে ইংরেজ সমাজে স্ত্রীসাধারণ সহবাসেও রাজার তদ্রূপ সত্ব ছিল। পরে প্রজাগণ এক বিশেষ শুল্কের দ্বারা রাজাকেও অধিকার সঞ্চালন হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল। ব্লাকষ্টন্ সাহেবের লিখিত ইংরাজি আইনের টিকার মধ্যে এই নিয়ম দেখিয়া বর্ত্তমান ইংরেজ সমাজের দাম্পত্যের প্রতি কেহ দোষারোপ করিলে যেরূপ ভ্রান্তি জন্মিবে, মনুসংহিতার সমুদায় নিয়ম আর্য্য সমাজে একদা চলিত থাকা অনুমান করিলেও তদ্রূপ ভ্রান্তি জন্মিবে।

প্রাচীন আর্য্যগণ পুরাবৃত্ত না লিখায় তাঁহাদিগের উন্নতির গতি স্থির করার কোন উপায় নাই। কিন্তু রামায়ণের আর্য্য সমাজ মহাভারতের সমাজ হইতে, এবং মহাভারতের সমাজ তৎপরবর্ত্তী কবিদগণের বর্ণিত সমাজ হইতে যে, কত বিভিন্ন তাহা পরিষ্কার লক্ষিত হয়। এই সকল প্রভেদ বর্ণনা আমাদের উপস্থিত প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য নহে। পারিলে সময়ান্তরে আমরা তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিব। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের আর্য্য সমাজে প্রভেদ থাকিলেও অনেক সাধারণ ধর্ম্ম ছিল। এই সাধারণ ধর্ম্ম গুলি অনুশীলন করাই আমাদিগের এই প্রস্তাবের বিশেষ উদ্দেশ্য। তবে প্রভেদ সম্বন্ধে আমরা কেবল এই মাত্র বলিতে চাহি, রামায়ণ সময়ের আর্য্যগণের বীর্য্য এবং তেজস্বীতা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া মহাভারতের সময়ে সীমা প্রাপ্ত হয়। এমন কি মহাভারতের অবলাগণও পুরুষের ন্যায় বীর্য্যবতী, ও তেজস্বিনী ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু এই সময়ে রামায়ণের সরলতা এবং উদারতার অনেক হ্রাস হইয়াছিল। ভরত জ্যেষ্ঠের রাজ্য স্বহস্তে পাইয়াও ত্যাগ করিলেন এবং দুর্য্যোধন ভ্রাতাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য ক্ষত্রিয় কুল সহ স্বয়ংধ্বংস হইলেন। বোধ হয় এই ভারত যুদ্ধের পরই আর্য জাতির গৌরব হইল। তাঁহাদিগের তেজস্বীতা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। যে রাম বাল্মীকির হস্তে হিমাচলের ন্যায় অটল ভাবে সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, সেই রাম “রঘুবংশে” সীতাকে বনে পাঠাইতে ছিন্নমূল কদলির ন্যায় ধূলিতে লুণ্ঠিত হইলেন। মহাভারতের যে শকুন্তলা বজ্রের ন্যায় রোষ প্রকাশ ও ঋষির ন্যায় নীতি বাক্য দ্বারা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক স্বীয় পত্নীত্ব স্বীকার করাইয়াছিলেন, সেই শকুন্তলাই কালিদাসের লেখনীতে মমের পুতলীর ন্যায় গলিয়া অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া দুষ্মন্তের সভা হইতে ব্যভিচারিণীস্বরূপে ফিরিয়া গেলেন। ক্রমে তেজস্বীতার হ্রাস হওয়াতেই আর্য্যগণের রুচির এই পরিবর্ত্ত হইল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মিল।

আমরা অতীব দুঃখিত অন্তরে প্রকাশ করিতেছি যে, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল বিগত ৯ই মে তারিখে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। যিনি তাঁহার রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে একখানিও পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই এই সংবাদে যারপর নাই বিষাদিত হইবেন।

১৮০৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডদেশে, ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক প্রসিদ্ধ জেম্‌স মিল সাহেবের ঔরসে, জন মিল জন্ম গ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই মিল ইণ্ডিয়া হাউসের একজন কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু কিয়ৎকাল মধ্যে উন্নত পদারূঢ় হইয়া ছিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রথমে 'ওয়েষ্ট মিনষ্টার' রিবিউ ও এডিনবরা রিবিউ " নামক প্রসিদ্ধ পত্রদ্বয়ে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৩৫ হইতে ১৮৪০ বৎসরপর্য্যন্ত প্রথমোক্ত পত্রের সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৮৪৩ অব্দে তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রে বিশেষ কিছু নবীনত্ব আছে। তৎ সম্বন্ধে আগামী বৎসরে আমাদিগের কিছু কিছু লিখিবার মানস রহিল। বার্ত্তা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় অনেক গুলি মত তাঁহার রচিত গ্রন্থদ্বয়ে সম্যক্‌রূপে উদ্‌ভাবিত হইয়াছে। তাঁহার তুল্য অবলাবান্ধব* পৃথিবীতে অতি অল্পাই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমরা তাঁহাকে একমাত্র পার্কার* ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত তুলনা করিতে সক্ষম হই না।

অনেক লোক মিলকে নাস্তিক বলেন, কিন্তু এ বাক্য সম্পূর্ণ অমূলক। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি পাঠে কোথাও তাঁহাকে নিরীশ্বর বাদী বলিয়া বোধ হয় না। তবে কোন কোন অংশে তাঁহার মত প্রত্যক্ষ দর্শনানুযায়ী † ছিল, এবং তিনি ফলসাপেক্ষনৈতিক মত ‡ বাদী ছিলেন। শেষোক্ত কারণবশতঃ তাঁহাকে নিরীশ্বরবাদী বলিলে ধর্ম্মশাস্ত্র লেখক পেলীও নাস্তিক নামে অভিহিত হন।

অদ্য প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আমরা ক্ষান্ত হইলাম। আগামী বর্ষে পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পাইব।

মিল সাহেব যেরূপ অসাধারণ চিন্তাশীল ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থাদির ভাষাও সেইরূপ প্রাঞ্জল। তাঁহার ন্যায় দার্শনিকদিগের এরূপ পরিষ্কার লেখা অতি অল্পাই দেখাযায়। কেহ কেহ বলেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিদ্যাবতী থাকায় এইরূপ ঘটিয়াছে। এই বাক্য মিল স্বয়ং কএক বৎসর হইল বনিতার মৃত্যুর পর সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মিলসাহেবের মৃত্যুতে উনবিংশশতাব্দী আপনার মহামূল্য রত্ন হারাইয়াছেন।

*Mill's Subjection of Women.

* Parker vs III State of America.

† Mill's System of Logic vol II Logic of the Moral Sciences.

‡ Utility.

PATRIOTISM.

NOTHING is so characteristic of a period of intellectual progress than a tendency to question the truth of theories which have been accepted as axioms by previous generations. We of the present day are perhaps inclined to under-estimate the moral and intellectual status of our ancestors: and to scoff at sentiments which they would cheerfully have died to uphold. A striking instance of this distrust of old and deep-rooted ideas, lies in the misgiving with which thinkers of the present time regard the sentiment yclept "Patriotism"—that yearning love for the land of one's birth which has exercised so powerful an influence in shaping the history of civilization. In order to appreciate the force of the objections of such men to Patriotism, it would be necessary to go far back into the history of the world and to study profoundly the social phenomena of the present age. We might show how a natural love for kindred, developed gradually into love for the tribe or family (in the wider sense): and finally broadened down into affection for the nation. We should thus be brought to discuss the concomitants of our national system—the curses of war and bloated armaments, the incongruities of our code of International Law, the inconveniences of a diversity of tongues, the advantages of brotherhood, and the bonds of common sympathies and prejudices, hopes and fears. Thus to pursue the question into all its bearings would be a task beyond the scope of the magazine writer, who, when he propounds theories, should illustrate them by familiar examples. Let us then examine the influence of this sentiment on the modern history of England, that nation whose sons are, to a man, strongly infected with that "brutal patriotism" against which Mr. John Stuart Mill philosophically inveighs. Within the last century, we shall find that this sentiment involved England in more than 30 years of war. At the beginning of this epoch, (1775) we find England engaged in a contest with her North American colonies—a contest which had no other origin than an attempt to force British Institutions and British Taxation upon a people who were unprepared to receive them. Three years later the long pent up national hatred for France broke out in a war with that country: which was only brought to a close in 1783 by the utter exhaustion of both nations. Ten years later, intolerant that France should presume to live under a Government of her own choosing, England joined the other European Powers in renewing a struggle which set the civilized world in a blaze, and did not terminate till 1815. This war cost England the lives of nearly half a million of her children: and involved the country in a load of debt which she has not yet shaken off. Will it be

credited that the Englishman of that day was taught to regard the Frenchman as his natural enemy ; and to invoke the aid of the "God of battles" that God who commanded us to "love one another ?" Forty years later came that gigantic blunder the Crimean War, caused solely by an insane national jealousy of Russia—which opened the door for a strife which has since been desolating Europe at constantly recurring intervals. Again, take the average Englishman of to-day, and observe the influence that this sentiment excercised in all his ideas. In his heart of hearts, he despises every one who does not happen to be a native of his "tight little island." His epithet for any act which he means to characterize as mean or degrading is "unenglish." Transplanted to a foreign country he carries an atmosphere of insularity with him and scorns to mix with the natives on equal terms. Hence his unpopularity where his gold does not cover his defects. Hence the deep and widening gulf in this country between the conquerors and the conquered. There are however signs of the advent of better time. Patriotism, in itself a vast advance on the narrower love for kindred, is being gradually supplanted by cosmopolitanism—that deep sympathy with, and love for, human nature which will one day "make the whole world kin." Far be it from us to prophesy a millenium when "men shall beat their swords into ploughshares and their spears into pruning hooks." That evil principle in human nature, the consciousness of which, made the gentle Goethe declare that he "felt himself capable of the greatest crimes" will never be so entirely eradicated. What we may expect, even in our time to see is a great Union between the thinkers of the world whose object it shall be to break down the artificial barriers that separate the members of the great family of mankind.

F. H. S.

স্বর্ণলতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নীলকমল কহিল " বিলক্ষণ ঠাকুর, এখন আমাকে বিপাকে ফেলে তুমি চলে যাবে।' এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে মুসলমানও নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যতই নিকটস্থ হইতে লাগিল, নীলকমলের ততই সাহস বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরে যখন একেবারে সন্নিকটে আসিল, নীলকমল হাসিয়া কহিল ও একটা বোকা লেড়ে?"

বিধুভূষণ নীলকমলের আচরণ ও পরে তদীয় উক্তি শ্রবণ করিয়া আর হাসি রাখিতে পারিলেন না। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসিলেন " বোকা লেড়ে কি নীলকমল?" ' বোকা লেড়ে কি?' ' ছাগলের যেমন দাড়ী হলে বোকা হয়, তেমনি লেড়েদের বড় দাড়ী হলে বোকা লেড়ে বলে।'

" বটে "

" হাঁ "

নীলকমল পুনরায় সাহস অবলম্বন করিয়া বিধুভূষণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার প্রগাঢ় হইয়া আসিল। চন্দ্র শূন্য আকাশে দুটি একটি তারা কি করিবে? চৈত্র মাস সন্ সন্ করিয়া বায়ু বহিতে লাগিল। একটু একটু মেঘ এদিগে ওদিগে দেখা যাইতে লাগিল। উভয়েই নূতন বাটী হইতে বিদেশে নিস্ক্রান্ত। উভয়েই চিন্তায় মগ্ন। রাস্তা জনশূন্য। কিয়দ্দূর নীরবে গমন করিয়া উভয়ের মনেই ভয় সঞ্চার হইল। বিধুভূষণ প্রথমে কথা কহিয়া উঠিলেন। কহিলেন 'রাত্রি বেশি হইল' যদি বাজারে ঘর না পাই তবে আর কি হবে?'

নীলকমল উত্তর করিল " পাবনা কেন?'

বিধু কহিলেন " যদি আমাদের যাইবার অগ্রে অন্য লোক আসিয়া ঘর লইয়া থাকে, তাহা হইলে হয়তো আমাদের গাছ তলায় থাকিতে হইবে।'

নীলকমল। " আচ্ছা আগেতো দেখা যাউক ঘর মেলে কিনা।' এই বলিতে বলিতে উভয়েই বাজারে পোঁহুছিলেন।

দশম অধ্যায়।

রাস্তা চলিবার সময় অনেকেই ভাল ও পরিষ্কার বস্ত্রাদি না পরিধান করিয়া মলিন ও পুরাতন বসনাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেন না রাস্তায় কাপড় চোপড় অত্যন্ত খারাপ হইয়াযায়। ' রাস্তায় ভাল কাপড়ের প্রয়োজন কি?' তাঁহারা বলেন। ' কেই বা তোমাকে দেখ্‌তে আসছে, কেই বা তোমাকে চিন্তে আস্‌ছে'। 'হাঁ কোন ভদ্রস্থানে গিয়া ভাল কাপড় পরা আবশ্যক বটে।' কিন্তু এটি যে কতদূর ভ্রান্তিমূলক তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ প্রাজ্ঞলোক রাস্তায় উৎকৃষ্ট বসনে দেহ সুশোভিত করিবেক, ভদ্রস্থানে তত উত্তম কাপড় না হইলেও চলে। রেলওয়ে চলিতে হইলে আপনিও যে পথটুকু জন্য যে মূল্য দিবেন, রাম-

কেষ্টাও তাহাই দিবেক। কিন্তু আপনার ভাল কাপড় দেখিয়া রেলওয়ের কর্ম্মচারিরা আপনাকে খাতির করিবেক, আর রামকেষ্টাকে ধাক্কা দিয়া গাড়ীর মধ্যে ঠেলিয়া দিবেক। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া আপনিও এক দোকানে যাউন, আর রামকেষ্টাও যাউক, আপনাকে হুকার জল ফিরাইয়া তামাক দিবে, আর রামকেষ্টাকে একটা কলিকা ও একটু তামাক আর একখানি টিকে দেবে। বল্‌বে "সেজে খাও।" কিন্তু উঠিয়া যাইবার সময় আপনি কিছু রামকেষ্টা অপেক্ষা বেশি পয়সা দিয়া যাইবেন না। আপনি যথার্থ ভদ্র হইলে মলিন বসন সত্ত্বেও ভদ্রস্থানে আপনাকে সমাদর করিবেক, যথার্থ ভদ্র না হইলে আপাদ মস্তক কিংখাপ ও জরি দিয়া মুড়িয়া গেলেও আপনাকে আদর করিবেক না। রাস্তায় ঠিক ইহারি বিপরীত। কেহ আপনার নিকট পরিচয় চাহিবে না—অর্থাৎ যদি পদ্মার দক্ষিণ পারে থাক—সুতরাং তুমি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান ও বি, য়ে, উপাধিধারী হইলেও মলিন বসন দেখিলে মুদী তোমাকে আগে তামাক দিবেক না, ও ষ্টেসন মাষ্টার তোমার টিকীটখানি আগে লইয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিবেক না। পাঠকবর্গ একথাটিতে অবজ্ঞা করিবেন না।

বিধুভূষণ ও নীলকমল উভয়েই বাজারে আসিয়া রাত্রিকালে অবস্থিতি করিতে পারেন এমন একটু স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যেখানে যান, সেই খানেই ঘর পূর্ণ দেখিতে পান। খালি আর নাই। অনুসন্ধান করিতে করিতে বাজারের একটু দূরে একখানি ঘরে আলো জ্বলিতেছে দেখিতে পাইলেন; ঘরখানির সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ গোটাকতক আম্রবৃক্ষ, এজন্য সন্ধ্যার পর হঠাৎ সে ঘরখানি দেখা যায় না ও পথিকেরা বাজারের মধ্যে স্থান পাইলে আর তথায় যায় না। বিধু ও নীলকমল তথায় গমন করিয়া দেখিলেন যে, সেখানেও দুএক জন পথিক আসিয়াছে। কিন্তু একটুখানি স্থান আছে।

মুদী ঘরে নাই। কিছু দূরে কোথায় এক হাটে গিয়াছে, তাহার স্ত্রী দোকানের কার্য্য করিতেছে। বিধুভূষণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন।

"বাছা, এখানে দুজন লোকের থাক্‌বার জায়গা হবে?"

মুদীর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল 'কি লোক?'

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন 'একটি ব্রাহ্মণ আর একটি জুগী।'

মুদীর স্ত্রী কহিল "দুজন ব্রাহ্মণ হইলে হইতে পারিত। দোকানে আর দুটি ব্রাহ্মণ আছেন। এদের মধ্যে তো আর জুগী থাকিতে পারিবেক না। কিন্তু যদি তোমার লোকটি ঐ গাছ তলায় থাকে, তাহা হইলে এখানে জায়গা হতে পারে।"

বিধু নীলকমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন 'কি বল নীলকমল?'

নীলকমল কহিল "ঐ তো বারাণ্ডায় জায়গা আছে, আমি ওখানে থাক্‌তে পারবো না?"

মুদির স্ত্রী। "ওখানে গরু থাক্‌বে।"

নীল। "গরুটা কেন গাছ্ তলায় রাখনা?"

মুদির স্ত্রী। "গরুটা গাছ্ তলায় রেখে তোমারে ঘরে জায়গা দেব? তুমি আমার গুরু ঠাকুর এলে নাকি? বিদেশে আসৃতি শিখেছ, গাছ্ তলায় শুতি শেখ নি?"

নীলকমল বড় অভিমানী ছিল, সুতরাং মুদীর স্ত্রীর কথা শুনিয়া সহজে তাহার রাগ হইল। বিধুকে সম্বোধন করিয়া কহিল "চল আমরা গাঁয়ের ভেতর গিয়া কোন খানে থাকি, এখানে থাকা হবে না।" বিধু পথশ্রান্তিতে কাতর ছিলেন তিনি কহিলেন "তুমি যাও, আমি এই খানে থাকি।" নীলকমল আরো রাগত হইয়া কহিল, "থাক, তবে আজুও থাক কালু থাক। আমি এই বিদায়। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।" এই বলিয়া নীলকমল প্রস্থান করিল, বিধু ঘরে উঠিয়া বসিলেন।

নীলকমল কিয়দ্দূর গিয়া থামিল। তাহার বিশ্বাস ছিল একটু রাগ করিয়া গেলেই বিধুভূষণ তাহাকে ডাকিবেন। বিধুরও ডাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নীল কমলের ভূতের ভয় তাঁহার পূর্ব্বেই জানা ছিল এজন্য তিনি নিশ্চয় করিয়া বসিয়াছিলেন যে নীলকমল আপনিই ফিরিয়া আসিবে। বস্তুত তাহাই ঘটিল। নীলকমল ক্ষণকাল এক স্থানে স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল 'পুনর্ব্বার না ডাকিলে কি প্রকারে যাই।' রাত্রি অন্ধকার, ভূতের ভয় না থাকিলেও যে কেহ সে রাস্তায় চলিতে পারিত তাহা নিতান্ত অসম্ভব। গ্রামের লোকেরই সে রাস্তা দিয়া বিনা আলোকে চলা দুঃসাধ্য। নীলকমল ভাবিয়া চিন্তিয়া দু এক পা দু এক পা করিয়া পুনর্ব্বার দোকানের উঠনে আসিয়া দাড়াইলেন। বিধুকে ডাকিয়া কহিলেন 'রাত্রিকালে তোমাকে একা ফেলে যাওয়া অন্যায়, তাই ভেবে আমি ফিরে এলাম। তুমি ঘরে থাক, করি কি, আমি গাছ্ তলায় থাকিব।" কিন্তু নীল কমলের মনে মনে এই রহিল যে হয় উভয়েই গাছ্ তলায় থাকিবেক, নচেৎ সমস্ত রাত্রি গান করিয়া কাটাইয়া দিবেক অর্থাৎ কাহাকেই ঘুমাইতে দিবেক না।

বিধুভূষণের বস্ত্রাদি তাদৃশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল না একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে; যে দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন সেখানে তাঁহার পূর্ব্বে আর দুটি ব্রাহ্মণ আসিয়া ছিল তাহাও বলা হইয়াছে। সে দুটি ব্রাহ্মণের কাপড় চোপড় অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কথোপকথনে টের পাইলেন তাহারা কলিকাতার কালেজে অধ্যয়ন করে। গ্রীষ্মের বন্ধের পর পুনর্ব্বার কলিকাতায় যাইতেছে। মুদীর স্ত্রী কায়-মনোবাক্যে তাহাদের পাকশাক ইত্যাদি তদ্বির করিয়া দিতেছে। বিধুর কথা বড় শোনে না। দুই বার তিন বার না চাহিলে একটু তামাক কিম্বা জল দেয় না। কোথায় পাক করিবেন জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিল "ঐ খোন্তা আছে, ঘরের ঐ কোণে একটা উনুন কাট, ঐ মাচার উপর হাড়ী আছে একটা নেও,

আর ঐ বারাণ্ডায় কাঠ আছে এনে রান্না-বাড়া কর।" এই বলিয়া মুদীর স্ত্রী অপর দুজন ব্রাহ্মণের জন্য হাড়ী, জল, কাঠ ইত্যাদি আনিয়া দিল।

মুদীর স্ত্রীর কথা শুনিয়া বিধু-ভূষণের সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলিয়া উঠিল। রাগতস্বরে কহিলেন "আমি যদি সব করিব তবে এখানে এসে আমার লাভ কি?"

মুদীর স্ত্রী মিষ্টি মিষ্টি করিয়া কহিল। "এখানে কোন লাভ না হয় যেখানে হয় সেই খানে যাও। আমি তো তোমার বাড়ী থেকে তোমাকে ডেকে আনিতে যাই নাই।"

বিধুভূষণ দেখিলেন এ তাঁহার নিজের বাটী নহে। রাগ করিলে এখানে কেহই তাঁহার রাগ গ্রাহ্য করিবেক না। মনের আগুন মনে রাখিয়া এবং একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া রসিকতা চ্ছলে কহিলেন "অত চট্‌লে চল্‌বে কেন। তুমি চট্‌লে এখন আমরা দাঁড়াই কোথা।"

তাঁহার কথা শেষ না হইতে হইতেই মুদীর স্ত্রী তাঁহার রসিকতায় বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল "আর তোমার পি-রিতে কাজ নেই, খোন্তা নিয়ে উনুন কেটে রেদে খেতে হয় খাও, না হয় এই বেলা অন্য জায়গা দেখ।"

বিধুর আর বরদস্ত হইল না। রাগত হইয়া উচ্চৈস্বরে কহিলেন "তুই ভেবেছিস্ এই দোকান ছাড়া বুঝি আর দোকান নাই। চল্লাম তোর এখান থেকে।" এই বলিয়া ব্যস্ত হইয়া বাহির হইবেন, এমন সময় মুদী বাটী আসিল, এবং মাথায় দোকান রাখিয়া জিজ্ঞাসিল, 'কিসের গোল কর তোমরা এত।'

মুদীর স্ত্রী কহিল "ঐ দেখ কোথাকার এক খদ্দের এসেছে, যেন নবাব আর কি, আপনার উনুন আপনি কেটে রেদে খেতে পার্‌বে না।"

মুদী বিধুর দিগে ফিরিয়া জিজ্ঞাসিল 'তোমরা আপনারা!' বিধু কহিলেন 'ব্রাহ্মণ।'

মুদী। "ব্রাহ্মণ, প্রণাম। আচ্ছা আমি উনুন কেটে দেব এখন। বোস ঠাকুর বোস।"

বিধু ভূষণ বসিলেন।

গোলমাল থামিলে নীলকমল বলিয়া উঠিল "মুদীনীর আবার জাঁক দেখ। না দেয় জায়গা না দেয় আসন। এখনি আমরা অন্য দোকানে যাব।" কিন্তু একথা পূর্ব্বে বলিতে ভরসা হয় নাই।

যে দুটী ব্রাহ্মণের জন্য মুদীর স্ত্রী এত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল, তাঁহারা অল্পবয়স্ক। ১৯। ২০ বৎসরের বেশি নহে, উভয়েই ব্রাহ্ম। এই গোলযোগের সময় তাঁহারা উপা-সনা করিতেছিলেন। অর্থাৎ এক জন অতি মৃদুস্বরে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এবং তাঁহার মুদীত নেত্র হইতে অশ্রুধারা বহিতেছিল। আর এক জন হেট মুণ্ডে একবার মুদীনীর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে—আর এক বার তদীয় সঙ্গীর দিকে সভয় নেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি-তেছিলেন।

'ব্রহ্মজ্ঞান রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরি হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত আছে' বটে

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলদ্বারা সে অগ্নিটুকু সত্বরই নির্ব্বাণ করিয়া ফেলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশীকা পরীক্ষার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই অগ্নি জ্বলিয়া উঠে; ২॥ বৎসর মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে, পরে চক্ষের জলে নিবিয়া যায়।

মুদীর 'প্রবেশ' হইবা মাত্রই যে ব্রাহ্মটির চক্ষু বাতাসে বিলোড়ি দীপশিখার ন্যায় এদিগে একবার ওদিগে একবার যাইতেছিল, তিনি একাগ্রচিত্তে মাটির দিগে দৃষ্টি করত উপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন। মুদী তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসিল "এরা কারা"? তাহার সহধর্ম্মিণী উত্তর করিল 'এরা ব্রাহ্মণ কালেজে পড়ে। এখন ওদের কিছু বলো না, ওরা পর্‌মেশ্বরের নাম কর্‌ছে।'

মুদী বিস্মিত ও রাগত হইয়া তাহার স্ত্রীকে কহিল "ওদের আমার ঘরে কেটা জায়গা দিলে? ওরা ব্রাহ্মণ তোরে কেটা বল্লে। দেখতি পাচ্ছিস্‌নে সব ধর্ম্মঘট কর্‌ছে? ওদের কি জাত্‌ আছে?" পরে ব্রাহ্মদ্বয়ের প্রতি 'ওগো তোমরা ব্রাহ্মণই হও আর যাই হও, এখন ওটো। আমার ঘরে রান্নার জায়গা হবে না। আমি হিন্দু মানুষ, ধর্ম্মঘট টট কিছু বুঝি নে। ওট ওট।'

মুদীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মদ্বয়ের ধ্যান ভঙ্গ হইল। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন সম্মুখে ৫ হাত লম্বা এক প্রকাণ্ড মুদীর মূর্ত্তি রাগত হইয়া তাঁহাদিগকে উঠিয়া যাইতে কহিতেছে। অন্ধকার রাত্-অজ্ঞাত স্থান। কোথায় যান।

উভয়েই সকরুণস্বরে কহিলেন 'আমরা ধর্ম্মঘট করিতেছি তোমাকে কে কহিল? আমাদের কালেজের পড়া মুখস্ত পড়িতেছিলাম।'

'পড়াই পড় আর ধর্ম্মঘটই কর আমার এখানে তোমাদের জায়গা হবে না।' যে ব্রাহ্মটি উপাসনার সময় 'একাগ্রচিত্তে' এদিগে ওদিগে চাহিয়া দেখিতে শুনিতে ছিলেন তাঁহার মনে হইল মুদীর রাগ যেন তাঁহারি উপর বেশি—কথা কহিবার সময় যেন তাঁহারি দিগে চাহিয়া কহিতেছে, এজন্য তিনি নয়ন উত্তোলন করিলেন না। উভয়ের উঠিতে অনিচ্ছা দেখিয়া মুদী অগ্রে তাঁহারি হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল "আমি ভালত্বরে বল্‌ছি এই বেলা ওটো, না ওটো যদি তবে একটা গোলযোগ হবে।' এই বলিয়া মুদী ঘরের কোণের দিগে চাহিল। কোণে এক গাছি স্থূলকলেবরা তাল-যষ্টি ছিল।

ব্রাহ্মদ্বয়ও সেদিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং আর দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন।

ঘর পরিষ্কার হইলে সহধর্ম্মিণীকে মুদী কহিল "বড় ধুম, যেন বাড়ী কুটুম এসেছে না? ওরা কে? তোর ভাই নাকি যে তুই দোকানের কাজ ফেলে, দুটো ভাল খর্দ্দের তাড়ায়ে ইষ্টীদেবতার মতন ওদ্দের সেবা কচ্ছিস?'

মুদীপত্নী চুপ করিয়া রহিল। বোধ হয় তাহার সহিত কথা কহিবার সময়ও মুদী গৃহের কোণের দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল।

এইরূপে সমস্ত গোলমাল চুকিয়া গেলে মুদী তামাক খাইতে আরম্ভ করিল, বিধু পাকশাকের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন ও নীলকমল ঘুন ঘুন করিয়া 'পদ্ম আখি আজ্জাদিনে' ধরিল। ব্রাহ্মদ্বয় আস্তেআস্তে স্থানান্তর চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মদ্বয় চলিয়া গেলে নীলকমলেরও ঘরের মধ্যে স্থান হইল। বিধুভূষণ রন্ধন করিলেন। উভয়ে আহারাদি করিয়া শুইলেন।

বিধুভূষণ আর কখন বাটীর বাহির হন নাই। নূতন স্থান ও বাটীর ভাবনা প্রযুক্ত তাঁহার ঘুম হইল না। নীলকমল শয্যায় শয়ন করিবা মাত্রই নাসিকা-ধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। একে দোকান ঘর চারিদিগে খোলা তায় সম্মুখে কতকগুলা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ,আবার রাত্রিকাল সমুদায় নিস্তব্ধ। গাছের পাতার একটু একটু শব্দ হইলেই যেন দশ গুণ হইয়া বিধুর কাণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঘরের মধ্যে ইন্দুর গুলা কিচ্‌কিচ্‌ করে একোণ ওকোণ করিতে লাগিল। চামচিকা গুলি উড়িতে আরম্ভ করিল। বিধুর কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। নীলকমল নীলকমল করিয়া ডাকিতে ডাকিতে নীলকমল কহিল 'তুমি যে আমাকে বিরক্তই কল্লে।'

বিধুভূষণ কহিলেন 'নীলকমল একবার তামক খাও? অত ঘুমচ্ছ কেন? বিদেশে বিশেষ রাস্তায় বেশি ঘুমান ভাল না?'

"বিদেশে রাস্তায় অত ঘুমান ভাল নয়। কেন মন্দই বা কি? আমার কি আছে যে কে নিয়ে যাবে?'

বিধু কহিলেন "তা নয় নীলকমল! আমিও বিদেশে এসেছি। কিন্তু তোমার একটা গুণ আছে, অনায়াসে দুটাকা করিতে পারিবে, কিন্তু আমার তো কোন গুণ নাই। যদি তুমি বেহালাটা আমাকে শেখাও তা হলে তোমার কাছে চিরকাল কেনা রব"।

নীলকমল বেহালা ও গানের নামে জল হইয়া যাইতেন। প্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন "হা শেখাব, তার ভাবনা কি? আজিই কি আরম্ভ কর্‌বে।

'শুভস্য শীঘ্রং'। বিধুভূষণ কহিলেন,'যাহা শেখা উচিত তা এখনি আরম্ভই ভাল।'

নীলকমল বেহালাটি পাড়িয়া লইয়া দুই চারিবার তার কাণ মোড়া দিয়া আরম্ভ করিলেন। কহিলেন "আমি যেমন বাজাই ও গাই, তুমি আগে নিপুণ হইয়া শোন; পরে তুমি শিখতি পার্‌বে।" এই বলিয়া নীলকমল "পদ্মআখি" ইত্যাদি আরম্ভ করিল, বিধুভূষণও ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

—::—

একাদশ অধ্যায়।

হেম ও স্বর্ণলতা তথা উকিল বাবু।

বর্দ্ধমান জেলার বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি অধিক ছিল না বটে কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহ

সময়ে তিনি কমিসারিয়েটে কর্ম্ম করিতেন। এই কার্য্যই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির মূল। নূতন বড়মানুষ হইলে প্রায়ই কৃপণ হয়। বিপ্রদাসের কিন্তু সে দোষটী ছিল না। তাঁহার সদ্ব্যয় যথেষ্ট ছিল। দেব সেবায় ও অতিথি সেবায় তাঁহার অনেক টাকা ব্যয় হইত। বাটীতে কোন পার্ব্বণ ফাঁক যাইত না। দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদিতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি আস্থা ছিল। সংক্ষেপে তিনি একজন যথার্থ "সেকেলে ধার্ম্মিক" ছিলেন। অর্থাৎ অর্থ উপার্জ্জনের সময় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন না। এটাকা লওয়া উচিত নয়, এটাকা লইলে ক্ষতি নাই, এরূপ কোন চিন্তা করিতেন না। টাকা পাইলেই গ্রহণ করিতেন। এবং ঐ অর্থ দেবসেবা ইত্যাদিতে ব্যয় করিতে পারিলেই সার্থক উপার্জ্জন জ্ঞান করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পরলোক হওয়া অবধি বিপ্রদাস কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাটীতেই থাকিতেন। তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্রটীর নাম হেমচন্দ্র, কন্যাটীর নাম স্বর্ণলতা। তাঁহার ন্যায় অপত্যবৎসল লোক সচরাচর দেখা যায় না।

পূজার সময় গ্রামস্থ যাহারা যাহারা বিদেশে থাকে, সকলেই বাটী আসিয়াছে। দুর্গোৎসবের সময় বঙ্গভূমি যেন হাসিতে থাকেন। বর্ষাকাল গত হয়। রাস্তার কাদা জল দূর হইয়া যায়। মৃত্তিকা শুষ্ক হইতে থাকে। বর্ষায় যে সমস্ত ছোট ছোট জঙ্গল হয় তাহা পরিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হয়। প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে সূর্য্যদেবের জ্যোতি মনোহররূপ ধারণ করে! আকাশ মণ্ডল মেঘশূন্য হয় ও চন্দ্রের কিরণ পরম রমণীয় শ্রীধারণ করে। অল্প ২, শীতের বায়ু বহিতে থাকে। আবালবৃদ্ধ সকলেই আনন্দিতচিত্ত হয়। সম্বৎসরের পর পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা,ভ্রাতৃ বন্ধু একত্রিত হয় ও কিয়ৎকাল পরমসুখে কালাতিপাত করে।

হেম বাড়ী আসিয়াছে। মা নাই বলিয়া পাছে আদায়ের ত্রুটি হয়, এজন্য বিপ্রদাস নিজে দুবেলা আহারের সময় হেমের কাছে বসিয়া থাকেন। তাঁহার মাতাকে কহেন—বিপ্রদাসের মাতা অদ্যাপি জীবিত আছেন—'মা আমি তোমার যেমন আদরের জিনিস হেমও আমার কাছে তেমনি। যখন যা চায় হেমকে তখনি তাই দিও। মা, আজি আমার স্বর্ণ কোথায়? তাহাকে দেখিতেছিনা কেন?'

স্বর্ণ পাশের ঘরে ছিল। পিতার মুখে তাহার নাম শুনিয়া দৌড়িয়া হস্তপ্রসারণ করিয়া আসিল। কহিল "এই যে বাবা আমরা মাজের ঘরে ছিলাম।"

বিপ্র। "এস, মা এস। আমার লক্ষ্মী মা এস। একি মা সমস্ত হাতে মুখে কালি মেখেছ কোথা থেকে?"

স্বর্ণ। "আমি দাদার কাছে নিখতে শিখছিলাম। দাদা আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিল।"

বিপ্র। "তুমি লিখ্‌তে শিখ্‌ছো। তোমার লেখায় দরকার কি। এই সময় হেমও তথায় আসিল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

—ঃঃ—

নয়শো রূপেয়া। *

বয়োবৃদ্ধি সহকারে, প্রত্যহ আমাদের শরীর পরিবর্দ্ধিত অথবা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অথচ এই পরিবর্ত্তন এত ধীরভাবে ও এমন অজ্ঞাতসারে হয়, যে আমরা কোন রূপেই তাহা অনুভব করিতে পারিনা। সমাজের আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়ম ; ঋগ্বেদের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, আমাদের সামাজিক আচার, ভাষা প্রভৃতির কত পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে, এই পরিবর্ত্তন কিছু এক দিনে, এক মাসে, অথবা, এক বৎসরে হয় নাই। কালের অখণ্ডনীয় নিয়ম অনুসারেই, এই পরিবর্ত্তন হইতেছে। অথচ পরিবর্ত্তন হইতেছে বলিয়া আমরা কোন ক্রমেই অনুভব করিতে পারিতেছিনা। গত দিবসের অবস্থার সহিত অদ্য তোমার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা কি তুমি প্রত্যহ অনুভব করিয়া থাক ? অথবা করিতে পার ? ইতিহাস, ব্যবস্থা, কাব্য প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে জাতীয় আচার ব্যবহার লিপিবদ্ধ হয় বলিয়াই আমরা এই পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে সমর্থ হই।

ঋগ্বেদ না থাকিলে "পিতৃ বিত্তস্য বায়ো বিস্থূরয় শত হিমা নো অশ্নুঃ" এই পদ দ্বারা আর্য্য জাতি যে এক সময়ে ভারতবর্ষবাসী ছিলেন না, হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমদিগস্থ কোন হিম-প্রধান জনপদে অধিবাস করিতেন, আমরা কোন ক্রমেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। বাস্তবিক ইতিহাস অপেক্ষাও প্রাচীন রীতিনীতি আচার ব্যবহার আদি অবগতির নিমিত্ত অথবা বর্ত্তমান আচারাদি লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত নাটক ও ব্যবস্থা অধিকতর উপায় বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। এই নিমিত্তই ভুবন বিখ্যাত কারলাইল বলিয়াছেন, যখন ইংলণ্ডের প্রাচীন আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন বেশ ধারণ করিতেছিল, তখন পরবর্ত্তী লোকের অবগতির জন্য বিধাতা সেক্সপিয়ারের দ্বারা তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ করিলেন

আমরাও, কোন কোন অংশে 'নয়শো রূপেয়ার' গ্রন্থকার সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের কন্যা ক্রয় বিক্রয়, পুত্রহীনা হিন্দু মহিলার দুর্গতি ও যন্ত্রণা, নব্য ব্রাহ্মদিগের ঔদ্ধত্য এবং অপক্কতা, হিন্দু সমাজের কুসংস্কার ও মূর্খতা নিবন্ধন যে সকল অনিষ্ট হইতেছে, ইত্যাকার সাময়িক দোষগুলি গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়া অনেক অংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই সকল দোষের মধ্যে কোন কোনটী প্রায় তিরোহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সুতরাং এই সময় তাহা লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। 'নয়শো রূপেয়া' দ্বারা তৎ কার্য্য এক প্রকার সুসাধিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রঞ্জন ও সরলার মধ্যে 'মালিনী' ব্যতীত প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ দেখা যায়। এটী সুখের বিষয়; কিন্তু এরূপ প্রেম আমাদিগের সমাজ

* হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলিস্থিত বহুবাজার স্মিথ এণ্ড কোর যন্ত্রে মুদ্রিত।

মধ্যে দেখা যায় না। যে সকল কবি প্রকৃত ঘটনা মাত্র অবলম্বন করিয়া স্বীয় কবিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদিগের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কল্পনার এত প্রবলতা দৃষ্ট হয় যে, কিছুদিন অবাস্তবিক উপন্যাসাত্মক গ্রন্থের তত প্রয়োজন নাই। আমরা কবি কল্পনার অনাদর করি না, কিন্তু এখন এদেশে যদি প্রকৃত ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন অংশ কল্পনা দ্বারা সংযোজিত হইয়া কাব্য নাটকাদি রচিত হয়, অথচ কাব্যস্থিত বিষয়গুলি সমুদয়ই সত্যমূলক হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে, সমাজের বিশেষ উপকার হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

মূলগ্রন্থ হইতে আমরা নিম্নে দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিলাম। উাহা যেমন কাল্পনিক বলিয়া দোষাবহ, আবার সেইরূপ প্রকৃত প্রেমের বিলক্ষণ উদাহরণ। আমাদের উদ্ধৃত অংশে এদেশের অল্প বিশ্বাস এবং কুসংস্কার প্রাবল্য হেতু, কত অনিষ্ট হইতেছে, গ্রন্থকার তাহার উত্তমপরিচয় দিয়াছেন।

"রঞ্জন। বে হবে তাই বোল্‌ছ?

সরলা। তাই বোলছি। তা নাকি সম্পর্কে বাধে?

রঞ্জন। এই কথা। তবু, ভাল। তুমি ক্ষেপেছ নাকি?

সরলা। আমার তোমার কাছে একটী মিনতি, শুন্‌বে ত?

রঞ্জন। অবশ্য শুন্‌ব।

সরলা। আমার কথা গুলি মন দিয়ে শুন্‌তে হবে, আর হেসে উড়ুয়ে দিতে পার বেনা।

রঞ্জন। আচ্ছা বল শুন্‌ছি।

সরলা। সম্পর্কে নাকি বাধে?

রঞ্জন। আমি স্বরূপ বোল্‌ছি আমি ঠিক জানি না। কেউ বলে বাধে, কেউ বলে বাধে, না। আমাদের এপ্রদেশের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ ঠাকুর ব্যবস্থা দিয়েছেন যে হোতে পারে।"

"সরলা। যদি তোমার মত আমার বিদ্যা থাকৃতো তবে হয়ত আমারও সন্দ হোত না।

রঞ্জন। বিশেষতঃ তোমার মা বাপ, গুরু পুরোহিতে, কুটুম্ব গ্রামস্থ লোকে তোমায় আমায় বে দিচ্ছেন, দোষ হয় তাঁদের হবে, তোমার আমার কি?

সরলা। মা বাপে টাকা নিয়েছেন, গুরু পুরোহিত টাকা নিয়েছেন, গ্রামস্থ লোক ফলার খাবে। যাদের বে, ভোগ কেবল তাদের।

রঞ্জন। তবে তুমি এখন বল কি? বে বন্ধ কোর্‌বো?

সরলা। সম্পর্কে যদি বাধে তবে তুমি আমায় নিয়ে কোর্‌বে কি?

রঞ্জন। তবে তোমার কি ইচ্ছা আমি বে তে ক্ষান্ত দেব।

সরলা। তা হোলে তোমার পক্ষে ভাল হয়।

রঞ্জন। তোমার পক্ষে।

সরলা। তা শুনে তোমার দরকার কি?

রঞ্জন। তা বটে। কিন্তু তা না শুন্‌লে তোমার কথায় উত্তর দেব কি রূপে?

সরলা। আমার তা হোলে জ্বালা যন্ত্রণা সব্ ঘুচে যায়।

রঞ্জন। তা হয় ত এখনি বন্ধ কর। আমি ত বোলেছি সরলা, তুমি আমার দিকে তাকাইও না। তবে আমি জন্মের মত বিদায় হই? কিন্তু বিদায় হবার আগে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার আজ এরূপ ভাব দেখ্‌চি কেন?

সরলা। কিরূপ ভাব?

রঞ্জন। তুমি আমার উপর রাগ কর্‌লে কেন?

সরলা। আমি তোমার উপর রাগ করিনি।

রঞ্জন। রাগ না কর, আমার উপর যদি কিছু স্নেহ মমতা ছিল, তা গেল কেন?

সরলা। কিসে বুঝ্‌লে?

রঞ্জন। এই যে বোল্লে আমার সঙ্গে তোমার বে না হোলে তোমার জ্বালা যন্ত্রণা সব্ ঘুচে যাবে।

সরলা। হাঁ তা যায়।

রঞ্জন। সরলা, তুমি আমাকে নিয়ে খেলা কোরোনা। আমার ধন, প্রাণ, মান, মন, যথা সর্ব্বস্ব তোমাতে সোপেছি। তুমি প্রকারান্তরে বোল্‌ছ আমার উপর তোমার স্নেহ মমতা কিছু কমে নাই, আজ্ যদি আমি বে তে ক্ষান্ত দেই, কাল তোমাকে এক জন বে কোরে নে যাবে। তখন বল দেখি আত্মহত্যা ব্যতীত আমার আর কি উপায় থাকুবে?

সরলা। তোমার খুব কষ্ট হবে। তা না হোলে আর গোল কি?

রঞ্জন। তোমার কষ্ট হবে না?

সরলা। হবার আগে ঔষধ খাব।

রঞ্জন। তবে আমায় কেন সে ঔষধ একটু দেওনা।

সরলা। তুমি! অমন কথা মুখের আগায় এন না। তুমি আমার চেয়ে সহস্র গুণে ভাল; আর একটী বে কোরে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আমার পৃথিবীতে থেকে ফল কি!

রঞ্জন। তবে তুমি প্রাণ ত্যাগ কোর্‌বে?

সরলা। আর আমার পথ কি আছে? তুমি ক্ষান্ত দিলে কাল্ বাবা আমারে আর এক জনের গলায় গেঁথে দেবেন।

রঞ্জন। তবু আমাকে বে কোর বেনা?

সরলা। আমি কোর্‌তে চাইলে কি হয়, তুমি আমাকে নিয়ে কি কোর্‌বে?

রঞ্জন। কেন? বুঝ্‌তে পাল্লেম না?

সরলা। আত্মহত্যা নাকি বড় পাপ।

রঞ্জন। সর্ব্বনাশ! অমন কথা মুখে আন্‌তে নাই, অমন পাপ পৃথিবীতে আর নেই।

সরলা। তাইত। তুমি যদি এক কায কর তবে এপাপের দায় হোতে এড়াই। তুমি যদি আমারে —।

রঞ্জন। কি বোল্‌ছিলে বল।

সরলা। তুমি যদি আমারে বে কর।

রঞ্জন। তুমি আবল তাবল বোক্‌ছ কেন?

সরলা। শোন, কিন্তু দুই জনে —

রঞ্জন। আবার চুপ কোর্‌লে কেন?

সরলা। দুই জনে — ।

রঞ্জন। আবার চুপ কোর্‌লে কেন?

সরলা। (অধোবদন) দুই জনে ভাই বোনের মত থাক্‌বো। তুমি আর একটা বে কর। আমি তোমার কাছে থাকব। আমি তার চেয়ে আর সুখ চাইনে।"

নব্য ব্রাহ্মদিগের ঔদ্ধত্য ও অবিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা একটি স্থল উর্দ্ধৃত করিলাম। এই বিষয়টি একবারে সত্যমূলক।

"নবীন। বিবাহ এমন পবিত্র বিষয় ইহাতে পৌত্তলিকতা? ব্রাহ্মণে মন্ত্র পড়াইবে, মন্ত্র কি পড়িবে তা তুমিও বুঝবে না, পাত্রীও বুঝবে না। আবার একটি নোড়া আনা হোয়েছে। দেখুন দেখি আপনি লেখা পড়া শিখেছেন, সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাসও আছে, আপনারা যদি এরূপ কার্য্য করেন, তবে আর কোথায় যাব। বলিতে কি, আপনি যদি এপ্রণালীতে বিবাহ করেন, অপানার পরংব্রহ্মের শত্রুর ন্যায় কার্য্য করা হবে।

রঞ্জন। ভাই ওসব মনে আমি কখন ভাবি নি। ভাল মন্দ কিছুই বুঝ্‌তে পার ছি না। আর দের সভায় ভেবেই বা কি হবে, ওর ত উপায় কিছু দেখ্‌ছি না।

নবীন। উপায় এখনও আছে। বে কোরো না, যতদূর কোরেছ তার জন্যে অনুতাপ কর, আর প্রার্থনা কর।

রঞ্জন। ভাই তুমি জান কি না জানিনা, আমি প্রেমে আবদ্ধ হোয়েছি, যদি এখন বিবাহ না হয় তবে স্বরূপ বোল্‌ছি, আমার প্রাণ বাহির হবে।

নবীন। তা হউক, এক শত বার হউক। শরীরের সুখের নিমিত্ত অবিনশ্বর আত্মাকে নষ্ট কোর্‌বে? মোটে বিবাহ না হয় সেও ভাল, তবু আত্মাকে নষ্ট করিও না। ছি! ছি! কি বৃথা পার্থিব প্রেমের কথা বলিতেছ? এ প্রেম কত দিনের? যে পাপী, তার আবার প্রেম কি? সে ক্রন্দন করুক। সে ক্রন্দন রাখিয়া কি প্রেম করিতে যাইবে? সে বক্ষে করাঘাত করুক, মস্তকে মুগ্দর প্রহার করুক। ভ্রাতঃ তোমার সম্মুখে কালফণী, ঐ তোমাকে দংশন করিতে আসিতেছে, সাবধান সাবধান! (কম্পিত স্বরে) হে ভ্রাতঃ পৃথিবী ক দিনের জন্যে। সমুদায়ই অনিত্য। কেবল মাত্র নিত্য আত্মা। শরীর কিছুই নহে, উহার স্পর্দ্ধা আর বাড়াইওনা, বৃথা আমোদ পরিত্যাগ কর। আজ্‌ আমাদের এক জন ভ্রাতা ও এক জন ভগিনী সংসার সাগরে ঝম্প প্রদান করিতেছেন। হে ভ্রাতঃ আমি ঘোর পাপী, আমার ন্যায় পাপী এ সংসারে আর নাই। আমার উপায় কি হইবে। আহা আজ্‌ বিবাহের দিন, কিন্তু সে দিনের উপায় কি ভাব্‌ছ? সেই দিন, সেই ভয়ঙ্কর দিন! সেই শেষের দিন! (উচ্চৈঃস্বরে গীত) মনে কর শেষের সে দিন ভয়ংকর। মনে করো—"

গ্রন্থের আর একটি মহৎ দোষ এই যে, যেমন সেক্সপিয়ারের 'ডেজ্‌ডিমোনা' ও 'জুলিয়াট, প্রত্যেকে সর্ব্বগুণভূষিত হইয়াও বিভিন্ন জানা যায়, এই পুস্তকের 'শশীর মা' ও 'সরলার'

প্রকৃতিতে এই বিষয়ের অন্যথাচরণ দেখা যায়।

সরল ভাষাতে রচিত হওয়া এই গ্রন্থের আর একটি বিশেষ গুণ। ভাষা দ্বারা ভাব গোপন যে যারপর নাই মন্দ নয়শো রূপেয়ার গ্রন্থকার বোধ হয়, বঙ্গ ভাষায় প্রধান দৃষ্টান্ত স্বরূপ। কিন্তু সরল ভাষায় লিখিতে গিয়া গ্রন্থকে বিস্তর গ্রাম্যতা দোষে পুর্ণ করিয়াছেন।

গ্রন্থের কোন কোন স্থলের ভাষা যথোচিতরূপে আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি গুণে ভূষিত নহে এবং কোন কোন স্থলে ইংরাজি ইংরাজি গন্ধ যুক্ত। যাহা হউক ভাষাগত ত্রুটি ব্যতীত লেখকের অন্যান্য অংশে অধিক ত্রুটি দেখা গেল না। কিন্তু ভাষাই-ভাব ব্যক্ত করিবার একমাত্র উপায়, সুতরাং সে দোষ একেবারে মার্জ্জনীয় নহে।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থকার ভবিষ্যতে আবার নাটকাদি রচনার সময় ভাষা সম্বন্ধে আরও কিছু সতর্ক হয়েন এবং গ্রাম্যতা দোষে পুস্তককে কলঙ্কিত না করেন।

কবিতা কুসুমমালা।

—ঃঃ—

রাজসাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর রায় প্রণীত, কলিকাতা প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই পুস্তক খানি প্রকৃত কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে এবং তাহা গ্রন্থকারের আশাও নয়। ব্রজসুন্দর বাবু বালকদিগের জন্য এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন, এবং তৎপক্ষে বিশেষ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। আমরা বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়কদিগকে এই পুস্তক খানি বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে অনুরোধ করি।

গ্রামদূত পাক্ষিক পত্র—বাখরগঞ্জ জেলার একটি পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত।

পল্লীগ্রাম হইতে সম্বাদ পত্র বাহির হইতেছে বড়ই আনন্দের বিষয়, কিন্তু কিছু সাবধান না হইলে দেশের হিতকারী হইতে পারে না।

—ঃঃ—

হালিসহর পত্রিকা—গত কএক বৎসর হইল এই পত্রিকা খানি প্রকাশিত হইয়াছে। গত বৎসর ইহাতে সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইত, কিন্তু এক্ষণে সম্বাদ পত্র রূপে প্রচারিত হইতেছে।

অদ্যাবধি বঙ্গভাষাতে যথেষ্ট পুস্তকাদি রচিত হয় নাই, সুতরাং হালিসহর পত্রিকার ন্যায় একখানি সাহিত্যসম্বন্ধীয় পত্র সম্বাদ পত্ররূপে পরিণত হওয়া বিশেষ আক্ষেপের বিষয়।

হালিসহর পত্রিকার লেখকদিগের উপর আমাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তাঁহারা অত্যন্ত পর-নিন্দাপ্রিয়, কেবল এই একমাত্র তাঁহা-দিগের প্রধান দোষ। যে কএক খণ্ড হালিসহর পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে প্রাগুক্ত দোষ ক্রমেই অপনীত হই-তেছে, দেখিতেছি, এতদ্দ্বারা বোধ হয়, যে কালে ইহা একখানি অতি উৎকৃষ্ট সম্বাদ পত্রের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

উপসংহার কালে আমরা পাটক-বর্গকে অনুরোধ করিতেছি যে, সকলেই হালিসহর পত্রকে সাধ্যানুসারে সাহায্য করেন।

মূল্য প্রাপ্তি ।

(কমিশন বাদ দিয়া ২৫এ মের পূর্ব্বাহ্ন পর্য্যন্তের
মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা গেল)

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র সাহা বোয়ালিয়া ৸০
" " কামিনীকুমার সেন ময়মনসিংহ ২।৵১০
" " শালগ্রামবর্ম্ম বহরমপুর ২।।০
" " ব্রজসুন্দর রায় কাকীনিয়া ২॥০
" " অঘোরনাথ মৈত্র ঐ ২॥০
" " দয়ানাথ মিশ্র ঐ ২॥০
" " নীলমাধব সিংহ ঐ ২॥০
" " ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় শিবগঞ্জ ২।৵১০
" " হরিহর ঘোষ মানিকগঞ্জ ১৵১০
" " রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় পূর্ণিয়া ২॥০
" " জনার্দ্দন সিকদার ফরিদপুর ২॥০
" " রমণ কৃষ্ণ দাস ঐ ২॥০
বন্ধু সুসঙ্গ দুর্গাপুর, ২॥০
শ্রীমতী রাণীস্বর্ণময়ী দেবী পুঁটীয়া ২॥০
শ্রীযুক্ত বাবু গজেন্দ্র শান্যাল ঐ ২॥
" " সনাতন বসাক জলপাইগুড়ি ২॥
শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গিধোর ৩।০
" " ধর্ম্মনারায়ণ দাস ঘোড়ামারা ২।৵১০
" " সুরেশচন্দ্র সরকার বারাকপুর ২।৵১০
" " গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাতক্ষীরা ২।৵১০
" " রামরুদ্র চন্দ্র সারঙ্গ ২।৵১০
" " পরমেশ্বর দাঁ দিনাজপুর ২॥০
" " জনার্দ্দন মহাপাত্র পুরী ১
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী ১।০
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সোম বোয়ালিয়া
" " প্রসন্নকুমার সিংহ ঐ ২॥
" " বরদাগোবিন্দসেন বি এল, ঐ ২
দীনবন্ধু সান্যাল ঐ
" " হরগোবিন্দ বসু ঐ ২॥
" " শ্রীশ চন্দ্র রায় ঐ ১।
" " হরচন্দ্র সরকার ১।
কালীপ্রসন্ন প্রামাণিক শান্তিপুর ২।

বিজ্ঞাপন।

১। জ্ঞানাঙ্কুরের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাস্থুল সহ ২॥০ টাকা; প্রতি সংখ্যা।৹।

২। যাঁহারা এই পত্রের গ্রাহকশ্রেণিভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা রাজসাহী বোয়ালিয়ায় জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিবেন।

৩। কলিকাতায় যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি চোরবাগান নং ৬ ভুবন বাড়ুয্যের গলি শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়কে পত্র লিখিবেন এবং তাঁহারই দস্তখত রসীদে মূল্য দিবেন।

৪। ছাত্রদিগের পক্ষীয় বিশেষ নিয়ম আমরা উঠাইয়া দিয়াছি। যে কএক জনকে পূর্ব্বে পত্র দেওয়া হইয়াছে, কেবল তাঁহারাই পাইবেন।

রাজসাহী বোয়ালিয়া
জ্ঞানাঙ্কুর পত্রালয়।

শ্রীকৃষ্ণ দাস
সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

যদি কেহ কোন সংখ্যক উক্ত জ্ঞানাঙ্কুর নিয়মিত রূপে প্রাপ্ত না হন, তবে তিনি আমাকে পত্র লিখিবেন।

নং ৬ ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, চোরবাগান, কলিকাতা
শ্রী রজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872.

(BEING ACT NO. OF 1872.)

Into which is incorporated

THE INDIAN EVIDENCE ACT, AMENDMENT ACT,

And to which is appended

THE INDIAN OATHS ACT,

BY

KISHORI LAL SARKAR, M. A. B. L.

Price Rs. 4.

To be had at the Amrita Bazar Putrika Office and Messrs Thacker Spink & Co.'s Library.



স্মৃতিতত্ত্ব

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত। মূল কাশীমবাজার রাজধানীর সভাপণ্ডিত রমাপতি তর্কভূষণ কৃত অনুবাদ উভয়ই বঙ্গাক্ষরে প্রতি মাসে বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্র হইতে৮০পৃষ্ঠা করিয়া প্রকাশ হইবে। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে স্বাক্ষরকারী মধ্যে গণ্য হইবেন। স্বাক্ষরকারীর সংখ্যার অতিরিক্ত পুস্তক হইবে না। মূল্যের নিয়ম যথা — মূল্য ও অনুবাদ একত্রে ৮০ পৃষ্ঠা ১২ সংখ্যা

	বার্ষিক	ডাকমাশুল
মূল্য	৬	।৵
কেবল মূল ৪০ পৃষ্ঠা	৩	।৵
কেবল অনুবাদ ৪০ পৃষ্ঠা	৩	।৵

সানুবাদ স্মৃতিতত্ত্ব প্রকাশক
বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্র।

ভর্ত্তৃহরিকাব্য।

সংস্কৃত নানাবিধ ছন্দে বিরচিত, শ্রীবলদেব পালিত প্রণীত ভর্ত্তৃহরিকাব্য, সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মূল্য ॥০ আট আনা।

JNA'NA'NKURA

OR

THE SPRONT OF KNOWLEDGE,

A MONTHLY MAGAZINE AND REVIEW

OF

LITERATURE, PHILOSOPHY, SCIENCE, HISTORY, BIOGRAPHY, ANTIQUITIES, AND RESEARCHES, POLITICS, ARTS, COMMERCE, &c. &c.

জ্ঞানাঙ্কুর।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদিসম্বন্ধীয়
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—ঃ॥ঃ—

সূচী

কলিকাতা ঃ

বহুবাজার, স্মিথ এণ্ড কোর যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮০

কালকাতা

বিডন স্কোয়ারের উত্তর ৯৬ নং বাটী।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক স্ত্রীপুরুষ ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীরের শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা ও ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তিবিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি এবং শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছুক হইলে পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিয়া ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ (৫) পাঁচ টাকা পাঠাইতে হইবেক।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

হেয়ার প্রিজারভার।

(যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।'

হেয়ার প্রিজারভার কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণ বর্ণ, ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থা হইবে।

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ,, ১ টাকা

ঐ ডাক মাসুল সহিত ,, ১॥৵

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, মধুমেহ, অর্শ, বহু মূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ বিক্রয়ার্থ এখানে প্রস্তুত আছে।

হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতিদিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূলগ্রস্থ রোগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ১ টাকা

ঐ ডাকমাসুল সহিত ১॥৵

কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি এক টাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১॥০ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেকের চারি আনা।

বীলাতি যত প্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী ও ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

জ্ঞানাঙ্কুর।

মাসিক পত্র

১ ম খণ্ড আসাঢ় ১২৮০। ১০ ম সংখ্যা

স্বর্ণলতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—ঃ।ঃ—

হেম কহিল 'তাতে দোষ কি? এখন সকল মেয়েই লেখা পড়া করে। কলিকাতায় কত স্কুল হয়েছে সেখানে কেবল ছোট ছোট মেয়েরা পড়ে।'

বিপ্রদাস কহিলেন 'আচ্ছা বাপু তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। কিন্তু তুমি কদিনই বা বাড়ী থাকবে? তুমি কলিকাতায় গেলে তখন কে শেখাবে?'

হেম। 'স্বর্ণ তখন আপনি শিখ্‌তে পারবে। এই তিন চারি দিনের মধ্যেই কথ লিখ্‌তে শিখেছে। আমি কলিকাতায় যাবার আগে ওর ফলা বানান শেষ হবে।'

বিপ্র। 'বটে। আমার মা লক্ষ্মী যে মা সরস্বতী হয়েছেন।' (ক্রোড়স্থিত স্বর্ণের প্রতি) 'স্বর্ণ মা, তুমি আমার মা লক্ষ্মী হবে না মা সরস্বতী হবে?'

স্বর্ণ। 'আমি দুই হব বাবা।'

বিপ্রদাস সস্নেহ নয়নে স্বর্ণলতার প্রতি ক্ষণেক একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষু হইতে দু এক বিন্দু প্রেম অশ্রুপাত হইল। পরে শিরচুম্বন করিয়া স্বর্ণলতাকে ভুমে নামাইয়া দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাও তোমার দাদার কাছে গিয়া লেখা পড়া শেখ।'

হেম স্বর্ণের হাত ধরিয়া লইয়া পুনরায় যে গৃহে তাহাকে শেখাইতেছিলেন সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বিপ্রদাস বহির্দ্বারে আসিলেন; দেখিলেন বৈঠকখানায় বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ হাইকোর্টের উকীল তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিপ্রদাসকে দেখিয়া তিনি মস্তকে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিলেন কিন্তু নমস্কার কি প্রণাম কিছুই বলিলেন না। আজি কাল লেখা পড়া জানা কায়স্থ মাত্রেই ঐরূপ করিয়া থাকেন। প্রণাম করিতে লজ্জা হয়। নমস্কার না করিলে ব্রাহ্মণেরা রাগ করেন।

বিপ্রদাস 'দীর্ঘজীবী' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "বিনয় বাবু ভাল আছেনতো"

বিনয়। 'আজ্ঞা ভালই আছি।'

বিপ্র। 'আজি কাল কাজ কর্ম্ম কেমন চলিতেছে।'

বি। "অমনি এক রকম; বড় ভালও নয় মন্দও নয়।' 'সেকেলে' লোক মাত্রেই বেতন কিম্বা প্রাপ্তি জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। বিনয় বাবু সেই আশঙ্কায় ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন 'আমাকে কি জন্য ডেকে পাঠাইয়াছেন?'

বিপ্র। 'ভাল সে পরে হবে এখন। অনেক দিনের পর এসেছেন, দুদণ্ড কথা বার্ত্তা শুনি। একটু জলযোগ করুণ, পরে কাজের কথা কহিতেছি।' এই বলিয়া বিপ্রদাস বাটীর অভ্যন্তরে গেলেন এবং কিঞ্চিৎ পরে ফিরিয়া আসিয়া বিনয় বাবুকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

বাটীর মধ্যে গিয়া বিপ্রদাস বাহিরে বিনামা রাখিয়া এক কুঠুরিতে প্রবেশ করিলেন এবং 'আসুন বলিয়া' বিনয় বাবুকেও সেই কুটুরিতে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন। বিনয় বাবুর পায়ে হাফ ষ্টকীং, জুতা খুলিয়া গেলে ময়লা হইবে এই ভয়ে একটু ইতস্ততঃ করিলেন। পরিশেষে আর উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা জুতা খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। গুরুতর ত্যাগ স্বীকার করিতে হইলে যেমন চেহারা হয়, বিনয় বাবু সেইরূপ মুখভঙ্গী করিয়া আসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। বিনয় বাবু আসিবেন পূর্ব্বেই জানা ছিল, ফলতঃ তাঁহাকে ডাকাইয়া আনান হয়, এজন্য জলযোগের দ্রব্য সামগ্রীর অগ্রেই আয়োজন ছিল। ক্ষীর ছাঁচ সন্দেশ রসকরা ডাব ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে আসনের সম্মুখে সাজান রহিয়াছে। বিনয় বাবু ডাবের জল টুকু পান করিয়া একটী সন্দেশ ভাঙ্গিলেন। ষ্টকীং ময়লা হওয়ার দরুণ মুখখানি এখন বক্র তাতে আবার সন্দেশটী ভাল নয়! একবিন্দু মুখে দিয়া মুখখানি আরও বাঁকাইলেন; বিপ্রদাস বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "বিনয় বাবু সন্দেস বুঝি ভাল নয়?'

বিনয় কহিলেন। "আজ্ঞা না তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। এসব সন্দেশ খাওয়া কি আমাদের কর্ম্ম। অন্ততঃ সচরাচর বড়বাজারে যেরূপ সন্দেশ পাওয়া যায় তাহা না হইলে খাওয়া দুষ্কর।

বিপ্রদাস অতিযত্নে জল খাবারদ্ব্যাদি আয়োজন করিয়াছিলেন। সুতরাং বিনয় বাবুর মনোমত না হওয়ায় একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন; তাঁহার দোষ কি? তিনি পয়সা দিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে ভাল সন্দেশ পাওয়া যায় না সে দোষ কার? পরন্তু বিনয় বাবুও ঐ স্থানের লোক, সাত পুরুষ ঐগ্রামেবাস। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা পিতল কাঁসার বাসনের ব্যবসায় করিতেন। তিনিই যেন আজকাল বড় মানুষ হইয়াছেন। তাই বোলে কি বিপ্রদাসের সম্মুখে তাহার আয়োজনের নিন্দা করা উচিত? না তাহা ভাল লাগিল না বলিয়া মুখ বাঁকান কর্ত্তব্য? বিপ্রদাসের মনে নিমিষের মধ্যে এই চিন্তা গুলিন একে একে উদয় হইল। ঈষৎ হাস্য করিয়া

কহিলেন 'বিনয় বাবু আজকাল যেন লোক বিদেশে গিয়া ভাল খাইতে ভাল পরিতে শিখিয়াছে কিন্তু আমরা যখন আপনাদের মতন ছিলাম সে এক কাল গিয়াছে। কেষ্টা ময়রা বলে এক জন ময়রা ছিল সেই চিনির ঢ্যালা প্রস্তুত করিয়া রাখিত। আমরা তাই পরমসমাদরে খাইতাম। আহা! তোমার বাপ বড় সাধু পুরুষ ছিলেন। বিপ্র পাদোদক না সেবন করিয়া কখনই আহার করিতেন না। এক দিবস বেলা তৃতীয় প্রহর হইয়াছে কোন ব্রাহ্মণের লাগাল পান নাই। হন হন করিয়া রৌদ্রের মধ্যে আমার বাটী আসিয়া উপস্থিত। পাদোদক তো দিলাম। কহিলাম, সনাতন-আহা তোমার বাপের যেমন নামটী ছিল তেমনি তাঁর চরিত্র— আমি বল্লাম সনাতন একটু জলযোগ করিয়া যাও। সনাতন জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রশাদতো?' আমি কহিলাম 'হা, এই বলিয়া সনাতনকে কমবেশ এক-সের সেই কেষ্টা ময়রার সন্দেশ দিলাম, সনাতন যেন অমৃত পাইল। সকল গুলিই আহার করিল।'

এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিবার সময় বিনয় বাবুর নানা রকম ভাবের উদ্রেক হইতে লাগিল এবং অন্তরে যখন যে ভাবের প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল মুখমণ্ডলে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িতে লাগিল। বিপ্রপাদোদকের কথা উল্লেখ হওয়ায় তাহার মুখ এমনি হইল যে স্পষ্টই বোধ হইল তাহার অন্তরে কোন ঘৃণাজনক কথা উপস্থিত হইয়াছে। পরে সনাতনের এক সের সন্দেশ খাওয়ার কথা শুনিয়া বিনয় বাবুর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু স্পষ্ট কিছুই বলিতে পারিলেন না, মনের বেগ মনেই রহিয়া গেল।

বিপ্রদাস পুনরায় আরম্ভ করিলেন। 'বিনয় বাবু, বলিলে এখন আপনারা প্রত্যয় করিবেন না কিন্তু সে সব এক ভোগ বিলাসের কাল গিয়াছে। এখন তা দেখা যায় না। অধিক আহার করিতে পারা একটা পুণ্যের কথা। তোমার পিতা এক হাড়ী কলায়ের ডাল খেতে পারিতেন, কিন্তু তোমার আহার দেখে বোধ হচ্চে তুমি এক ছটাকও পার কিনা সন্দেহ।'

বিনয় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'হা কৃষ্ট। কি জিনিসই ঘাটাইয়াছি, এখন চুপ করিলে বাচি। 'এই মনে করিয়া প্রাণপণে রসকরা ঠুকিতে লাগিলেন।'

বিপ্রদাস বিনয়ের রসকরা ভক্ষণে অপেক্ষাকৃত ইচ্ছা দেখিয়া নিকটস্থ এক হাঁড়ী হইতে আরও কতকগুলি তাঁহার পাতে দিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন 'হা বাপ্‌কা বেটা সিপাইকা ঘোড়া' না হবে কেন। বিনয় বাবু এই কয়েকটা খান এ গুলা বোধ হয় আরো ভাল। সেকালের কথা বল্‌তেছিলাম। আজ কাল দেখ্‌তে পাই গরমী কালেও লোকে মোজা পায় দেয় ও জামা গায় দেয়। কিন্তু আমাদের সময় যে সব বেশ ভুষা ছিল এখন মনে করিলে হাসি পায়। বিশে যুগীর তাঁতে আমাদের পোসাকী কাপড় প্রস্তুত হতো। পূজার সময় তারি একখানা একখানা পরে আমাদের নৃত্যই বা কত?

আজ কাল সে সব কাপড় দিয়া তোমরা পাও মোছ না।'

বিনয় বাবু (স্বগত) 'রক্ষা কর বাবা, আর কাজ নাই। যথেষ্ট হইয়াছে। আর তোমার বাড়ীর চৌহদ্দি যে মাড়াবে সে বড়—'

বিপ্র। বাপু এখন এত খাবার পরবার সুখ হয়েই বা কি হলো। তখন ঐ কাঁচা কড়ায়ের ডাল খেয়ে আর মোটা কাপড় পরে আমরা কি না করেছি? এখনও আমি যে বুড় হয়েছি তবু আমার গায়ে যে জোর আছে তা তোমাদের মতন ৫ জনের গায়ে নাই।

বিনয় বাবু বিপ্রদাসের তৃতীয়বার বক্তৃতার সুরু দেখিয়া ক্রমাগত ত্রাহি মধুসূদন ত্রাহি মধুসূদন করিতেছিলেন। এখন একটু ফাক পাইয়া কহিলেন 'তা সত্য বটে, আজ কাল শক্তির যেমন হ্রাস হইতেছে, মনুষ্যের জীবনও তেমনি সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে। এখন আর আশী বৎসর কটা লোককে বাচিতে দেখা যায়। কলির শেষে এও যে থাকবে তারই বা সম্ভব কি?' বিনয় মনে করিলেন যে, কলির শেষের কথা কহিলে বিপ্রদাস গোড়ার কথা ভুলে গিয়া তাহাই লইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিবেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার পিতা সনাতনকে ছুটী দিবেন। কিন্তু কার্য্যত যে তাহা ঘটিবে না তাহা টের পাইলে তিনি কখন দুষ্ট কলির নাম করিতেন না।

বিপ্রদাস বক্তব্য বিষয় অভাবেই একটু চুপ করিয়া ছিলেন কিন্তু কলির কথা শুনিয়া পুনরায় আরম্ভ করিলেন। 'হাঁ বাপু ঠিক বলিয়াছ। কলির প্রভাবেই এ সমস্ত হইতেছে। ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ হইতেছে, আর পাপাচরণ বৃদ্ধি হইতেছে। এই তুমি আসিয়া হাত তুলিয়া একটী প্রণাম করিলে কিন্তু তোমার ছেলে কি এ করিবে?' বিনয় বাবু (স্বগত) 'রাম বল বাচ্‌লাম" কিন্তু সত্ত্বরই যে বিবাদ ঘটিবেক তাহা মনে করেন নাই।

বিপ্রদাস। 'হা বাপু আমি যা বলিতেছি এ যুক্তির বহির্ভূত নহে। মনে কর কি দশ বৎসর বাদে আর কেহ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবেক? দশ বৎসর আগে যা ছিল তা নেই, তোমারি বাপ—আহা সনাতন বড় সাধু পুরুষ ছিল—যদি কখন আমাদের বাটী আসিতেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পদ ধুলি মস্তকে দিয়া তবে অন্য কথা কহিতেন।' (বিনয় বাবু হিমাঙ্গ হইতেছেন) 'আহা! তাঁর সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপ, অনবরত মুখে হরিনাম! বড় সাধু পুরুষ ছিলেন। বিনয় বাবু, তোমার পিতার ন্যায় সাধু ব্যক্তি আজ কাল পাওয়া দুর্ল্লভ।'

বিনয় বাবুর গলায় রসকরা বাধিতে লাগিল। জলপান করিলেন। একটি পান হাতে লইয়া ম্লান মুখে কহিলেন 'তাঁরা সাধু ছিলেন তার আর সন্দেহ কি' মনে মনে কহিতেছেন এইখানেই থামিলে বাচি!

বিপ্র। 'সাধু তার আর কথা। বিবিনয় বাবু, তোমার পিতার কথা তোমার মনে না থাকিতে পারে। তিনি পরম সাধুব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার তিলক ও গায়ে হরিনামাবলির ছাপ দেখলে, বোধ

হইত যেন কোন দেবঋষী মানব দেহ ধারণ করিয়াছেন।'

উভয়ে বাহিরে আসিলেন। বিনয় বাবু একটু অবকাশ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে কি জন্য ডাকিয়াছিলেন?

বিপ্র। 'হাঁ বাপু এখন বলি। আমি প্রাচীন, শরীরের ভদ্রাভদ্র বলা যায় না। আমার ছোট ছোট যারা তারাও মোরে গেল। বিনয় বাবু তোমার পিতা আমার কমবেশ ১৫ বৎসর বড় ছিলেন। আহা, যথার্থ পুণ্যাত্মা! তা নৈলে কাশী লাভ হয়?' কাশীর নাম উচ্চারণ করিয়া করপুটে প্রণাম করিলেন। (বিনয় বাবুর পিতা বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন পথিমধ্যে কাশীতে মৃত্যু হয়) পাছে আবার সেকালের দিকে মন যায় তন্নিবারণার্থে বিনয় বাবু কহিলেন 'হা তার পর?'

বিপ্র। হা তাই বলিতেছি। এই ত কাল এখন কখন মরি কখন বাচি তার ঠিক নাই। এজন্য একখান উইল করিয়া রাখিতে চাই। কি জানি আমার অভাবে কেউ ছেলেটাকে আর মেয়েটাকে ফাকি দেয়।'

বিনয়। 'এ উত্তম কথা। উইল করা খুব সদ্বিবেচনার কার্য্য তাহার আর সন্দেহ নাই।'

বিপ্র। 'আমিও তাহাই ঠিক করিয়াছি। তুমিও বাটী আছ। মনোযোগ করিয়া যদি আমার কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিয়া দাও তা হলে আশীর্ব্বাদ করিব।'

বিনয়। 'তার ভাবনা কি, আমার পরিশ্রমের ত্রুটি হইবেক না। আপনার কার্য্যে কি আমার অবহেলা হইতে পারে? এই যে উইল হবে এতে হেমকেই বা কি দিবেন আর স্বর্ণলতাকেই বা কি দিবেন?'

বিপ্র। 'আমার পৈত্রিক সম্পত্তি কি তাত জানই। তাহাতে অন্ন বস্ত্র হওয়াই ভার। তা যা থাকুক সে ত হেমেরই থাকিবেক। কিন্তু আমি কায় ক্লেশে যাহা করিয়াছি, ইচ্ছা করি তাহা উভয়কেই সমান অংশ করিয়া দিয়া যাই।'

বিনয় বাবু একটু বিস্ময়াত্মক স্বরে কহিলেন 'সেকি মহাশয়? আপনার স্বোপার্জ্জিত বিষয় তো কম নহে। কন্যাকে তাহার অর্দ্ধেক দিয়া যাইবেন'?

বিপ্র। 'হাঁ বাপু আমি তাহাই স্থির করিয়াছি। বেটা ছেলের ভাবনা কি? বেঁচে থাকলে বিষয় করিতে পারিবেক। আমিই কত পেয়েছিলাম? এ সকলি ত তার পর আমারি হস্তোপার্জ্জিত। কিন্তু কন্যাটীর বিষয়ে তো সে কথা বলিতে পারি না। যদি অদৃষ্টে থাকে আর যদি সৎ পাত্রস্থ করিতে পারি তাহা হইলে অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হইবে না বটে, কিন্তু সৎ পাত্রস্থ হইবে তারি স্থিরতা কি?'

বিনয়। আপনার স্বোপার্জ্জিত বিষয় কি আন্দাজ আছে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

বিপ্র। কি বল্লে? কি জিজ্ঞাসা করিতে পার? বিপ্রদাস বিনয় বাবুর বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ইংরাজি ভাব বুঝিতে পারেন নাই।

বিনয়। আমি বলছি এই যে আপনার স্বোপার্জ্জিত বিষয় কি পরিমাণে আছে?

বিপ্রদাস ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর

করিলেন ওঃ সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তা তোমাকে বলিব তার আর ভাবনা কি? কিন্তু তোমার ত আর অজ্ঞাত কিছু থাকিবে না। তুমি সকলি টের পাইবে। তবে দু দণ্ড অগ্র পশ্চাৎ। একেবারে সেই লিখিবার সময়ই টের পাবে।

বিনয় কহিলেন 'তবে অদ্য আমি যাই' এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। যে বক্তৃতা শুনেছেন ভূমিষ্ঠ না হইলেই আশ্চর্য্যের কথা হইত। বিপ্রদাস কহিলেন 'দীর্ঘজীবি হও বাপু। তোমাদের যেমন পরমেশ্বর বৈভব দিয়াছেন তেমনি নম্রও করিয়াছেন। না হবে কেন? কেমন লোকের বেটা।'

পাছে সনাতন ঘোষকে ধরেন এই আশঙ্কায় বিনয় বাবু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। রাস্তায় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আর যদি আমি এ বাড়ী আসি তবে আমার মত নির্লজ্জ আর জগতে নাই।

পূজা সমাগত হইল। মহোৎসবে তিন দিবস অতিবাহিত হইল। যতই কেন আমোদ হউক, যতই কেন গোলযোগ হউক না, বিপ্রদাস এক মুহূর্ত্তের জন্যেও হেম ও স্বর্ণলতার নাম বিস্মৃত হইলেন না। পূজার পর বিনয় বাবুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিপ্রদাসের উইল লিখিতে হইল। পৈত্রিক সম্পত্তি সমুদায় হেমের রহিল। আর তিন লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ স্বর্ণলতাকে ও হেমকে সমান ভাগ করিয়া দিলেন।

হেম স্কুল খোলা হইলেই পুনর্ব্বার কলিকাতায় গেলেন। স্বর্ণ যথার্থই অতি অল্প দিনের মধ্যেই কলা বানান শেষ করিল। হেম কহিয়া গেলেন, 'স্বর্ণ আমি কলিকাতায় গিয়াই তোমার জন্য একখান বৈ পাঠাইয়া দিব। আর যদি তুমি আমাকে চিটি লিখিতে পার তবে চৈত্র মাসে যখন বাটী আসিব তোমার জন্যে দিব্বি একটী খোপার ফুল আনিব।'

স্বর্ণ সহাস্য বদনে কহিলেন 'এই কথা তো দাদা। যেন মনে থাকে?'

হেম। 'তা থাকুবে।'

-০ঃ।ঃ০-

দ্বাদশ অধ্যায়।

প্রমদা গৃহকার্য্যের সদুপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন; শশিভূষণের সে জন্য ভাবনা নাই।

বিধুভূষণকে পৃথক করিয়া দিয়া প্রমদা ৩। ৪ দিবস বিনা কলহে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু যেমন অঙ্গারের মলিনত্ব শত২ বার ধৌত করিলেও যায় না তেমনি স্বভাব কখন পরিবর্ত্তন হয় না। প্রমদা ঠাকুরুণদিদীর সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরুণদিদীর প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিতে লাগিলেন। ঠাকরুণদিদী নাকি তেল নুন চুরি করেন, ঠাকুরুণদিদী কাল, ঠাকুরুণদিদী অপরিষ্কার। প্রমদা এ সকল কথা কি ঠাকুরুণদিদীর মুখের উপর বলিতেন? না, তা নয়। মুখের উপর বলিলেই ঠাকুরুণদিদী হাঁড়ি কুঁড়ি ফেলিয়া

চলিয়া যাইবেন, প্রমদা তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। এজন্য পাড়ার অন্যান্য লোকের সহিত এ সমস্ত আলাপ হইত। পাড়ার অন্যান্য লোকেরা অবিলম্বেই এ সমস্ত কথা ঠাকুরূণদিদীকে কহিত। ঠাকুরূণদিদী একদিন মুখ ভার করিলেন। পর দিন দুই একটী অসন্তোষের কথা কহিলেন। তৃতীয় দিবস প্রমদার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিবেন ঘোষণা করিয়া দিলেন। কেনই বা না করিবেন? তিনি তো সরলার ন্যায় পরাধীনা নন। পর দিবস বৈকালে মহা ঝকড়া উপস্থিত হইল। প্রমদাও চুপ করিবার লোক নন, ঠাকুরূণদিও নন। একজন অপরকে পরাস্ত করিবারও যো নাই। উভয়েই কলহ বিদ্যাবিশারদ। ঠাকুরূণদিদী অনেকক্ষণ ঝকড়ার পর দুহাতের দুটী বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রমদার মুখের কাছে লইয়া গিয়া কহিলেন 'আমি তোর দাসী না তোর রাধুঁনি, যে যা মনে আসছে তুই তাই বল্‌চিস। এই থাক্‌লো তোর বাড়ী ঘর আমি চল্লাম। তুই রেঁধে খাস আর না খাস তোরি ইচ্ছা আমার কি— ' এই বলিয়া ঠাকুরূণদিদী শশীভূষণের বাড়ী ত্যাগ করিলেন। প্রমদা কখন সমকক্ষ লোকের সহিত কলহ করেন নাই, সুতরাং এত দিন পরাস্তও হন নাই। আজি এই প্রথম সম্মুখ যুদ্ধে পরাভূত হইলেন।

ঠাকরূনদিদী চলিয়া গেলে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমদা একাকিনী গৃহে বসিয়া রোদন করিলেন। পরে চক্ষু মার্জ্জন করিয়া বাহিরে আসিলেন। আজকার বিবাদে অভিমান খাটিবেক না, এজন্য নিজ হস্তেই গৃহের কাজ কর্ম্ম করিতে হইল।

শশিভূষণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাটী আসিলেন। সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'ঠাকরূণদিদী কোথায়?'

প্রমদা উত্তর করিলেন 'ঠাকরূণদিদীকে তাড়াইয়া দিয়াছি।' ঠাকরূণদিদী নিজেই চলিয়া গিয়াছেন বলিতে প্রমদার কোন মতেই ইচ্ছা হইল না, বস্তুতঃ তাহাই সত্য।

শশিভূষণ কহিলেন 'কেন ঠাক্‌রূণদিদীর অপরাধ?'

প্রমদার যাহা মনে আসিল তাহাই কহিলেন। বিধুভূষণকে পৃথক করিয়া দেবার সময় ঠাক্‌রূণদিদী বড় ভাল মানুষ ছিলেন, কিন্তু দশ দিন না হইতে হইতে ঠাক্‌রূণদিদীর এতগুলি দোষ উপস্থিত, শুনিয়া শশিভূষণ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন 'কখন কারে তুমি স্বর্গে তোল আর কখন কারে নরকে ফেল টের পাওয়া ভার। এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি অনাহারে মর্‌তে হবে। তোমার ব্যাম তুমি পারবে না, আমারও রন্ধনের শক্তি নাই। এখন উপায়?'

প্রমদা কহিলেন 'সে জন্য তোমার ভাবনা কি? তোমার ত সময়ে আহার হলেই হয়?'

শ। আমার নিজের আহারের জন্য ভাবি না। ছেলেটা আর মেয়েটা আছে, তারা পাছে ঘরে চাল থাকতে অনাহারে মারা যায়।'

প্রমদা গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া উত্তর করিলেন, 'পরকে দিয়ে কি কাজ চলে? কাল মাকে আনিব।

আমি কষ্ট পাইতেছি শুনিলে তিনি অবশ্যই আস্‌বেন। তা হলেই তোমার ভাবনা চুকে গেল।'

প্রমদার কথা শুনিয়া শশিভূষণ যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে জড় পদার্থের ন্যায় হইলেন এবং কি বলিতেছেন না টের পাইয়া কহিলেন 'কেনই বা বিধুকে পৃথক করিয়া দিলাম।' কারণ প্রমদার মাকে আনা যে সহজ ব্যাপার নহে, শশিভূষণ ইতিপূর্ব্বেই তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। প্রথমতঃ মা আসিবেন, পরে বৈকালে প্রমদার ভ্রাতা আসিবেন। তাহাকে কাজে কাজেই আসিতে হইবেক, তিনি বাটী থাকিলে তাহাকে কে রাঁধিয়া দিবে? পর দিবস সূর্য্যদেব না উঠিতে উঠিতে প্রমদার কাকা আসিবেন, তিনি একাকী নির্জ্জন পুরিতে থাকিতে ভাল বাসেন না। কাকা আসিলে তাহার মদের ও গুলির ইয়ার আসিবেক। অধিকন্তু তাহার আফিং ও মদের খরচ দিতে হইবেক। শশিভূষণ যেন নিমিষের মধ্যেই এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন 'কেনই বা বিধুকে পৃথক করিয়া দিলাম?'

প্রমদা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন 'তুমিই পৃথক করিয়া দিলে তুমিই তার কারণ জান। আমি পৃথক করিয়া দিইনি তার কারণও জানিনে।'

শশিভূষণ কিছু উর্ত্তর করিলেন না। চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রমদা বলিয়াছিলেন মাকে আনিলে আর ভাবনা থাক্‌বে না সেই জন্যেই বুঝি শশিভূষণ যত ভাবনা অগ্রেই ভাবিয়া রাখিতেছিলেন।

প্রমদা শশিভূষণকে চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন 'কেনইবা বিধুকে পৃথক করিয়া দিলাম? কেন দিয়াছিলে তা তুমিই জান। আমার কি দোষ? আমিতো তখনি বলেছিলাম আমাকে বাপের বাড়ী পাঠায়ে দাও। এখনও বল্‌ছি। দাও, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। তোমরা একত্র হও। কত লোকের তাওতো হয়। একবার পৃথক হলেই যে জন্মের মত পৃথক হয় তাওতো নয়।'

প্রমদার কথা শুনিয়া শশিভূষণের চৈতন্য উদয় হইল। বুঝিতে পারিলেন অপরাধ হইয়াছে। প্রকাশে কহিলেন 'আমি তো আর কিছু বলিতেছি না। কেবল —'

প্র। 'কেবল কি? আমি তোমার ওসব বাকা চুরা কথা বুঝিতে পারি না। যদি বোল্‌বার হয় একেবারে বলে ফ্যালো। আমি বকে মরি শুদ্ধ তোমারি ভালর জন্য বৈত নয়। আমার কি, আমি এখানে থাক্‌লেও তুমি চারটি না দিয়ে থাক্‌তে পারবে না, সেখানে গেলেও তারা আমাকে ফেলে খেতে পারিবে না।'

বোধ হয় বাপের বাড়ীর কথা লইয়া পূর্ব্বে কি হইয়া গিয়াছিল প্রমদার তাহা স্মরণ ছিল না। সে কথা মনে থাক্‌লে আর বাপের বাড়ীর নাম করিতেন না কিন্তু শশিভূষণ তাহা বিস্মৃত হন নাই। এ জন্য তিনি আর সে বিষয় সম্বন্ধে কিছু কহিলেন না। ক্ষণ কাল উভয়েই নীরবে থাকিয়া শশিভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন 'বিপিন কোথায় গেল? কামিনীই বা কোথায়?'

প্রমদা উত্তর করিলেন। 'বিপিন তার মামার বাড়ী গিয়াছে। কামিনী

ঐ শুয়ে আছে।'

শ। 'শুয়ে আছে? রাত্রে কিছু খাবে না?'

প্র। 'কি খাবে? কে রান্দ্‌বে?'

শ। আর কেউ না রান্ধে আমিই রান্দ্‌বো এখন। সব গোছান গাছান আছে তো?

প্র। গোছান গাছান আর কি? ও বেলার সবই আছে চারটি ভাত হলেই হয়।

প্রমদা এই বলিয়া 'উঃ আজি আমার অসুখটা কিছু বেড়েছে' এই বলিয়া শয়ন করিলেন। শশিভূষণ রান্না ঘরে গিয়া তত্রত্য দারগ্‌গিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

দস্তুর মত প্রমদার ভাত থালাটি ঘরে আসিল। বারম্বার ডাকা ডাকির পর প্রমদা বাঁকা মুখ করিয়া গিয়া আহার করিতে বসিলেন। শশিভূষণ মনে করিতে লাগিলেন ইহাতেও যদি মন না পাই তবে আর কিসে পাব। এই ভাবিয়া তিনি মৌনবালম্বন করিয়া রহিলেন। প্রমদার আহার হইল। অসুখ বাড়িয়াছে বলিয়া এক দানা কম খাইলেন তাহা নয়। রোজিই যে পরিমাণে খাইতেন অদ্যও তাই খাইলেন। আহারের পর আচমন করিলেন কিন্তু এতাবৎ একটীও কথা কহিলেন না। উঠনে ধান থাকিলে কৃষকের মন যেমন মেঘ দেখিলে চিন্তাকুল থাকে প্রমদার মুখ ভার দেখিলে শশিভূষণের হৃদয়ও তেমনি হইত। এজন্য কিয়ৎক্ষণ নিরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন 'বিপিনকে তো বলে দিলেই হতো সে একেবারে তোমার মাকে ডেকে আনিত।'

এই কথা কহিয়া প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু প্রমদা চিত্রিত পুত্তলির ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিলেন। ফলতঃ বলিবারও কোন কথা ছিল না। মাকে আনিবার জন্যই বিপিনকে পাঠান হইয়াছিল।

শশিভূষণ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া দুই একটা হাই ছাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে ২ নাসিকা শব্দ করিয়া নিদ্রিত হইলেন। প্রমদাও শয়ন করিলেন। নিদ্রায় রজনী অতিবাহিত হইল।

প্রমদা বলিয়াছিলেন 'আমি কষ্ট পাইতেছি শুনিলে মা অবশ্যই আস্‌বেন।' কার্য্যতঃ প্রমদার মাতা সে পর্য্যন্ত শুনিতেও অপেক্ষা করিতেন না। যে প্রকারে হউক একটা খবর পাইলেই যেখানে থাকুন অমনি পাখির ন্যায় উড়িয়া আসিতেন। বিপিনের নিকট যখন শুনিলেন প্রমদা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি তখনই আসিতেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র তৎকালে বাটি না থাকায় সে দিবস আসা রহিত করিলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন 'কতক্ষণে রাত পোহাবে' এবং পুত্রের অনুপস্থিত থাকার জন্য সে দিবস যাওয়া না হওয়ায় মনে২ তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে গদাধর আসিয়া বাটি উপস্থিত হইলেন। প্রমদার ভ্রাতার নাম গদাধর।

গদাধর কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, অন্নাভাবে কৃশ কলেবর। মস্তকটি ক্ষুদ্র, নাসিকা পর্য্যন্ত কেশে আবৃত, গলাটী প্রায় হাড়গিলের মতন লম্বা, পা দুখানি কু-

লার মত, লেখা পড়া সম্বন্ধে মা সরস্বতীর বাচ্চা বলিলে হয়। প্রমদার মা সে জন্য বড় দুঃখিত। যখন তখন কহিতেন "যারা লেখা পড়া শেখাবে তারা ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না তবে আর কেমন করে গদাধরের বিদ্যা উপার্জ্জন হবে।' প্রমদার মাতার হিসাবে গদাধরকে লেখা পড়া শেখান প্রমদার একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আর একটী কথা বলিলেই গদাধরের রূপ গুণের সমুদায় পরিচয় দেওয়া হয় অর্থাৎ তিনি 'ত' বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারিতেন না এবং তৎপরিবর্ত্তে 'ট' বর্ণ প্রয়োগ করিতেন।

সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া বিপিনকে দেখিয়া কহিলেন 'কি বিপিন টুমি কি মনে করে? কখন এলে?'

বিপিন উত্তর না দিতে দিতে গদাধরের মাতা কহিলেন 'তুমি এমন সময় কোথায় গিয়েছিলে, গদাধর চন্দ্র?' প্রমদা ও প্রমদার মা উভয়েই গদাধর চন্দ্র বলিয়া ডাকিতেন, কখনই তাহার অন্যথা হইত না। পাড়ার লোকে কিন্তু 'গদা' ছাড়া আর কিছুই বলিত না। 'তুমি কোথায় গিয়াছিলে গদাধর চন্দ্র? দেখ দেখি বিপিন এসেছে, কি খাবে কি হবে তার কোন কিছু উদ্যোগ কর্‌লে না, লোকে কি বোলবে বল দেখি?'

গদাধর উত্তর করিলেন 'আমি কোটায় গিয়েছিলাম টাটে টোমার কাজ কি? আমি কাজে ছিলাম। বিপিনের খাবার ভাবনা কি, আমরা যা খাই বিপিনও টাই খাবে। এটো বিপিনের পরের বাড়ী নয়। 'বিপিন' 'বিপিন' টামাক খেয়েছ?'

বিপিন। 'আমি তামাক খাইনে।'

গদা। টুমি খাও না আমরা টো খাই। মা, একটু টামাক সাজ।

গদাধরচন্দ্র আদরের ছেলে। নিজহাতে কখন তামাক সেজে খান নাই। তাঁর মাতা খেতে দিতেন না; তামাকের পিপাসা হলেই তিনি নিজে সেজে দিতেন। গদাধরের মা তামাক সাজতে আরম্ভ করিলেন গদাধর ইত্যবকাশে জিজ্ঞাসা করিলেন। 'বিপিন টবে কি মনে করে এসেছ?'

বিপিন। দিদিমাকে নিতে এসেছি।

গদাধর সহাস্য বদনে কহিলেন, 'মা শুন্‌লি, টুই যে সে ডিন বোলছিলি প্রমডার ডশ্না মায়া নেই কখন ডেকেও পাঠায় না আর খরচও ডেয় না। এই ড্যাক ডেকে টো পাঠায়েছে।'

বিপিনের সম্মুখে গদাধর এরূপ বলায় গদাধরের মা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন 'গদাধর চন্দ্র তোমার কি এ জন্মেও বুদ্ধি হবে না? আমি কবে ও কথা বলেছিলাম?'

গদাধর। 'আমার বুড্‌ডি নেই টোমার টো আছে, টা হলেই আমার হবে। কিণ্টু টোমার মনে ঠাকে না এই একটা ডোষ। সে ডিন টুমি এক কটা বল্লে আজ বল না।' এই সময়ে গদাধরের মা তামাক সাজিয়া গদাধরকে হুকা দিলেন। গদাধর চন্দ্র হুকা পাইয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন, উপস্থিত কথা ভুলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল তামাক টানিয়া মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মা একটা ডায় বেচে গেলাম, ডিডিড্‌ডের

বাড়ী গেলে আর একটু টামাকের জন্যে টোমার খোসামোড কোরটে হবে না।'

গদাধরের মা। 'গদাধর চন্দ্র তোমার কি বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে?'

গদা। 'টবু ভাল, টূমি বল্লে আমার বুড্ডি লোপ পেয়েছে। টবে আমার এককালে বুডডি ছিল। এট ডিন টো আমার বুড্ডি নেই বোলে টুমি মোর্‌ছিলে।'

গদাধরের মাতা কহিলেন 'হ্যাঁ তোমার খুব বুদ্ধি আছে, এখন দেখ দেখি জেলে পাড়ায় চার্টি মাছ পাওয়া যায় কি না। বিপিন এসেছে ওকে চারটি খাওয়াতে হবে তো।'

গদা। কেন ডীডী যে ডাল পাঠায়ে ডিয়েছিল টা নেই?

গদাধরের মা সক্রোশে গদাধরের মুখের দিকে তাকাইলেন অর্থাৎ সে সব কথা বলিতে বারণ করিলেন। গদাধর কিন্তু ভয় পাইবার লোক নন। তিনি কহিলেন 'অমন চোক গরম করে কাকে ভয় ড্যাকাও? আমি বুঝি জানি নে। সে ডিন ডাল এসেছিল সে কি মিঠ্‌ঠে কঠা? সেই ডাল রাঁডো এখন আমি রাট্রে কোন খানে মাছ আণ্টে যেটে পারবো না।'

গদাধরের মা সক্রোধে ভ্রূকুটি করিয়া 'গদাধর চন্দ্র—'

গদা। কেন, গডাঢর চণ্ড্রকে কেন, এই টো গডাঢর চণ্ড্র আছে। টোমার ভয়ে পালাবে না। গডাঢর চণ্ড্র পালাবার ছেলে নন, কিণ্টু যদি বিরক্‌ট কর টবে সব কটা বলে ডেবে।'

গদাধরের মা অনুপায় দেখিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। গদাধর তামাক খাইতে খাইতে বিপিনের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। 'টবে বিপিন টোমরা সব ভাল আছ? টূমি নাকি এখন ইংরাজি পড়?'

বিপিন। 'হ্যাঁ। আর মা বলেছে তোমাকেও এবার ইংরাজী পড়তে দেবে।'

গদাধর। 'হ্যাঁ ইংরাজি পড়টে ডেবে, এমনি কিছু পড়ি নি, টারি পয়সা ডেয় কে, টার আবার ইংরাজী পড়টে ডেবে।'

বিপিন। 'হ্যাঁ মা বলেছে দেবে।'

গদাধর। 'টবে যেন টোমার মা আমার হয়ে পড়ে আসে।'

বিপিন। 'মামা তুমি তয়ের জায়গায় ট বল কেন?'

গদাধর। 'কৈ বলি? ও টোমার শোনবার দোষ।'

বি। 'ঐ যে বল্লে'

গদা। 'বলেছি টো খুব করেছি।'

এই রূপ কথোপকথনে আহারের সময় পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল। আহারান্তে গদাধর ও বিপিন শয়ন করিলেন। গদাধরের জননী ঘরের সমস্ত জিনিস পত্র গোছাইতে লাগিলেন এবং পর দিবস গমনের জন্য বস্ত্রাদি নির্ব্বাচন করিলেন। সমস্ত গোছান হইলে তিনিও নিদ্রিতা হইলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রা আজি সুচারু রূপে হইল না। বড় আহ্লাদ হইলে নিদ্রা হয় না। প্রমদার মাতার বড আহ্লাদ হইয়াছিল। জামাতার গৃহে গেলে অন্ততঃ তিন মাস আর আহারের ভাবনা ভাবিতে হইবেক না। লোকে কথায় বলে কাহারও সর্ব্বনাশ কাহারো পৌষ মাস। শশিভূষণ ও প্রম-

দার মাতার সম্বন্ধে আজি যথার্থই তাই।

পর দিবসপ্র্যুত্তূষে শশিভূষণ শয্যা হইতে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে 'ভীভী ভীভী' রবে গদাধরচন্দ্র দেখা দিলেন। তাঁর পশ্চাৎ গদাধর চন্দ্রের মাতা, সর্ব্ব শেষে বিপিন। একে ২ তিন জন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গদাধরকে দেখিয়া শশিভূষণের মনোমধ্যে যে ভাবের উদয় হইল তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা সহজে অনুভূত হইতে পারে। আপাদমস্তক পর্য্যন্ত তাহার কলেবর ঈষৎ কম্পিত হইল। বোধ হয় [লঘুপতনক " দ্বিতীয় কৃতান্তমিব' ব্যাধকে দেখিয়াও যত অনিষ্টের আশঙ্কা না করিয়াছিল শশিভূষণ সহধর্ম্মিণীর প্রিয়তম কনিষ্টকে দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক ভীত হইলেন।

প্রমদা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া জননীও ভ্রাতাকে সমাদরে বসাইয়া বাটীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গদাধর চন্দ্র ক্ষণেককাল বসিয়া বাটির চতুর্দিগ পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গদাধর চন্দ্র যে বাটিতে থাকেন সেখানে কোন দ্রব্য লুকাইয়া রাখিবার যো নাই। তাঁহার চোক তাহাতে পড়িবেই পড়িবে; বিশেষ যদি খাবার জিনিস হয়।

শশিভূষণ মনে মনে যার পর নাই বিরক্ত হইয়া কাছারি চলিয়া গেলেন। প্রমদা "ষোড়োশোপচারে" আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। প্রমদার জননী পাক শাক করিয়া উচিত সময়ে আহার করিলেন। বাটীর অন্যান্য সকলেরও আহার হইল। গদাধর চন্দ্র প্রথম তরকারিটী নামিলেই পাত করিয়া বসিয়া ছিলেন, আর শেষ তরকারি হইলে আহার শেষ হইল। আহার সমাপন হইলে, প্রমদা জিজ্ঞাসা করিলেন 'গদাধর চন্দ্র পেট ভরেছে তো?' গদাধর উত্তর করিলেন 'ভীভী টোমার বাড়ীতে পেট না ভরবে টো ভরবে কোটায়, টুমি আমার অর্ন পুর্ণা।'

প্রমদা কহিলেন 'ছি ও কথা বল্তে নেই?'

গদাধর। কেন বাবা মাকে বলটে পারলে আর আমি টোমাকে বোলটে পারবো না। সেই আর বছর বাবার মার শ্রাদ্ধের সময় সকলের খাওয়া ডওয়া হলে বাবা বল্লে মাকে টুমি আমার অর্ন পূর্ণা টা না হলে এখন খাওয়ান হটো না। বাবা বলটে পারলে আমি পারবো না।

প্রমদার মা শুনিয়া কহিলেন 'ছি গদাধর চন্দ্র তোমার কি বুদ্ধি কখনও হবে না?'

গদাধর বিরক্ত হইয়া 'আমি কি টোমাডে্ডর জালায় মরবো? যখন একটা কটা কব এক জন বলবে ছিছি, আর এক জন বলবে টোর বুড্ডি নেই, আর টোমরাই যেন বিদ্যাসাগরের মাগ।'

গদাধরের মাতা রাগত হইয়া কহিলেন 'চুপ কর্ কালা মুখোটা, যা মনে আসছে তাই বলছে। যত না কিছু বলি ততই যে বাড়িয়ে দিচ্ছিস্?'

গদাধর ক্রোধে কম্পিত হইয়া আরক্ত লোচনে উত্তর করিলেন 'বড় হুকুম জারি করটে শিখেছো যে, যেন

লাট সাহেবের বিবি, ফের যডি আমাকে কিছু বলিস টবে এই ইট ডিয়ে মাটা ভেঙ্গে ডেব, ডেখি টোর কোন্ বাপে ঠেকায়।'

গদাধর চন্দ্র রাগ করিলে আর রক্ষা থাকিত না। হাঁড়ী, কুঁড়ী, বাসন কোসন যেখানে যা পেতেন তাই ভেঙ্গে চুরে ফেলিতেন, তার আপন পর জ্ঞান থাকিত না। এজন্য গদাধর চন্দ্রের জননী আর কথা কহিলেন না। প্রমদাও মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার একটু অগ্রে শশিভূষণ বাটি আসিয়া বসিয়াছেন, বিপিন আর কামিনী এক জোড়া পুরাতন ময়লা তাস লইয়া খেলা করিতেছে, গদাধর চন্দ্র খাবার খাইতেছেন, প্রমদার মা ইন্দুরের ভয়ে ঘোমটার অভ্যন্তরে লুচি লুকাইয়া রাখিতেছেন, (তিনি লোকের সম্মুখে কিছুই খাইতেন না, বিরলে কিছুই বাকী রাখিতেন না), প্রমদা দ্বারে দাঁড়াইয়া চৌকি দিতেছেন পাছে কেহ ঘরে আসে, এমন সময়ে এক জোড়া জগন্নাথি চটী পায়ে, এক খানি উত্তম রূপে কোঁচান সাদা পেড়ে ধুতি পরিধান, স্কন্ধে একটী উড়ুনী, বাম হাতে একটী গোলাপ ফুল, ডান হাতে একগাছি ছড়ি, সুররাজ ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি দেবরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি যাজকের ব্যবসায় করিতেন না। ইনি মোক্তারি করিতেন। কিন্তু দেবরাজের মৃত্যু হওয়াবধি বাটী থাকেন। সংসারের কাজ কর্ম্ম করেন। শশিভূষণ সুররাজকে প্রণাম করিয়া বসিতে বলিলেন। সুররাজ কহিলেন, আমি বসিব না, এঁদের দেখতে এলাম কেমন আছেন। আমি আবার এই চল্লাম। সুররাজ কখনই থাকিবেন মনে করিয়া আসিতেন না। তবে যে থাকিতেন সে কেবল অনুরোধ বশতঃ। শশিভূষণ কহিলেন 'যাবেন কেন; আজ ত থাকুন, আজ সন্ধ্যা হলো।'

শশিভূষণের তৎকালিন মুখ দেখিলেই যে সে বুঝিতে পারিত যে, শশিভূষণ রাগত হইয়া একথা কহিলেন। সুররাজও বোধ হয় তাহা টের পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, পরন্তু হাস্য মুখে কহিলেন 'ঐজন্যেই তো বাপু তোমাদের এখানে আসিনে। এই এক দিন থাক্‌তে বল্‌ছো এর পর এক মাসেও ছাড়বে না। আমার বাড়ী ঘরের কে তত্ত্ব তল্লাস করে তাতো বুঝবে না। কি করি বাপু তুমি বিস্তর বোলছো, আজিকার রাতটা থাক্‌লাম, কাল্ কিন্তু আমি প্রত্যুষে উঠিয়া চলিয়া যাইব।'

শশী। স্বগত। 'চলে যাবে কেন? তোমার ঘর তোমার দোর। আমিই যাব।' প্রকাশে একটু কাষ্ঠ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

সুররাজ অনন্তর 'গদাধর, গদাধর' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গদাধরের গাল লুচিতে পরিপূর্ণ। আস্তে ব্যস্তে সে গুলি গিলিয়া উত্তর করিলেন। 'আমার আর বেঁচে সুখ নেই। লোকের জ্বালায় একটা কটাও কৈটে পারব না; আর তোমার

জ্বালায় কিছু খেটেও পারবো না। ডেখটে পাচ্ছ না আমি খাচ্ছি, এখন কটা কোটে পারবো না ?’

সুর। ‘খাচ্ছ, খাও, ডান হাতে করে খাও। আমি আর তোমাকে ডেকে বিরক্ত করিব না।’ সুররাজ গদাধরকে বড় ভাল বাসিতেন না, ও খালি গদাধর বলিয়া ডাকিতেন, চন্দ্র সংযোগ করিতেন না। গদাধরের জননী ও প্রমদা উভয়েই এজন্য সুররাজের উপর সর্ব্বদাই বিরক্ত থাকিতেন কিন্তু বিবাদ করিলে পাছে সুররাজ যেখানে যা পান তাহা নিজে হস্তগত করেন, এজন্য তাহার সহিত প্রকাশ্য কলহ করিতেন না। সুররাজ মোক্তার ছিলেন, সুতরাং এ কথা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন এবং মর্ম্মে বেদনা দেবার জন্য গদাধর চন্দ্রকে ‘গদাধর’ বলিয়া ডাকিতেন। এমন কি কখন কখন ‘গদা’ এবং সময় বিশেষে ‘গদাই’ বলিয়াও ডাকিতেন।

*

শশিভূষণ এই অবধি আপনার বাটীতে আপনি পরাধীনের ন্যায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। গদাধর চন্দ্রের মাতা বাটীর একমাত্র কর্ত্রী স্বরূপ হইলেন। সুররাজ সমস্ত দিন রাত্রি পাড়ায় থাকেন, আহারের সময় কেবল বাটিতে আসেন। গদাধর চন্দ্র স্কুলে বিদ্যাভ্যাসের কারণ ভরতি হইলেন। প্রমদা পরম সমাদরে সকলকে আহারাদি করাইতে লাগিলেন, কি জানি ক্রুটি হইলে পাছে লোকে নিন্দা করে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শশিভূষণের বুদ্ধি বিলক্ষণ প্রখর ছিল। সেই বুদ্ধিই শশিভূষণের উত্তর উন্নতির মূল। প্রথমতঃ ৫ টাকা বেতনে প্রবেশ করেন কিন্তু এক্ষণে ২৫ টাকা হইয়াছে। তাঁহার উপরে একমাত্র দেওয়ানজী আছেন। পরম্পরায় শুনা যাইতেছে দেওয়ানজীও বুঝি বেশী দিন আর না টেঁকেন। বাবু শশিভূষণের বুদ্ধি দর্শন করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় শশিভূষণকে দেওয়ানি কার্য্যের ভার দিলে তাঁহার আর নিজে কিছু না দেখিলেও চলিবে। হিসেব কিতেব দেখা কি ঝঞ্ঝাটের কাজ? বাবু এক বিন্দু বিশ্রাম পান না, আমোদ প্রমোদ করা তো দূরে থাকুক, ভাবিয়া পান না তাঁহার পিতা পিতামহ প্রভৃতি কি প্রকারে এ সমস্ত কাজ করিবার অবকাশ পাইতেন; বিশেষ তাঁহাদের সময়ে তো দুই তিনটী বৈ আমলা ছিল না। বাবু স্থির করিলেন ‘সেকেলে লোকে খুব পরিশ্রম করিতে পারিত। তাঁহাদের বুদ্ধি তাদৃশ সূক্ষ্ম ছিল না। যাহাদের বুদ্ধি অধিক তাহারা অধিক কায়িক পরিশ্রম করিতে পারে না। পরমেশ্বরের নিয়মই এই।’

আশ্চর্য্যের বিষয় এই লোকে পরস্পরের কার্য্যেই হিংসা করে, বুদ্ধি বিদ্যার হিংসা করিতে দেখা যায় না। আমা চাইতে এর জমী বেশী, ওর টাকা বেশী, অনেকেই বলে। কিন্তু কে কোথায় কাহাকে কখন বলিতে

শুনিয়াছে ‘ আমার অপেক্ষা অমুকের বুদ্ধি বেশী।’ বুদ্ধি থাকিলে ধন হয়, জমী হয়, জমীদারি হয়, কিন্তু তথাপি অমুকের মতন আমার বুদ্ধি হউক একথা কেহই বলে না।

লোকে কায়িক বলের হীনতা স্বীকার করিতে লজ্জিত হয় না। অনেক সময়ে এমনও দেখা গিয়াছে যে, বলবান বলায় লোক অসন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মানসিক দৌর্ব্বল্য কখনই কেহ স্বীকার করিতে চাহে না। পরন্তু যাহার যত মানসিক দৌর্ব্বল্য সে ততই ধী-শক্তির গৌরব করে ও তাহার পরিচয় প্রদান করিতে ব্যগ্র হয়। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন শারীরিক দৌর্ব্বল্য দেখিলে লোকের অন্তঃকরণে দুঃখের সঞ্চার হয়, কিন্তু মানসিক দৌর্ব্বল্য দেখিলে রাগ হয়। তাহার কারণ এই, যে পঙ্গু সে অবলীলাক্রমে স্বীকার করে যে যাহাদের পদযুগ দোষশূন্য তাহারা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কিন্তু যে বোকা সে মনে করে যে পৃথিবীতে তার তুল্য বুদ্ধিমান আর কেহই নাই।

বাবুর পিতা পিতামহেরা এক সন্ধ্যা আতবান্ন আহার করিয়া কৃশ কায়ে যাহা করিতেন বাবু তিন বেলা মৎস্য মাংস ও প্রয়োজন মত বলদায়ক ‘ আরক’ সেবন করিয়াও তাহা করিতে পারেন না। তাঁহার কি বুদ্ধি কম তা নয়। তবে কি না ‘ সে কেলে ’ লোকের বিস্তর বরদস্ত হইত। বাবুর ততদূর সহ্যগুণও নাই আর ততদূর শারীরিক বলও নাই।

শশিভূষণের বুদ্ধি আছে, বল আছে, সহ্যগুণ আছে এবং মিষ্ট কথায় মনের তুষ্টি সম্পাদন করার শক্তি আছে। তিনি যে ক্রমে ২ উচ্চপদাভিষিক্ত হইবেন তাহার বিচিত্র কি ? না হওয়াই আশ্চর্য্য।

শশিভূষণের অধীনে এক্ষণে ৭। ৮ জন আমলা। সকলেই বিশ্বাসী। শশিভূষণ সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসী। তিনি যাহা দেখিয়া দিবেন তাহাতে ‘ ভুল চুক ’ থাকিবার যো নাই। সমস্ত খরচ তাঁহার ভার।

শশিভূষণ হিসাবের কতকগুলি কাগজ হস্তে লইয়া বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন ‘ বাবু, শিব মন্দির ও শিব প্রতিষ্ঠার খরচের হিসাব প্রস্তুত হইয়াছে দেখুন।’

বাবু বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত। ‘ তুমি ভাল করিয়া দেখিয়াছ ? কোন ভুল চুক নাই তো ?’

শশী। ‘ আমি তো কিছুই টের পাইলাম না। আমার যতদূর বিদ্যা তার মধ্যে এক পয়সাও তফাত দেখিতে পাইতেছি না। আপনি না দেখিলে ভুল চুক আছে কি প্রকারে বলিব।’

বাবু মহা সন্তুষ্ট, শশীভূষণের অপেক্ষা এ সব কর্ম্ম বেশী বোঝেন। শশীভূষণ তাহা নিজেই স্বীকার করে। কহিলেন ‘ তবে আর আমি কি দেখিব, তুমি দেখিয়াছ তাহা হইলেই হইল।’

শশীভূষণ তাহার অধীনস্থ একজন কর্ম্মচারির সমভিব্যাহারে হিসাব পেষ করিতে গিয়াছিলেন। বাবুর কথা শুনিয়া পরস্পর একবার চোক চোকি করিলেন। তাঁবেদার কর্ম্মচারী ঈষৎ হাস্যও করিলেন। কিন্তু সে হাসি শশিভূষণ টের পাইলেন। আর কাহারো টের পাইবার যো নাই।

শশিভূষণ ঈষৎ চক্ষু গরম করিলেন, যেন সে স্থানেও সে সময়ে সে হাসি টুকু হাসা ভাল হয় নাই। তাঁবেদার মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

বাবুর একজন বন্ধু ইংরাজিতে কহিলেন 'কাজ হইয়া গেল, এক্ষণে ইহাদিগকে বিদায় করিবার আপত্তি কি ?'

বাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'আর কোন কাজ উপস্থিত আছে ?'

শশী। 'আজ্ঞা না। আপাততঃ তো কিছু দেখিতেছি না।' হস্তস্থিত কাগজ গুলাকে একবার নাড়িয়া 'এটায় মোট কত খরচ হলো একবার দেখলে ভাল হতো না ?'

বাবু শশিভূষণের কাগজ নাড়া দেখিয়া ভাবিলেন একবার আরম্ভ করিলে তো সহজে শেষ হয় তাহার সম্ভব নাই। বিশেষ ছিপী খোলা বোতলটা তক্তপোষের নিচে রহিয়াছে, তাহা হইতে কত উপে যাইতেছে, গেলাসে যে টুকু ঢালা ছিল সে তো একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। প্রকাশে কহিলেন 'কত হইয়াছে বল।'

শশী। ২৪ হাজারের ইষ্টিমিট ছিল কিন্তু ৩১ হাজার ৩ শ ১৩ টাকা খরচ হইয়াছে।' কথাগুলি কহিয়া শশিভূষণের ওষ্ঠাধর যেন ঈষৎ কম্পিত হইল।

বাবুও যেন একটু আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু বয়স্যগণের মধ্যে এই কটী টাকার জন্য সমুদায় হিসাব দেখা কিছু অপমানের কথা বিবেচনা করিয়া কিছু কহিলেন না। একজন বয়স্য ইংরাজিতে কহিলেন 'ইষ্টিমিটের চাইতে প্রকৃত খরচ তো চিরকালি বেশী হইয়া থাকে।' বাবু কতক অভিমানের ভয়ে কতক বন্ধুর কথায় শশিভূষণের হস্ত হইতে কাগজগুলি লইয়া ইংরাজিতে নাম সই করিয়া দিলেন। হিসাব শেষ হইল।

আজ্ কাল্ ইংরাজি যুবকদিগের একটা রোগ বিশেষ হইয়া পড়িয়াছে। লেখা, পড়া, কথা বার্ত্তা সকলই ইংরাজিতে চাই। পরস্পর চিটি ইংরেজিতে না লিখিলেই নয়। বাপ মাকে পর্য্যন্ত ইংরাজিতে তরজমা করা হইয়াছে। কোন স্থানে বাপ মায়ের বিষয়ে কথা কহিতে হইলে বাপ মায়ের ইংরাজি প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যুবকদের বোধ হয় 'বাবা' 'মা' বলিতে লজ্জা করে।

হিসাব স্বাক্ষরিত হইলে শশিভূষণ উহা লইয়া কাছারি আসিলেন। এ দিগে তক্তোপোশের নিম্ন হইতে গেলাস ও বোতল উপরে উঠিলেন। বাবুরা আমোদে আসক্ত হইলেন। শশিভূষণ অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত বাটীতে পোঁছিয়া লাভ বণ্টন করিতে লাগিলেন।

শশিভূষণ এইরূপে ক্রমে২ একজন বিলক্ষণ ধনশালী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। পূর্ব্বেও যে ধুতি চাদর ও চটি জুতা লইয়া বাহির হইতেন এখনও তাই। প্রমদার দেহে আর গয়না দিবার স্থান নাই। কিন্তু তথাপি তাহার মন উঠে না। স্ত্রীলো-

কের অলঙ্কার লালসা কখন নিবৃত্তি হয় কি না সন্দেহ।

গদাধর চন্দ্র একজন বাবু হইয়া উঠিলেন। চিনের বাড়ীর জুতা তাঁর জন্য কলিকাতা হইতে ডাকে আইসে। চুল না বেঁকাইয়া বেরুতে গদাধর চন্দ্রের লজ্জা করে। শান্তিপুরে ঢাকাই ধুতি ভিন্ন আর অন্য কাপড় পরা হয় না। 'শশী বাবু কেমন করে ঠানের ধুটি হাঁকান' গদাধর চন্দ্র তাঁহা ভাবিয়া পান না। তাইতো বটে গদাধর, বেশ! সার্থক ভগিনীর বিবাহ দিয়েছিলে। অমন আর একটী ভগিনী থাকিলে আজ্ তোমাকে পায় কে? তুমি আর নবাব সরাজুদ্দোলাতে তফাত কি? কিন্তু লোকে থানের ধুতি কেমন কোরে 'হাঁকায়' তা তোমার বাপ তোমা অপেক্ষা ভাল জানিতেন। তুমিও হয় তো কোন কালে জানিতে পারিবে।

সুররাজ ভট্টাচার্য্য ধান্যেশ্বরী ত্যাগ করিয়াছেন। ইংরাজি মদ নৈলে আর চলে না। 'ধেনো গুলার কেমন গন্ধ, কেমন কোরেই বা লোকে ওগুলা গেলে' সুররাজ যখন তখন বলেন। সুররাজের ছিটে অর্থাৎ গুলি এক্ষণে গৃহ-জাত হয়। তাহাতে জিনিস ভাল হয়। গয়লা বাড়ীর দুদ, আর ঘরের দুদ্ বিবেচনা কর না কেন কত তফাত। সুররাজের গুলি প্রস্তুত করিবার জন্য একজন বিশেষ চাকর নিযুক্ত। ধন্য সুররাজ, তুমিও ধন্য! সার্থক ভাতৃ কথায় বিবাহ দিয়াছিলে।

গদাধর চন্দ্রের মাতা যেন দিন২ শশীকলার ন্যায় রূপ ধারণ করিতে লাগিলেন। না করিবেন কেন? রসদটি সামান্য নয়। দিনের বেলা ষোলো ষোলোং দুশ ছাপ্পান্ন উপচারে আহারটী হয়। রাত্রে অতি অল্প হইলেও রোজ রোজ একদিস্তা লুচি ঘোমটার মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। শরীরটী দিন কতকের মধ্যে গোল হইয়া গেল।

বিপিন, কামিনী খায় দায় স্কুলে যায়। ভাল কাপড় পরে, ভাল জামা গায় দেয়। যে পয়সা পায় তা দিয়ে স্কুলে খাবার খায়। তাস পাশা কেনে না। গদাধর এজন্য বিপিনকে কতবার বলিয়াছেন 'বিপীন টোর বড় ছোট নজর।' কি করা যায় গদাধর বাবু! সকলেরি কি সমান মহৎ নজর হয়?

গদাধর চন্দ্রও স্কুলে গিয়াছিলেন। শিক্ষকেরা প্রথমতঃ অত বড় ছেলে ভরতি করিতে চান না। কিন্তু শশিভূষণ, বাবুর দ্বারায় অনুরোধ করান তখন। গদাধর পাঠভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। দিন কতক স্কুলে গিয়া গদাধর টের পাইলেন শিক্ষকেরা কেহই সুযোগ্য নহে। বাটী আসিয়া জননীর নিকট কহিলেন 'মা আমার টো পড়া হয় না।'

গদাধরের জননী জিজ্ঞাসিলেন 'কেন?'

গদাধর উত্তর করিলেন 'কোন ব্যাটা মাস্টার পড়াটে পারে না। ওরা কেউ কিছু জানে না।'

গদার মাতা। 'কেউ কিছু জানে না তবে বিপিনের কেমন করে পড়া হয়?'

গদা। ও ছেলে মানুষ, ওকে যা বলে ও টাই শুনে, আমার কাছে টো

টা হবার যো নেই। এই একথার আর আমারে সকলি ' মামা ' বোলে ডাকে। আমি আর ও স্কুলে যাব না।'

গদাধরের জননী আর্দ্র নয়নে সকরুণস্বরে কহিলেন, ' বাপু তোমার কিছু যে হবে না আমি আগেই জানি। তোমাকে যে শেখাবে সেই তোমাকে দেখ্‌তে পারে না। তা না হলে তুমি কেন এতদিন কলিকাতায় গেলে না ? '

শশিভূষণের ভারি অপরাধ যে তিনি গদাধর চন্দ্রকে কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাসের কারণ রাখেন নাই। আর আপাততঃ রাখিতে স্বীকার করেন না। প্রমদা অনুরোধ করিলেন কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শে নাই।

প্রমদার মাতা, ভ্রাতা, ও খুল্য-তাত শশিভূষণের বাটিতে আবির্ভাব হওয়া অবধি শশিভূষণের বাটিতে থাকিবার অত্যন্ত অসুবিধা হইল। বাটিতে স্থান অল্প। বৈঠকখানা ঘরটী অর্দ্ধেক হইতে হইতেই বন্ধ রহিয়াছে। শশিভূষণ ভাবিলেন আর অল্প খরচ করিলেই বৈঠকখানাটী প্রস্তুত হয়। অতএব তাহাই করা উচিত। কিন্তু প্রমদা এ পরামর্শ মনোনীত করিলেন না। ঘরটী প্রস্তুত হইলে বিধুভূষণকে কালে তাহার অংশ দিতে হইবেক. ইহা অপেক্ষা অন্যায় কথা আর কি হইতে পারে। শশিভূষণ গদাধর চন্দ্রকে কলিকাতায় না পাঠাইয়া এক বার প্রমদার কথা লঙ্ঘন করিয়াছেন। এবার আর তার কথা লঙ্ঘন করিবার সমর্থ হইল্‌ না। সুতরাং অন্য একটী স্থান ক্রয় করিয়া শশিভূষণকে বৈঠক খানা প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইতে হইল। কিন্তু স্থান ক্রয় করিবার সময় এই এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল ' কাহার নামে কেনা যায় ?' শশি-ভূষণের নিজের নামে তো হইতেই পারে না। কারণ তাহা হইলে পাছে বিধুভূষণ মোকদ্দমা করিয়া তাহার অংশ লয়। সেই কারণ প্রযুক্ত প্রম-দার নামেও হইল না। পরিশেষে সাত পাঁচ ভেবে চিন্তে গদাধরচন্দ্রের নামে স্থান খরিদ করা হইল। গদাধরের ইহাতে আহ্লাদ আর ধরে না।

প্রথমতঃ বৈঠকখানাই প্রস্তুত করিবার কথা, কিন্তু ক্রমে ক্রমে একটী সুন্দর বাটী হইল। শশিভূষণ সপরি-বারে সেই নূতন বাটীতে উঠিয়া গেলেন। সরলা, গোপাল ও শ্যামা সেই পুরাতন বাটীতেই রহিলেন। এখন পুরাতন বাটীতে যে অংশ আছে তাহা কি করিবেন শশিভূষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, বাটী পাড়া গাঁয় ভাড়া হইবার সম্ভব নাই। শূন্য ফেলিয়া রাখিলেও ক্রমে ক্রমে খারাপ হইয়া যায়। শশিভূষণ প্রমদাকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমদা একটু মিষ্ট হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ' আগে তুমি কি মনে করিয়াছ বল, তার পর আমার মনের কথা বলিব।'

শশীভূষণ কহিলেন ' তুমি কি ভাবিয়াছ আগেই বল না ?'

প্রমদা এবার একটু মন-কেড়ে-লওয়া গোছ হাসি হাসিয়া শশীভূষ-ণের নিকটে গিয়া বলিলেন এবং সেই রূপ প্রকার হাসিতে হাসিতে কহিলেন " তুমি না বলিলে আমি বলিব না।'

শশী। ' আমি মনে করিয়াছি

ও বাড়ীটা সমুদায়ই বিধুকে দি।' এই সময়ে প্রমদার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন মুখ চন্দ্রিমা মেঘাচ্ছন্ন, অমনি পুনুরায় কহিলেন 'এই মনে করিয়াছি, কিন্তু তোমাকে না জিজ্ঞাসা করে কি আমি কোন কাজ করিতে পারি? এখন তোমার বিবেচনায় কি হয় বল।'

প্রমদা। 'আমার বিবেচনা লইয়া তুমি কি করিবা। তোমার বাড়ী, তোমার যা খুসী তাই কর।'

শশিভূষণ কথার ভাব শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন আচ্ছা আজ একথা এই পর্য্যন্তই থাক। আর এক দিন হবে। দুদিন থাক্‌লে বাড়ীটে তো আর পচে যাবে না।

———ooo———

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দুই ভাই মুন্‌সেফ ও ডাক্তার।

—::—

বিধুভূষণ ও নীল কমল প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া মুদির দোকান হইতে পুনরায় কলিকাতার পথে চলিলেন। ক্ষণকাল গমন করিয়া উভয়ে এক বৃক্ষ মূলে শ্রান্তি দূর করিবার মানসে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্ব দিবস নীল কমল ক্রমাগতই গান করিয়াছিল। অদ্য নীল কমলের মুখে কথা নাই। যে সর্ব্বদা বকে তাহাকে চিন্তাকুল দেখিলে তাহার সমভিব্যাহারী লোকের মনে এক রকম কষ্ট অনুভূত হয় বোধ হয় তাহা সকলেই জানেন। বিধুভূষণের মনেও সেই কষ্ট হইতে ছিল। কিন্তু কথা কহিতে গেলেই পাছে নীল কমল গান ধরে এই ভয়ে এতক্ষণ কথা কন নাই। বৃক্ষমূলে বসিয়া উভয়ে তামাক খাইতে২ বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন;

'নীলকমল, কি ভাবিতেছ?'

নীলকমল কথা কহিল না।

বিধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন 'নীলকমল কি ভাবিতেছ?'

নীলকমল কথার জবাব না দিয়া একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল 'দাদা ঠাকুর, যে সাহেবেরা খৃষ্টান করে তারা যা বলে সব কি সত্যি?'

বিধুভূষণ কহিলেন 'কি বলে তা না শুন্‌লে কেমন করে বল্‌বো?'

'এই যে তারা বলে খৃষ্টান হোলে মেম দেবে, তা কি যথার্থই দেয়?'

বিধু হাসিয়া উত্তর করিলেন 'কেন যদি দেয় তা হলে তুমি খৃষ্টান হবে নাকি?'

নীলকমল কহিল 'হতে ত ইচ্ছা করে কিন্তু জাত যাবে যে? আচ্ছা ব্রেহ্মজ্ঞানী হলে কি তারা বিয়ে দিয়ে দেয়?'

বিধু কহিলেন 'তা তো আমি বল্‌তে পারিনে।'

নীলকমল। 'আমাদের গাঁয়ে কতক গুলি ব্রেহ্মজ্ঞানী হয়েছে তাদের আগে বিয়ে হতো না এখন খুব হয়। তাই আমার ইচ্ছা করে ব্রেহ্মজ্ঞানী হই। কিন্তু যদি পাদরি সাহেবেরা মেম দেয় তা হলে খৃষ্টানই হই। বাঙ্গালী বে করার চাইতে মেম বে করা ভাল। কেমন দাদাঠাকুর ভাল নয়?'

বিধু। সে যার যেমন ইচ্ছা। তুমি যে মেম বে করবে তাকে খাওয়াবে কি আর পরাবেই বা কি?

নীল। সেইত ভাবনা। আমি তাই ভাবিতে ছিলাম। যাই বিদেশে তো যাচ্ছি, কিছু না কিছু অদেষ্টে জুটে যাবেই।

বিধুভূষণ। তার আর সন্দেহ কি?

উভয়ে পুনরায় বৃক্ষমূল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাস্তায় চলিতে লাগিলেন নীলকমল তথাপি পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় কথা কহে না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকার পর কহিল 'দাদাঠাকুর যার যা কপালে থাকে কেহ খণ্ডন্ করিতে পারে না। আমি তার এক গল্প জানি। আমার যদি কপালে লেখা থাকে মেমের সঙ্গে আমার বে হবে তা হবেই হবে।'

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নীলকমল তুমি কপালে যা লেখা থাকে তাই ঘটে এর কি গল্প জান বল দেখি?'

নীলকমল কহিল, 'এক গাঁয়ে এক জন ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্মণের এক বউ আর এক ছেলে। এক দিন রাত্রে ঘরে শুয়ে আছে আর শুয়ে থাকিতে থাকিতে দেখতে পেলে আড়কাটা থেকে এক গাছ দড়ি ঝুলছে। দড়িগাছ তো দড়িগাছ। বামুন পাশ ফিরে ঘুমুতে গেল, ঘুম হয় না। উশ পিশ উশ পিশ করিতে করিতে বিছানায় এগোড় ওগোড় দিতে লাগলো, খানিক পরে দেখে না দড়ি গাছ ক্রমে লম্বা হয়েছে। বামন ভাবলে এক গাছ দড়ি ছিল ইন্দুরে ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু না তা না। দড়ি ক্রমে ক্রমে লম্বা হয়ে একটা সাপের মত হলো। তাড়াতাড়ি তার বউকে জাগাবে কিন্তু না জাগাতে ২ সাপটা নেমে তার বউকে ও ছেলেকে কামড়ালে। যে কামড়ান আর অমনি মরা। বামনের আর রোজা ডাকৃতে ভর সোলো না। সাপটা সেই ঘরেই আছে। পরে সাপটা দরজার ফাকদিয়ে বেরিয়ে গেল। বামুনও অমনি পিছু পিছু গেল। সাপ যদি রাস্তা দিয়ে যায় বামনও রাস্তা দিয়ে যায়, সাপ জঙ্গলে গেলে বামনও জঙ্গলে যায়। এমনি করতে ২ ভোর হয়ে গেল। সাপটা তখন একটা বাঘের রূপ ধরলো। বামন ভাবলে এও এক রকম মন্দ নয়, কিন্তু বাঘের পাছ ছাড়া হবে না। বামন ছেলে ও বউ মরায় যেন ক্ষেপে গিয়াছিল। তার পর ঐ বাঘ এক জন বুড় মানুষ যে ঘর থেকে খানিক বেরিয়ে এসেছে অমনি তাকে ধরে তার ঘাড় মোটকিয়ে রেখে গেল। তার পরই বাঘ রূপ গিয়া ষাঁড হলো। তখন বেশ বেলা হয়েছে। চাসারা মাটে টাটে যাচ্ছে। এক জন লাঙ্গল ঘাড়ে হাতে পাচনি নিয়ে ঐ ষাড়ের সম্মুখে পড়লো আর অমনি ষাড সিং দিয়ে তার পেট চিরে ফেল্লে। চাসা তখনি মোল। অন্য অন্য লোক দেখতে পেয়ে ষাড়ের কাছে লাটী ঠ্যাঙ্গা নিয়ে এল আর ষাডও পালাল। বামনও সেই সঙ্গে সঙ্গে দৌডে গেলো। খানিক গিয়া ষাড একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হলো। এখন বামন তার পায়ে ধরে পডলো। বুড বামন বলে 'তুই কে' আর যে পায়ে ধরে পডলো সে বলে 'তুমি কে।' বামুনকে না ছোড দেখে বুডো বলিল আমি কর্ম্ম-

সূত্র। বামুন বলে কর্ম্ম সূত্র কি, আমি তো জানি না। তখন বুড় বলিল, যার কপালে যেমন করিয়া মরবে লেখা থাকে আমি সেই রূপ ধরে তাকে মারি। এখন আমাকে ছেড়ে দে আমার অনেক মারা বাকী আছে। তাই বুঝি তুমি কাল আমার ছেলেটাকে আর স্ত্রীকে সাপ হয়ে কামড়ে এলে। এখন বলে দাও আমার কেমন করে মৃত্যু হবে। বুড় বলে, পাগল তাকি বলতে আছে। বামন বলে, না বল্লে আমি ছাড়বো না। বুড় কি করে তার কাজ ক্ষতি হয়, না বল্লে আর বামন ছাড়ে না। তখন বামুনকে বল্লে, তোরে গঙ্গায় কুমিরে মারবে। বামুনের শরীর কেঁপে উঠলো। তার বাড়ী গঙ্গাতীর, প্রত্যহই গঙ্গাস্নান করে। এই কথা শুনে আর বামুন বাড়ী গেল না। বাড়ী গেলেই মরা ছেলে ও বউকে গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে পোড়াতে হবে, পাছে স্নান করবার সময় কুমীরে খায়। বামন এই ভেবে একেবারে পূব মুখ চলে গেল, যে দেশে গঙ্গা নেই। চলে গিয়ে চলে গিয়ে এক রাজার দেশ ছেড়ে আর এক রাজার দেশ গেল। সেখানে গিয়া এক বড় মানুষের বাড়ী রৈল। সে বড় মানুষের ছেলে পিলে হয় নাই। বামন বল্লে আমি স্বস্তেন জানি, স্বস্তেন করলে ছেলে হবে। পাড়ার লোক খুব ভক্তি করে স্বস্তেন করালে আর এক বছরের মধ্যে তার ছেলে হলো।

সেই দেশের রাজারও ছেলে পিলে হয় নাই। রাজা কোথা থেকে শুনেছে অমুক গায়ে এক বামন আছে তাকে দিয়ে স্বস্ত্যয়ন করালে ছেলে হবে। রাজাতো ভারি যত্ন করে বামনকে নিয়ে গেল। বামন স্বস্তেন করলে আর রাজারও এক বছরের মধ্যে এক ছেলে হলো। বামনকে আর রাজা ছেড়ে দেয় না। ছেলে ক্রমে ক্রমে বড হলো। রাজা ভাবলে যে, বামনের মতন বিদ্বান আর নেই। ছেলেকে সেই বামনের কাছে পড়াবার জন্যে রাখলে। রাজপুত্রের যখন ১৬ বছর বয়স তখন সর্ব্ব শাস্ত্রে বিদ্বান হলো। রাজপুত্র দেশ ভ্রমণ করিতে যাবেন। রাজা বামনকে বলিলেন তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। বামন বল্লে আপনার হুকুম ফেলতে পারিনে। কিন্তু এই কড়ারে সঙ্গে যাব যে আমাকে পশ্চিমদিগে যেতে বলবে না। রাজা ও রাজপুত্র সম্মত হলো। তার পর সকলে হাতি ঘোড়া লোক লস্কার সঙ্গে করে দেশ ভ্রমণ করিতে গেল। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব তিন দেশ ভ্রমণ করা হলো। বামন বরাবর সঙ্গে সঙ্গে আছে। রাজপুত্র বামনকে বাপের মতন ভক্তি করে, বামন রাজপুত্রকে ছেলের মতন ভাল বাসে। ছেলেও সহজ ছেলে নয়। শোলো বছরের সময় সর্ব্বশাস্ত্র পণ্ডিত।

তিন দেশ ভ্রমণ করা হলে রাজপুত্র বলে 'এখন পশ্চিম দেশে যাব।' বামন বলে 'যাও কিন্তু আমি আর সঙ্গে যেতে পারব না।' রাজপুত্র বলে 'তুমি না গেলে আমার যাওয়া মিথ্যা'। বামন রাজী হয় না রাজপুত্রও ছাড়ে না। শেষে রাজপুত্র বল্লে, আচ্ছা চল আমি গঙ্গার ধারে যাব না তাহলে তো তোমার আর ভয় নাই। বামন করে কি তাহাতেই

স্বীকার হলো। পশ্চিম দেশে এসে নানা মুলুক দেখা হলো। রাজপুত্র এক দিন বল্লে 'সমুদায় মুলুক দেখ্‌লাম গঙ্গাস্নান না করে তো যাওয়া হবে না।' বামন বল্লে তুমি গিয়া গঙ্গা স্নান কর আমি পুনরায় তোমার রাজ্যে ফিরে যাই। রাজপুত্র তা শুনে না। গঙ্গাস্নানে যেতে হবেই। বামন কোন মতেই যাবে না। তার পর রাজপুত্র বল্লে 'আচ্ছা তোমার সে দেশে যেতে কি আপত্তি আছে, তোমাকেতো রাস্তা থেকে কি ঘরে থেকে কুমীরে নিয়ে যাবে না।' বামন করে কি। রাজপুত্রের সঙ্গে গেল। ক্রমে ক্রমে যোগের দিন এল, রাজপুত্র স্নান করিতে গেলেন, ব্রাহ্মণ বাটী রহিল, রাস্তায় গিয়া বলে, আমি গঙ্গায় তো স্নান করিতে যাই, মন্ত্র পড়াবে কে? এই বলে ফিরে বাসায় এল। এসে বামনকে বল্লে আমার সঙ্গে যেতে হবে কিন্তু তুমি ডাঙ্গায় দাঁড়ায়ে মন্ত্র পড়ো তাহলেই হবে, তোমাকে জলে যেতে হবে না। বামন স্বীকার হলো। তীরে গিয়া দেখে হাজার হাজার লোক গঙ্গাস্নান করছে। তাই দেখে বামনের একটু সাহস হলো। রাজপুত্র স্নান করিতে নামিলেন বামন কুলে দাড়ায়ে মন্ত্র বলিতে লাগিল। রাজপুত্র বলে 'আর একটু জোরে বল আমি শুন্তে পাইনে। বামন খুব চেঁচায়ে মন্ত্র বলিতে লাগিল। রাজপুত্র তখনও শুনিতে পায় না। বামন দুএক পা করে করে জলের ধারে গেল তবু রাজপুত্র শুনিতে পায় না। শেষে রাজপুত্র বলিল 'আচ্ছা আমার লোক চারিদিকে দাঁড়াবে তুমি সেই চক্রের মধ্যে থেকে আমাকে মন্ত্র পড়াও।' এই বলতে চারিদিগে লোক দাঁড়াইল, মধ্যখানে রাজপুত্র ও বামন। বামন মন্ত্র বলিতে লাগিল রাজপুত্র সেই মন্ত্র পড়িয়া ডুব দেবার সময় বামনকে কহিল 'ঠাকুর আমি সেই কর্ম্মসূত্র' এই বলিয়া কুমীরের রূপ ধরিল এবং তখনি বামনকে নিয়ে এক লাফ দিয়া গভীর জলে চলিয়া গেল।'

এইরূপে নীলকমল গল্প সমাপন করিয়া কহিল 'দেখুন ঠাকুর অদেস্টে গঙ্গাতীরে মরণ ছিল কেউ নিবারণ করতি পারলো না। যার অদেস্টে যা থাকে সে কি কেউ খণ্ডাইতে পারে?'

বিধুভূষণ নীলকমলের গল্প শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ চিন্তাকুলও হইলেন। ক্ষণকাল পরে উভয়ে এক রাস্তার ধারে দোকানে গিয়া স্নানাহার করিলেন।

নীলকমল দোকানে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'দোকানী ভাই এখানে দুজন ব্রহ্মজ্ঞানী এসেছিল?'

বিধু কহিলেন 'কেন সেকথায় তোমার কাজ কি?'

নিল। 'যদি এসে থাকে তবে ঐ রাস্থায় যে কথাটা বলেছিলাম মীমাংসা করিয়া যেতাম।'

মুদী কহিল। 'না বাপু ব্রহ্মজ্ঞানী ট্যানি কেউ এখানে আসে নি।' নীলকমল মুদীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ খুন্ন হইল। তার মনে বিশ্বাস ছিল যে দোকানে আসিয়া পূর্ব্বরাত্রের ব্রাহ্মদ্বয়ের সহিত দেখা হইবেক।

অতঃপর উভয়ে পুনরায় তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এইরূপে দুইজনে গমন করিয়া কলিকাতার কাছাকাছি এক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। সে দিবস আর মুদীর দোকান মিলিল না। এক গৃহস্থের বাটী গিয়া উভয়েই বসিল। কাল কলিকাতা দেখিতে পাইবে নীলকমলের বড়ই আহ্লাদ হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা কেমন জায়গা কত বড় সহর নীলকমল কিছুই জানে না। এজন্য বিধুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ দাদা ঠাকুর কলিকাতা কেমন জায়গা?'

বিধু। 'কেমন জায়গা জিজ্ঞাসা করলে এখন আমি কি বলিব। কত বড় তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছ না কেমন জল কেমন হাওয়া তাই জিজ্ঞাসা করিতেছে?'

নীল। 'আমি সব জিজ্ঞাসা করছি। কলিকাতায় কি আমাদের দেশের মতন মাটী?'

বিধু। হাসিয়া উত্তর করিলেন, আমাদের দেশের মতন না কি আর এক রকম মাটী?'

নীল। 'আচ্ছা কলিকাতা যে বড় সহর বলে। তা সহরটা কি আমাকে বল দেখি।'

বিধু। 'সহর এই যে মস্ত বাজার, অসংখ্য দোকান, অসংখ্য লোক জন।'

নীল। 'আচ্ছা আমাদের ফকিকের হাটে যত লোক হয় এত লোক?'

বিধু। 'কোথায় তোমার ফকীরের হাট। কলিকাতায় যত লোক এত লোক এ দেশে আর কোন জায়গায় একত্র নেই।'

নীল। আচ্ছা সেখানে ক দিন অন্তর হাট হয়?

বিধু। হাট কি, সেখানে কি হাট আছে? সেখানে রোজই যে জিনিস ইচ্ছা হয় তাই কিন্তে পাওয়া যায়। কত শত দোকান আছে। রোজ কত শত জায়গায় বাজার বসে।

নীল। আচ্ছা রোজ বাজার বসে আর এত দোকান আছে এত রোজ খর্দ্দের হয় কোথা থেকে? আমাদের ফকিরের হাট তো মস্ত হাট কিন্তু তাতো রোজ হয় না আর এক দিন জিনিস কিন্‌লে আর তিন দিন কিন্তে হয় না।

বিধুভূষণ কহিলেন। কোথা থেকে খোদ্দের হয় কালি দেখ্‌তে পাবে। আমি আর এখন বক্‌তে পারি না।

বিধুভূষণ ও নীলকমল যে বাটিতে গিয়াছিল সে বাটীর কর্ত্তা উভয়ের এই রূপ কথোপকথন শুনিয়া অত্যন্ত আমোদিত হইলেন। তিনি এক জন মুনসেফ ছুটি লইয়া বাটী গিয়াছেন। বয়স প্রায় ২৭। ২৮ বৎসর, স্থূলাকার, শ্যামবর্ণ, বাম চক্ষু একটু টেরা। বড় ভাল মানুষ এবং গীত বাদ্য প্রিয়। তিনি বিধুকে ডাকিয়া মজার কথা শুনিবার জন্য বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। কিন্তু দুই চারি কথা কহিয়া টের পাইলেন যে বিধু কলিকাতার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে না। বাবু যেন কিঞ্চিৎ ভগ্নোদ্যম হইলেন। তিনি একটু বোকা লোক পাইলে খুব গল্প করিতে পারেন কিন্তু চতুর লোকের কাছে মুখ চোরা।

বৈঠকখানায় বিছানার উপর একটা তাম্বুরা ও তবলা পড়িয়া রহিয়াছে।

বাবু বিধুকে ডাকিয়া আনিয়া কথা না কওয়া বড় লজ্জা মনে করিয়া তবলায় ঘা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। 'তুমি গাইতে পার ?'

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন 'অম্নি অল্পস্বল্প, কিন্তু আপনাদিগের শুনিবার যোগ্য নহে।'

বাবু কহিলেন, 'আচ্ছা তবে একটা গাও।'

যারা একটু গাইতে বাজাতে পারে তাহারা সহজে বিদ্যা বাহির করিতে চায় না। অনেক খোসামোদ করিতে করিতে আচ্ছা গাই বলিয়া দুই এক বার গলা ঝাড়া দেয় দিয়ে প্রায়ই বলে 'না মহাশয় আজি হবে না। কালি রাত্রি জেগে কিম্বা দৈ খেয়ে গলা ভেঙ্গে গিয়াছে।' বিধুভুষণ তাদৃশ লোক না হইলেও দু এক বার অস্বীকার করিলেন, কিন্তু পরে গান করিতে আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বে বাবু একাকী বসিয়া ছিলেন, গান শুনিয়া পাড়ার লোক আসিয়া জমিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ১০।১২ জন আসিল। বিধুভূষণের গান শুনিয়া সকলেই আহ্লাদিত হইলেন। নীলকমল আসিয়া উপস্থিত হইল। নীলকমলের জ্ঞান ছিল বিধু গাইতে বাজাইতে জানেন না, এজন্য প্রথমে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। পরে সেই খানে বসিয়া শুনিতে লাগিল। সকলে বেস ভাল বলে, নীলকমল একটু মুখ বাঁকায় যেন নীলকমল তার চেয়ে ভাল পারিত। বিধুভুষণ থামিলেই নীল কমল ঘুন ঘুন করে কিন্তু পাছে লোকে নীলকমলের বিদ্যা টের পায় এজন্য বিধুভুষণ আর ফাঁক দেন না। চারি পাঁচটা গান গাওয়া হইলে বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি বাজাইতে পার।' বিধু কহিলেন তাও একটু পারি। বাবু বিধুকে তবলা দিলেন। বিধু বাজাইতে লাগিলেন। তাহাতেও সকলে সন্তুষ্ট হইলেন।

বৈঠকখানার পাশে একটী ছোট ঘর ছিল। ঘরের মধ্যে এক খানি ভাঙ্গা চেয়ার,একটী তিন পেয়ে টেবেল, একখানা অব্যবহার্য্য খাট। খাটের নিচে একটি কাটের বাক্স তার ডালা নেই। বাক্সের মধ্যে খড বোঝাই। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় কতক গুলা খড় আছে মাত্র কিন্তু তার মধ্যে ক্রমাগত বোতল। ছোট বড় নানা রকম, নানা রকম টিকিট। কোনটার উপর বেরালের ছবি, কোনটার বৃক্ষের পত্র আঁকা, কোনটার মাথায় টিনের টুপি, কোনটার অম্নি ছিপী। বোতলের মধ্যে কি, পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিয়াছেন। বাবুর ভাই ডাক্তার, এই তাঁর ডাক্তারখানা। বাবুরা সকলে এক একবার এই ঘরের মধ্যে যাইতেছেন আবার ক্ষণকাল পরে বাহির হইয়া আসিতেছেন। ঘরটীর কি চমৎকার শক্তি! তার মধ্যে যে যায় সেই আমোদ করিতে করিতে বাহিরে আসে।

সকলেই দুই একবার এই ঘরের মধ্যে গিয়াছেন। গান বাজনা অবিশ্রান্ত চলিতেছে। আমোদের সীমা নাই। এমন সময় একটী ফ্লুট হাতে বাবুর ভাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে একখানি ডুরে চাদর। একটী পীরাণ তার হাতা কনুই পর্য্যন্ত মাত্র, কিন্তু একখানি শান্তিপুরে ধুতি পরি-

থান, পায়ে এক জোড়া সামান্য জুতা। বাবুর ভাই গোল ভাল বাসেন না। এজন্য অনেক লোক দেখিয়া একটু চটিলেন কিন্তু প্রকাশে কিছুই বলিতে পারিলেন না। সকলে যেখানে বসিয়াছিল, তিনি সেখানে না বসিয়া একেবারে তার ডাক্তারখানায় অর্থাৎ সেই ছোট কুটুরীটীর মধ্যে গেলেন। গিয়া কি দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। দাদাকে ডাকিয়া কহিলেন 'দাদা শুনে যাও।'

দাদা যদিও বাড়ীর কর্ত্তা কিন্তু ভাইকে ভয় করেন। শুনিতে গেলেন।

ভাই কহিলেন 'দাদা দেখ দেখি কি অন্যায়। একেবারে ৫ বোতল একরাত্রে খালি করেছ?'

দাদা তখন স্ফুর্ত্তিতে আছেন। বলিলেন 'তাতে কি হয়েছে? কাল তোমাকে ১০ বোতল এনে দেবো।'

ভাই। 'এনে দেবে, কোথা থেকে আন্‌বে? তাতে কি পয়সা লাগ্‌বে না?'

দাদা। তোমার পয়সা না লাগিলেই তো হলো?'

ভাই। 'আমার লাগবে না তোমার তো লাগবে? সে পয়সা কি নষ্ট হবে না?'

দাদা। 'সেসব কথা রেখে দাও, এখন এই গেলাসটা খাও।'

ভাই। 'না আমি খাবো না। আমার টুকু রেখে দেও, ভাল সেই টুকুও তো বাঁচুক।'

দাদা। 'তাতেই কি বড় মানুষ হবে নাকি?'

ভাই। বড় মানুষ হই না হই তবু তো একটু বাঁচলো।

ভাইটী বড় হিসাবি লোক। যে দিবস বাটীতে কেহ আসে সে দিবস তিনি আহার করেন না। তিনি যাহা খাইতেন আগন্তুক আসিয়া তাহাই খাইয়া গেল, খরচ বেশী হইল না। এই প্রকার ভাই সর্ব্ব বিষয়েই হিসাবি। দাদার পাঁচ টাকার কম জুতো হয় না, ভাই কখন জুতোর জন্য বারো আনার বেশী খরচ করেন নাই। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যা বাঁচাতে পারেন। এই প্রকার বাঁচাইতে বাঁচাইতে শরীরটী এত শীর্ণ হইয়াছে যে হাড়গুলি গুণিয়া লওয়া যায়। দাদা ভাল খাইতে কত বলেন তবু ভাই বাঁচাইতে ছাড়েন না।

দাদা ও ভাইতে উল্লিখিত কথোপকথনের সময় চাকোর আসিয়া তামাক দিল। ভাই হুকটী লইয়া বাহিরে আসিলেন। দাদা যে গেলাসটী ঢেলে ছিলেন সেটী উদরস্থ করিতে বসিলেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সকলি একত্রে চলে কিন্তু তামাক খাবার বেলা হুকাটী লইয়া বাহিরে না আসিলে চলে না। কিন্তু চুরুটের বেলা আবার সে নিয়ম নয়। সেটা একত্রই চলে।

ভাইও বাড়ী এলেন আমোদপ্রমোদও কমিতে লাগিল। ভাই যতক্ষণ বাটীতে থাকেন অন্য কেহ তখন আসে না। দুজন একজন করিয়া প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। সত্বরই গৃহশূন্য হইয়া গেল। দাদা ভাই ও বিধুভূষণ এই কয়েক জন মাত্র রহিলেন। ভাই বাঁশি বাজাইতে লাগিলেন। দাদা ও বিধুভূষণ গল্প করিতে লাগিলেন। ক্রমে২ ভাই বাঁশি বাজান বন্ধ করিয়া গল্প শুনিতে লাগিলেন। বিধুভূষণ

কেমন করিয়া গান বাজনা শিখিলেন ও তার পর কি হইল এক্ষণেই বা কোথায় যাইতেছেন এসমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিতেছেন। দাদার কেমন হৃদয়! বিধুভূষণের দুঃখের কথা শুনিয়া দ্রব হইয়া গেল। তিনি কহিলেন 'আচ্ছা তুমি আমার এই খানে থাক, আমার বাড়ি ঘর বাগান ইত্যাদি তদারক করিতে হবে, আমি ৮ টাকা করিয়া বেতন দিব। আর মধ্যে২ একটু বাজানা শেখাতে হবে।'

বিধুভূষণের চক্ষু দিয়া কৃতজ্ঞতা অশ্রু পড়িতে লাগিল। আর কথা কহিতে পারিলেন না। দাদারও চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল।

এমন সময়ে বাটির অভ্যন্তর হইতে চাকর আসিয়া কহিল, আহারের জায়গা হইয়াছে আপনারা আসুন। দাদা ভাই উভয়েই চলিলেন। বিধুভূষণ নিজের পাকশাক করিতে গেলেন। বাবুরা কায়স্থ, তা না হলে বিধুভূষণকে রন্ধন করিতে হইত না। বাটীর ভিতর আহার করিতে বসিয়া কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে কহিলেন 'দেখ দেখি দাদা তুমি কি অন্যায় করিলে।'

জ্যেষ্ঠ। 'কি অন্যায় করিলাম।'

কনিষ্ঠ। তুমি ওকে একেবারে বলে ফেল্লে ৮ টাকা মাইনে দেবে, এটা কি অন্যায় দেখ দেখি। ওতো এক জন পাকা গুলিখোর আমি দেখতে পাচ্ছি। তিন দিনের মধ্যে যা কিছু আছে যদি না নিয়ে পালায় তবে আমি যা বলেছি সব মিথ্যা।

জ্যেষ্ঠ। তুমি তো যা বলে থাক সকলি প্রায় মিথ্যা হয় কিন্তু তবু তো আবার নূতন করে বল্‌তে ছাড় না।

কনিষ্ঠ। আর আমি বল্লাম এখন আমি যেখানে বাড়ীই থাক্‌ছি সেখানে এক জন সরকারের দরকার কি? আগে যখন আমি কালেজে ছিলাম সে এক কথা স্বতন্ত্র কিন্তু এখন তো আমি সরকারের যে কার্য্য সমুদায় করিতে প্রস্তুত আছি। তবে মাইনে দিয়ে এক জন লোক রাখার দরকার কি?

জ্যেষ্ঠ। ঐ তো আমি যা বলে থাকি সে কথা কি মিথ্যা। ডাক্তর হলেই যেন লোকের ছোট নজর হয়। তোমরা নিজের মান বোঝ না।

কনিষ্ঠ। আমরা নিজের মান বুঝি না বুঝি তুমি তো বোঝ তা হলেই আমার হবে। এখন আমার কথা এই যে, কাল সকালে ও লোকটি বিদায় কর।

জ্যেষ্ঠ। তা আমি পারবো না। এক বার এক কথা আর একবার আর এক কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না। তোমার টাকা দিয়ে তো আর ওকে মাইনে দিতে হবে না তবে তোমার এত জিদ কেন? আমার খুসী আমার টাকা আমি জলে ফেলে দেবো।

বাবু কিঞ্চিৎ রাগিয়া উল্লিখিত রূপ কহিলেন। কনিষ্ঠের রাগ মাত্র নাই। যাই বলুন কিছুতেই অসন্তুষ্ট নাই। অর্থ বাঁচানই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। অর্থ বাঁচাইবার জন্য যদি এক অঙ্গও দিতে হয় তাই তাতেও কাতর নন। দাদাকে মিষ্টি২ করিয়া কহিলেন 'আমার টাকা দেবেন না।

কিন্তু এ বাড়ীতে তো আমার অংশ আছে। আমার বাটীতে ওকে থাক্‌তে দেব না।'

দাদা শুনিয়া অত্যন্ত রাগ করিয়া উঠিলেন এবং আহার ত্যাগ করিয়া গিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। ভাই টের পান নাই যে, এত খানি হবে। দাদা অন্ততঃ দেড় বোতল খাইয়াছেন সুতরাং কিঞ্চিৎ গরম ছিলেন। ভাই কিছুই খান নাই, সুতরাং পরস্পরের মনের ভাব পরস্পর টের পান নাই। জ্যেষ্ঠ উঠিয়া গেলে কনিষ্ঠও উঠিতেন কিন্তু তাহা হইলে পাতের ভাত গুলি পাছে ফেলে দিয়ে নষ্ট করে এই জন্য সে গুলি খেয়ে দাদার কাছে আসিলেন। মনে বুঝি কি সদ্ভাবের উদয় হইল। দাদার কাছে আসিয়া বলিলেন, 'দাদা আমার অন্যায় হইয়াছে তুমি ওকে রাখ।' দাদা আবার এখন বেশী রাগ দেখাইবার জন্য বলিলেন, 'না ওরা এখনিই যাউক।' ভাই বলিলেন 'না আমি ভাবিয়া দেখিলাম একজন সরকার না হইলে চলিবে না।' দাদা কহিলেন,না সরকারে কাজ নেই,আমি যত দিন বাড়ী আছি নিজে সব করিব তার পর আমি বাড়ী থেকে গেলে নষ্ট হলে তো আর আমি দেখ্‌তে আসবো না।'

এই রূপ কনিষ্ঠ যতই রাখিতে বলেন, জ্যেষ্ঠ ততই না বলেন। অনেক ক্ষণের পর জ্যেষ্ঠ কহিলেন 'না যথার্থই সরকার দরকার নাই। যে কাজ তা তুমিই করিতে পারিবে।' অতঃপর উভয়ের পুনর্ম্মিলন হইল এবং ঠিক হইল যে, দাদা তো বলিতে পারিবেন না, সকালে কনিষ্ঠ উঠিয়া বিধুভূষণকে বলিবেন, রাত্রিকার বন্দোবস্ত সুবিধা হইল না ও স্থানান্তরে কর্ম্মের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিবেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

কলিকাতা।

— ঃঃ —

নীলকমল বিধুভূষণের আর কলিকাতায় যাইতে হইবেনা শুনিয়া প্রথমতঃ অত্যন্ত দুঃখিত হইল। সে নিজে কখন বিদেশে আইসে নাই বিশেষ কলিকাতায় যাইবে। বিধুভূষণের নিকট শুনিয়াছে সেখানে অতিশয় জনতা ও মস্ত স্থান; আলাপী লোকও তথায় নাই। কিন্তু যখন শুনিল যে বিধুভূষণও যাত্রার দলে যাইতেছিলেন তখন তার একটু আনন্দ বোধ হইল। মনে মনে যদিও তার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে বিধুভূষণ তার তুল্য গাইতে পারে না, বাজাতেও পারে না, বিশেষ বেহালায় তার পারদর্শিতা নাই, তথাপি দুজন উমেদার যাওয়া অপেক্ষা একজন গেলে ফলোলাভের বেশী সম্ভব সেটা তার জ্ঞান ছিল। রাত্রে বিধুভূষণকে নানা প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। 'আচ্ছা দাদা ঠাকুর বাবুরা বেহালা শিখ্‌তে চায় না?' বিধুভূষণ কহিলেন 'তাতো আমি জানি না, কাল সকালে বরঞ্চ তুমি একবার জিজ্ঞাসা করিও।' নীলকমল ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিল 'আচ্ছা দাদা ঠাকুর, কালি

আমি সকালে উঠে বাবুদের সম্মুখে একবার বাজাব। আমাকে রাখেন না রাখেন কিছু বকসীসতো দিতে পারবেন।’ বিধুভূষণ কহিলেন ‘হাঁ তা দেবার আশ্চর্য্য কি? বাবু যে ভাল মানুষ দেখ্‌তে পাচ্ছি কিন্তু এক কাজ কর ছোট বাবুর সঙ্গে কিছু বোল না।’

নীলকমল। কেন? ছোট বাবু কি গান বাজনা কিছু জানেন না?

বিধু। তা আমি বল্‌তে পারিনে। তাঁকে তো গাইতে শুনি নাই, কিন্তু বাঁশি বাজাতে পারেন, যদি কেহ তাল না দেয়।

নীল। আর তাল দিলে?

বিধু। তা হলে তত ভাল লাগে না। ছোট বাবুর বাজনা শুনে বড় তাল বোধ আছে তা বোধ হলো না।

নীল। আচ্ছা তবে বড় বাবুর কাছে বাজাব। কিন্তু বড় বাবু কোনটী?

বিধু। ঐ ছোট বাবু এলে যিনি উঠে গেলেন।

নীলকমল আবার কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল ‘দাদা ঠাকুর তোমার তো চাকুরি হলো, তবে কাছে যে পয়সা ও টাকা আছে আমাকে দাও না কেন? কি জানি কাল যদি কোন জায়গায় অতিথি হতে না পাই।’

বিধুভূষণ কহিলেন ‘আচ্ছা দেখি কাল তো আসুক। যদিই আমার এখানে থাকা হয় তবে আমার সঙ্গে যা আছে কাল্ তোমাকে দেব।’

নীলকমল। যদি থাকা হয় আর বলো কেন। তোমার তো মাইনে টাইনে বরাদ্দ হয়ে গেল?

বিধুভূষণ কহিলেন ‘আজকার কথা তত গ্রাহ্য করিতে নাই। দেখ্‌তে পাওনি বাবুরা মদ খেয়ে ছিল। মদের মুখে লোকে যা বলে তা যদি সব সত্য হতো তা হলে দুঃখ থাকতো না।

নীলকমল। কখন মদ খেলে দাদাঠাকুর?

বিধু। আস্তে, কে কোথা থেকে শুন্‌বে।’

বিধুভূষণ যদিও বাবুর কথায় তাদৃশ বিশ্বাস করেন নাই, তথাপি মনে২ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। আর অধিক অবিশ্বাস করিবারও কারণ ছিল না। বাবু মদ খাইয়াছিলেন বটে কিন্তু কোন কথা তো বেঠিক বলেন নাই। সুতরাং ঐটীই যে বেঠিক হইবেক তাহার প্রমাণ কি?

রাত্রে উভয়ের মধ্যে কাহারো সুচারুরূপে নিদ্রা হইল না। নীলকমলের নানা ভাবনায় আর বিধুভূষণের আহ্লাদে। নীলকমল জীবনের মধ্যে এত দুঃখিত কখন হয় নাই। তাহাকে ডাকিয়া কেহ তাহার বাজানা শুনিল না এই তাহার শোকের প্রধান কারণ। বিধুভূষণের উপর যে একটু ভক্তি হইয়াছিল তা এখনি দূরীভুত হইয়া গেল।

প্রাতঃকালে উভয়েই উঠিয়াছে। কিন্তু অন্য দিনকার মতন আজি তাড়াতাড়ী নাই। বেলা হইল। ছোট বাবু উঠিলেন। তামাক খাইয়া

মুখ হাত ধুইয়া, বিধুভূষণকে ডাকিলেন 'ওহে একবার এই দিকে এস তো।'

নীলকমল নিজ গুণের পরিচয় দিবার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র ছিল। যদিও মনেং জানিতেছে যে তাহাকে ডাকে নাই তথাপি ত্রস্ত হইয়া অগ্রে গিয়া জিজ্ঞাসিল 'কি জন্য ডাকুলেন মহাশয়?'

ছোট বাবু কহিলেন 'তোমাকে কি? না আমি তোমাকে ডাকি নাই, তোমার নাম কি বিধুভূষণ?'

নীলকমল উত্তর করিল 'না আমার নাম বিধুভূষণ নয়। কিন্তু একবার বেহালা শুন্‌বেন না? আমি বেশ ভাল বেহালা বাজাতে পারি, কাল যে গান বাজানা শুনেছেন তার চাইতে ঢের ভাল জানি!'

ছোট বাবু কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া কহিলেন 'আমি তোমাকে গান বাজনা শুনাইবার জন্যে ডাকি নাই। যদি তোমার নাম বিধু না হয় তবে যার ঐ নাম তাকে পাঠাইয়া দাও।'

নীলকমল ছোট বাবুর কর্কশ কথা শুনিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বিধুকে ডাকিয়া দিতে চলিল। যাইবার সময় বাবুকে বলিয়া গেল 'আমি যে কালিকার গান বাজানার নিন্দা করিয়াছি দাদাঠাকুরকে তা বোল্‌বেন না।'

নীলকমল আসিয়া যখন বিধুকে যাইতে কহিল তখন বিধুর গা যেন কাঁপিয়া উঠিল। নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। ছোট বাবু কহিলেন 'আপনাকে কালি দাদা যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সুবিধা হইল না। এক্ষণে সরকার রাখিবার দরকার নাই। যখন হয় তখন আপনাকে লিখিয়া পাঠাইব। কোন্ ঠিকানায় পত্র লিখিলে আপনি পাইবেন আমাকে বলিয়া দিন।'

ছোট বাবু কখন প্রায় 'তুমি' বলিয়া কাহাকে সম্বোধন করিতেন না। বিশেষ যেখানে অসন্তোষজনক কথা কহিতে হইবেক। পাড়ায় তিনি 'মিস্ত্রীর ছুরি' বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

বিধুভূষণ বাবুর কথা শুনিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। বাবু তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন এবং কহিলেন 'কৈ আপনি ঠিকানা বলিয়া গেলেন না।'

বিধুভূষণ কহিলেন 'ঠিকানাই যদি থাকবে তবে এমন টো টো করে বেড়াব কেন?'

ছোটবাবুর পূর্ব্ব সন্দেহ আরো গাঢ় হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই গুলি খোর তার আর সন্দেহ নাই। পাছে যাইবার সময় কিছু চুরি করিয়া লইয়া যায় এই ভয়ে নিজে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।'

বিধুভূষণ নীলকমলের কাছে গিয়া কহিলেন 'চল নীলকমল আমরা যাই।'

নিল। 'কেন তুমি থাকুবে না?'

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন 'না। বাবুদের এখন লোক রাখিবার প্রয়োজন নাই।'

নীল। 'কি বল্লেন?'

বিধু। 'চল রাস্তায় গিয়া বলিব। এখন বলিবার সময় নয়।'

নীল। 'না না দাদা ঠাকুর বল।'

'তবে তুমি থাক আমি চল্লাম।'

এই বলিয়া বিধুভূষণ অগ্রসর হইলেন। নীলকমল আহ্লাদিত চিত্তে পিছু২ চলিল। ভাবিতে লাগিল ‘বড় বাড়াইও না ঝড়ে ভাঙ্গবে। কেমন হয়েছে তো? কাল যে আমারে খাবার একটু অবকাশ দিলে না।’

উভয়ে ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া চলিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল ‘এখন বলো দাদা ঠাকুর ছোট বাবু তোমাকে কি বল্লে।’

বিধু কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া কহিলেন ‘বল্লাম এখনকার সময় নয়, তবু জিজ্ঞাসা করিবে। আমি অমন কর তো বলিব না।’

আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া গেল। কলিকাতার যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই লোকের সমারোহ বেশী দেখিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল ‘আচ্ছা দাদা ঠাকুর, এত লোক কোথায় যাচ্ছে? বোধ হয় কোন জায়গায় যাত্রা হচ্ছে।’

বিধু। ‘হ্যাঁ যাত্রা হচ্ছে না তোমার মাথা হচ্ছে। দেখ্‌তে পার্চ্ছ না প্রায় কলিকাতায় পৌঁছিলাম। এখানেও লোক হবে না তো কোথায় হবে।’

নীল। ‘এত লোক যে যাচ্ছে এরা সকলেই কলিকাতায় যাচ্ছে?’

বিধু। হ্যাঁ।

নীলকমল আবার খানিক চুপ করিয়া থাকিল। শ্যামবাজারের কাছাকাছি হইয়াছে। এক খানা ঘোড়ার গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া নীলকমল বলিয়া উঠিল ‘দাদা ঠাকুর দাদা ঠাকুর হ্যাদে দেখ এ আবার একটা কি?’

বিধুভূষণ হাসিয়া কহিলেন ‘নীল কমল তুমি কখন গাড়ী দেখনি?’

নীলকমল। ‘দেখবো না কেন? ফটীক ঘরামীর গাড়ী দেখেছি, আর২ কত লোকের গাড়ি দেখেছি।’

বিধু। ‘সেতো গরুর গাড়ি। কখন ঘোড়ার গাড়ির নাম শুনো নি?’

নীল। ‘এরি নাম ঘোড় গাড়ি? ও!

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন ‘হাঁ। কেন তুমি কখন কি কৃষ্ণনগর যাও নাই? সেখানেই কত ঘোড়ার গাড়ি আছে।’

নীল কমল কহিল ‘আমি ভাবতাম ঘোড় গাড়ি আর গরুর গাড়ি দুই এক রকম, এতে গরু জোড়ে আর ওতে ঘোড়া জোড়ে। এ দেখি এক খান পালকীর মতন তা কেমন করে টের পাব?’

এই বলিতে বলিতে উভয়ে শ্যামবাজারের পুল পার হইল। নীল কমল পুল পার হইয়াই দেখে কতক গুলি গাড়ী যাচ্ছে। অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল ‘দাদা ঠাকুর দাদা ঠাকুর হ্যাদে ডান দিগে দেখ কত ঘোড় গাড়ি। বাপরে! বাড়ীও তো কম না, কতই ইট লেগেছে এসব তৈয়ার কর্‌তে!’

নীল কমলের চোক আর রাস্তার দিকে নেই ক্রমাগত এদিক্ ওদিক্ দেখিতেছে, এমন সময় একখান গাড়ি আসিয়া তার গায়ে পড়িবার যো হইল। গাড়য়ান ‘হট যাও’ বলিয়া হাতের চাবুক ছিল নীল কমলকে সেই চাবুকের দ্বারা প্রহার করিল। নীল কমল হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখে গাড়ি তাহার উপর চড়িবার উপক্রম করিয়াছে। অমনি ‘বাবারে’

বলিয়া রাস্তার ডান দিকে চলিয়া গেল।

বিধু ভূষণ কহিলেন ‘নীল কমল, এ তোমার বাঘ মারাও নয়, ফকীরের হাটও নয়, এখানে রাস্তা দেখে না চল্লে মারা পড়্‌বে। এখনি গিয়াছিলে আর কি?’

নীল। ‘দাদা ঠাকুর এখন অবধি আমি তোমার গা ধরে চল্‌ব।’ এই বলিয়া বিধুভূষণের হস্ত ধারণ করিল। বিধুভূষণ কহিলেন ‘আমাকে ধরলে লাভের মধ্যে এই যে তুমিও মারা যাবে আর আমিও মারা যাব। তা না করে তুমি রাস্তার ধার দিয়া আমার পিছু পিছু এস, আর মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে দেখ। পাগলের মত এক জিনিষের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকো না।’

বিধুভূষণ যদিও কখন কলিকাতায় আইসেন নাই কিন্তু কৃষ্ণনগরে সর্ব্বদা তাঁহার যাতায়াত ছিল এবং তিনি নীলকমলের মত বাকুব নন। সুতরাং তাহার পক্ষে কলিকাতা তত নূতন বোধ হইল না। নীলকমলকে ডাকিয়া কহিলেন ‘নীলকমল কলিকাতার মধ্যে থাকা তো বড় কষ্ট, চল আমরা কালিঘাটে যাই, গঙ্গা স্নান করা হবে, কালী দর্শন হবে আর সেখানে একটু এর চাইতে কম গোলযোগ শুনিয়াছি।’

নীল কমলের কলিকাতা দেখিবার জন্যে যত স্পৃহা ছিল দেখিয়া তাদৃশ ভক্তির উদ্রেক হইল না। চাবুকের আঘাতটা এখনও জ্বলিতেছে। সুতরাং কালিঘাটে কম গোলযোগ শুনিয়াই সেইখানে যাইতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসিল ‘আচ্ছা দাদা ঠাকুর এখানে লোকে কি সুখে থাকে? যে গন্ধ বেরুয়েছে চারি দিক থেকে আর রাস্তায় বেরুলে তো হয় চাবুক খেতে হয় নয় গাড়ি চাপায় পড়ে?’

বিধুভূষণ হাসিয়া কহিলেন ‘কলিকাতায় থাকিবার ঐ সুখ।’

নীলকমল। ‘আমি এমন সুখ চাইনে। চল এখন কালীঘাটে যাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে পেঁছিতে পারিলে হয়। যে ঘোড়গাড়ীর হ্যাংগাম।’

বিধু। ‘কালীঘাটে ত যাব, কিন্তু রাস্তা চিনি নে ত। শুনেছি কালীঘাট এর দক্ষিণে, চল দক্ষিণ মুখ যাই।’

এই বলিয়া উভয়ে দক্ষিণ মুখ চলিল। কিন্তু দুই চারিটী মোড় না ঘুরিতে ঘুরিতেই পথ ভুলিয়া গিয়া একেবারে বড় গঙ্গার ধারে উপস্থিত। বাঁদিকে চাহিয়া নীলকমল জাহাজের শত শত মাস্তুল দেখিতে পাইয়া বিস্মিত চিত্তে কহিল ‘দাদাঠাকুর, এ যে কোম্পানির বাগানে এলাম, ঐ দেখ সব গাছ। বাঃ কেমন সুন্দর করে ছেটেছে দেখ দেখি!’

বিধুভূষণও কখন জাহাজ দেখেন নাই, কিন্তু নদীর উপর রহিয়াছে দেখিয়া ভাবিলেন যে জাহাজের কথা শুনিতাম এই সেই জাহাজ হবে। কিন্তু কালীঘাটের গঙ্গাতো এত বড় শুনি নাই এই রূপ ইতস্তত করিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘বাপু এই কি কালীঘাট?’

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কথার জবাব না দিয়া কহিল ‘তোমার বাড়ী কি ডাহা না বিক্রমপুর?’

বিধুভূষণ কহিলেন ‘আমার বাড়ী কৃষ্ণনগরের কাছে।’

পথিক অধিক কথা না কহিয়া দেখাইয়া দিল ' যাও ২ এই দিক দিয়ে যাও ডাইনে বাঁয়ে যেও না। তাহলে কালিঘাট পৌঁছিবে।'

বিধুভূষণ আর কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বরাবর গঙ্গার ধার দিয়া দক্ষিণ মুখ চলিলেন। নীলকমল কত শত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল তাহার আর সীমা নাই। উভয়ে চলিতে চলিতে একেবারে খিদির-পুরে গিয়া উঠিলেন। বিধুভূষণ মনে করিলেন লোকে বলে গড়ের মাটের দক্ষিণে কালীঘাট, এত গড়ের মাটের দক্ষিণ, নদীটীও ছোট, এই কালিঘাট হবে। কিন্তু সেবার নিজে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নীলকমলকে বলিলেন 'নীলকমল এইতো কালিঘাট বোধ হচ্ছে। কাহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি কালীবাড়ী কোথায় ?'

নীলকমল রাস্তার একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল 'কালীবাড়ী কো-থায় ?'

যাহাকে জিজ্ঞাসা করিল সে এক জন ঢাকাই চালওয়ালা মহাজন। পুর্ব্বদেশে কখন কথায় জবাব দেয় না। একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সে উলটে পাঁচটা জিজ্ঞাসা না করিয়া জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উর্ত্তর দেওয়া সেখানকার দস্তুর নয়। নীলকমলের কথা শুনিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল 'তোমরা কোথা থেকে আসছো ?'

নীলকমল কহিল, 'কৃষ্ণনগর থেকে।'

মহাজন। আর কখন কি কলি-কাতায় আস নাই ?

নীলকনল। তা হলে আর তো-মাকে জিজ্ঞাসা করিব কেন ?

মহাজন। যাবা কোথায় ?

বিধুভূষণের বিরক্ত ধরিয়া উঠিল। রৌদ্রে চলিয়া চলিয়া মাথা ধরিয়াছে। পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় গা ঘুরিতেছে। তিনি ঢাকাই মহাজনের কথা শুনিয়া বলিলেন 'আমরা যাব চুলায়। এখন যদি তুমি কালীবাড়ী কোথায় জান তবে বলে দাও।'

মহাজন বিধুভূষণের কথা শুনিয়া চটিয়া উঠিয়া কহিল 'এ এ যে বড় বড় মানুষ দেহি, যেন রাজা রাজবল্ল-ভের নাত্তি। যা তো দেখে নেগে কালীবাড়ী। আমি তো না বল্মু।'

বিধুভূষণ। 'না বলবে তো বোয়েই গেল। চল নীলকমল আমরা খুঁজে নিতে পারিব।'

আবার খানিক দূর গিয়া বিধু-ভূষণ মনে করিলেন, রাস্তার লোকের উপর বিরক্ত হইয়া নিজে কষ্ট পাওয়া অতি নির্ব্বোধের কাজ। এমন সময়ে এক জন ব্রাহ্মণ, গলায় এক খান গা-মছা, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, হাতে এক ছড়া ফুলের মালা, তাঁহাদের দিকে আস্‌ছে। বিধুভূষণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ' মহাশয় কালী-ঘাটের কালীবাড়ী কোন দিক্‌ দিয়া যাব।'

জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র ব্রাহ্মণ চির পরিচিতের ন্যায় বিধুভূষণের হস্তধরিয়া কহিল, তার জন্যে ভাবনা কি, আমার সঙ্গে এস, আমি সেইখানে যাচ্ছি, নীলকমল ও বিধুভূষণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ব্রাহ্মণটী মা কালীর পাণ্ডা। সে শিকারে বাহির হইয়াছিল তাহাই

পাইয়াছে। রাস্তায় নানা বিধ মিষ্টালাপ করিয়া বিধুকে ও নীল কমলকে কালীঘাটে লইয়া গেল।

———000———

শোড়ষ অধ্যায়।

সুহৃদ্ভেদ।

———000———

বিধুভূষণ ও নীলকমল প্রায় অপরাহ্নে কালীঘাটে গিয়া পহুঁছিলেন। গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন। নীলকমলের গঙ্গা দর্শন করিয়া অভক্তি হইল। বিধুভূষণকে কহিল ‘ দাদা ঠাকুর এই কালীঘাটের গঙ্গা. আর এরি এত নাম, এর চেয়ে আমাদের হাঁসখালির নদী ঢের ভাল, আর সেখানে কাদা কম।’ বিধুভূষণ কহিলেন ‘ এই গঙ্গায় এত লোক উদ্ধার হলো আর তুমি আর আমি কি হতে পারিব না ? ’ এই রূপ গল্পে স্নান সমাপন করিয়া উভয়ে কালীর মন্দিরে গেলেন। পাণ্ডাজী সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। পথ প্রদর্শন করিয়া লইয়া যাইতেছেন। মন্দির দেখিয়াও নীলকমলের বড় ভক্তি হইল না, কিন্তু কালী দর্শন করিয়া একেবারে তাহার অভক্তির পরাকাষ্ঠা হইল। ‘ দাদা ঠাকুর, দূরে থেকে সব জীনিষের বড়২ কথা শুনা যায়, তুমি বল্লে বিশ্বাস করিবে না কিন্তু যে দিব্বি বল আমি করিতে পারি, এর চেয়ে আমাদের সদামালী ভাল ঠাকুর গড়িতে পারে।’ বিধুভূষণ কহিলেন, আচ্ছা, পারে ভালই, এখন যাহা করিতে আসিয়াছ করিয়া যাও।

উভয়ের কালী দর্শন করা হইল। মন্দিরের দ্বারে এক জন কালীর পরিচারক ছিলেন। তিনি বিধু ও নীলকমল প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্রেই দর্শনী ও প্রণামী পয়সা চাহিলেন। পাড়াগেঁয়ে লোক কিছুই জানে না। বিধুভূষণ জিজ্ঞাসা করিলেন ‘ কত দিতে হবে ?’

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, কত দিতে হবে তাহার নিয়ম নাই, কিন্তু ৷৹ আনার কম নহে, অধিক যত দিতে পার ততই তোমাদেরি ভাল।

বিধুভূষণ কোমোর স্থিত থলি হইতে ।০ আনা দিলেন। নীলকমল না দিয়া চলিয়া আসিতেছে। ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিল ‘ তুমি দিলে না ? তোমার পয়সা কোই ?’

নীলকমল কহিল ‘ আমি বাবুর চাকর, আমি আর কি দেব?’

উভয়ে মন্দির হইতে বাহিরে আসিলে পাণ্ডা হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিল ‘ আমাকে কি দেবে দাও ?’

বিধুভূষণ কহিলেন ‘ তোমাকে আর কি দেব ? একবার তো দিয়ে এলাম।’

পাণ্ডা কহিল ‘ ওতো তুমি প্রণামী দিলে। তুমি প্রণামী কেন লাক্ টাকা দাও না তাতে তো আমার কোন লভ্য নাই। আমি যে তোমারদের সঙ্গে করিয়া আনিয়া কালী দর্শন করাইলাম তার পারিতোষিক কই, আর এই ফুল দিলাম সিন্দূর দিলাম ইহার দক্ষিণা কৈ ?’

বিধুভূষণ টেঁকে থেকে আর ।০ আনা পাণ্ডাকে দিয়া যাইতেছেন কিন্তু কালীঘাটের লোকে যদি একবার

টের পায় কাহারো কাছে পয়সা আছে তাহা হইলে তাহাকে সহজে ছাড়ে না। বিধুভূষণের হাতে পয়সা আছে দেখিয়া অন্ততঃ ২৫ জন স্ত্রী পুরুষে আসিয়া মালা হাতে করিয়া তাহাকে ও নীলকমলকে ঘিরিয়া ফেলিল। আর যাবার উপায় নাই। সম্মুখে যাইতে গেলে পশ্চাৎদিক্ হইতে কাপড় ধরিয়া টানে, পশ্চাতে আসিতে গেলে সম্মুখে টানে, যে দিকে যাও অপর দিক থেকে ৩। ৪ জন টানাটানি করে। আর এত আশীর্ব্বাদ ও গোলমাল করে যে সেখানে যে না গিয়াছে সে কখন তাহা অনুমান করিতে সমর্থ হয় না অথবা বলিলেও বিশ্বাস করে না। বিধুভূষণ বিরক্ত হইয়া কোমর থেকে পয়সা খুলিয়া সকলকে কিছু২ দিতে গেলেন। কিন্তু দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয় কোমোরে থলি নাই। উচ্চৈঃস্বরে নীলকমলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'নীলকমল আমার থলি কি হল?'

নীলকমল কহিল 'আমি আপনার মাথা বাঁচাতে পারিনে তা তোমার থলি কোথায় কেমন করে বলবো।'

বস্তুতঃ নীলকমলের মাথা বাঁচানই দায় হইয়া উঠিয়াছিল। যে যে দিক থেকে পাচ্ছে তার কপালে সিন্দূর দিতেছে। সকলেরি সিন্দূর যে কপালে পড়িতেছে তা নয়। কেউ গালে দিলে, কেউ কাণে,কেউ নাকে, একজন খানিক তার চকের মধ্যে দিল। মালা এতই দিয়াছে যে নীলকমলের সে এক প্রকার বোঝা হইয়া উঠিল। নীলকমল ক্রমাগতই উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে 'ওগো আমার কাছে কিছু নেই আমাকে কেন মিথ্যা কষ্ট দাও।'

অতিকষ্টে বিধু ও নীলকমল গোলের মধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখেন যে একজন খোট্‌টাকে তাহাদেরি মতন আক্রমণ করিয়াছে। নীল কমল আর তথায় এক মুহুর্ত্তও দাঁড়াইলেন না। 'দাদা ঠাকুর ওই আবার আসিতেছে। আমি চল্লাম। আর কোন্ শালা এখানে থাকিবে' এই বলিয়া দৌড়িয়া পালাইলেন। বিধুভূষণ আস্তে আস্তে আসিতেছেন। দৌড়িয়া পালান কলিকাতায় সহজ ব্যাপার নহে। নীলকমলের পিছু২ অমনি ধর ধর বলিয়া লোক দৌড়িতে লাগিল। নীলকমল যতই যায় লোকের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ধর ধর করিয়া সকলি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। খানিক দৌড়িয়া নীলকমল আর পারে না। তিন দিন রাস্তা চলিয়াছে, বিশেষ সেদিন কিছুই আহার হয় নাই। একটা মোড় ঘুরিবার সময় নীলকমল পড়িয়া গেল। সকলে আসিয়া নীলকমলের চতুষ্পার্শ্বে দাঁড়াইল, কিন্তু কি জন্যে তার পশ্চাৎ২ দৌড়িয়া আসিয়াছে কেহই জানে না। লোকে আসন কালে যেমন সংসারের দয়ামায়া পরিত্যাগ করে নীলকমল তেমনি ক্রোধভরে কহিল 'দাও, দাও, কত মালা আছে আর কত সিন্দূর আছে দাও। একটা চোক গিয়াছে নয় বাকী যেটা আছে সেটাও যাবে।' নীলকমলের কথায় লোকে মনে করিল এটা পাগল, এই ভাবিয়া একটু পরে

সকলে হাসিয়া চলিয়া গেল। নীল-কমলের বেদনায় চক্ষে জল পড়িল, একটু রাস্তার ধারে বসিয়া থাকিয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া ফিরিয়া বিধু-ভুষণের নিকট আসিতে লাগিল। কিন্তু কালীঘাটের রাস্তাতো বাঘ-মারার রাস্তা নয়। নীলকমল আর পথ চিনিতে পারে না। ঘুরে ঘুরে প্রায় সন্ধ্যা হইল তথাপি আর মন্দিরের কাছে আসিতে পারে না। ক্ষুধায় শরীরে আর সামর্থ নাই। ইটের রাস্তায় পড়িয়া গিয়া শরীরের স্থানে২ চর্ম্ম উঠিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় নীলকমল এক বাটীর দরজায় বসিল, একাকী বিদেশে কোথায় যাইবে, কাহার বাড়ীতে থাকিবে ভাবিয়া নীলকমল কাঁদিতে লাগিল।

যে বাটীর দ্বারে বসিয়া নীলকমল রোদন করিতেছে সন্ধ্যার সময় সে বাটীর বাবু কাছারী হইতে বাটী আ-সিয়া নীলকমলকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কে?'

নীলকমল কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল 'আমার নাম নীলকমল, বাড়ী বাঘমারা'

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এস্থানে বসে কাঁদছো কেন?'

নীলকমল কহিল, 'আমি হারা-ইয়া গিয়াছি।'

বাবু। 'সে কিরে? তুই হারায়ে গিয়াছিস কেমন করে?'

নীলকমল আদ্যোপান্ত সমুদয় র্ণনা করিল। নীলকমলের কথা শুনিয়া বাবুর অত্যন্ত দুঃখ হইল। বাটির মধ্যে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া তিনি নীলকমলকে জলখাবার দিলেন। আহার করিয়া নীলকমলের শরীর প্রায় পূর্ব্ববৎ হইল। তখন নীলকমল মনে করিল এই সময় একবার গুণের পরিচয়টা দেওয়া যাউক। এই ভাবিয়া বাবুকে কহিল 'আমি যাত্রাদলে থাকিব বলিয়া আসিয়াছি। ভাল বেহালা বাজাতে পারি।'

বাবু কহিলেন 'একবার বাজাও দেখি।'

নীলকমল বেহালাটি বাহির করিয়া দেখিল ৪।৫ জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নীলকমলের সর্ব্বস্বধন বেহালাটী। সেটীর এমন দুর্দশা দেখিয়া নীলকমলেয় চক্ষু হইতে ঝর ২ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হই-য়াছে, কি হইয়াছে?'

নীলকমল কথা না কহিয়া বেহালাটী বাবুর সম্মুখে রাখিল। তর্দ্দর্শনে বাবুর অত্যন্ত দুঃখ হইল। বাবু কহিলেন 'তুমি কেঁদ না, আমি তোমাকে একটা বেহালা কিনে দেবো।' নীলকমল কহিল, 'দেবেন বটে কিন্তু এমনটী আর হবে না।'

বাবু কহিলেন 'তুমি আমার সঙ্গে দোকানে যেও। দোকান থেকে তোমার যেটি পছন্দ হয় সেইটী নিও।'

নীলকমল আশ্বস্ত হইল এবং চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল। পরে রাত্রে আহা-রাদি করিয়া বাবুর বাটিতে শয়ন করিয়া রহিল।

বিধুভূষণের যথা সর্ব্বস্ব এক থলীর মধ্যে—সেই থলী চুরি হওয়ায় তাহার যে পর্য্যন্ত দুঃখ হইল তাহা বর্ণনাতীত।

নীলকমলকে সকলে তাড়াইয়া লইয়া গেল তাহা দর্শন করিয়া তিনি আরো বিস্ময়ান্বিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন একাকী এখানে আসিয়া কি কুকর্ম্মই করা হইয়াছে। পথশ্রান্তে, মনদুঃখে ও জঠরানল প্রজ্বলিত হওয়ায় বিধুভূষণের চক্ষু হইতে দর দর করিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। মনোদুঃখে একাকী গঙ্গাতীরে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তাহার পূর্ব্ব পরিচিত পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হইল। পাণ্ডাজী পুনর্ব্বার শিকারে বহির্গত হইয়াছেন। বিধুভূষণ পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় গেলে তিনি চারটী অন্ন পান। পাণ্ডা কহিল 'সেজন্য ভয় কি তুমি আমার সহিত এস আমি তোমাকে প্রসাদ দেব এখন।' বিধুভূষণ পাণ্ডার সমভিব্যাহারে চলিলেন।

কালীঘাটের নিয়ম এই যে ভোগ হইয়া গেলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করিতে হয়। সুতরাং একবার দরজা বন্ধ করিলে পুনরায় সন্ধ্যার মধ্যে আর কোন লোকজন আসিলে ফিরিয়া যায়। সকালে২ দরজা বন্ধ করিলে প্রাপ্যের হানি হয়, এজন্য যাহার যে দিন পালা সকলেই সন্ধ্যার প্রাককাল পর্য্যন্ত প্রায় দরজা খুলে রাখে। দিবা অবসানের সময় ভোগ দেয়, দিয়া দরজা বন্ধ করে, আবার সন্ধ্যার সময় দরজা খুলিয়া দেয়।

কালীর ভোগ হইয়া গেলে যতলোক উপস্থিত হয় সকলেই প্রসাদ পায়, কিন্তু দেরি হইলে আর সেটী হইবার যো নাই। ভোগ হইলেই সকলেই পাত করিয়া বসে। পূর্ব্বদেশীয় লোকে কলিকাতায় গিয়া আলু পটল ইত্যাদি যাহারা ফিরি করিয়া বিক্রয় করে তাহারা এবং দীন দুঃখী লোক জন আর যাদের ভক্তি অত্যন্ত প্রগাঢ় তাহারা না হইলে সেখানে প্রসাদ পায় কাহার সাধ্য। নানাবিধ জাতি নানাবিধ রোগগ্রস্থ লোক সকলেই গোলমাল করিয়া বসে। সকলেরি উদ্দেশ্য ভোগের ঘরের যত নিকটে বসিতে পারে ততই ভাল, সুতরাং সে স্থানটা যেন পাতে পাতে ঠেকে এমনি ঘন হয়। সকলে বসিলে দুই তিন জন পরিবেশন করিতে আরম্ভ করে। তাড়াতাড়ী পরিবেশন শেস করিতে না পারিলে আবার আরতির সময় পয়সা সংগ্রহের ব্যাঘাৎ জন্মিবে এই ভয়ে, ডাল মন্দ, শাক, তরকারি, যা হাতে উঠে তাই অগ্রে দেয়, কখন কখন ২টা ৩টা মিশ্র করিয়া দেয় তাহাতে অনেক সময় বাঁচে। পাক শাক কেমন হয় তাহা আমরা জ্ঞাত নহি কিন্তু তরকারির চেহারা দেখিলে বড় রুচি হয় না।

লোকে বলে ক্ষুধার ন্যায় পাচিকা আর দ্বিতীয় নাই। যাহারা এই প্রসাদ পাইতে আসে তাহাদের প্রায় দুবেলা যোটে না এজন্যে তাহারা যাহা পায় সমুদায় খাইয়া যায়। বিধুভূষণের ক্ষুধায় শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল। এমন সময় তিনি মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সকলেই পাত করিয়া বসিতেছে। তিনিও একখান পাত লইয়া বসিলেন। পাণ্ডার সহায়তা প্রযুক্ত অন্যান্য লোকাপেক্ষা তিনি জিনিস পত্র ভালই পাইলেন এবং

সে সকল অপেক্ষাকৃত পরিষ্কারও ছিল। আহার করিয়া উঠিতে উঠিতে সন্ধ্যা হইল। নীল কমলের ভাবনা তখন তাঁহার প্রথম উপস্থিত হইল। অজ্ঞাত স্থান, অন্ধকার রাত্রি, পাছে নীল কমলকে খুজিতে গিয়া নিজে গাড়ি চাপা পড়েন এই ভয়ে আর বাহির হইলেন না। মন্দিরের মধ্যেই রহিলেন।

আরতির সময় উপস্থিত হইল। লোকের সমারোহ যৎপরোনাস্তি হইল। টং টং করিয়া ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। 'মা মা' করিয়া লোকের চীৎকার শব্দে কিছুই শোনা যায় না। ধুনার ও ধূপের ধোমায় পাঁঠার রক্তের পচা গন্ধটা কিঞ্চিৎ দূর হইল। কিন্তু হায় লোকে যে স্থান এত পবিত্র জ্ঞান করে সে স্থানেও জানিয়া শুনিয়া লোকে কত শত পাপ করে। টেঁকে কিম্বা জেবে টাকা পয়সা থাকিলে সে তাহার নয় এ নিশ্চয়। স্ত্রীলোকের হাতের কাণের ও নাকের গয়নার জন্য কারু নাক ছিড়ে যাইতেছে, কাহারো কাণ ছিড়িয়া যাইতেছে। ধরিয়াই এক টান দিয়া লইয়া পালায়। অল্প বয়স্ক যুবক যুবতীরা তাহারা ভিন্ন আর সকলেই একাগ্রচিত্তে কালীর ধ্যান করিতেছে বিবেচনা করিয়া কতই রঙ্গরস করিতেছে। কালীঘাট একটী পৃথক পৃথিবী বিশেষ। সেখানে যারপরনাই ধার্ম্মিকও আছে এবং যারপরনাই পাষণ্ডও আছে।

অনেকক্ষণ পরে আরতির ধুম মিটিয়া গেল। মন্দির পুনরায় লোক শূন্য হইতে লাগিল। ২।১ জন সন্ন্যাসী নাটমন্দিরে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া বম্ বম্ করিয়া মহাদেবের ধ্যান করিতে লাগিল। নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণ যে যেখানে ইচ্ছা শয়ন করিতে লাগিল। তারি মধ্যে একস্থানে বিধুভূষণও শয়ন করিলেন এবং নিদ্রায় বিভাবরী অতিবাহিত করিলেন।

বিধুভূষণ প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া সকালে ২ গঙ্গাস্নান করিলেন, কিন্তু কোন কায কর্ম্ম না থাকায় তাঁহার অত্যন্ত বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। লোকে বলে 'বসে না থাকি ব্যাগার খাটি।' সহসা লোকে মনে করে বটে যে যাহাদের কোন কাজকর্ম্ম করিতে হয় না তাহারা বড় সুখী। কিন্তু এ কথা যে কত দূর ভ্রান্তিমূলক তাহা যাহাদের একবার কাজ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছে তাহারা ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন অলস থাকার অনেক দোষ। কর্ম্ম হাতে না থাকিলে শরীরই যেন স্থির থাকিল, মনুষ্যের মন তো তা বলে কম চঞ্চল থাকে না। কর্ম্ম থাকিলে মন সেই কর্ম্মে নিয়োজিত থাকে কিন্তু কর্ম্ম না থাকিলে অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা করে তার মধ্যে ভালও থাকে, মন্দও থাকে। যদি মন্দের ভাগ বেশী হয় তাহা হইলে কালে তাহা হইতে বিষময় ফল উৎপাদিত হয়।

বিধুভূষণ নাট মন্দিরের এক কোণে বসিয়া আছেন। অবাক—তিনিও কাহারো সঙ্গে কথা কহেন না অন্য লোকও তাঁর সহিত কথা কহিতে আইসে না। যখন বড় সমারোহ হইল একটু এদিকে একটু

ওদিকে চলিয়া বেড়াইলেন। ভোগ হইয়া গেলে প্রসাদ পাইলেম। পূর্ব্ব দিবসের মত নিদ্রায় রজনী যাপন করিলেন। এইরূপে বিধুভূষণ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

———000———

সভ্যতার ইতিহাস।

সপ্তম অধ্যায়।

ক্ষুধার আবশ্যকতা—২ স্বার্থসাধন হইতে উন্নতি—৩ পশু—৪ কৃষি—৫ ভারতবর্ষ—৬ মিসর—৭ রোম—৮ গ্রীস্—৯ অন্যান্য জাতি—১০ অসভ্য জাতির মধ্যে কৃষির অবস্থা—১১ উপসংহার।

ক্ষুধার আবশ্যকতা — মনুষ্য শরীরী জীব, সুতরাং শারীরিক নিয়মানুসারে ক্ষুৎপিপাসার অধীন। যে ভাবেই অবস্থিতি কর অঙ্গ সঞ্চালন, গমনাগমন, শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি যাবদীয় ক্রিয়া কলাপেই প্রতিমুহূর্ত্তে কিয়ৎ পরিমাণে শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এই ক্ষতিপূরণের কোন উপায় না থাকিলে, মনুষ্যমাত্রই ভূমিষ্ঠ হইবার ২। ৪ দিন পরে মৃত্যু মুখ দর্শন করিত সুতরাং পৃথিবীতে মনুষ্য সঞ্চারের কোন সম্ভাবনা থাকিত না।

রক্ত সঞ্চালন দ্বারা এই ক্ষতিপূরণ হয়। বিশুদ্ধ রক্ত শারীরিক ক্ষতিপুরণ করিয়া শরীরস্থ সমস্ত অনিষ্ট পদার্থের যোগে স্বয়ং বিদূষিত হইয়া থাকে; রক্তের এই বিদুষ্টভাব দূরীকৃত হইয়া বিশুদ্ধি প্রাপ্তি না হইলে শরীর রক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই। নিশ্বাসগৃহীত অম্লজান এবং ভুক্ত বস্তুর সারাংশ দ্বারা রক্ত পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শরীর বর্দ্ধন করিয়া থাকে। এ নিমিত্ত শরীর রক্ষার্থ আহারের নিতান্ত আবশ্যক। যখন শরীর রক্ষার নিমিত্ত ভক্ষ্যের আবশ্যক হয় তখনই শারীরিক প্রকৃতি আহার গ্রহণার্থ আমাদিগকে উত্তেজনা করিয়া থাকে; এই উত্তেজনাকেই ক্ষুধা বলা যায়। বিশ্বনিয়ন্তা যদি ক্ষুধার সৃষ্টি না করিয়া, ভক্ষণ ক্রিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অধীন করিয়া দিতেন, তাহা হইলে এই শারীরিক ক্রিয়ার অনুভব করিয়া আহার গ্রহণ করা অধিকাংশ এমন কি প্রায় সমস্ত মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য হইত, বিশেষতঃ বিজ্ঞান-বিবর্জ্জিত আদিম নর কুলে আহারের উপযোগীতা নিরাকরণ করিতে করিতে ভক্ষ্যাভাবেই উপরত হইয়া ধরণীকে মনুষ্য শূন্য করিত।

২য় স্বার্থসাধন হইতে উন্নতি — নিতান্ত আদিম অবস্থায় ক্ষুধা শান্তিই মানবগণের একমাত্র কার্য্য ছিল এ কথা প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। তৎকালে যাহারা উদর পূরণে সমুদয় সময়াতিপাত করিত, কাল ক্রমে তাহাদের বংশধরগণ এতদূর উন্নতাবস্থ হইয়াছে, এ কথা মনে ভাবিলে নিতান্ত বিস্মিত হইতে হয়। আদিম অবস্থায় তণ্ডুল ও গোধূমাদি ভক্ষ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল না, তৎকালীন লোকে পশু পক্ষীর দৃষ্টান্ত অনুসারে অযত্নলব্ধ ফল মুল ও মৃগয়া লব্ধ মাংস দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিত। কিন্তু এইরূপ মৃগয়া বা ফলমুল দ্বারা জীবন যাপন নিতান্ত কষ্টকর। মৃগয়া সকল

দিন সফল হয় না, ফল মূলও সর্ব্বদা সুপ্রাপ্য নহে ; মৃগয়ায় বিফল যত্ন এবং ফলাদির অপ্রতুলতায় অনেক সময় উপবাসে থাকিতে হইত সুতরাং তাহার প্রতিবিধান নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। যাহার যাহা নিতান্ত আবশ্যক তাহাই তাহার চিন্তার বিষয়, প্রতিবিধানে নিতান্ত যত্ন থাকিলে প্রায় কোন আপদই আমাদিগকে নিতান্ত অভিভূত করিতে পারেনা। বিশেষতঃ সংসারে যত প্রকার আপৎ আছে ভক্ষ্যের অভাব তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, প্রবল জঠরানলে প্রপীড়িত হইলে অপর বিষয়ে দৃষ্টিপাতও থাকেনা, কিসে ভক্ষ্যের সুবিধা হইবে ইহাই আদিম মনুষ্যদিগের একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল এবং সেই চিন্তা হইতেই পশু পালন, বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি সাংসারিক সুবিধা হইয়া আসিল।

ফল লিপ্সু হইলেই বৃক্ষ রোপণ করিতে হয় এবং কোনরূপ কৌশল ব্যতীত মৃগ বধও সম্পন্ন হয় না। কোদাল প্রভৃতি কৃষি কার্য্যোপযোগী অথবা তীর ধনু প্রভৃতি মৃগয়ার উপকরণ, এই সকল অস্ত্রকে এইক্ষণে আমরা অতি সামান্য বিবেচনা করিয়া থাকি কিন্তু লৌহ * প্রভৃতি ধাতুর গুণ অবগত হইয়া এই সকল অস্ত্র প্রস্তুত করিতে আদিম নরগণকে কত কাল চিন্তা করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। ফলতঃ বহু চিন্তা এবং বহুবার বিফল-যত্ন হইয়াই মানব সমাজ উহা লাভ করিয়াছে। অনেক বার তাহাদের যত্ন বিফল হইয়া ছিল বটে, কিন্তু ইহাতেও * মানসিক শক্তি ক্রমশঃ উন্নত হইতেছিল। লাঙ্গল কোদাল আদি যৎসামান্য কৃষি সাধন অস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের সুকৌশলে সম্পন্ন বাস্পীয় যন্ত্র পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখ, সকলই এই মানসিক শক্তি পরিচালনার ফল। স্বার্থের অসুবিধা দূর করণার্থেই সকলে শরীর ও মন সমর্পণ করিতেছে, কি উপায়ে আমি ভাল থাকিব সকলের অন্তঃকরণেই এই চিন্তা প্রবল. নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক উপকারের নিমিত্ত অল্প লোককেই কার্য্য করিতে দেখা যায়, বিশেষতঃ তৎকালীন লোকের মনে দেশ হিতৈষিতার ভাব ছিল কি না সন্দেহকল্প। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে মনুষ্য স্বস্ব স্বার্থের নিমিত্ত যাহা করে তদ্দ্বারাই সমাজের কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং স্বার্থানুরোধে যে সকল সামান্য কর্ম্ম করা হয় কালে সেই সকল সামান্য কার্য্যের কারণ হইতেই সুমহান কার্য্যের উৎপত্তি ও তদ্দ্বারা জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। জল তপ্ত করাই জন ওয়াটের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু সেই উষ্ণ জলোৎপন্ন বাষ্পরাশি দ্বারা উপরিস্থিত লম্বমান বস্ত্রের বিকম্পনই বাষ্পের শক্তি মানব জাতিকে দেখাইয়া দেয়, লোকেও তাহা অবগত হইয়া বাষ্পযন্ত্রের পরিচালন পূর্ব্বক শারীরিক শ্রম লাঘব করিয়া সংসারের উন্নতি করিয়াছে।

* কোন কোন বিখ্যাত পর্য্যটক বলেন অসভ্যজাতি বিশেষ মধ্যে প্রস্তর নিমিত্ত অস্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়।

*যত্ন ওচিন্তা প্রভৃতি উপায় উদ্দেশ্য জ্ঞান অপেক্ষা উপকারী Hamilton vol I lect1

৩ পশু এরূপ অনুমান অন্যায় নহে যে মৃগয়ালব্ধ মাংস অথবা অযত্ন সম্ভূত ফল মুল অল্প কালই মনুষ্যের একমাত্র জীবনোপায় ছিল; কলে এইরূপ জীবনোপায় নিতান্ত কষ্টসাধ্য, মৃগয়া সকল দিন সফল হয় না এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ফল মুল লাভও সহজ ব্যাপার নহে অতএব শীঘ্রই এইরূপ কষ্ট নিবারণের নিমিত্ত তাহারা বিশেষ সচেষ্ট হইয়া ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। বাস্তবিক সহজেই এরূপ অনুমান হইতে পারে যে, কতগুলি পশু পোষণ করিয়া রাখিলে এবং আবাস কুটীরের চতুর্দ্দিকে কতগুলি বৃক্ষ রোপণ করিয়া রাখিলে এইরূপ ক্লেশের শান্তি হইতে পারে, অতএব এই মৃগয়া ও অযত্ন সম্ভূত ফলাহরণ বৃত্তির অব্যবহিত পরেই মনুষ্য পশু পালন ও বৃক্ষ রোপণ আরম্ভ করিয়াছিল। বাস্তবিক এই সময়ে পশুই মনুষ্য সমাজের একমাত্র ধন সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত সুতরাং তৎকালে যাহার যত পশু থাকিত সেই ব্যক্তি সমাজ মধ্যে তত ধনাশালী বলিয়া বিখ্যাত হইত।* এ নিমিত্তই প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তারা, পশু দান পশূপহার প্রভৃতি ক্রিয়ার এত গৌরব করিয়া গিয়াছেন।

লাটিন ভাষাতে পিকস (Pecus) শব্দে ধন বুঝায়। পিকুনারী শব্দ পিকস শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, পিকস শব্দের অর্থ পশু। বিশেষতঃ তৎকালে বিনিময় প্রণালীর প্রধান সাধন মুদ্রা প্রচলিত ছিল না, এবং বিনিময়ের তাদৃশ আবশ্যকতা ছিল না, এদিকে দুগ্ধ পান, মাংস ভক্ষণ, চর্ম্ম পরিধান প্রভৃতি আহার ও পরিচ্ছদাদির সমুদয় প্রয়োজনই পশুদ্বারা নির্ব্বাহ হইত, অতএব তৎকালীন লোকে যে পশুকেই একমাত্র ধন সম্পত্তি মনে করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি।

কৃষি বন্যফলমূলাহরণ অপেক্ষা আবাস গৃহের চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ রোপণ করিলে ফলাদি প্রাপ্তির বিশেষ সুবিধা হয় এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অপিচ বৃক্ষাদি রোপণ, ফলাহারণ, ফল ভক্ষণ যেরূপ সহজে হইতে পারে, ধান্য গোধূমাদি কৃষিকার্য্য অথবা ঐ সকল শস্যের ব্যবহার তত সহজ নহে। কোন সময়ে কোন ব্যক্তি এই সকল শস্যের গুণ অবগত হইয়া প্রথমে তাহা মানব মণ্ডলীর ব্যবহারে আনিয়াছিলেন এইক্ষণে তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। এদিকে পশু পালন বা ফলভক্ষণ মাত্র অবলম্বন করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করা সমধিক কষ্টসাধ্য। একমাত্র আহার অন্বেষণেই সমুদায় অতিবাহিত হয় অতএব শীঘ্রই যে মানব জাতি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। আবার অনুমান দ্বারা বিলক্ষণ অনুভব হয় যে, যে সকল শস্য নিস্তুস* না করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে. তাহাই মনুষ্য সমাজে প্রথমতঃ ব্যবহৃত

* অদ্যাবধি লাপলাণ্ড দেশে যাহার যত (Reindeer) পশু বিশেষ আছে, সে তত ধনশালী বলিয়া অভিহিত হয়, । স, ই ৩য় অধ্যায়।

* প্রায় কোন অসভ্য জাতীয় লোক মধ্যে আমাদেরদেশের ন্যায় 'অন্ন' ভক্ষণের রীতি দেখা যায় না। প্রায়ই রুটি ব্যবহার হয়।

হইয়াছিল। যাহা তুষত্যাগ না করিলে ভক্ষণীয় হইতে পারেনা, সেই সকল ভক্ষ্য দ্রব্য ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত কাল বিলম্ব হইয়াছিল। গোধূম প্রভৃতি শস্য খোসা ত্যাগ না করিয়া আহার করা যাইতে পারে ধান্যাদি সেরূপ নহে অতএব অগ্রে গোধূম প্রভৃতি ও পরে ধান্যাদি মানবগণের ভক্ষ স্থানীয় হইয়াছে।

যখন মনুষ্যগণ ফল মূল বা মাংস দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তৎ কালে যে তাহারা মানসিক শক্তি চালনায় বিশেষ অবকাশ পায় নাই, এ কথা বলা বাহুল্য। গৃহে ভক্ষ দ্রব্যের সঞ্চয় না থাকিলে, কখনই নির্বিঘ্নে মনোবৃত্তি চালনা করা যায় না, সুতরাং ফল মূল বা মাংস মাত্র যাহাদের জীবনোপায় সেই শ্রেণীর লোক কদাপি সভ্যতার মুখ দেখিতে পারে না। ফল বা মাংস অধিক দিন গৃহে রাখা যায় না, উহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং প্রতিদিন শয্যা হইতে উঠিয়া আহারের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইলে, সাহিত্য বিজ্ঞানাদি সমালোচনার অবকাশ থাকে না; পক্ষান্তরে বৎসরের মধ্যে ঋতু বিশেষে শস্য বপন ও তাহা পরিপক্ক হইলে কর্ত্তন করিয়া গোলা জাত করিয়া রাখিলে তদ্দ্বারা সংবৎসর অনায়াসে চলিতে পারে এমন কি খাদ্যাবশিষ্ট শস্য যত্ন পূর্ব্বক রাখিলে ৮। ৯ বৎসরেও তাহার জীবনদায়িনী শক্তি নষ্ট হয় না। সুতরাং সমাজ মধ্যে শস্যাদি আহার প্রচলন হইলে, আহারার্থ চেষ্টা করিয়াও যথেষ্ট অবকাশ কাল পাওয়া যায়। এই রূপ অবকাশ পাইয়াই মানবগণ সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং প্রবৃত্ত হইয়া ঐ সকল শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি সাধন করিয়াছে। অপিচ তৎ সাহায্যে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি কার্য্যেরও উন্নতি হইয়াছে। প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, যে তৎকালে কৃষি প্রণালী উৎকৃষ্ট ছিল না, সুতরাং শস্যও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ হইত। প্রাচীন কালের প্রকৃত ইতিহাসাদি পাওয়া না গেলেও তৎকালের সংহিতা ও পুরাণাদি শাস্ত্র দেখিলে কথিত বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারেনা। ইতিহাস অপেক্ষাও যে এই সকল শাস্ত্রে সামাজিক ঘটনা বিশেষরূপে বর্ণিত থাকে তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে কৃষি প্রণালী উৎকৃষ্ট ছিল না বটে কিন্তু কৃষির উপকারিতা তৎকালীন মানবগণ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল, অপিচ কৃষির অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থা থাকাতে সময়ে সময়ে দেশ মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত এইরূপ দুর্ভিক্ষও তখনকার লোকদিগকে কৃষির আবশ্যকতা বিলক্ষণরূপে স্মরণ করাইয়া দিত। বাস্তবিক প্রাচীন জাতি মাত্রেরই কৃষি কার্য্য একটী প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল।

৫ ভারতবর্ষ। মিসর ও ভারতবর্ষ অপেক্ষায় প্রাচীন সভ্য দেশ কোথাও দেখা যায় না। আর্য্যজাতি অথবা ঋগ্বেদ প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সকলকে অতিক্রম করিয়াছে। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণাদি সংস্কৃত গ্রন্থগুলি বিশেষরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে আর্য্য জাতির মধ্যে কৃষি কার্য্যের মধ্যমাবস্থা ছিল।

যখন যে যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত তাহাতেই আর্য্যগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট কৃষি বিষয়ক সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন দেখিতে পাইবে্ পুরাণাদিতেও দুর্ভিক্ষের বিষয় অনেক উপাখ্যান পাওয়া যায়। দেশ মধ্যে সুবৃষ্টি হইলেই লোকে শাসনকর্ত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিত। বাস্তবিক অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কৃষির ব্যাঘাত জনক যতগুলি বিষয় আছে সকলই রাজার শরীরের পাপ সঞ্চয় থাকিলে উপস্থিত হয় বলিয়া পূর্ব্বতন লোকের দৃঢ় সংস্কার ছিল। আর্য্য সমাজের কৃষকগণ বৈশ্য বলিয়া অভিহিত হইতেন, বৈশ্যগণ দ্বিজ বর্ণ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, ব্রাহ্মণ গণও দৈব ক্রিয়াদির দ্বারা কৃষির বিলক্ষণ সাহায্য করিতেন।

৬ মিসর। মিসর দেশের প্রকৃত ইতিহাস অত্যন্ত দুজ্ঞেয়, কিন্তু পিরামিড প্রভৃতি যে সকল মন্দির বা কীর্ত্তিস্তম্ভ এখন পর্য্যন্তও কাল কর্ত্তৃক অবিলুপ্ত আছে তাহাতে যে সকল প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে অনেকগুলি পূর্ব্বতন মিসরদিগের বর্ণস্থানীয় ছিল; বহু দিন পর্য্যন্ত চিত্রময় বর্ণ ব্যবহার করিতে ঐ সকল প্রতিকৃতি বা বর্ণাবলীতে দেখিতে পাইবে যে কোথাও মিসরীয়েরা হল চালন করিতেছে, কোথাও মৃগয়া যাত্রা করিতেছে, কোথাও শস্য কর্ত্তন করিতেছে। ইতিহাস পাওয়া না গেলেও ঐ সকল চিত্র দ্বারা তাহাদের সামাজিক অবস্থা অনেকাংশে অনুভূত হয়। ফলতঃ পূর্ব্বতন মিসরীয়দিগের মধ্যে, কৃষি কার্য্যের বিলক্ষণ অনুষ্ঠান ছিল। এমন কি য়িহুদী দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে তদ্দেশীয় বহু লোক সময় সময় মিসরে যাইয়া জীবন রক্ষা করিত। বিশেষতঃ মিসরে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভূমি ক্রয় বিক্রয় এমন কি দলীলাদি রেজিষ্টরির * নিয়ম পর্য্যন্ত থাকাতে বোধ হয় তাহারা অন্যান্য প্রাচীন জাতির অপেক্ষা কৃষি কার্য্যে কিয়ৎ পরিমাণে বিশেষ পারদর্শী ছিল।

৭ রোম। প্রাচীন রোমকদিগের মধ্যে কৃষির বিলক্ষণ সমাদর ছিল। এরূপ আভাস পাওয়া যায় অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি স্বহস্তে হল চালনা করিতেন। সিন্‌সিনেটসকে যখন সেনেট্ সভার ডিরেকটর পদে মনোনীত করিয়া সনন্দ দেওয়া যায় তৎকালে সনন্দ বাহকেরা যাইয়া দেখে তিনি স্বহস্তে কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের মর্য্যাদাসূচক উপাধি শস্য বিশেষের নাম মূলক ছিল। যখন এই জাতি বিলাস পরায়ণ হইয়া কৃষি প্রভৃতি শারীরিক শ্রম সাধ্য ব্যাপার সকল অনাদর করিতে লাগিল, যখন বিদেশাগত শস্যের উপর রোম জাতির জীবিকা নির্ভর করিত, সেই সময়েই প্রবল প্রতাপশালী রোমক জাতির পতন দশা উপস্থিত হয়। প্রসিদ্ধ ইতিহাস বেত্তা গিবন বলেন, বিদেশ হইতে খাদ্যের আমদানীই রোম ধ্বংশের প্রধান হেতু।

* Wilson's History of Egypt. Britanica Encyclopedia. vol. II.

৮ গ্রীস্। গ্রীক জাতির মধ্যে ভদ্র লোকে কৃষি কার্য্য করিত না। হেলট দিগের দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু অন্যান্য দেশীয় দাস দিগের অপেক্ষা হেলট দিগের অবস্থা অনেক উন্নত ছিল। দেশীয় ভদ্র লোকেরা হেলট দিগকে অপেক্ষাকৃত সমাদর করিতেন।

৯ অন্যান্য জাতি। এইরূপ প্রচীন ফিনিসীয়, ব্যাবিলন, পারস্য, চীন প্রভৃতি সভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য যে দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান কর সর্ব্বত্রই কৃষি কার্য্যের সমাদর দেখিতে পাইবে।

অসভ্য জাতির মধ্যে কৃষির অবস্থা। পক্ষান্তরে অসভ্য দিগের মধ্যে কৃষি কার্য্যের কিছুমাত্র উন্নতি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয়না। আফ্রিকা বা আমেরিকার অসভ্য জাতি এবং অষ্ট্রিলিয়া প্রভৃতি দ্বীপবাসী বন্য লোক দিগের অবস্থাই তাহার উত্তম উদাহরণ। তৃতীয় অধ্যায়ে এবিষয় অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

উপসংহার। উপসংহার কালে আমরা বলিতেছি যে কালে কৃষি হইতে সভ্য সময়োচিত সমুদয় উন্নতি হইয়াছে, তদ্বিষয় আগামীতে বর্ণিতব্য।

হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নামক একখানি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। রাজনারায়ণ বাবু প্রথমত এই বিষয়ে জাতীয় সভায় একটী মৌখিক বক্তৃতা করেন, পরে তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় প্রীত হইয়াছি।

ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায়ের অনেকের এই প্রকার জ্ঞান আছে যে, খৃষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তক বাইবেল আদিতে যে প্রকার সাধুতা, কর্ত্তব্য পরায়ণতা বিষয়ে উপদেশ আছে, আর্য্য দিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র সমুদয়ে তাদৃশ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহারা বিবেচনা করেন, হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্র কেবল অসার কথায় পরিপূর্ণ এবং ঢেঁকীর কচ কচি বা শাঁকের করাত স্বরূপ; কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। ঐ সকল নব্য মহাশয়েরা এক্ষণে দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাদের বিশেষ আদরের যোগ্য পাত্র ইংরাজী ভাষায় ও বিবিধ বিদ্যায় পারগ এক জন কৃতবিদ্য বিজ্ঞ ব্যক্তি উচ্চৈস্বরে স্পষ্টতঃ বলিতেছেন, আর্য্যদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তাঁহারা দেখুন হিন্দু দিগের শাস্ত্র পাঠ যোগ্য ও সারবান উপদেশে পরিপূর্ণ কি না। তাঁহারা রাজ ভাষায় উৎকৃষ্ট রূপ কথোপকথন ও লিপি চাতুর্য্য লাভ করিয়াই মনে করেন যে আপনারা অসাধারণ পণ্ডিত এবং সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বাস্তবিক মূর্খ, ইহা তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম। আমাদিগের চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ

ও এই প্রস্তাব পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন বিষয়ী লোক হইলেই অজ্ঞ এবং শাস্ত্রের মর্ম্মাবধারণে অসমর্থ হয় না। পণ্ডিতগণ বোধ করেন যাঁহারা বাল্যকাল হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের আলোচনাতে ব্যাপৃত, তাঁহারাই বাস্তবিক পণ্ডিতপদ বাচ্য এবং অন্য প্রকার লোক বহু বিদ্যা বিশারদ হইলেও তাহারা বিষয়ী এবং শাস্ত্রার্থ বোধে অক্ষম। বাস্তবিক তাহা নহে। যাঁহারা যথার্থ বিজ্ঞ, তাঁহারা সর্ব্ব স্থান হইতেই সার গ্রহণ করিতে সক্ষম।

রাজ নারায়ণ বাবুর পুস্তকের অধিকাংশ কথাই আমাদের অনুমোদনীয়। আর্য্য শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মতবাদ ও অনুষ্ঠান প্রণালী যে অধিকারী দিগের উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনায় বর্ণিত হইয়াছে, আমাদিগেরও এই প্রতীতি। কিন্তু কাল ক্রমে অনেক স্বার্থপর লোক স্বীয় স্বীয় ইচ্ছানুসারে উক্তি সকল প্রক্ষিপ্ত করিয়া এবং ব্যাখ্যা ও ব্যতিক্রম করিয়া অনেকাংশে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

এই প্রস্তাবটী অত্যুৎকৃষ্ট হইলেও সম্পূর্ণ রূপে ত্রুটি ও প্রমাদ বিবর্জ্জিত বোধ হয় না। রাজ নারায়ণ বাবু তাঁহার পুস্তকের ১২ শ এবং ১৩ শ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে ‘বেদান্ত দর্শনে এই অদ্বৈত বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বেদান্ত দর্শন শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য বুঝায়, নিজ বেদান্ত সূত্র বুঝায় না; যেহেতু শঙ্করাচার্য্য যেমন বেদান্ত সূত্রের অদ্বৈত কল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, রামানুজ স্বামী সেই রূপ দ্বৈত কল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব উপনিষদের কথা দূরে থাকুক, বেদান্ত সূত্রও যে অদ্বৈত বাদাত্মক শাস্ত্র তাহা প্রমাণ হয়না। বেদান্ত শাস্ত্র শঙ্করাচার্য্য প্রণীত।” আমাদের বোধে এই কথা সর্ব্বতোভাবে ভ্রমবিহীন নহে। অদ্বৈত বাদ শঙ্করাচার্য্যদ্বয় বহুল রূপে প্রচারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই মত বাদ তাঁহার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না এ কথা বলা যাইতে পারেনা। কারণ ‘তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো’ এবং ‘ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় উপনিষদ প্রণেতা ঋষিদিগের মধ্যেও অনেক অদ্বৈতবাদী ছিলেন।

সাংখ্যদর্শনকার মহর্ষি কপিলেরও পূর্ব্বে যে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল তাহা কাপিল সূত্র দেখিলেই বোধ হয়। এস্থলে সাংখ্যসূত্র কয়েকটী উদ্ধৃত করা গেল।

না বিদ্যাতোপ্য বস্তুনা বন্ধা যোগাৎ ২০
বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানি ২১
বিজাতীয়দ্বৈতাপত্তিশ্চ ২২
বিরুদ্ধো ভয় রূপোচেৎ ২৩
ন তাদৃক্ পদার্থ প্রতীতে ২৪

আত্মার বন্ধন অবিদ্যা হইতে ঘটে, এ কথা বলিবার উপায় নাই কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্তু। অবস্তু দ্বারা বন্ধন কি প্রকারে সম্ভব হয়। যদি অবিদ্যাকে বস্তু বল তাহা হইলে তোমারই সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম হয়। এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত বিজাতীয় অন্যবস্তুর সত্তা স্বীকার করা হয়। যদি বল, ইহা বস্তু অথচ অবস্তু তাহা অসম্ভব কারণ তাদৃশ প্রতীতি লোকে অপ্রসিদ্ধ।

এই সাংখ্য সূত্র দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় ইহা শঙ্করাচার্য্যের কল্পিত মত নহে। বাস্তবিক ইহা অতি প্রাচীন কালেও কেহ২ মানিতেন, কিন্তু আমাদিগের দেশের অদ্বৈতবাদীরা নাস্তিক নহেন। সাধন কালে ব্রহ্মের সহিত উপাস্যোপাসক ভাব রাখিতে উপদেশ দিতেন। অনুষ্ঠান সময়েও তাদৃশ উপদেশ অনুসারে চলিতেন।

গ্রন্থ খানির আর একটী ত্রুটী এই যে ইহাতে সকল শাস্ত্রেরই অপর্য্যাপ্ত সুখ্যাতি করা হইয়াছে, কিন্তু তন্ত্র প্রভৃতিতে যে পঞ্চমকারাদির উল্লেখ আছে, তাহার উপযুক্ত কারণ কিছুই দেখা যায় না। এই সকল বিষয়ে গ্রন্থকার কিছুই বলেন নাই।

অবশেষে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

'আমার এরূপ মনে হয় যে এই ধর্ম্মবাদীদিগের নিকট ইদানীন্তন কোন কোন জাতি আসিয়া ধর্ম্মের কথা বলে, ধর্ম্মোপদেশ দেয়, সে যেন জেঠার নিকট জেঠামি করা।

হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃতি আলোচনা করিলে বোধ হয় যে এ ধর্ম্ম কোন কালে বিলুপ্ত হইবে না। * যত কাল ভারতবর্ষ থাকিবে, ততকাল এই ধর্ম্ম থাকিবে। অনেকে বলেন, হিন্দুধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে, তাঁহাদের কথা অমূলক। এ ধর্ম্ম কে বিলুপ্ত করিতে পারে? * * *'

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে রাজ নারায়ণ বাবু 'হিন্দু' নামের পরিবর্ত্তে অন্য নাম দেওয়াই কর্ত্তব্য ছিল, যেহেতু 'হিন্দু' শব্দের অর্থ লইয়া অনেক তর্ক আছে।

খ্রীষ্টীয় নব শতাব্দীতে আরব্য সম্রাট হারুণ রসিদের পুত্র মহমূন খোরাসান দেশের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি মিবার রাজধানী চিতোরের নিকটবর্ত্তী হইলে মিবারাধিপতি খোমন সিংহ অন্যান্য হিন্দু ভূপালবর্গের সাহায্য লইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন।

যুদ্ধ-যাত্রাকালে রাজন্যগণের প্রতি খোমনের উক্তি।

প্রাচীর বাহিরে, দেখ বন্ধুগণ,
সিন্ধু-পার-বাসী বিজাতি যবন,
ভল্ল তলবার করিয়া ধারণ,
দুর্গ আক্রমণ করিতে চায়!

হরিত বরণ বসনে বসান,
শশি-কলাঙ্কিত তুলিয়া নিশান,
ডঙ্কা বাজাইয়া হয়ে আগুয়ান,
'অলী' 'অলী' রবে মাটি কাঁপায়।

এ বড় বিচিত্র করি দরশন,
এই রাজস্থান সিংহের ভবন,
নির্ভয়ে ইহারে আজি আক্রমণ
করিছে যবন শৃগালে আসি।

রিপুর রুধিরে এ রাজ্য মজ্জন,

---

* সময়ে ২ ইহার অবস্থার কিছু২ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইবে, আমাদেরও এমত বোধ হয় না। স।

কর, শীঘ্র কর, ওহে যোদ্ধাগণ!
থাকিতে এ দেশে একটী যবন,
হও হে নগনা অসি বিলাসী।

জ্বলন্ত আগুনে পড়িয়া যেমন
পতঙ্গ নিকরে হারায় জীবন;
তেমতি দুর্ম্মতি দুরাত্মা যবন
আমাদের তেজে হইবে ক্ষয়।

সমুদ্র সমান খোরাসানিগণ।
আমাদের কাছে গোষ্পদ মতন,
হরিণের পাল করি নিরীক্ষণ,
মৃগেন্দ্র কোথায় কাতর হয়?

খড়্গ খরশান ধরিয়া পুলকে,
বিপক্ষ সেনায় পশহ পলকে,
যে খড়্গ ফলকে চপলা ঝলকে,
সে খড়্গ ওখানে খেলাও সবে।

প্রতিজ্ঞা করিয়া যত ক্ষাত্র বীর
করহ চ্ছেদন শত্রুদের শির,
এত দিন পর এ সব অসির
রুধির পিপাসা পূরণ হবে।

ত্রেতায় ভূভার করিতে হরণ,
আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ রতন *
সুরগণ ত্রাস রাবণ নিধন
করিলা যেমন অমোঘ বলে,

তেমতি আমরা, মাতি বীররসে,
অমর বিরোধি যবন রাক্ষসে,
সমরে পশিয়া নাশিয়া সাহসে।
আবার তোষিব দেবতা দলে।

যোদ্ধৃ চূড়ামণি তুমি হে 'চৌহান!'
তুমি হে 'প্রমর!' অমর-সমান,
যবন দমনে হও আগুয়ান,
বিজয় পতাকা উড়াও রণে।

তুমি হে রাঠোর সমরে দুর্জ্জয়,
করাল কৃপাণে কর অরি-ক্ষয়,
কেন হে 'চন্দেল' এমন সময়
উপেক্ষা করিছ বিপক্ষগণে।

ওহে দিল্লিপতি প্রবল 'তোমর!'
ও হে 'রাজধর' 'চাউর' † প্রবর!
বিজয় উৎসাহে হও অগ্রসর
দেখহ যবন আগত প্রায়।

চল শীঘ্র চল ‡ 'চালুক' 'সঙ্কলা'
চল হে 'গোহিল' 'গেহ লোট' ভালা
চল 'দোর' 'গোর' 'যদু' 'বুসা' 'বালা'
চল পরিহার কুমার ন্যায়।

করিছ কিসের অপেক্ষা এখন।
* * হর হর বলি চল বীরগণ,
কৃপাণের চোটে কৃতান্ত ভবন
পাঠাও আরব্য পাঠানে সদ্য।

ক্ষত্রিয় তনয় তোমরা সকলে,
বীরত্ব প্রকাশে অতুল ভূতলে,
বিপক্ষের বল মর্দ্দি বাহুবলে,
জীবন সার্থক করহ অদ্য।

দাপটি সাপটি তীক্ষ্ণ তরবার,
শত্রু দলে ঢুকে কর মহামার,

* শ্রীরামচন্দ্র। মিবার বা উদয় পুরের রাজ বংশ রঘুবংশ সম্ভূত ইহা প্রসিদ্ধ।

† চাউর বংশ রাজধর নামে বিখ্যাত ছিল।

‡ চালুক, সঙ্কলা গোহিল ইত্যাদি ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বংশ বিশেষ।

* * রাজ পুতদিগের যুদ্ধ প্রবর্ত্তক শব্দ। মুসলমানেরা অলী অলী বলিয়া যুদ্ধে প্রবত্ত হয়।

কি বৃদ্ধ, কি যুবা, নাহিক বিচার,
সৈনিক হলেই বধিবে তারে।

নিদাঘ কালীন যেন দাবানল,
নাশ বৈরী-বল প্রকাশিয়া বল,
রিপু বিনাশিয়া কর কুলোজ্জ্বল,
তোমাদের সনে রণে কে পারে।

সূর্য্য, শশধর, আর বৈশ্বানর
যাঁহারা ক্ষত্রিয় কুলের আকর,
দেখিবেন তাঁরা কেমন সমর
করিব আমরা আজি এখানে।

শত্রু সঙ্গে করি তুমুল সংগ্রাম,
চিরস্মরণীয় কর নিজ নাম,
তোমাদের কীর্ত্তি, ওহে শৌর্য্যধাম,
হইবে অমর কবির গানে।

রণস্থলে পীঠ দেখায় যে জন,
তার তুল্য আর নাই অভাজন,
হেয় হয়ে সেই কাটায় জীবন,
জীবনান্তে ঘোর নরকে যায়।

এর চেয়ে ভাল সমরে মরণ,
সুরধাম যাতে লভে শূরগণ,
যাদিগে বরিতে করে আগমন
অনন্ত-যৌবনা সুরবালায়।

কে আছে ভারতে হেন মতি হীন,
চায় যে থাকিতে পরের অধীন?
কাররে এমন মনো বৃত্তি ক্ষীণ,
দাসত্বে যাহার নাই অরুচি?

যদি কেহ থাকে এমন পামর,
নর মধ্যে তারে নাহি বলি নর,
কুক্কুরের মত হয় সে কিঙ্কর,
তাহাকে ছুঁইলে হয় অশুচি।

ভার্য্যা, পুত্র বধূ, জননী, ভগিনী,
আর আর যত কুল-সীমন্তিনী,
স্বর্ণ তুল্য যাঁরা করেন মেদিনী,
রক্ষহ তাঁদিগে বিপক্ষ নাশি।

আমাদের এই পবিত্র ভবনে,
পদার্পণ যেন না করে যবনে,
না যেন উহারা দেব-নিকেতনে
মহম্মদী ঝণ্ডা উড়ায় আসি।

নরসিংহ সম বলিষ্ঠ তোমরা,
তোমাদের দাপে কাঁপে বসুন্ধরা,
হেন ক্ষুদ্রাশয় শত্রু নাশ করা
তোমাদের কাছে বিচিত্র নয়।

তোমরা সকলে ক্ষত্রিয় তিলক,
স্বকীর্ত্তি সাধক, স্বধর্ম্ম পালক,
আজি তোমাদিগে শশাঙ্ক-তালক
অবশ্য আহবে দিবেন জয়।

শক্তি মহাদেবী কেশরি-বাহিনী
রক্ষিবেন আজি ক্ষত্রিয়-বাহিনী,
* 'আশা পূর্ণা' দেবী ফল-প্রদায়িনী
আমাদের প্রতি হবেন রণে।

হেষারব করি তুরঙ্গমগণ
ক্ষুরেতে মেদিনী করিছে খনন,
আর কেন কর বিলম্ব এখন?
চল যাই চল, সমরাঙ্গনে।

ত্রেতা যুগে সূর্য্য বংশ মহী ভুজে
ইন্দ্র-সখ হয়ে দলিলা দনুজে,
চন্দ্র বংশ নৃপে, দ্বাপরে, মনুজে
পূজিত প্রধান ভূভুজ বলি।

বশিষ্ঠের যজ্ঞে, হুতাগ্নি হইতে
উঠিলেন চারি বীর আচম্বিতে,

---

*রাজ স্থানে শক্তি ও আশা পূর্ণা দেবীর পূজা অদ্যাপি প্রচারিত আছে।

রবি সোম বহ্নি সম্ভূত আমরা,
এতকাল ভোগ করিতেছি ধরা,
আমাদিগে যেন জ্ঞান করি মরা
এসেছে যবন-ভূপাল অদ্য।
করোনা তিলার্দ্ধ অপেক্ষা এখন,
হর হর বলি চল বীর গণ,
অসির প্রহারে শমন সদন
পাঠাও বিজাতি সেনারে সদ্য।

* 'পৃথ্বী দ্বার' আর 'চুলুক' † সহিতে
প্রবল প্রমর ‡ চৌহান ** বলী।

পৃথ্বী দ্বারকে চলিত ভাষায় পরিহার বলে।

† চুলুক বংশ এখন চালুক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

‡ প্রমর এক্ষণে পোঁয়ার। উজ্জয়িনী পতিরা এই কুলোদ্ভব।

** সংস্কৃত ভাষায় চতুরঙ্গি বলিয়া উক্ত দিল্লীশ্বর পৃথুরাজ এই বংশীয় ছিলেন।

মূল্য প্রাপ্তি ।

(কমিশন বাদ দিয়া ২৫এ মের পূর্ব্বাহ্ন পর্য্যন্তের মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা গেল)

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীজীবচন্দ্র সরকার সুর্দ্দলপুর	২॥০
" প্রসন্ন চন্দ্র মুখটি আবদুলাপুর	১॥
" কালিনারায়ণ সান্যাল ময়মনসিংহ	২॥০
" রাসবিহারী বসু মহরমপুর	১॥
" জগদীশচন্দ্র বসু কাটোয়া	২॥০
" রামব্রহ্মচন্দ্র সারঙ্গাবাদ স্কুল	২॥০
" ভগীরথ দাস মাহিগঞ্জ	২।৶১০
" রাজেন্দ্র লাল রায় পাবনা	
" দ্বারকা নাথ বসু পাবনা	২॥০
" হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ	১।০
" শ্রীরাম মজুমদার, মাধবপুর	২॥০
" বরদাকান্ত সাহা বোয়ালিয়া	২॥০
কহিনীকান্ত চৌধুরী ঐ	২॥০
দেবকীনন্দ সেন, বোয়ালিয়া	২॥০
" গোবিন্দ চন্দ্র মিত্র বোয়ালিয়া	১॥
" গিরিশচন্দ্র সরকার ঐ	১॥
" মহেশচন্দ্র কর, ঐ	১॥
" যাদব চন্দ্র সরকার ঐ	২॥০
" শ্রীমতী দুর্গা সুন্দরী দেবী ঐ	২॥০
" দুর্গাশঙ্কর গুপ্ত বোয়ালিয়া	১॥০
" বিপীন বিহারী মুখোপাধ্যায় ময়মনসিংহ	২॥০
" পার্ব্বতী চরণ রায়, ঢাকা,	।০
" দুর্গা দাস চৌধুরী ভাড়াঙ্গা	১৸৶০
" রাধাগোবিন্দ রায় দিনাজপুর	৫
" বেনী মাধব মিত্র, নড়াইল	২॥০
" উমেশচন্দ্র বসাখ শিবসাগর	২।৶১০
" গুরু চরণ গঙ্গোপাধ্যায় কারাগোলা	২॥০

Registered No. 109.

বিজ্ঞাপন।

১। জ্ঞানাঙ্কুরের অগ্রিম বার্ষিক মুল্য ডাক মাসুল সহ ২॥০ টাকা; প্রতি সংখ্যা ।০ ।

২। যাঁহারা এই পত্রের গ্রাহকশ্রেণিভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা রাজসাহী বোয়ালিয়ায় জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিবেন।

৩। কলিকাতায় যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি চোরবাগান নং ৬ ভুবন বাড়ুয্যের গলি শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়কে পত্র লিখিবেন এবং তাঁহারই দস্তখত রসীদে মুল্য দিবেন।

৪। ছাত্রদিগের পক্ষীয় বিশেষ নিয়ম আমরা উঠাইয়া দিয়াছি। যে কএক জনকে পূর্ব্বে পত্র দেওয়া হইয়াছে, কেবল তাঁহারাই পাইবেন।

রাজসাহী বোয়ালিয়া
জ্ঞানাঙ্কুর পত্রালয়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস
সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

যদি কেহ কোন সংখ্যক জ্ঞানাঙ্কুর নিয়মিত রূপে প্রাপ্ত না হন, তবে তিনি আমাকে পত্র লিখিবেন।

নং ৬ ভুবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, চোরবাগান, কলিকাতা। } শ্রী রজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

কবিতা কুসুম মালা।

কবিতা কুসুম মালা। মূল্য ।/০ আনা। বিদেশে পাঠাইতে হইলে প্রতি ২ খণ্ডে অতিরিক্ত ডাক মাশুল /০ আনা লাগে। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী, ভারত যন্ত্র ৮৩ নং যোড়াশাকো ও মুর্শিদাবাদ সত্যরত্ন যন্ত্র কাকিনীয়া রঙ্গপুর গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়ের নিকট উক্ত পুস্তক প্রাপ্তব্য।

স্মৃতিতত্ত্ব

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত। মুল কাশীমবাজার রাজধানীর সভাপণ্ডিত রমাপতি তর্কভূষণ কৃত অনুবাদ উভয়ই বঙ্গাক্ষরে প্রতি মাসে বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্র হইতে৮০পৃষ্ঠা করিয়া প্রকাশ হইবে। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে স্বাক্ষরকারী মধ্যে গণ্য হইবেন। স্বাক্ষরকারীর সংখ্যার অতিরিক্ত পুস্তক হইবে না। মুল্যের নিয়ম যথা — মুল্য ও অনুবাদ একত্রে ৮০ পৃষ্ঠা ১২ সংখ্যা

	বার্ষিক	ডাকমাশুল
মুল্য	৬	।৵
কেবল মুল ৪০ পৃষ্ঠা	৩	।৵
কেবল অনুবাদ ৪০ পৃষ্ঠা	৩	।৵

সানুবাদ স্মৃতিতত্ত্ব প্রকাশ—
বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্র।

শিল্প বিদ্যালয়।

রাজসাহী বোয়ালিয়াতে একটী শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপন হইবার প্রস্তাব হইতেছে। ছুতার খলিফা ঘড়ি মেরামত কারী প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবেক। এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ আগামীতে প্রকাশ করা যাইবেক।




JNA'NA'NKURA

OR

THE SPRONT OF KNOWLEDGE,

A MONTHLY MAGAZINE AND REVIEW

OF

LITERATURE, PHILOSOPHY, SCIENCE, HISTORY, BIOGRAPHY, ANTIQUITIES, AND RESEARCHES, POLITICS, ARTS, COMMERCE, &c. &c.

জ্ঞানাঙ্কুর

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদিসম্বন্ধীয়
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সূচী

কলিকাতাঃ

বহুবাজার, স্মিথ এণ্ড কোর যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮০




কালকাতা

বিডন স্কোয়ারের উত্তর ৯৬ নং বাটী।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক স্ত্রীপুরুষ ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীরের শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা ও ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তিবিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি এবং শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছুক হইলে পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিয়া ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ (৫) পাঁচ টাকা পাঠাইতে হইবেক।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

হেয়ার প্রিজারভার।

(যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দ্বারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।)

হেয়ার প্রিজারভার কিছুদিন প্রণালীপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণ বর্ণ, ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থা হইবে।

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ,, ১ টাকা

ঐ ডাক মাসুল সহিত ,, ১৷৵

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, মধুমেহ, অর্শ, বহু মূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ বিক্রয়ার্থ এখানে প্রস্তুত আছে।

হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতিদিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূলগ্রস্থ রোগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ১ টাকা

ঐ ডাকমাসুল সহিত ১৷৵

কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি এক টাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৹ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেকের চারি আনা।

বীলাতি যত প্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী ও ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

জ্ঞানাঙ্কুর।

—০০।০—

মাসিক পত্র।

১ ম খণ্ড | শ্রাবণ ১২৮০ । | ১১ শ সংখ্যা

স্বর্ণলতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

—ঃঃ—

সপ্তদশ অধ্যায়।

—ঃঃ—

সরলার বিরহ শ্যামার বিক্রম।

কোন সুবিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছে মৃত্যুকালে যে মহাবিরহ ঘটিবে তাহাই মনে হয় বলিয়া আমাদে আপাততঃ সামান্য বিরহে কষ্ট বোধ হয়। একথা খুব সঙ্গত বটে। নচেৎ দুঃখের তো আর কোন কারণই নাই। জানিতে পারিতেছি আমার ভাই বন্ধু আজ বাটী হইতে যাইতেছে, আবার প্রয়োজন সমাপ্ত করিয়াই প্রত্যাগত হইবেক। কিন্তু তথাপি যে মন প্রবোধ মানেনা তাহার কারণ সেই মহাবিরহের ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন কেহ আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যায়, তখনই যে আমরা মৃত্যুচিন্তা করিয়া থাকি এমত নহে; কিন্তু তাহা না হইলেও বিরহবেদনার যে সেই মূল কারণ, তাহা নিশ্চয়। তুমি কাহাকেও ৫ টাকা দান করিলে তোমার কোনই কষ্ট বোধ হয় না, কিম্বা যদি তোমার ১০ টাকা হারাইয়া যায় তাহাতেও তোমার বিশেষ দুঃখ হয় না, কিন্তু বাজারে যদি চারি পয়সার জিনিস কিনিতে তোমাকে ঠকাইয়া ছয় পয়সা নেয়, তাহাতে তোমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট বোধ হয় কেন? কারণ তোমার মনে হয় তোমাপেক্ষা দোকানী বেশি চালাক, বেশি বুদ্ধিমান্। লোকে কখনই নিজের ন্যূনতা স্বীকার করিতে চায় না। ঠকিয়া আসিলে নিজের ন্যূনতার স্পষ্টাক্ষরে পরিচয় দেওয়া হয় এবং সেই জন্যই এত দুঃখ হয়। কিন্তু ঠকিয়া আসিলে কি কেহ এরূপ তর্ক করিয়া দেখে? এইরূপে আমাদের অনেক সময় অনেক ভাবের উদয় হয়, যদিও তত্তৎসময় সে ভাবের কারণ আমরা সম্যক্‌রূপে টের পাইনা, অথবা বিচার করিয়াও দেখি না।

বিধুভূষণ বাটী হইতে চলিয়া গেলে সরলার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কেনই বা যাইতে দিলাম। বাটী থাকিয়া দুজনে একত্রে উপবাস করিতাম তাহাও এ যন্ত্রণা অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল ছিল। আবার ভাবেন "আমি কি স্বার্থপর! আমার জন্য তিনি কষ্ট পাইবেন ইহাও আমার বাঞ্ছনীয় মনে হইতেছে? বিশেষ তাঁহাকে যদি অনাহারে থাকিতে হইত, তাহা তো আমি কখনই দেখিতে পারিতাম না।" কবে বিধুভূষণ কি মিষ্ট কথাটী কহিয়াছেন, কবে অন্যান্য দিন অপেক্ষা একটু বেশি ভালবাসার চিহ্ন দেখাইয়াছেন, সরলার মনে তাহাই উদিত হইতে লাগিল। বিধুভূষণ এক একদিন রাগ করিতেন বলিয়া সরলার কত কষ্ট হইত, তিনি কাহারও সহিত বিবাদ করিয়াছেন শুনিয়া সরলার কত দুঃখ বোধ হইত, সে সমস্ত কথা এক্ষণে তাঁহার মনে হইল না। তাঁহার কবে কি ব্যামোহ হইয়াছিল, সরলার তাহাও স্মরণ হইতে লাগিল। বিদেশে যদি সেইরূপ পীড়া হয় তাহা হইলে কে তাঁহার শুশ্রূষা করিবেক। এই সমস্ত ভাবিয়া সরলা ছাতে বসিয়া অবিরত অশ্রুপাত করিতেছেন।

বিধুভূষণকে বাটীর মধ্য হইতে বিদায় দিয়া সরলা ছাতে গিয়া বসিয়াছিলেন। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর অনিমিশনয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন। বিধুভূষণও দু এক পা যান আর ফিরিয়া ফিরিয়া ছাতের দিকে নজর করেন। ক্ষণকাল এইরূপে গমন করিয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষ তাঁহাদিগের দৃষ্টি অবরোধ করিল। বিধুভূষণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। সরলা ঐ ছাতেই বসিয়া রহিলেন। একবার ইচ্ছা করিলেন দৌড়িয়া গিয়া এখনও ফিরাইয়া আনি, কিন্তু কি সুখভোগ করিতে আনিব? না আমি নিজে অনাহারে মরি ...াল, তবু তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া ...না। দিদির দাসী হইয়া থাকিলে ...দি মুক না করিয়া চার্‌টি চার্‌টি খেতে দিতো, আমি তাহাও করিতে পারিতাম। সরলা এইরূপ ভাবিতেছেন। শ্যামা গৃহকর্ম্ম সমস্ত সমাপন করিয়া পাকশাকের আয়োজন করিয়া দিয়া সরলাকে ডাকিতে গেল। বেলা এক প্রহর হইয়াছে তথাপি ...র হুঁস নাই। শ্যামা নিকটে গিয়া ...বলি ও ছোটগিন্নি, আর কারু ...য়ামী নেই? না আর কেউ কখন ...শ যায় নাই?"

...্যামার ডাক শুনিয়া সরলার চৈতন্য ...। তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ...াকে জিজ্ঞাসিলেন "শ্যামা কি বল্‌ছো?"

শ্যামা। "কি বোল্‌বো আজ্‌ কি আর গৃহস্থদের রান্নাবাড়া হবে না? না তোমার খিদে নেই বোলে আমরা সকলেই উপস কর্‌বো?"

সরলা। "শ্যামা আমার যথার্থই খিদে নেই, তুমি গিয়া রেঁদে খাও আমি আজ আর কিছু খাবনা।"

শ্যামা। "আমি খেলে তো আর গোপালের পেট ভোর্‌বে না? সে যে পাঠশাল থেকে আসছে, এসে কি খাবে?'

সরলা। " এত বেলা হয়েছে ?"

শ্যামা।" বেলা হবে কেন, তোমার জন্যে সুর্জ্জিদেব বসে আছে ?"

সরলা। সূর্য্যের দিগে তাকাইয়া দেখিলেন যথার্থই অধিক বেলা হইয়াছে। তখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছাত হইতে নামিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন। পাকশাক হইল। গোপাল খাইল, সরলার ভাতের কাছে বসা মাত্র। শ্যামা আবার বাসন, ঘর মুক্ত করিল।

সে দিন গেল, তার পরদিনও গেল। সরলার বিরহানলও ক্রমে ক্রমে কম পড়িয়া আসিতে লাগিল। একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গেল তাহা নয়। কিন্তু সে পাবকের শিখা আর রহিল না। সময় কি চমৎকার চিকিৎসক। শোক তাপ যদি চিরকালই সমান থাকিত, তাহা হইলে মানবজীবন কি দুঃসহ দুঃখভার হইয়া পড়িত।

বিধুভূষণ ও শশিভূষণের পৃথক্ হইবার দিনকতক পরেই গদাধর চন্দ্রের দল আসিয়া উপস্থিত হয়। বিধুভূষণ যত দিন বাটীতে ছিলেন, গদাধর চন্দ্র অথবা তাঁহার জননী সরলার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না, কিম্বা তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করিতেও সাহস পাইতেন না। প্রমদা মাঝে মাঝে বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেন বটে, কিন্তু সরলা তাহা শুনিয়াও শুনিতেন না। কিন্তু এক্ষণে তিন জন একত্রে সাবেক বাকী সুদ সমেত আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদিবস প্রমদা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া শ্যামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন " ও শ্যামা, বলি তোমাদের বাবুজী মহাশয় কোথায় গেলেন, কাপড় ধার করিতে না টাকা ধার করিতে? আজ কাল যে বড় গান বাজনার কথা শুনতে পাইনে ?"

শ্যামা কহিল "যদি বেঁচে থাক আর পরমেশ্বর তোমার চোক্ কাণ বজায় রাখেন, তা হলে শুন্‌তে পাবে ?

প্রমদা শ্যামার কথায় ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন " কি বল্লি।

শ্যামা কহিল " আজ্ মাসের ক দিন তাই জিজ্ঞাসা কল্লেম। "

প্রমদা। 'দেখ্‌লে দেখ্‌লে মাগীর আক্কেলটা ? থাক্‌তো যদি বাড়ী, তা হলে এখনি মুখ খান যুতো দিয়ে সোজা করে দিতাম।

সরলা কহিলেন "শ্যামা ক্ষান্ত দে শ্যামা ক্ষান্ত দে। ওঁর মনে যা আসে উনি তাই বলুন না, তোর তো আর তাতে গা ক্ষয় যাবে না। "

শ্যামা। কেন ক্ষান্ত দেব। উনি কোথাকার কে। উচ্চৈঃস্বরে প্রমদাকে সম্বোধন করিয়া "বলি বড় মাগী মাগী করছো যে, তুমি কি মিন্‌সে নাকিই বড় যুতোর মানুষ হয়েছ। কথায় কথায় যুতো মারিব। বলি ভিজিয়ে মার বে না সুকনো মার্‌বে ?

প্রমদা রাগে আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। "থাক্, থাক্ আসুক আগে বাড়ী, তখন তোর কত প্রতাপ দেখাবো এখন।

শ্যামা। "কত লোকে দেখাইয়াছে, এখন বাকী আছ তুমি। এসনা এখনি দেখাও না ? আর তার বাড়ী আসিবার দরকার কি ?

প্রমদা কথা না কহিয়া গৃহ মধ্যে গিয়া বসিলেন। রাগে কর্ণের অগ্র পর্য্যন্ত

রক্তিমাবর্ণ হইয়াছে, ফোঁস্ ফোঁস করিয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতেছে। হস্ত পদ সর্ব্বদা নাড়ার দরুন্ অলঙ্কারের শব্দ হইতেছে। প্রমদার মাতা দেখে শুনে এক বারে অবাক হইয়া রহিলেন। প্রমদার মাতা সম্মুখ সমরে সাহায্য করিতেন। কিন্তু শ্যামার বিক্রম দেখিয়া ভরসা হইল না। তিনি এক্ষণে তনয়ার নিকটে বসিয়া বলিতে লাগিলেন।

"মা স্থির হও, স্থির হও। শিখান না থাক্‌লে কি ছোট লোকের মুখে এসব কথা বেরোয়, তলে তলে টিপ্‌নি আছে, তাতো তুমি টের পাও না। আজ বাড়ী এলে সব বলে দিও। দেখ তিনি কি বলেন বাপরে বাপ আমার তো আর এবাড়ী তিলার্দ্ধ থাকৃতে ইচ্ছা করেনা কবে আমা-কেই বা কি বলে বসে।

প্রমদার মাতার কথা শেষ না হইতে গদাধর চন্দ্র কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রমদাকে রাগত দেখিয়া ও জননীর মুখে উল্লিখিত কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ডি ডি— কি হয়েছে। ডি ডি কথা কহিলেন না। গদা-ধর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "ডি ডি কি হয়েছে।

প্রমদা উত্তর করিলেন "যা যা এখন ঐ দিগে যা, কোথাকার গণ্ডমুর্খটা, তোর যদি বুদ্ধি সাদ্ধি থাক্‌তো তা হলে তোর অদেষ্টে এত দুঃখ হবে কেন!

গদাধর চন্দ্র অজ্ঞান। তার কপালে কি দুঃখ! তার বিশ্বাস, ক্রমেই তার সুখ বৃদ্ধি হচ্ছে। দিদির বাটী এসে পর্য্যন্ততো আহার আদি ভালই হচ্ছে, তবে আবার অসুখ কি! এই ভাবিয়া গদাধর ব্যাকুবের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিলেন।

গদাধরের মা সমুদায় কহিলেন। গদাধর শুনিয়া ক্রোধে কম্পবান্ হইয়া কহিলেন "চল্লাম আমি দেখি ও মাগীর কট প্রটাপ" এই বলিয়া একগাছ লাটি হাতে করিয়া গদাধর সরলার ঘরের দিগে অগ্রসর হইলেন। "আয় বেটী আয় ডেখি টোর কত জোর, আর কার প্রটাপে টুই লড়িস।

প্রমদা নিষেধ করিলেন না। গদা-ধরের মাও না। তাঁহারা ভাবিলেন যদি দুযা এক ঘা দিতে পারে ভালই।

সরলা গদাধরের আস্ফালন শুনিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতে গেলেন, শ্যামা কোন মতেই দরজা বন্ধ করিতে দিলনা। গৃহের কোণ হইতে তরকারি কোটা একখান বঁটী হস্তে লইয়া দ্বারে দাঁড়া-ইয়া কহিল "কে কোথায় সে ল্যাজ কাটা বামুন? আয় আজ তোর্ নাক কাণ না কেটে যদি আমি জল খাই তবে আমার নাম শ্যামাই নয়!

বঁটির চোকাল ধার দেখে গদাধরের আর ভরসা হইল না। দূর হইতে কহিলেন "টুই আমাকে কাট্‌বি, এই চল্লাম আমি থানায়? ডারগা বক্‌সী ডেকে আনি।

শ্যামা। "যা তুই যেখানে ইচ্ছা সেই খানে। গিয়ে যা কর্‌তে পারিস্ তা করিস্।

থানা সেই গ্রামেই। গদাধরের সহিত থানার এক কনষ্টেবলের সহিত

আলাপ ছিল। গদাধরের বিশ্বাস ছিল, তিনি গেলেই আর কেউ আসে না আসে, সেই কনষ্টেবল তো আস্‌বেই, তা হলেই শ্যামা জব্দ হবে। দৌড়িয়া থানায় গেলেন। দেখ্‌লেন দারগা কি বলিয়া দিতেছে, আর তাঁহার আলাপী কনষ্টেবল তাই লিখিয়া লইতেছে। গদাধর গিয়া কহিলেন "ডারগা মশায়, ডারগা মশায়, শ্যামা আমার নাক, কাণ কাট্‌তে চায়?"

দারগা কহিল "তুমিই বা কে, আর শ্যামাই বা কে?"

গদাধর। "আমি শশী বাবুর শালা।"

দারগা "তোমার বাপের নাম কি?"

গদাধর "টা বল্লে চিণ্টে পার্‌বে না। শ্যামা ডাসী, আমার সঙ্গে ঝকড়া করে আমার নাক কাণ কেটে ডিটে চায়।"

দারগা কনষ্টেবলের দিকে চাহিয়া কহিলেন "রমেশ একে তুমি চেন?" কনষ্টেবলের নাম রমেশ।

রমেশ গদাধরের কুল, শীল, বিদ্যা, বুদ্ধির পরিচয় দিল। দারগা শুনিয়া কহিলেন "ভাল তোমার মোকদ্দমা কচ্ছি। এত বড় অন্যায় তোমার নাক কাণ কাট্‌তে চায়!"

গদাধর। "অন্যায় না বড় অন্যায়। আপনি এর একটা সুবিচার করুন্‌।"

দারগা কহিলেন "আচ্ছা তা কর্‌ছি। কিন্তু তোমার নাক কাণ কেটেছে না সুদু বলেছে কাট্‌বো?"

গদাধর হঠাৎ কাণে হাত দিলেন। দারগা কহিলেন "হাঁ আগে ভাল করিয়া দেখ, দাবি এর পর তো প্রমাণ করা চাই।"

গদাধর কহিলেন "কাটে নাই কিন্টু বলেছে কাট্‌বো।"

দারগা "একটা স্ত্রী লোক বলেছে তোমার নাক কাণ কাট্‌বে, তাই তুমি দৌড়ে থানায় এসেছ? তোমার লজ্জা করে না?"

গদাধর। "সে টেমনি স্টী লোক বটে। সেঠো স্ট্রী লোক নয়, সে স্ট্রীলোকের বাবা। যে বঁটী টুলে ছিল, যডি ডেখটে, টবে বাপ্‌ বাপ্‌ করে টুমিও পালাটে"

দারগা। "সত্যি নাকি? তবে তো তাকে জব্দ করা উচিত। তুমি এক কাজ কর। ফিরে যাও, গিয়ে ঝকড়া কর। তোমার কাণ কেটে দিক আগে, তা নৈলেত মকদ্দমা হবে না।"

গদাধর "আগে যডি কাণ কেটে ডেবে, টবে আমি কি নিয়ে নালিস কর্‌বো?"

দারগা "কেন এক কাণ নিয়ে।"

গদাধর বুঝিতে পারিল দারগা ঠাট্টা করিতেছে। তখন রাগত হইয়া কহিল "আচ্ছা টুমি আমার মকড্‌ডমা না কর, আমি জেলায় যাব।"

দারগা কহিলেন "সেই ভাল। এ সব বড় মকদ্দমা এখানে হয় না।"

গদাধর উঠিয়া যাইতেছেন। দরগা কনষ্টেবলকে কহিলেন একটু মজা কর্‌বো দেখ্‌বে?

কনেষ্টেবল কহিল "কি মজা?"

দারগা অন্য একজন কনষ্টেবলকে কহিলেন "হরিসিং এই লোকটীকে গারদে দাও তো। এ মিথ্যা এজাহার দিতে এসেছে।"

হরিসিং আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবা মাত্র গদাধরের হস্ত ধারণ করিয়া গারদে

লইয়া গেল। গদাধর আর কাঁদিয়া বাঁচে না। প্রথমতঃ কত প্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল। "টোমরা টের পাও নাই আমি কে? ঠাক টোমাদের মজা ডেকাব, আমি শশী বাবুর শালা টা টোমরা জান? আমাকে গারডে ডেওয়া সোজা কটা নয়।"

কনষ্টেবল কহিল "তুমি ঠাকুর যা কর্‌তে পার, কোরো। আমার কি, আমি তো হুকুম মেনেছি। মোদ্দা তুমি আর বেশি কথা কইও না। দারগা বাবু বল্লেন বেশি কথা কৈলে হাত কড়া লাগাতে হবে।"

গদাধরের শুনিয়া ভয় হইল, না জানি আবার হাত কড়া কি। তখন কনষ্টেবলের পায় পড়িতে লাগিল। "হরসিং তোমার পায় পড়ি আমাকে ছেড়ে ডেও।"

হরিসিং কহিল "আমার ছেড়ে দেবার কি ক্ষমতা?"

গদাধর। "টবে একবার রমেশ বাবুকে ডেকে ডেও?"

কনষ্টেবল ফিরিয়া আসিয়া বলিল "রমেশ বাবু আসিতে পাবে না।"

গদাধর। আচ্ছা আমি রমেশ বাবুর এট কল্লাম, আর রমেশ বাবু আমার সঙ্গে একবার ডেকা কর্‌লেন না। গদাধর এই প্রকার ক্রমাগত কখন তোষামোদ, কখন রাগ প্রদর্শন করিয়া পরে সন্ধ্যাবেলা উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিল। তখন দারগা গারদে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল? কেমন তুমি আর মিথ্যা মকদ্দমা কর্‌বে?"

গদা। "না"

"স্ত্রী লোকের সঙ্গে ঝকড়া কর্‌বে।

"না?"

"তবে তিন হাত মেপে নাকে ক্ষত দাও, তবে যেতে পাবে।"

গদাধর তাহাই করিল। পরে গারদ হইতে চলিয়া গেল।

গদাধরচন্দ্র থানায় গেলে ক্ষণকাল পরে শশিভূষণ বাটী আসিলেন। অন্যান্য দিন অপেক্ষা সে দিন সকালে কাছারি বন্ধ হইয়াছিল। বাটী আসিয়া প্রমদাকে রাগত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমদা আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বলিলেন, কেবল প্রথমতঃ তিনিই যে ঠাট্টা করিয়াছিলেন সেই টুকু বাদ দিলেন। শশিভূষণ শুনিয়া প্রথমতঃ চটিয়া উঠিলেন। সুযোগ বুঝিয়া প্রমদার মাতাও আবার এই সময়ে দুই একটি টিপ্‌পনী করিলেন। কিন্তু রাগ করিয়া শ্যামার কি করিবেন। তাহাকে ধরিয়া মারিতেও পারেন না, কিম্বা এই কথা লইয়া মকদ্দমাও করিতে পারেন না। সাত পাঁচ ভাবিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

যাইবার সময় গদাধরের নানান চিন্তা উপস্থিত। "বাটী গিয়া কি বলিব? গারদের কটা টো বলা হবে না। কিন্তু শ্যামা টো আর মান্‌বে না। রমেশ বাবুকেও টের পেলাম। আর শশী বাবুর বাড়ী যাব না। একেবারে আপনার বাড়ী যাই, কিণ্টু সেখানে গিয়ে কি খাব। না টাও না, শশী বাবুর বাড়ীই যাই। গিয়ে বলিব আমি ঠানায় যাই নাই আর এক জায়গায় গিয়াছিলাম, গদাধরচন্দ্র এই ভাবিতে ভাবিতে দুএকপা করিয়া (শশিভূষণের) বাটী গেলেন।

গিয়া দেখিলেন শশিভূষণ বাটী আসিয়াছেন। কিন্তু মুখ অন্ধকার, প্রমদাকে যেরূপ দেখিয়া গিয়াছিলেন প্রায় সেই রূপেই আছেন,তাঁহার মাতা রান্না ঘরে পাকশাক করিতেছেন। গদাধর গিয়া আস্তে আস্তে রান্না ঘরে আড্‌ডা নিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অতি ক্ষুদ্র।

গদাধর থানায় কি হইয়াছিল তাহা কাহাকে বলিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে কিরূপে শ্যামা ও সরলাকে জব্দ করিবেন, এই চিন্তাই সর্ব্বদা করিতে লাগিলেন। প্রমদাও তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার স্বামী বাটী আসিয়া শ্যামার বিধিমত লাঞ্ছনা করিবেন, কিন্তু যখন দেখিলেন তিনি কিছু করিলেন না, তখন মনে করিলেন আর কাহাকে কিছু না বলিয়া নিজেই শ্যামাকে শাসন করিবেন। কিন্তু শ্যামাকে কিছু বলিতে কাহারো সাহস হয় না। মুখে তার কাছে কাহারো সাধ্য নাই যে জেতেন।

এক দিবস রাত্রিতে আহারাদি করিয়া শ্যামা ও সরলা শুইয়া আছেন, ঘরের দরজা খোলা রহিয়াছে। প্রমদা নিশঃব্দপদসঞ্চারে দ্বারের নিকটে গেলেন। শুনিলেন সরলা ও শ্যামা উভয়ে কথোপকথন করিতেছে। সরলা কহিলেন "শ্যামা প্রায় তিন মাস হইল তবু এক খানা পত্রও পাওয়া গেল না। তিনি কোথায় গেলেন কি হলো তার তো কিছুই টের পেলেম না। আমার ভাবনায় শরীর শুখিয়ে যাচ্ছে।

শ্যামা উত্তর করিল 'তার ভাবনা কি? এই পত্র এলো বোলে। মনে কর, তিনি এক বিদেশে গিয়াছেন, সেখানে দেখে শুনে নিতেই কত দিন গিয়েছে. একটু স্থির হয়ে না বস্‌লে তো আর কেউ পত্র টত্র লিখ্‌তে পারে না।

সরলা কহিলেন "তা সত্য বটে, কিন্তু তিন মাসও তো অল্প সময় নয়?

শ্যামা। তিনি যে এ তিন মাস এক যায়গায়ই আছেন. তারি বা ঠিক কি? যাত্রার দল তো কখন এক জায়গায় বসে থাকে না। হয় তো আজি এখানে কালি ওখানে, ফেরে বেড়াচ্ছেন, তাই পত্র লিখিবার কোন সুবিধা পান নাই।

সরলা। আমাদের খরচ পত্রও বুঝি প্রায় শেষ হয়ে এলো, এর পর কি হবে, আমি তাই ভাব্‌ছি।

শ্যামা। "তার ভয় কি? এখনও যা আছে তাতে ৬ মাস অনাসে চল্‌বে"

সরলা। "শ্যামা তুমি যে ঐ ভাঙ্গা সিন্দুকে টাকা রাখ এ কিন্তু ভাল না। কবে কে টের পেয়ে এক দিন সব নিয়ে যাবে।"

শ্যামা। "কেই বা টের পাবে যে সিন্দুক ভাঙ্গা। যদি তুমি চুরি কর তা হলে যাবে, আর আমি চুরি কর্‌লে যাবে। এছাড়া আর কে চুরি কর্‌তে আসবে।

প্রমদা এত দূর পর্য্যন্ত শুনিয়া দুয়ারের নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বড়ই আহ্লাদ হইল। একবার

মনে করিলেন, এই রাত্রিই টাকা গুলি চুরি করিবেন। কিন্তু নিজে গেলে পাছে ধরা পড়েন, এই ভাবিয়া রাত্রে চুপ করিয়া রহিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে শশি-ভূষণ কাছারি চলিয়া গেলে গদাধরও জননীকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। গদাধর আহ্লাদে ৮ খানা হইয়া কহিল "ডিডি টোমায় আর কিছু করটে হবে না। আমি একলাই পারবো, কিণ্টু ডুয়ার খোলা পেলে হয়।,,

গদাধরের মাতা কহিলেন "সে জন্য ভয় নাই। আমি আজি চারি পাঁচদিন দেখ্ছি ওরা রোজই দোর খুলে রাখে। কিন্তু গদাধরচন্দ্র সাবধান শ্যামা যদি জেগে থাকে তবে তুমি এমন কাজে যেও না।,,

গদাধর উত্তর করিল "ভয় কি মা। আমি গায়ে টেল মেখে যাব, যডিও ঢরে টবে একটান মেরে পালাব।

প্রমদা দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলেন, দূরে শ্যামাকে দেখিয়া "গদাধর চুপ চুপ।,, গদাধর চুপ করিল। পরে প্রমদা উচ্চৈঃ-স্বরে কহিলেন "গদাধরচন্দ্র আজি না তুমি বাড়ী যেতে চেয়েছিলে, তবে যাওনা কেন?,,

গদাধরও উচ্চৈঃস্বরে কহিল "এখন টো রোড্ হয়ে উঠলো ওবেলা যাবো। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ অগ্রে গদাধর কাপড় চোপড় পরিয়া বাটী যাইবার জন্য বাহির হইলেন। কিন্তু সন্ধ্যার পরে রাত্রি ১০ টা ১১টার সময় পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। প্রমদা দরজা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং গদাধর নিঃশ-ব্দেই বাটীমধ্যে আসিলেন। গ্রীষ্মকাল সরলা ও শ্যামা দরজা খুলিয়া শুইয়া আছেন, দুজনের মধ্যে শুইয়া গোপাল নিদ্রা যাইতেছে। বাটীর অন্যান্য সক-লেই নিদ্রিত। গদাধর সুযোগ বুঝিয়া সরলার গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক টাকা গুলি লইয়া পুনরায় সেই রাত্রিই বাহির হইয়া গেলেন। পরদিন ৭টা ৮টার সময় গদাধর ফিরিয়া আসিলেন। রাস্তায় আসিবার সময় মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছুই নূতন রকম টের পাইলেন না। পাড়াগাঁয় তো সহরের মতন প্রত্যহ টাকার প্রয়ো-জন হয় না। সরলার কোন খরচ পত্রেরও আবশ্যক হয় নাই। শ্যামাও সেদিবস সিন্দুক খোলে নাই, সুতরাং সেদিবস কোন গোলযোগও হইল না।

পর দিবস আহার করিয়া গোপাল স্কুলে যাইবার সময় কহিল মা আজ ইস্কুলের মাইনে দিতে হবে, মাস্টার মহাশয় কালিই নিয়ে যেতে বলেছিলেন, তা আমার মনে ছিল না। আজ না দিলে হবে না।

সরলার তখন অবসর ছিল না। শ্যামাকে ডাকিয়া কহিলেন "শ্যামা গোপালের স্কুলের মাইনে দাও।

শ্যামা সিন্দুক খুলিয়া যে স্থলে টাকা থাকে খুঁজিয়া দেখিয়া পাইল না। এদিগে ওদিগে দেখিল নাই। মনে করিল সরলা টাকা স্থানান্তরে রাখিয়া ঠাট্টা করিতেছেন। এজন্য সরলাকে কহিল "খুড়িমা আমার সঙ্গে চালাকি?

সরলা কহিলেন "সে কি শ্যামা?"

শ্যামা। ইঃ উনি কিছু জানেন না আর কি?

সরলা কহিলেন শ্যামা যথার্থই আমি কিছু জানিনে।

শ্যামা সরলার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, তিনি যা বলিতেছেন, যথার্থ। তখন কহিল "তুমি তো টাকা কোন জায়গায় রাখ নাই।"

সরলা কহিলেন "আমি তো দু তিন দিন হলো সিন্দুকের কাছে যাইও নি।"

শ্যামা কহিল 'তবে যথার্থই টাকা চোরে লইয়াছে।' উভয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সিন্দুকের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। টাকা কোথাও নাই। সরলার মুখ শুকাইয়া গেল। কপালে ঘর্ম্ম বহিতে লাগিল। কাতরস্বরে কহিলেন "শ্যামা উপায়?"

শ্যামা কহিল "আর কিছু না, ঐ বিট্‌লে বামুন নিয়েছে। এ গদার কর্ম্ম। এত দিন না তত দিন না, হঠাৎ ও পরশু বাড়ী গেল কেন? ঐ টাকা চুরি করে নিয়ে রেখে আস্‌তে গিয়াছিল। এখন আমার মনে হলো, ওরা সেদিন সকলে ফিস্ ফিস্ করে পরামর্শ কোর্‌ছিল, আমি এলাম, তখন চেঁচিয়ে কথা কৈতে আরম্ভ করিল। চল্ল্যাম আমি থানায় ও কেমন বামন, আমি ওরে মজা দেখাব।"

এই বলিয়া শ্যামা গৃহমধ্য হইতে বাহির হইল। প্রমদা, গদাধর ও গদাধরের জননী এ দু দিবস ক্রমাগত চৌকি দিতেছিলেন কখন্ টের পায়। সরলার গৃহে উচ্চ কথা শুনিয়া পরস্পর তিন জনে হাসিতে লাগিলেন।

শ্যামা বাহির হইয়া কহিল, আমি টের পেয়েছি, কে টাকা চুরি করেছে? এসব ঐ গদাধরের কর্ম্ম। সেদিন বাড়ী গেল, যেন কেউ টের পেলেনা আর কি? এখনও আমি বল্‌ছি, ভাল চাও তো টাকা গুলি দাও, নাদিলে কিন্তু আমি থানায় খবর দেব। আমি কাউকে ছেড়ে কথা কব না। ধাড়ি বাচ্ছা সকলেরি নাম করে দিব।

গদাধর বাহির হইয়া কহিল "কি টুই বক্ বক্ কর্‌ছিস্? কে টোর টাকা নিয়েছে। ফের যডি টুই চোর বলিস, টবে আমিই টোকে ঠানায় নিয়ে যাব।

শ্যামা। তোর আর আমাকে থানায় নিয়ে যেতে হবে না। সেদিন গিয়েছিলি না থানায়, কি বল্লি গিয়ে?

গদাধর মনে করিল, শ্যামা তাহার বিদ্যা টের পেয়েছে, পাছে বেশি কথা কহিলে সমুদায় প্রকাশ করিয়া দেয়, এই ভয়ে ঝকড়া ত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শ্যামা বল্‌তে লাগিল "এই আমি জানিলাম। আমি কাহারো উপরোধ করিব না। ঘরের মধ্যে পুলিস এনে খানা তলাসি করে তবে ছাড়্‌বো।" শ্যামা এইরূপ বলিয়া বাটীর বাহির হইতেছে এমন সময় শশিভূষণ কাছারি হইতে বাটী আসিলেন। পুলিষ খানতেলাসির কথা শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ আবার কি হয়েছে!"

শ্যামা কহিল "গদাধর আমাদের টাকা চুরি করেছে, যদি ভাল চায়

এখনি দিক্, নইলে আমি চল্ল্যাম, এই পুলিষ ডেকে আনি গিয়ে।”

শশিভূষণ কহিলেন “শ্যামা আমার সঙ্গে এস—আমি অনুসন্ধান করে দেখি, পরে তুমি থানায় যেও।” শ্যামা শশিভূষণের কথায় ফিরিয়া আসিল।

শশী কাপড় চোপড় ছাড়িলেন। শ্যামা গদাধরের বাটী যাওয়া ও তার পূর্ব্বে তাহাদিগের পরামর্শ ও পরে টাকা হারানর বিবরণ সমুদায় বর্ণনা করিলে শশিভূষণ শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই না বলিয়া শ্যামাকে কহিলেন, “শ্যামা এখন এই টাকাটি দিয়া গোপালকে ইস্কুলে পাঠাইয়া দাও। আমি আহারাদি করিয়া ইহার বিচার করিব।”

শ্যামা তাই করিল।

শশিভূষণ আহারাদি করিয়া সমুদায় পুনরায় প্রমদার নিকটে শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইল। প্রমদাকে কিছু না বলিয়া পুনরায় কাছারি যাইবার সময় শ্যামাকে ডাকিয়া কহিয়া গেলেন ‘শ্যামা কে টাকা লইয়াছে ঠিক হইল? কিন্তু পুলিষ আনিয়া গোল মালের প্রয়োজন কি, তোমার যত টাকা গিয়েছে আমিই দেব।”

কাছারি হইতে আসিয়া শশিভূষণ শ্যামাকে পুনারয় টাকাগুলি গুণিয়া দিলেন।

ঊনবিংশত্যধ্যায়।

গোপালের দুই মা।

—o—

শশিভূষণের বাটীর দশ বারো রসী তফাতে রামচন্দ্র ঘোষের বাটীতে পাঠশালায় গোপাল লিখিতে যান। রামচন্দ্র ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসে। পাঠশালায় ৬০। ৭০ জন বালকে লেখে। চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে সারি সারি ছাত্রেরা বসে। প্রথম ৩ সারি বালকেরা তালপাতায় লেখে, তার পর দুসারি কলার পাতায় লেখে। সকলের শেষের সারিতে বালকেরা কাগজে লেখে। গুরুমহাশয় চণ্ডীমণ্ডপের এক প্রকাশ্য স্থানে একটি পাটী বিছাইয়া বসেন।

গুরুমহাশয়ের আসনের দক্ষিণভাগে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দেওয়া একটি হুঁকা, ও হুঁকাটির পাশে একটি কলিকা রহিয়াছে। তার কিঞ্চিৎ সম্মুখে ভাগে ভাগে তামাক সাজান রহিয়াছে। বালকেরা সকালে পাঠশালায় আসিবার সময় এক এক কলিকা করিয়া যে তামাক আনিয়াছে, গুরুমহাশয় সে সমস্ত তামাক একত্র করেন নাই। রকম রকম সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। গুরুমহাশয়ের আসনের বাম পার্শ্বে এক গাছি মাঝারি রকমের মোটা বেত। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয়, বেতগাছটির সহিত তামাকের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু সে কথা কতদূর সত্য, তাহা গুরুমহাশয়ের শাসনপ্রণালী দেখিলেই অনায়াসে বোধগম্য হইবেক।

গুরুমহাশর বেতের দ্বারা চণ্ডীমণ্ডপের

মেঝের উপর ৩।৪ বার সপাং সপাং করিয়া আঘাত করিয়া বলিলেন ‘পোড়ে লেখ, পোড়ে লেখ।’

বালকেরা যাহার যতদূর গলা উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া পড়িয়া লিখিতেছে। কেহ কেহ পঞ্চমে তুলিয়া “ক লেখ, খ লেখ করিতেছে” কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে ‘রামকৃষ্ণ পরামাণিক” “জন্মেঞ্জয় মিত্র’ ইত্যাদি যুক্তাক্ষরে নাম লিখিতেছে। অসংযুক্ত বর্ণের নাম গুরুমহাশয়ের গ্রাহ্য হয় না। কলার পাতায় কেহ হেঁকে হেঁকে “সেবক শ্রীউত্তমচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ” পাঠ লিখিতেছে। কাগজ লেখক ছাত্রেরা যেন মস্ত মস্ত জমিদার মহাজন হইয়া পড়িয়াছে। অর্থের প্রতি যেন দৃক্পাতই নাই। যেমন তেমন বাঙ্গালা কাগজে মহামহিম পাঠ লিখিয়া দুলাক, পাঁচলাক টাকাই কর্জ্জ দিতেছে। কেহ গ্রামকে গ্রামই পত্তনি পাট্টা ইজারা দিচ্ছে। টাকার সুদ কিম্বা জমির নিরিক লইয়া কোনই গোলযোগ হইতেছে না। একটি ছেলে ৫০,০০০ হাজার টাকা ।০ আনা দস্তুর সুদেই কর্জ্জ দিয়া ফেলিল, তার একজন সাক্ষীও রহিল না। আর একজন ৫০০ বিঘা জমী ।৶০ হারেই জমা দিয়া ফেলিল। এতেও গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে নিন্দা করেন।

নিধিরাম পাততাড়ি কক্ষে করিয়া ডান হাতে দোয়াত ঝুলাইতে ঝুলাইতে পাঠশালায় দেখা দিল। গুরুমহাশয় নিধিরামের দেরি হইয়াছে বলিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। নিধিরাম উপস্থিত হইবা মাত্রই গুরুমহাশয় সমাদরে নিধিরামকে ডাকিলেন “নিধে এদিগে আয় তো।” হুকুম পেশ করিয়াই গুরুমহাশয় বেত্র আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

নিধিরামের তদ্দর্শনে ওষ্ঠ, তালুকা শুষ্ক হইতে আরক্ত হইয়াছে। কিন্তু গুরুমহাশয়ের হুকুম লঙ্ঘন করিবার যো নাই। নিধিরাম আস্তে ব্যাস্তে এজলাসের নিকটে অগ্রসর হইল।

গুরুমহাশয় দক্ষিণ হস্তে বেত্রাস্ফালন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেনরে নিধে আজি তোর দেরি হলো?”

নিধিরামের চক্ষের তারাদ্বয় মস্তকে উঠিয়াছে। যেন নিধিরামের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে। ঢোক গিলিয়া নিধিরাম উত্তর করিল “সকাল বেলা তামাক ছিল না, তাই তামাক মেখে আস্তে দেরি হয়ে গিয়েছে।”

এক কথাতেই গুরুমহাশয়ের রাগ কমিয়া গেল। কলিকাটি নিধিরামের হাতে দিয়া কহিলেন ‘আচ্ছা সাজ তোর এক কলিকা তামাক? যদি ভাল হয় তবে কিছু বল্‌বো না, মন্দ হলে তোর হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় করবো।’

নিধিরাম আশু বাঁচিয়া গেলেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া পাততাড়ি ফেলিয়া কলিকা হস্তে করিয়া তামাক সাজিতে গেল

অনেক ছেলে পিলে গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতেই তামাক খেতে শেখে। আর কেহ শিখুক না শিখুক আমরা তো শিখেছিলাম। বোধ হয়, সেই জন্যেই আজি পর্য্যন্ত জ্ঞানের অঙ্কুর লিখেই মরছি,

তা না হলে এত দিন জ্ঞানের ডাল পালা লিখিতে পারিতাম। সে যাহা হউক বাজে কথায় প্রয়োজন নাই। ফলতঃ গুরুমহাশয় মাত্রেই যদি গুড়ুক খোর না হইতেন, আর বালকদের দ্বারা তামাক না সাজাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এত দিন তামাক সস্তা হইয়া পড়িত। কারণ অতি অল্প লোকেই তাহা হইলে তামাক খাইতে শিখিত। আড়ালে আসিয়া নিধিরাম তামাক সাজিলেন এবং নিজে দুই একটান দিয়া গুরুমহাশয়ের কাছে লইয়া গেল। নিধিরাম হালি তামাকে দীক্ষিত হইয়াছেন, সুতরাং যত তামাক খান ততই ভাল লাগে। তাঁহার মুখে ভাল লাগিলে গুরুমহাশয়ের মুখেও ভাল লাগিবে, এই ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে গুরুমহাশয়কে কলিকাটি দিয়া নিজের জায়গায় বসিতে যাইতেছ।

গুরুমহাশয় দুই চারি টান টানিয়াই নিধেকে ডাকিলেন। আজি নিধের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ! নিধে মনে করিতে লাগিল "হায় আমি সকাল বেলা উঠে কাহার মুখ দেখেছিলাম, অদৃস্টে যে কি আছে বলা যায় না।' নিধিরাম যদি মানুষ না হইয়া কাক্ হইতেন, তাহা হইলে হয় তো 'শোকস্থান সহস্রশেণী' ইত্যাদি পড়িয়া উঠিতেন।

নিধিরাম মানুষ, সুতরাং সেটি হবার যো নাই। এজন্য বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হুজুরে হাজির হইলেন।

গুরুমহাশয় কহিলেন "তবে রে পাজি, তুই কি এই তামাক আমার জন্য এনেছিস।"

নিধি। "আমার দোষ কি গুরুমহাশয়! বাবা কালি হাটে থেকে যে তামাক এনেছেন্ আমি তাই এনেছি।"

গুরু। 'তোর বাবা কেমন তামাক আনে আমি দিচ্ছি।' বল্‌তে না বল্‌তে অমনি গুরুমহাশয় সপাং সপাং করে নিধিরামের পৃষ্ঠে ঘাকতক বসাইয়া দিলেন।

গুরুমহাশয় নিধিকে ঠ্যাঙ্গাইয়া বীরভাব ধারণ করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন 'দোলের পার্ব্বণি যার যার বাকী আছে দাও।'

পাঁজিতে যত পার্ব্বণ আছে গুরুমহাশয় তার প্রতি পার্ব্বণে পয়সা আদায় করেন। যদি বাপ মা না দিতে চান, গুরুমহাশয় বালকদিগকে চুরি করিয়া আনিতে শিখাইয়াদেন। ছেলেরা যদি সুবিধামতে বাহিরে পয়সা না পায়,তবে বাড়ীর কোন জিনিস পত্র চুরি করিয়া বেচিয়া গুরুমহাশয়কে পয়সা দেয়। গুরুমহাশয়কে সন্তুষ্ট করা আর দেবতা সন্তুষ্ট করা বালকদের কাছে উভয়ই তুল্য। কেবল পাঠশালায় কেন মেডিকেল কলেজের ছাত্রেরা পর্য্যন্ত রোগী জুঠাইয়া দিয়া গুরুর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে ত্রুটি করেন না।

দোলের পার্ব্বণি পয়সা যাহারা যাহারা আনিয়াছিল, গুরুমহাশয়কে দিল। গোপাল দিতে পারিল না।

গুরুমহাশয় গোপালকে ডাকিয়া কহিলেন 'গোপাল তোমার পয়সা কোথায়?'

গোপাল সকাতরে উত্তর করিল "গুরুমহাশয় আমি কালি দেব।" প্রহারের ভয়ে গোপাল বলিল কালি দেব, কিন্তু কোথায় পাইবে তাহার ঠিক নাই। গুরুমহাশয় কহিলেন তুমি আজি ৩ দিন দেব বলে দিতে পারলে না। কাল যদি না পাই তবে তোমাকে নিধের মতন করিব।'

গোপাল দাঁড়াইয়া কহিলেন "কালি আমি অবশ্যই আনিব।'

পাঠশালার ছুটি হইলে গোপাল বাটী যাইবার সময় ভুবন নামে আর একটি ছেলেকে বলিল "ভুবন আমাকে যদি একটা পয়সা ধার দাও তা হলে আমি বাঁচি, তা নৈলে কাল আর আমার পিঠে চামড়া থাক্‌বে না।

ভুবন কহিল "তোমার মায়ের কাছ থেকে এনে দাও না কেন?'

গোপাল। "মায়ের কাছে পয়সা, নেই, থাক্‌লে কি আমি তোমার কাছে ধার চাই।'

ভুবন। "তবে তোমার জলখাবার পয়সা দাও না কেন?"

গোপাল। "আমি জলখাবার পয়সা পাইনে। তা যদি পেতাম তা হলেও আমি তোমার কাছে ধরা চাইতাম না।

ভুবন। "তুমি জল খাবারের পয়সা পাওনা তবে জল খাও কি আজ বাড়ী গিয়ে কি খাবে ?"

গোপাল। "তাতো আমি বলতে পারিনে। যদি কিছু থাকে তবে মা দেবে এখন। যদি না থাকে তবে খাব না।',

ভুবন। "তুমি বাড়ী গিয়ে কিছু চাবে না।"

গোপাল। "না।"

ভুবন। "কেন।"

গোপাল। "যদি চাই, আর যদি ঘরে কিছু না থাকে, তবে মা বড় কাঁদে। মার কান্না দেখ্‌লে আমি থাক্‌তে পারিনে। আমারও বড় কান্না পায়। এই জন্যে আমি কিছু চাইনে। একদিন আমি আর বিপিন একত্তর বাড়ী গেলাম, বিপিন খাবার খেতে লাগলো, মা আমাকে কিছু দিতে পার্‌লেন না বোলে বড় কান্তে নাগলেন। সেই অবধি আমি আর একত্তর বাড়ী যাইনে। যখন বুঝি বিপিন বাড়ী গিয়া খাবার টাবার খেয়ে খেলা করছে, আমি তখনি বাড়ী গিয়াই বিপিনের সঙ্গে খেলা করি। যদি কিছু খাবার থাকে মা ডেকে দেয়। যদি না থাকে তা হলে আর কিছু খেতে পাইনে।" গোপালের এই কথা বলিতে বলিতে চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল।

গোপালের অশ্রুপাত দর্শন করিয়া ভুবনের সরল চিত্ত দ্রব হইয়া গেল। ভুবন জিজ্ঞাসা করিল "বিপিন যা খেতে পায়, তার কিছু তোমাকে দেয় না?"

গোপাল কহিল "বিপিনের দেবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু জেঠাইমা দিতে দেন না। বিপিনকে খাবার দিয়ে তিনি নিজে সমুখে বোসে থাকেন, পাছে বিপিন আমাকে দেয়।"

ভুবন। "চল তুমি আজ আমাদের বাড়ী চল, আমার যে খাবার আছে দুজনে ভাগ করে খাব এখন; আর তোমাকে মার

কাছে থেকে একটা পয়সা চেয়ে দেব এখন।”

গোপাল। “তোমার মার কাছে চাইলে দেবে না, তুমি যদি দেবে তো চল যাই।”

ভুবন। “আচ্ছা চল আমিই দেব এখন।”

উভয়ে অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে বাটী গেল। গোপালের বয়স হদ্দ ৮। ৯ বৎসর, ভুবনের বয়স যদি বড় অধিক হয় ত ১০ বৎসর। ভুবন ও গোপাল বাটী গেলে গোপাল বাহিরে বসিল। ভুবন মায়ের কাছে গিয়া পোপালের কাছে যাহা শুনিয়াছিলেন আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তিনি শুনিয়া গোপালকে ডাকিয়া আনিতে কহিলেন। ভুবন মাতার আজ্ঞা পাইবামাত্র দৌড়িয়া দ্বারে আসিয়া গোপালকে লইয়া গেলেন।

ভুবনের মাতা গোপালের ম্লান মুখ ও ছল ছল নেত্র দেখিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। দুটি হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “গোপাল তোমরা দুজনে একত্তর হয়ে পাঠশালা থেকে এলে, তা তুমি বাইরে বোসে ছিলে কেন?”

গোপাল উত্তর করিল না।

তখন ভুবনের মাতা উভয়কে খাবার দিলেন। এবং দুটি ছোট ছোট গেলাসে জল দিলেন। গোপাল ও ভুবন খাবার খাইয়া জল খাইতেছে। গোপাল এক গেলাস জল খাইয়া শূন্য গেলাসটী হাতে ধরিয়া কহিল “আমাকে আর একটু জল দিন্।’

ভুবনের মাতা হাসিতে হাসিতে কহিলেন “কার কাছে জল চাচ্ছ।”

গোপাল একটু লজ্জিত হইয়া হেটমুখে কহিল “আপনার কাছে।” ভুবনের মাতা কহিলেন ‘আমি কে তা না বল্লে জল দেব না।’ গোপাল আরো লজ্জিত হইল এবং আরক্তিম মুখ হেট করিয়া রহিল। ভুবনের মা পূর্ব্বের মতন অল্প হাসিতে হাসিতে কহিলেন “আমাকে যদি বল, মা একটু জল দাও, তা হলে দেব, তা নৈলে দেব না।’

গোপাল গাঢ়স্বরে কহিল “মা একটু জল দাও।’

ভুবনের মা গোপালকে অবিলম্বে কোলে লইলেন এবং শিরঃচুম্বন করিয়া আর এক গেলাস জল দিলেন।

গোপাল ক্ষণকাল চক্ষের জলে কিছুই দেখিতে পাইল না। ভুবনের মায়ের স্কন্ধে নিজ মস্তক রাখিয়া চক্ষু বুঁজিয়া রহিল। ভুবনের মার চক্ষু হইতে ঝর ঝর জল গোপালের বাহুমুলে পড়িতে লাগিল।

গদাধর তোমারও মা আছে! প্রমদা তোমারও সন্তান আছে।

অনেকক্ষণ কোলে রাখিয়া ভুবনের মাতা গোপালকে নামাইয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ গোপালের হাত ধরিয়া কহিলেন, ‘গোপাল আগে বল যে তুমি পাঠশালা থেকে বাটী যাইবার সময় রোজ এখানে আস্‌বে, তা নৈলে তোমাকে ছেড়ে দেব না।’

গোপাল কহিল “আমি রোজি আস্‌বো।”

ভুবনের মাতা তখন গোপালের দুহাতে দুটি টাকা দিয়া কহিলেন “যাও

এখন দুজনে গিয়া খেলা কর। বাড়ী যাবার সময় আমাকে না বোলে যেও না।”

গোপাল কহিল। “আমি টাকা চাইনে মা, আমাকে একটা পয়সা দাও তা হলেই হবে?”

ভুবনের মাতা দুইহস্ত দ্বারা গোপালের দুই গণ্ডদেশ ধরিয়া কহিলেন “আমি টাকা চাইনে মা, কিন্তু মা জোর কোরে দেবে তুমি মায়ের সঙ্গে জোরে পার্‌বে?”

গোপাল টাকা দুটি লইয়া গিয়া বাহিরে ভুবনের সঙ্গে খেলা করিতে লাগিল। বাটী যাইবার সময় ভুবনকে বলিল “ভুবন আমি দুটাকা নিয়া কি কর্‌বো। তুমি একটা নেও আমি একটা নি।”

ভুবন বলিল “না আমি নিলে মা বকবে। তুমি রেখে দাও, গুরুমহাশয় যখন চাঁদা চাবে, এর থেকে অল্প অল্প কোরে দিও।”

গোপাল বলিল। “না ভাই! একটা হলেই চাঁদার পয়সা হবে, তুমি এটা নেও, তোমার মা টের পাবে না।”

ভুবন টাকাটি লইয়া কহিল ‘তবে ভাই তুমি যেন কখন মাকে বলো না।’ গোপাল সম্মত হইয়া ভুবনের মায়ের নিকট বাটী যাইবার কথা বলিতে গেল। ভুবনের মাতা কহিলেন “কেমন কালি আসবেতো?”

গোপাল। “আসবো।”

ভুবনের মাতা বাটীর একজন চাকর সঙ্গে দিয়া গোপালকে বাটী পাঠাইয়া দিলেন।

গোপাল অন্য দিন যে সময় বাটী আসে, আজি সে সময় অতিক্রম হইয়া গেল দেখিয়া সরলা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। শ্যামাকে কহিলেন “শ্যামা বিপিনকে জিজ্ঞাসা কর দেখি গোপাল কোথায়?”

বিপিন মায়ের কাছে বসিয়া খাবার খাইতেছে, শ্যামা গিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘বিপিন গোপাল কোথায়, আজ এখনো আস্‌চে না কেন জান?’

বিপিন। আমরা একত্র হই——

প্রমদা বিপিনকে কহিলেন ‘চুপ কর্‌; তুই এখন যা করছিস্‌ তাই কর। তোর পাড়ার লোক কে কোথায় সে খবরে কাজ কি?’

বিপিন চুপ করিল।

শ্যামা কহিল “কথা কহিলে কি ছেলে ক্ষয় হয়ে যাবে না কি? পরমেশ্বর যেন সাত জন্ম তোমারে বোবা করিয়া রাখেন।”

প্রমদা “কি বল্লি তোর দাসী হয়ে এমন কথা।”

শ্যামা কহিল “চুপ কর ঠাকরুন্‌, আমি এখন তোমার সাতে ঝকড়া করিতে আসি নাই। এখন তুমি বাপান্ত করিলেও আমি রাগ করিব না।” এই বলিয়া শ্যামা গোপালের খোঁজে বাহির হইয়া গেল।

শ্যামা প্রথমতঃ পাঠশালায় গেল। সেখানে কোন অনুসন্ধান পাইল না। পরে রামচন্দ্র ঘোষের বাটীর মধ্যে গেল, সেখানেও কেহ কিছু খবর বলিতে পারিল না। শ্যামা অত্যন্ত ব্যস্ত হইল এবং প্রতি বালকের বাটী যাইতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বস্থানেই এক কথা

"গোপাল আমাদের বাড়ী আসে নাই, কোথায় গিয়াছে জানি না।" শ্যামা অঞ্চলের দ্বারা চক্ষু মুছিয়া ক্রমাগত এবাড়ী ওবাড়ী করিতে লাগিল। কোন স্থানে অনুসন্ধান না পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া বাটী আসিতেছে। বাটীর নিকটে রাস্তায় এক মোড় আছে। সেই মোড় ঘুরিয়াই দেখে যে, গোপাল আগে আগে যাইতেছে। শ্যামা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া গোপালকে ধরিয়া কোলে লইল। গোপাল প্রথমতঃ চমকিয়া উঠিল, পরে শ্যামাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দিদি কাঁন্দিস্ কেন?"

শ্যামা উত্তর করিল 'দিদি কাঁন্দিস্ কেন, তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

গোপাল কহিল 'আমি ভুবনদের বাড়ী ছিলাম।' এই কথা বলিতে বলিতে শ্যামা গোপালকে লইয়া বাটীর দ্বারে আসিল। সরলা শ্যামাকে পাঠাইয়া দিয়া দ্বারেই দাঁড়াইয়াছিলেন। সেখান হইতে এক পাও নড়েন নাই। গোপালকে পাইয়া শ্যামার ক্রোড় হইতে নিজ ক্রোড়ে লইলেন।

সরলা বাটীর মধ্যে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আজি কোথায় ছিলে বাবা? এত দেরি হলো কেন?'

গোপাল সমুদায় পরিচয় দিল।

সরলার চক্ষে জল পড়িতেছে অথচ হাসিতে হাসিতে কহিলেন 'গোপাল তবে আজ অবধি তোমার দুই মা হলো।'

শ্যামা তদবধি ভুবনের মাতার ক্রীতদাসী হইল।

বিংশ অধ্যায়

ঃ০।০ঃ

নীলকমল যাত্রার দলে।

নীলকমল কালীঘাটে বাবুর বাড়ী 'খায় দায়' থাকে, কাজ কর্ম্ম করে। বাবু একটি ভাল বেহালা খরিদ করিয়া দিয়াছেন। সকলে কুঠী কাছারি চলিয়া গেলে সেইটি বাজায়। নীলকমলের বিশ্বাস ছিল যে, তাহার সাবেক বেহালাটির মতন আর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু তাহার সে ভ্রম দূর হইয়াছে! বাবু নিজে নীলকমলকে সঙ্গে করিয়া নিয়া এক দোকানে ছাড়িয়া দিলেন। নীলকমল পূর্ব্বে পাড়া গাঁয়ে বেহালা কিনিত। সেখানে হদ্দ ৩। ৪টা একে বারে এক দোকানে থাকিত, কিন্তু নীলকমল এক্ষণে যে দোকানে উপস্থিত হইল, সেখানে বিস্তর বেহালা ঝুলান রহিয়াছে। নীলকমল 'বাঁশ বনে যেমন ডোম কানা হয়' বেহালা দেখিয়া সেইরূপ হইল। কোন্‌টি ভাল স্থির করিতে পারে না। বিস্তর দেখে শুনে সকলের মন্দটি পছন্দ করিল। এবং সেইটি লইয়াই পরমাহ্লাদে বাবুর সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। রাস্তায় দু এক বার 'পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে' ঘুন ঘুন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু বাবু বারণ করায় আর বাড়া বাড়ী করে নাই।

নীলকমলকে বাবুর বাটী দেখিয়া যদি কেহ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিত 'এটি কে' বাবুর উত্তর করিবার অগ্রে

নীলকমল কহিত 'আমি একজন কালওয়াৎ' বাবুকে গান বাজনা শোনাই, আর বাবুর বাটীতে বাসা করিয়া থাকি। বস্তুত নীলকমলের দ্বারা বাবুর একটি চাকরের কাজ চলিত। এজন্য বাবু নীলকমলের কথায় একটু হাসিয়া ক্ষান্ত হইতেন, আর কিছু বলিতেন না।

রাস্তা দিয়া ফিরিওয়ালারা যখনি জিনিস পত্র হাঁকিয়া যাইত, নীলকমল তখনি তাহাদিগকে ডাকিত। নিকটে আসিলে নীলকমল জিজ্ঞাসা করিত, 'আজ কোন জায়গায় কারুর যাত্রা হবে বল্‌তি পার?' যে ফিরিওয়ালা একবার নীলকমলের ডাকে আসিয়াছে, সে আর দ্বিতীয়বার আসিত না। নীলকমলও আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিত না। তার এই বিশ্বাস ছিল, ফিরিওয়ালারা সকল বাটীতে যায়, সুতরাং সব জায়গার খবর জানে।

ক্রমে এক মাস, দুমাস যায়, নীলকমল আর যাত্রার খবর পায় না। নীলকমলের রাত্রে ঘুম হয় না। দিনে দুদণ্ড স্থির হইয়া এক স্থানে বসে না। কিন্তু রাস্তায় গিয়া অনুসন্ধান করিতে ভরসাও হয় না। কালীঘাটের রাস্তা যে বাঘমারার রাস্তা নয়, নীলকমল তাহা বিলক্ষণরূপে অবগত হইয়াছে। ঘরের বাহিরে গেলেই হারাইয়া যাইবে, এই চিন্তা নিয়তই নীলকমলের অন্তঃকরণে জাগরুক। অথচ কোথায় যাত্রা হইবে, কেমন করিয়া সেখানে যাইবে, তার উপায়ও না করিলে নয়।

নীলকমল এক দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তামাক খাইতেছে, এবং কোথায় যাত্রা হইবে এই চিন্তা করিতেছে, এমন সময় বাবু বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, 'নীলকমল, নীলকমল।'

নীলকমল অনন্যমনা হইয়া ভাবনা করিতেছিল, সুতরাং বাবুর ডাক তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। বাবু নিকটে আসিয়া ডাকিলেন। নীলকমল ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চাহিতে বাবুকে দেখিতে পাইল। বাবুর পোসাকি ধুতি চাদর ও ছড়ী হাতে দেখিয়া নীলকমল জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথায় যাবেন? আমারে ডাক্‌ছেন নাকি?'

বাবু কহিলেন 'হঁা। চল যাত্রা শুনে আসি। তুমি নাকি যাত্রা শুনিবার জন্যে বড় ব্যস্ত হইয়াছে?'

নীলকমল উত্তর করিল 'আজ্ঞা হাঁ। আমারে যদি নিয়ে যান, তবে বড় ভালই হয়।'

বাবু কহিলেন 'সেই জন্যেই তো তোমারে ডাক্‌ছি। শীঘ্র চল, আবার বাড়ী ফিরে এসে কাছারি যাইতে হইবেক।'

নীলকমলের আর দেরি নাই। অবিলম্বে হুঁকাটি রাখিয়া স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর বাহির হইল। বাবু কালীঘাটের কালীবাড়ীর রাস্তা ধরিলেন। নীলকমল তদ্দর্শনে অমনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'যাত্রা হচ্ছে কোথায়?'

'কালী বাড়ীর কাছে।'

নীলকমল। 'কালীবাড়ীর বড় কাছে?'

বাবু। 'হাঁ।'

নীলকমল বাবুর উত্তর শুনিয়া কহিল, 'তবে আপনি যান—আমার যাওয়া হবে না।'

বাবু জিজ্ঞাসিলেন "কেন—কেন যাওয়া হবে না ?'

নীল। 'যার পাথরের চক থাকে, সে যেন কালীবাড়ী দুবার যায়। আমার মাংসের চক, আমি আর সেখানে যাইনে।'

বাবু। 'কেন বল দেখি ? ?

নীলকমল কহিল, 'মহাশয় আমি যখন প্রথম দিন এলাম, তখন এক হাটের লোক ধর্ ধর্ কোরে পিছু পিছু এসে এক থানার কাছে আমাকে পেড়ে ফেল্লে। কেবল সিন্দুর দেবার জন্যে। আমি আর সেখানে যাইনে। আমার চকটি যাবার জো হয়েছিল। আর খানিক থাকলেই যেতো।'

বাবু হাসিয়া কহিলেন "আমার সঙ্গে এস, তোমার ভয় নাই।'

নীল। "অমন দাদাঠাকুরও বোলেছিল, কিন্তু বিপদের সময় তো থ্যাকাতে পার্লেনা। তখন যে রামা মাঝীর মতন হাল ছেড়ে বসেরলো। হতো যদি আমার দেশ, তা হলে এক তাঁতের পেটের বাড়ীতে মাথা ভেঙ্গে দিতাম।"

বাবু। "তোমার দাদাঠাকুরও তো তোমার মতন সহুরে লোক, তা তোমাকে বাঁচাবে কি ? তুমি আমার সঙ্গে এস কোন ভয় নাই।"

নীল। "দাদাঠাকুর সহুরে লোক মন্দ কি। সে কেষ্টনগরে থাকতেই কত গাড়ি দেখেছিল।"

বাবু। 'গাড়ি দেখলেই সহুরে হোলো ? এখন তুমি যেতে হয় তো চল। না যাও বল আমি যাই ?'

নীলকমলের যাবার খুব ইচ্ছা, অথচ কালীবাড়ীর কাছে, ভয়ে সহজে স্বীকার হয় না। ক্ষণকাল এক স্থলে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিয়া কহিল " কোন ভয় নেই তো, এই বেলা ঠিক কোরে বল।"

বাবু উত্তর করিলেন " আর কতবার বলিব।"

নীলকমল বাবুর কথায় ভর করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। যাত্রার স্থলে গিয়া নীলকমল একবার ঝাড় লাণ্টনের নিকট দিগে চায়, একবার যাত্রারদিগে চায়, মাঝে মাঝে উপস্থিত লোকজনের দিগে চায়। তার কাছে সকলি নূতন। এমন সময়ে একজন লোক বাতি নিবাইয়া দিবার জন্য মস্ত একটা লোহার শীক আগায় কলার পাতা দেওয়া ও কলের একটা মই আনিয়া আসরে উপস্থিত করিল। নীলকমল বাতি নিবাইবার জন্যে তাদৃশ ষড়যন্ত্র কখন দেখে নাই। সে মনে করিল একটা সং আসিল, বাবু পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, নীলকমল তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'বাবু বাবু এ টা কি সং ? এটা তো গানও গায় না, কিছুই করে না। আমি তো এমন সং কখন দেখি নাই। অনেক যাত্রাই শুনেছি কিন্তু——' নীলকমল আরও বলিত, কিন্তু তাহার কথা শেষ না হইতে হইতেই একজন লাঠি হাতে, নীলকমলকে " চুপ কর চুপ কর ' বলিয়া ওঠাতে, চুপ করিয়া রহিল।

যে লোকটি বাতি নিবাইতে আসিয়াছিল,সে যখন মৈ খানির প্রকাশ্য দুই ঠ্যাং হইতে টানিয়া আর দুই খানি বাহির করিল "নীলকমল মনে করিল এটা কিছু বাজী দেখাবে।" প্রকাশে বাবুর কাণে কাণে কহিল 'ও কিছু বাজী দেখাবে না বাবু?'

বাবু উত্তর করিলেন "দেখতো কি দেখায়।"

পরে লোকটি যখন একপা দুপা করিয়া উঠিয়া বাতি নিবাইতে লাগিল, নীলকমল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল "রাম বলো বাঁচলাম। এরি জন্যে এত বুজরুগী। এ বাতি নিবান কলের জন্য কামরূপ কামিক্ষেয় গিয়েছিল না কি?"

নীলকমল যা দেখে তাহারি সম্বন্ধে এই রূপ টিপ্পনি করিতে লাগিল। বাবু ক্ষণকাল শুনিয়া বিরক্ত হইয়া গেলেন। বেলাও বেশি হইতে লাগিল, কাছারি যাইতে হইবেক, এজন্য বাবু নীলকমলকে কহিলেন "চল তবে এখন যাই।"

নীলকমল কহিল "আমি যে খানে একবার আসিয়াছি, যাত্রা শেষ না হইলে আর যাইব না।"

বাবু নীলকমলের কথা শুনিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন নীলকমল পথ চিন্তে পারবে তো?"

নীলকমল উত্তর করিল "না চিনি এত লোক আছে জিজ্ঞাসা করিলেও বলে দেবে না?"

"কি জিজ্ঞাসা কোরবে বল দেখি?"

"কেন, বাবুর বাড়ীর কথা।"

"কোন্ বাবু?"

'যে বাবু কাছারি কর্ম্ম করে।'

বাবু হাসিয়া কহিলেন 'তা হলেই তুমি আমার বাড়ী পোঁহুছাবে আর কি!'

নীলকমল কহিল "কেন হাসলে যে? আর কি কেউ কাছারি কর্ম্ম করে নাকি! এখানে কটা কাছারি। আমাদের গাঁয় তো একটা বৈ নেই।'

বাবু কহিলেন 'তার হিসাব তো এখন দিতে পারিনে। মোদ্দা যদি আমার বাড়ী যেতে চাও, তবে রমেশ বাবুর বাড়ী কোথায়, বলে জিজ্ঞাসা কোরো।?'

নীলকমল রমেশ বাবু রমেশ বাবু মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিল। রমেশ বাবুর নাম মুখস্থ করিয়া নীলকমলের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে কার যাত্রা হইতেছে এটি নিশ্চয় করা। নিকটস্থ একজন লোককে দুবার জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু উত্তর না পাইয়া তার গা টিপিল। জোরে ডাকিতে ভরসা হয়না। পাছে আবার লাটি হাতেওয়ালা—"চুপকর চুপকর বলে।' নীলকমল যে টিপ্‌টি দিয়াছিল, সেটি বড় সহজ টিপ্ নয়। টিপ খাইয়া সে লোকটি "উঃ কে রে "বলিয়া নীলকমলের মুখের দিকে চাহিল।

নীলকমল তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাহার যাত্রা হচ্ছে? কাহার যাত্রা হচ্ছে।" তা কি লোকের গা না টীপে জিজ্ঞাসা করা যায় না?

নীলকমল কহিল 'এত চটো কেন ভাই!

যদি তোমার ব্যথা লেগে থাকে, তুমি আমাকে নয় একটা টীপ দেও।'

"গোল মৎ কর, গোল মৎ কর" পুনরায় লাটীওয়ালা দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলকমলের আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। এমন সময়ে দুজন লোক গান শুনিয়া উঠিয়া যাইতেছে। নীলকমলের নিকটবর্ত্তী হইয়া একজন অপর জনকে কহিল "আর গোবিন্দ অধিকারীর সেকাল নাই।" নীলকমল যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। তখন ভাবিতে লাগিল "গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গে তো আমার আলাপ আছে। একবার চোকোচোকি হইলে হয়। তা হলেই আমাকে ডাক্‌বে, আর আমি আসরে গিয়া বসিব। এ ব্যাটার গায়ে হাত দিয়ে ডেকেছি বলে চটে গেল, আসরে গিয়া বস্‌লে ব্যাটা টের পাবে আমি একজন যে সে নই।" এই রূপ চিন্তা করিয়া নীলকলম একবার ডান্‌ দিকে বেঁকে চেয়ে থাকে, একবার বাঁদিকে বেঁকে চেয়ে থাকে, কিন্তু চকোচোকি আর হয় না। অগ্রে যাইবারও আর জো নাই। নীলকমল এক স্থানে দাঁড়াইয়া ক্ষণেক এদিক্ ক্ষণেক ওদিক্ বেঁকিতেছে, এমন সময় যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে বাহিরে যাইতে লাগিল, গোল অনেক চুকিয়া গেল, নীলকমলের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, নীলকমল আসরে গিয়া বসিল।

-000-

একবিংশ অধ্যায়।

--:০।০:-

আশা মরিচিকা।

বিধুভূষণ কিয়ৎকাল কালীঘাটে থাকিয়া তিনিও যাত্রার দলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেখানে যান সেই খানেই শুনেন, হয় তো তাহাদের বাদ্যকরের দরকার নাই, অথবা অত ভাল বাজনার বেতন দিবার ক্ষমতা নাই। কালীঘাটে যদিও আহারের বেশি ভাবনা নাই।' কিন্তু বিধুভূষণের বস্ত্রাদি এরূপ মলিন হইয়া গেল যে, তাঁহার আর কোন স্থানে যাইবার জো রহিল না। তাঁহার পাণ্ডাবন্ধু তাঁহাকে তাহার নিজের ব্যবসায় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিল। কিন্তু বিধুভূষণ নূতন লোক, সকল স্থান ভাল করিয়া চিনেন না। অধিকন্তু কালীঘাটে থাকিয়া মিথ্যা কথা বলা ও প্রবঞ্চনা করা অপেক্ষা অধিক পাপ আর নাই, এই সমস্ত ভাবিয়া পণ্ডার উপদেশ গ্রহণ করিলেন না।

একদিবস একাকী বসিয়া বিধুভূষণ নিজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতেছেন। পূর্ব্বেই বা কি ছিলাম, এখনই বা কি হইয়াছি। শরীরে সামর্থ্য মাত্র নাই। যেখানে বসিয়া থাকি সেই খানেই থাকিতে ইচ্ছা করে মনে উৎসাহ মাত্র নাই। বস্ত্রাদি দেখিলে আর ব্রাহ্মণ কেহই বলিবেন না, বাড়ীর খবর পাইলাম না, পত্র লিখি তাহারও জবাব পাই না। পথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা হলো সেইবা কোথায়? আমর অদৃষ্টই বুঝি

এমনি। যার সঙ্গে আমার সংস্পর্শ হলো, তার আর সুখ হলো না। আহা সরলার যদি অন্য কাহারো সহিত বিবাহ হইত, তাহা হইলে আর কোন সুখ হউক না হউক, অনাহারে থাকিতে হইত না।” সরলার কথা মনে হইয়া বিধুভূষণের চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শশিভূষণ ও প্রমদার কথা মনে হইয়া তাঁহার চেহারার আর এক প্রকার ভাবান্তর হইল। চক্ষু লাল হইল। মুখভঙ্গি ভীষণাকার হইল, এবং দক্ষিণহস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল। পুনরায় গদাধর চন্দ্র ও তদীয় জননীর কথা মনে হইয়া মুখে ঈষৎ হাস্য উপস্থিত হইল।

মুখমণ্ডল হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ। অন্তঃকরণে যখন যে ভাবের উদয় হয়, মুখে অবিলম্বে তাহা প্রতিভাত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণে দুঃখ উপস্থিত হইলে মুখ ম্লান হয়, সুখ উপস্থিত হইলে, মুখ প্রফুল্ল হয়। অন্তঃকরণে রাগের কারণ সঞ্চার হইলে চক্ষু আরক্তবর্ণ হয়, ওষ্ঠাধর কাঁপিতে থাকে ও দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত হয়। এইরূপে চিত্ত যখন যে রসে অভিষিক্ত থাকে, মুখমণ্ডলে তখনি তাহার প্রতিবিম্ব পতিত হয়। ফলতঃ মনুষ্যের মুখ জীবদ্দশায় নিয়তই বিকৃত ভাবে থাকে। স্বাভাবিক কাহার কেমন মুখ, তাহা মৃত্যুর পরে ব্যতীত জানা যায় না।

অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই বিধুভূষণের মুখে দুঃখ, রাগ ও কৌতুকের চিহ্ন দর্শন করিয়া তাঁহার পাণ্ডা বন্ধু কহিল “কিহে পাগল হবার উদ্যোগ করিতেছ না কি?”

বিধুভূষণ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, সুতরাং পাণ্ডা বন্ধু নিকটে আসিয়াছে, তাহা টের পান নাই। এজন্য তাহার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন “হুঁ। কি বল্‌ছো?”

পাণ্ডা। “এমন কিছু না পাঁচালি শুনে! আমাদের দেশের একদল পাঁচালি ওয়ালা এসেছে। চল আজি পাঁচালি হবে শুনে আসি।”

বিধুভূষণ সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত। বলিবামাত্রই তাহার সঙ্গে চলিলেন। কিয়ৎ দূর গমন করিয়া পাণ্ডা কহিল “তুমি যে বলিছেলে কোন যাত্রার দলে চাকরি করবে। এই তো উপস্থিত আছে, কর না কেন?”

বিধুভূষণ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন “কৈ, কৈ?”

পাণ্ডা কহিল “যেখানে আমরা পাঁচালি শুন্‌তে যাচ্চি সেই খানেই আছে। আমার সঙ্গে দলের অধিকারীর দেখা হয়েছিল। তার বাড়ী আমাদের গ্রামে, তাদের যে একজন আছে, সে তো একে ভাল বাজাইতে পারে না, আবার তার উপর মদ খায়। নূতন দল। এ সময় একজন ভাল লোক না রাখ্‌লে নাম হবে না। এই জন্য আমাকে বেলেছিল যদি তোমার কোন আলাপী লোক থাকে, সঙ্গে করে নিয়ে এস। কিন্তু এক বন্দবস্ত কর্‌তে হবে। তারা এখন মাইনে দিতে পারবে না। যা পায় তার বখরা দিতে প্রস্তুত আছে।”

বিধুভূষণের মন—“ এখন হলেই হয়, বখরাই দিক্ আর মাইনেই দিক্।” এই কথা সাঙ্গ না হইতে হইতে তাহারা পাঁচালির দলে গিয়া উপস্থিত হইল। আর দুইঘণ্টা বাদ পাঁচালি আরম্ভ হইবেক। পাণ্ডা দলের কর্ত্তাকে কহিল “ এই তো তোমার লোক এনেছি।”

বিধুভূষণের বেশভূষা দেখিয়া দলের কর্ত্তার কিছু অভক্তি হইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বিধুকে কহিল “ আপনি একবার বাজান দেখি ?” এই বলিয়া এক জোড়া তবলা তাঁহার কাছে দিল। বিধু-ভূষণ বাজাইলেন। পাঁচালিওয়ালা বড় ধূর্ত্ত। মনে মনে পছন্দ হইয়াছে, কিন্তু প্রকাশে বলিলে পাছে বেশি দর হইয়া যায়, এজন্য মুখ বাঁকাইয়া কহিল “ হঁা চল্‌তে পারে।” পরে পাণ্ডারদিকে মুখ ফিরাইয়া বন্দবস্তের কথা বলিয়াছ।

পাণ্ডা কহিল “ হঁা।”

“ তাতেই স্বীকার ?”

পাণ্ডা। “ তাতেই ”

অধিকারী। “ তবে কবে থেকে মিস্‌বেন ?”

বিধুভূষণ কহিলেন। “ যবে থেকে বলেন।”

অধিকারী। “ তবে আজি।”

বিধুভূষণ। “আচ্ছা তাই।”

বিধুভূষণের পাঁচালির দলে যাওয়া পর্য্যন্ত যেন দলের অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। অল্পদিবসের মধ্যেই দলের নাম প্রকাশ হইয়া পড়িল, এবং দেশ বিদেশ হইতে বায়নাপত্র আসিতে লাগিল। “ টাকা হইলে লোকের চেহারা ফেরে” সকলেই বলিয়া থাকে, বস্তুতঃ সে কথাও যথার্থ। বিধুর এক্ষণে বিলক্ষণ আয় হইল। তাঁহার মলিন বসন দূর হইল, শরীরে স্ফূর্ত্তি হইল, মুখভঙ্গী ভাল হইয়া আসিল, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় চিন্তাশূন্য আর হইল না। পৃথিবীতে অতি অল্প লোকই ক্রমে ক্রমে প্রাচীন হয়। অধিকাংশও হঠাৎ বিজ্ঞ হইয়া বসে। এমন সর্ব্বদাই দেখা গিয়া থাকে। আজি দিব্য যুবা পুরুষ, অনবরত আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, কোন ভাবনা চিন্তা নাই, দুঃখ ক্লেশ কাহাকে বলে জানেন না। দেখিলে বোধ হয়,যেন চিরকালই তাঁর এই ভাবেই কাটিয়া যাইবে। এমন সময়ে তাঁহার পিতা, কিম্বা মাতা, কিম্বা জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাল হইল। আর সে প্রফুল্ল মুখে হাসি নাই, সে ক্রীড়া কৌতুকে আশক্তি নাই। একেবারে সমুদায়ই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক রাত্রিতে বৃদ্ধ হইয়াছেন। বিধুভূষণ সেই পৃথক্ হইবার দিন অবধিই বিজ্ঞ হইয়াছেন।

টাকা হাতে পাইবামাত্রই বিধু-ভূষণ সরলাকে পত্র লিখিলেন এবং কিঞ্চিৎ খরচ পাঠাইয়া দিলেন। লেখা পড়ায় তাদৃশ পারদর্শিতা না থাকা-প্রযুক্ত এক খানা পত্র লিখিতে কত কাগজই নষ্ট করিলেন। একবার অক্ষর মনোমত হইল না, সেখানা ফেলিয়া দিলেন। আর একবার কথা ভাল লাগিল না, সেখানও ফেলিয়া দিলেন। একবার খানিক কালি পড়িয়া গেল, সেখানিও নষ্ট হইল। শেষের খানি ভাল হইয়াছে, প্রফুল্ল-চিত্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন।

সরলা পাইয়া কত আহ্লাদিত হইবে! সেই আহ্লাদে বিধুর আর আহ্লাদের সীমা নাই। চক্ষু হইতে দুটি মুক্তাফল বর্ষণ হইল। বিধুভূষণ আহ্লাদে অশ্রুপাত না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না।

চিঠিখানি ডাকঘরে রেজেষ্টরি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

ঐ ডাকঘরে চিঠির জবাব আসিবে। বিধুষভূণের নিকট ডাকঘর তীর্থস্থান হইয়া উঠিল। রোজি এক এক বার যান। "কিন্তু সরলা তো লিখিতে জানেন না।" বিধুর ভাবনা হইল "কে চিঠি লিখিয়া দিবে? গোপাল এতদিন চিঠি লিখিতে শিখিয়াছে, গোপাল লিখিবে।"

প্রত্যহই ভাবিয়া যান, আজি চিঠি আসিবে, কিন্তু আইসে না।

আশা! ধন্য তোমার ছলনা, ধন্য তোমার কুহকিনী শক্তি! তুমি কি না করিতে পার? তোমার ন্যায় আর কে প্রবোধ দিতে পারে? তুমি মুমূর্ষুকে বলবান্ করিতে পার, অন্ধকে দর্শন করাইতে পার, পঙ্গুদ্বারা গিরি লঙ্ঘন করাইতে পার, তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পার! কিন্তু তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনীও আর কেহ নাই। তোমার রূপ দেখিয়াই লোকে ভুলিয়া যায়। তোমার চরিত্র কেহ অনুসন্ধান করে না। যাহাকে তুমি বারম্বার প্রবঞ্চনা করিয়াছ সেও তোমার মায়া জাল হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

বিধুভূষণও ডাকঘরে যাইতে ক্ষান্ত হন না, কিন্তু চিঠিও আইসে না। প্রত্যহই আশা করিয়া যান, প্রত্যহ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসেন। এক দিবস পোষ্টমাষ্টার কহিলেন "আপনার চিঠি পেঁহুছিয়াছে, রসিদ আসিয়াছে।"

বিধুভূষণ আগ্রহ সহকারে কহিলেন "কৈ? কৈ? দেখি।"

পোষ্টমাষ্টার পুস্তক খুলিয়া দেখাইয়া দিলেন। লেখা রহিয়াছে "গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

বিধু হর্ষোৎফুল্লনেত্রে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে নামটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে পোষ্টমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এ কাগজ খানা আমাকে দিতে পারেন?"

পোষ্টমাষ্টার কহিলেন "এখানা আমার রসিদ। এখানা হস্তান্তর করিবার হুকুম নাই।"

বিধুভূষণ সতৃষ্ণনয়নে আরও ক্ষণকাল নামটী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া আর্দ্র চক্ষু বস্ত্রদ্বারা মার্জনা করিয়া ডাঘকর হইতে চলিয়া আসিলেন।

বিধুভূষণের মন আজি ইতিপূর্ব্বের দিন কতক অপেক্ষা অনেক ভাল।

---000-

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

——:০।০:——

নীলকমল ও বিধুভূষণের পুনর্ম্মিলন।

হুগলি জেলার অন্তর্গত রামনগরে বারইয়ারি পূজায় যাত্রা, পাঁচালি, কবি ইত্যাদি বায়না করা হইয়াছে। বৈকাল হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত পাঁচালি হইয়া গেল।

সকলেই পাঁচালি শুনিয়া প্রশংসা করিলেন। কিন্তু তাহার গানে যত মোহিত না হইলেন, বাজনা শুনিয়া তদপেক্ষা অধিক প্রীতিলাভ করিলেন।

এদলে বিধুভূষণ বাদ্যকর।

শেষরাত্রে যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই যাত্রা শুনিতে বসিয়াছে। বিধুভূষণের দলের সকলে প্রাতঃকালে গান শুনিতে গেল। বিধুভূষণও সেই সঙ্গে গেলেন। নব কুশের পালা হইতেছে। বিধুভূষণও গেলেন আর সংএর বাজনা বাজিয়া উঠিল এবং যাত্রা দল হইতে একটি কচি, কৃষকায় ছিটের ইজের চাপকান পরা রাম উঠিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল 'বাছা হনুমান—বাছা হনুমান।' দুই চারিবার ডাকিয়া চুপ করিল। পুনরায় 'বাছা হনুমান—বাছা হনুমান।' রামটি এমনি কৃষ ও দুর্ব্বল যে, এক একবার বাছা হনুমান বলিয়া ডাকিতেতাহার আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে, গলায় শির উঠিতেছে এবং মুখ কালীর বর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু তথাপি হনুমানের দয়া হয় না। হনুমান এসেও আসেনা। রামের এদিকে চক্ষু ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এরা মরে আসরে প'ড়ে ঘ্যাং ঘোঁৎ করে ঘুম দিচ্ছেন। রাম বেচারার হিংসা হচ্ছে। মরিতে পারিলেই একটু ঘুমাইয়া বাঁচে। কিন্তু হনুমা না এলে তো যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে না। হনুমানও আইসে না। দঃ হইতে এক জন তানপুরা ফেলে দৌড়িয়া হনুমানকে আনিতে গেল।

কপাঠকবর্গ চলুন দেখি সাজ ঘরে হনুমান কি করিতেছে।

নীলকমল গোবিন্দ অধিকারীর দলে গিয়াছিল পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু নীলকমলের বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া গোবিন্দ অধিকারী তাহাকে নিজে না রাখিয়া আর এক রাম যাত্রার দলে শুপারিস করিয়া দিয়াছিল। নীলকমল ৪ টাকা মাইনে পায়, আর তামাক টামাক সাজে, মন্দিরে বাজায় দু একবার বা বেহালারও কাণ মোড়া দেয়। কি করে বিদেশে চাকরি মেলে না। যা পেয়েছে তাই করিতেছে। কিন্তু এত দিন তাহাকে কেহ সং সাজিতে বলে নাই। আজ আর অন্য লোক নাই, সুতরাং অধিকারী নীলকমলকে হনুমান সাজিতে বলিয়াছে। নীলকমল ইহাতে অত্যন্ত রাগত হইয়াছে। চক্ষু লাল করিয়া কহিল 'আমার সঙ্গে এমন কোন বন্দবস্ত ছিল না যে আমি সং সাজিব। আর যদিও সাজি,তবে রাজা সাজিব,কিম্বা আর কিছু সাজ্‌ব, আমি হনুমান সাজ্‌তে পারি না।'

অধিকারী কহিল "এতে দোষ কি। যাত্রাদলে সং তো সকলেই সেজে থাকে। আর যদি সং সাজ্‌তেই হয় তবে হনুমানই বা কি আর রাজাই বা কি?"

নীলকমল "না আমি হনুমান হয়ে মুখে চুণ কালি দিয়ে কলা খেতে খেতে অত লোকের মধ্যে যেতে পারি না। আমাকে এতে চাই রাখ বা না রাখ।"

অধিকারী মহা বিপদে পড়িল। এ দিকে "বাছা হনুমান, বাছা হনুমান' কোরে রামের স্বরভঙ্গ হবার জো হই-

তেছে। এজন্য অধিকারী কহিল "তোমাকে এখন অবধি ৫ টাকা করিয়া বেতন দেওয়া যাইবেক, যদি হনূমান সাজ।"

নীলকমল সম্মত হইল, কিন্তু তথাপি লজ্জায় আসরে আসিতে পারিতেছে না। দু এক জন লোক গিয়া হনূমানরূপী নীলকমলকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া আনিল।

রাম কহিলেন 'কি বাছা হনূমান এতক্ষণে এলে?'

নীলকমল 'হাঁ প্রভু এলাম' বলিয়া উত্তর করিবে, এমন সময় বিধুভূষণকে দেখিতে পাইল। রাস্তায় সর্প দেখিয়া পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, নীলকমল তেমনি চমকিয়া উঠিল। নীলকমল ভাবিল যে, বিধুভূষণ সকলি টের পাইয়াছেন, গোবিন্দ অধিকারির দলে মিশিতে পারে নাই তাহাও জানিতে পারিয়াছেন, এখন যে কি অবস্থায়, কি বেতনে আছে, সকলি অবগত হইয়াছেন।

নীলকমল এই সমস্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাবিয়া রামের কথায় আর জবাব না দিয়া সভাস্থ লোকের নিকট যোড়হাতে উচৈঃস্বরে কহিল "মহাশয় আমাকে জোর করিয়া হনূমান সাজাইয়াছে।"

হনূমানের কথা শুনিয়া সভাস্ত সমুদায় লোক হাসিয়া উঠিল। নীলকমল পূর্ব্ববৎ উচ্চৈঃস্বরে কহিল আপনারা আমার কথায় কি বিশ্বাস করিলেন না। আমি দিব্বি করিয়া বলিতে পারি আমি হনূমান নই, আমার নাম নীলকমল, বাড়ী বাঘমারা, আমারে জোর করে হনূমান সাজাইয়াছে।

সভাস্থ লোক আরো বেশি হাসিয়া উঠিল। নীলকমল লজ্জিত হইয়া বসিল।

রাম ডাকিতেছেন 'বাছা হনূমান!'

নীল। "কে তোর হনূমান? আমাকে অমন হনুমান হনূমান করিলে তো ভাল হবে না?

রাম (অধিকারির পরামর্শে) 'হনূমান এযুদ্ধ বিপদ হইতে রক্ষা কর।'

নীল 'ফের তুই হনূমান হনূমান কর্ছিস। তোর যুদ্ধ হলো আর না হোলো তাতে আমার কি।'

অনেক খোষামোদের পর নীলকমল যুদ্ধে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেন। কিন্তু সে সাহায্য নাম মাত্র। রাম ধনুক বাণ যে ধরিলেন, আর অমনি পঞ্চত্ব পাইলেন। একটু পরে গান ভাঙ্গিয়া গেল। নীলকমল মুখস খুলে ফেলে অধোবদনে বসিয়া আছে। বিধুভূষণ গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নীলকমল কোথা থেকে এখানে জুট্‌লে?'

নীল। 'আর যাও ঠাকুর, তোমার কথায় কাজ নাই। ওরাই নয় হেসে উঠ্‌লো আমাকে চিন্তে পারে না। কিন্তু তুমি কেমন করে হাস্‌লে? তুমি তো আমাকে চিন্তে; তুমি কেন দুটা কথা-বোলে দিলেনা।'

বিধুভূষণ কহিলেন 'নীলকমল আমি তো তুমি নীলকমল নও ভেবে হাসিনি। তোমার কথায় হাসি এলো।'

নীল। 'আমার কথায় হাসি এল। কেন আমি কি পাগল?'

বিধু। আমিও তো বোল্‌ছি না যে তুমি পাগল।'

নীল। 'আমি আর এদলে থাক্‌বো না।'

বিধুভূষণ কহিলেন 'নীলকমল তুমি আমাদের সঙ্গে চল। আমাদের পাঁচালির দল, সেখানে সংসাজা টাজা নেই, সেই বেশ হবে। তুমি এখানে কত বেতন পাও ?'

নীলকমল ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল '৬ টাকা।' নীলকমল দুটাকা বেশি করিয়া বলিল। এরোগ অনেকেরি আছে, খালি নীলকমলের নয়। এমন কি অনেকে ইন্‌কম্‌টেক্‌সের সময়ও মিথ্যা করিয়া আয় দিয়া বেশি টেক্‌স দিয়াছেন।

বিধুভূষণ এক্ষণে দলের প্রধান হইয়াছেন বলিলে হয়। এজন্য তিনি কহিলেন 'তবে তোমার কাপড় চোপড় লইয়া আইস। আর যা পাওনা থাকে তাও নিয়া এস। আমরা তোমাকে ৬ টাকা মাইনে দেব।' এই বলিয়া বিধুভূষণ চলিয়া গেলেন।

নীলকমল মনে করিল 'যদি আর দুটাকা বেশি করিয়া বলিতাম, তাহা হলেও তো পেতাম। আহা হা! আমি তো বড় বোকামি করিয়াছি।'

নীলকমল মনস্তাপে বাসায় ফিরিয়া গেল। দলের কর্ত্তার নিকট কহিল, 'আমার মাইনে হিসাব করিয়া দাও, আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকিব না।'

দলের কর্ত্তাও নীলকমলের উপর বড় চটিয়াছিল। সুতরাং মাহিয়ানা হিসাব করিয়া দিতে আর কোন আপত্তি করিল না। নীলকমল মাহিয়ানা ও বেহালাটি লইয়া পাঁচালিদলে আসিল।

নীলকমল পাঁচালিদলে আসিয়া বিধুভূষণকে ডাকিয়া কহিল 'দাদাঠাকুর আমি চল্লাম ?'

বিধুভূষণ কহিলেন 'কোথায় ?'

নীলকমল 'যে দিকে পা চলে।'

বিধুভূষণ। 'তার মানে কি নীলকমল ?'

নীলকমল আঁধার মুখ করিয়া উত্তর করিল 'আর আমার এজীবনে কাজ কি ? দেশে থাক্‌তে পার্‌লাম না। বিদেশে এলাম এখানেও সুখ হলো না। এখন চল্লাম যে দেশে আলাপী লোকের মুখ দেখ্‌তে না পাই সেই দেশে যাই।'

বিধু। 'কেন, কেন, এই তো তুমি বল্লে' আমাদের দলে থাক্‌বে। আমি সকলকে বোলে কোয়ে ঠিক্ ঠাক্ কোর্‌লাম। এখন আবার এমন কথা বোল্‌ছ কেন ?'

নীল। 'এখানে যদি থাকি, তোমরা আমাকে নিয়ে কত হাসি ঠাট্টা কর্‌বে; আমার তা বরদাস্ত হবে না। হয় তো আমাকে হনুমান ছাড়া আর কিছু বোল্‌বেই না। রাস্তায় আস্তে কতকগুলা ছেলে আমার পাছে লেগে গেল। সদু মিস্ত্রী যেমন বল্‌তো 'কাগের পাছে ফিঙ্গে লাগে' তেমনি সকলেই আমাকে হনুমান হনুমান বোলে ডাকে। আমি তো আসছিলাম তোমাদের দলে থাকবার জন্যে, কিন্তু এমন করিলে তো আর থাকা হবে না।'

বিধুভূষণ কহিলেন 'নীলকমল এখানে তোমাকে হনুমান বোলে কেউ ডাকবে না।' এই কথা বলিবার সময় বিধুভূষণের মুখে একটু ঈষৎ হাসির দেখা দিল।

নীলকমল তাহাতেই রাগত হইয়া

কহিল 'ঐ ঠাকুর তুমিই বল্‌ছো তার আর অন্যে কি ছাড়বে।

বিধুভূষণ কহিলেন 'কৈ আমিতো তোমাকে তা বলে ডাকি নাই।'

নীলকমল কহিল "তবে দিব্বি করে বল আর ওকথা মুখে আন্‌বে না।"

বিধুভূষণ। "আচ্ছা দিব্বি করেই বল্লাম। এখন হলো তো!"

শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়।

সমর তরঙ্গে বীর যোধাগণ,
ঘন ঘন অসি করি আস্ফালন,
প্লাবিতে ধরণী লোহিতের নদে
রাজপুত্রগণ সতত ধায়।

বিপক্ষ পক্ষের করি দর্প চূর্ণ,
চির মনোরথ হইলেই পূর্ণ,
হবে ক্ষত্রোচিত কার্য্য অনুপম,
সুবিখ্যাত কীর্ত্তি রবে ধরায়।

এতাদৃশ করি নিষ্ঠুরের কাজ,
পূজ্য হইবারে বীরের সমাজ,
কদাচ বাসনা শাক্যসিংহ মনে
ভ্রমেও না হল কভু উদয়।

হয়ে রাজপুত্র ছেড়ে রাজভোগ,
নবীন বয়সে বোধি সত্ব যোগ,
করিলা অভ্যাস হয়ে চিরযোগী,
কাম ক্রোধ অরি হলো বিজয়।

পরনে কৌপীন কমণ্ডলু করে,
দেববৎ হাস্য আস্য শোভাকরে,
প্রশান্ত বদনে সুবিমল কান্তি-
হেরিলে মুনির মানস হরে।

"বুদ্ধ অবতার, মহিমা অপার
যোগীন্দ্র যোগেতে সদা মগন,
মায়া দেবীসুত, বহু গুণযুত,
সত্য নররূপে নৃপনন্দন।"

জয়, জয়, জয়, সবে বলে জয়,
অহিংসা পরমোধর্ম্মের জয়।
সর্ব্বজীবে সম, দয়া অনুপম,
হেন ধর্ম্ম কভু না হবে ক্ষয়।

এতেক কহিলা অমর কিন্নর,
এতেক কহিলা অপ্‌সর নিকর,
এতেক কহিলা দেব পুরন্দর,
এতেক কহিলা দেবতা সবে।

হলো প্রতিধ্বনি 'বুদ্ধ অবতার'
হলো প্রতিধ্বনি 'মহিমা অপার'
বন্দিল স্বর্গের দেব অগণন
শুনিয়া অবাক্ মানব সবে।

পারিজাত মালা গলে পরিধান,
স্বর্গ-বিদ্যাধরী করে যশোগান
মৃদু মন্দরবে বাদিত্র বাদক
বাজায় মধুর বীণা রবাব।

সঙ্গে বহু জ্ঞানি শিষ্য অগণন
নানা শাস্ত্র যারা করি অধ্যয়ন,
আর্য্য শাস্ত্র সব সামঞ্জস্য করি
সুতীক্ষ্ণ করেছে বুদ্ধি প্রভাব।

পরনে কোপীন—সবে উদাসীন,
জ্ঞান বলে ভব বন্ধন বিহীন,
জীবনে উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ কামনা,
ভোগ বিলাসের নাহিক আশ।

মুখেতে সবার জয় জয় ধ্বনি,
হোক নবধর্ম্মে পবিত্র অবনী,
রসাতলে যাক বেদ যাগ যজ্ঞ,
পশু বলিদানে নিত্য উল্লাস।

গুরু বুদ্ধ দেব জ্ঞানের শিখর,
যাহা হতে জ্ঞান বারি নিরন্তর
উপালী, আনন্দ কাশ্যপের সহ,
পানকরি তৃপ্ত করিলা ধরা।

মায়াময় এই সংসার আঁধার,
তাহে জীব পায় কষ্ট, অনিবার
স্বীয় কর্ম্ম গুণে, পাপ আচরণে
সবাই অধীন মরণ জরা।

স্বভাবে উৎপত্তি স্বভাবেতে লয়,
স্বভাবেই হয় জীব সমুদায়,
নির্ব্বাণেই সুখ, বাঁচিয়া অসুখ।
সুগতের পদে লও শরণ।

যতেক আচার্য্য সবে এই বলি
মিথ্যা কদাচার পদ যুগে দলি,
"বৌদ্ধ ধর্ম্ম" জয় করি ঘোর রব,
বুদ্ধ দেব সহ করে গমন।

তর্কের তরঙ্গ-সমর তরঙ্গ
যতেক তার্কিক সবে দিয়া ভঙ্গ।
লইল বুদ্ধের চরণে আশ্রয়
এ ভব যাতনা করিতে নাশ।

স্বর্গে দেবগণ মর্ত্ত্যে কোটি নর
ভক্তিভাবে সবে যুড়ি দুই কর,
অক্ষি যুগ মুদি প্রশান্ত অন্তরে
মনের বেদনা করে প্রকাশ।

"জয় গুণাকর, শোক তাপ হর,
জগতে পবিত্র তোমার নাম।
এক মাত্র গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু
তুমিই কেবল আনন্দ ধাম।

নানা গুণ ধর ত্রিকালজ্ঞ বর
সংসারের কষ্ট জরা মরণ—
করহ বিনাশ, এই মাত্র আশ,
তব শ্রীচরণে লই শরণ।"

মানব নিকর আনন্দ অন্তর,
সবে এই স্তব করে নিরন্তর,
দেবগণ করি পুষ্প বরিষণ,
জয় জয় রবে করিছে বন্দন।

বহরম পুর।

—

সুগ্রা সিংহ।

——000——

মোগল সম্রাট মহা পরাক্রম
জাহাঙ্গীর সাহ, * সংগ্রামে বিষম,
শিখি-সিংহাসনে কান্তি কেয়োপম,
বসেছেন বার দিয়া দিবামে। †

সম্মুখে দাঁড়ায়ে মহামাত্যগণ
শুনাইছে তাঁরে প্রজা আবেদন;
আমীর নবাব, সুবা অগণন
মাথা নুয়াইছে রাজ-সম্মানে।

লইয়া সমস্ত ভারতের কর,
তথাপি চিন্তিত সদা নৃপবর;
কি জানি কখন চিতোর ঈশ্বর
আসি উপদ্রব করে আবার।

যতক্ষণ সেই রবে রাজাসনে,
মানিবে তাহারে রাজপুতগণে,
হয় ত তাদিগে লয়ে পুনঃ রণে
বহাইবে সেই রুধির ধার।

অন্য জনে দিলে চিতোরাধিকার,
রাজন্য সমূহে বশ হবে তার;
‡ উমরার আর নাহিক নিস্তার,
আসিতে হইবে মোগল দ্বারে।

মনেতে সম্রাট এ হেন চিন্তিয়া,
উমরার খুড়া "সুগ্রায় ডাকিয়া,
তলবার তার কটিতে বাঁধিয়া
চিতোরের রাজা করিল। তাঁরে।

বসি সুগ্রাবীর রাজ সিংহাসনে,
রাজত্ব ক'রন পুলকিত মনে,

---

* তখ্‌ত তাউস যাহা নাদের সাহ অপহরণ করে।

† রাজসভা।

‡ উমরা—প্রতাপ রাণার পুত্র।

বশীভূত করি রাজপুতগণে,
ঐশ্বর্য্যের তাঁর নাহিক শেষ।

হঠাৎ একদা মনে হ'ল তাঁর,
এই সিংহাসনে অধিকার যার,
রিপুর ভয়েতে সে রাজকুমার *
বনে বনে হায় পেতেছে ক্লেশ।

তখনি তাঁহার গলিল হৃদয়,
নয়নে হইল সলিল উদয়,
† বৈরীর তনয়ে হইয়া সদয়
বসাইলা আনি গদিতে ‡ সুখে।

উমরায় পুনঃ দেখি রাজাসনে,
আনন্দিত চিত্ত যত প্রজাগণে,
কুলাঙ্গনাকুল প্রফুল্লিতমনে,
লাজাঞ্জলি দিল সহাস মুখে।

কিছুদিন পরে সুগ্রা যশোধন,
সম্রাটের সহ সাক্ষাত কারণ
দরবার আসে ** করিয়া গমন
সেলাম করিলা সাহেন সায় ††

দরবারে তাঁরে দেখি উপস্থিত,
‡‡ পৃথিবীর পতি হয়ে কোপান্বিত
বলেন তাঁহারে বচন গর্জ্জিত ;
শুনি মহাভয় সকলে পায়।

"জানিলাম তোরে নিমক হারাম,
বগলেতে ছুরি মুখে তোর রাম,
দুষ্ট, দাগাবাজ কাফর গোলাম,
ফিরিস্ আপন মগজ নিয়া।

"একায তোর কি ছিলরে উচিত ?
যে তোর করিল অসময়ে হিত,
চিতোরে যে তোরে করিল স্থাপিত,
তারি অরি সনে মিলিলি গিয়া ?

"ছিল যাহা চির-দোসর আমার,
অরিক্ষয়কারী যার খরধার,
কেন হায় ! আমি হেন তরবারি
দিলাম বাঁধিয়া কোমরে তোর !

* মালিকের প্রতি খলভাব যার,
তারে নাহি সাজে হেন হাতিয়ার,†
কি জানাবি তুই মরম উহার,
ফিরে দে উহায় হারাম খোর।

ঈদৃশ বলিল যদি জাহাঙ্গীর,
প্রচণ্ড কোপেতে কম্পিত শরীর
অধীর হইয়া সুগ্রা মহাবীর
অসি-কোষ হতে খুলিলা অসি।

ভীষণ-দর্শন লগ্ন তরবার,
ধূমকেতু মত বজ্র খরধার,
দেখি ভয়ে প্রাণ আকুল সবার
বদন মণ্ডলে ছাইল মসি।

স্পন্দহীন হয়ে ভাবিছে সকলে,
কার মুণ্ড কেটে পাড়ে ধরাতলে,
মানসিংহ আদি সেনাপতিদলে
ঘেরিল সম্রাটে চকিত-ন্যায়।

তখন সেখানে সভার গোচর
নিশ্বাস ত্যজিয়া সুগ্রা বীরবর,
না হানিয়া অসি অন্যের উপর,
আপনা উদরে পূরিলা তায়।

নির্ঝরের মত ছুটিল রুধির,
পড়িল ভূতলে সুগ্রার শরীর,
হাহাকার করি যত হিন্দু-বীর
ধাইল তুলিতে সে মৃতকায়।

দেখি সভাজন মানিল বিস্ময়,
"ধন্য ধন্য" বলে ক্ষত্ররাজচয়,

* উমরা।

† প্রতাপ-রাণার সহিত বিবাদ থাকাতে সুগ্রা মোগল সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

‡ গদি—রাজাসন।

** যে দরবার সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত।

†† রাজাধিরাজ।

‡‡ জাহাঙ্গীরের অর্থ, পৃথিবীশ্বর।

*প্রভু

† অস্ত্র।

বাদসার চক্ষে অশ্রুধারা বয়,
পাষাণ-হৃদয় গলিয়া যায় !

এইরূপে হল সুগ্রোর পতন,
রাজদ্রোহি মাঝে কে আছে এমন ?
পূর্ব্ব বৈরীভাব হয়ে বিস্মরণ,
রাজ্য ফিরে দেয় রাজার সুতে।

শুধিতে বিজাতি আশ্রয় দাতার
উপকার ঋণ, সহি তিরস্কার,
বলির স্বরূপে প্রাণ আপনার
করে সম্প্রদান দেশের হিতে !

——oo·

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

কবিতাকুসুম·প্রথমভাগ—হালিসহর নিবাসী শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও কলিকাতা জিপি রায় এণ্ড কোম্প্যানির যন্ত্রে মুদ্রিত।

পণ্ডিতপ্রবর হ্যাজলেট্ বলেন, প্রকৃতি দর্শনে রস ও ভাব·উদ্দীপনের নামই কবিত্ব। কবিতাকুসুমের কোন কোন স্থলে যদিও লালিত্য দৃষ্ট হইল, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ভাব বিবেচনাতে ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগ করা হয় নাই।

যাহা হউক এই পুস্তকের কএকটী খণ্ড-কবিতা পাঠে আমরা সাতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি:—

"দেখাও সমর ক্ষেত্রে বিক্রম গভীর।
দেখুক ভারত ভূমে আছে কিনা বীর ॥
জানুক ক্ষত্রিয়চয়, করে না শমনে ভয়,
অশিচর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের চির অলঙ্কার।
জীবন থাকিতে নাহি করে অহঙ্কার॥"

পুনশ্চ—

'মর্ত্তেতে অমরাবতী, কোথা সে পারিস সতী,
হেরিলে যাহার শোভা মুগ্ধ হয় মন।
ভূতলে নন্দনবন, কোথা বা সে উপবন,
বলগো প্রকাশি সতি করনা গোপন ॥
কোথায় যাইল হায়। সে নাট্য মন্দির
জগতের শোভা।
সঙ্গীতের সুলহরী, কিবা দিবা কি শর্ব্বরী,
বহিত যথায় সদা মোহিয়া হৃদয়।
উর্ব্বশী মেনকা জিনি রূপবতী সুকামিনী,
নিয়ত করিত নৃত্য তুলনা না হয় ॥'

'এ কি দশা আজি তব করি নিরীক্ষণ করাসি জননি।'
কিন্তু
কে জানিত তব ভাগ্যে ঘটিবে এমন
লো চারুহাসিনি ॥

উপর্য্যুক্ত দোষ একেবারে অসহনীয়। কবিকুল-তিলক স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থও এদোষ বর্জ্জিত নহে, বলিয়া ইহা কোনরূপে মার্জ্জনীয় হইতে পারে না।

উপসংহার কালে বক্তব্য যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিরুৎসাহী না হইয়া ভবিষ্যতে গ্রন্থ

প্রণয়ন কালে আরও কিছু সাবধান হন।

গ্রামবাসী—রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা স্মিথ এণ্ড কোর যন্ত্রে মুদ্রিত। নগদ মূল্য এক পয়সা।

পল্লীগ্রামের উন্নতির জন্য যত গুলি পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গ্রামবাসীই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী। "গ্রামবাসীর" সালকষ্ঠের বিবরণ পাঠে আমরা যারপর নাই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আমাদের দেশে অনেকের অর্থ আছে, কিন্তু অল্পসংখ্যক লোক বাণিজ্যের প্রণালী অবগত আছেন। "গ্রামবাসী" কিম্বা অন্যান্য পত্রিকাতে যদি এরূপ প্রস্তাব সকল সন্নিবেশিত হয়, তাহা হইলে এদেশের যথোচিত হিত সাধিত হইবে।

গ্রামবাসী দীর্ঘজীবী হউন। আমাদিগের পাঠকগণকে গ্রামবাসীর সহায়তা করিতে আমরা অনুরোধ করি।

লক্ষ্মণ বিবাসন—লক্ষণ বিবাসন নামক একখানি গদ্য কাব্য প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি সীতার বনবাস প্রভৃতি গ্রন্থের অনুকরণে ইহা প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু লেখক বিলক্ষণ রচনা লালিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখের মধ্যে ইহাতে উদ্ভাবনী শক্তির কিছুই পরিচয় পাইলাম না। যাহাহউক আমরা করুণ রস প্রধান গ্রন্থ পাঠ করিয়া একপ্রকার বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি। তবে তেমন লিপি চাতুরী ও কবিযশোচিত নব সৃষ্টির শক্তি এরূপ গ্রন্থ আদরের পাত্র হইতে পারে।

বালারঞ্জিকা—সাপ্তাহিক পত্রিকা বরিশালে মুদ্রিত।

বঙ্গীয় কামিনীগণের উন্নতিই এই পত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভাষা ও বিষয়াদি তদুপযোগী হয় নাই।

একস্থলে স্ত্রীলোকদিগকে এতই নীচ ও ঘৃণিত করা হইয়াছে যে, কোমল প্রকৃতি অবলাদিগের পক্ষে তাহা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। ভরসা করি, লেখক ভবিষ্যতে সতর্ক হইয়া আপনার উদ্দেশ্য সাধন করেন।

-000-

BOALIA INDUSTRIAL ARTS SCHOOL. PROSPECTUS.

The establishment of an INDUSTRIAL ARTS SCHOOL at Rampur Boalia would be a great blessing to the District. Hitherto we have had a little of what is called general education and recently something in the shape of mass education. But up to this time, little or nothing has been attempted, especially in this part of the country, for introducing a branch of education which has a tendency to develope the practical genius of a nation, viz., education in the practical arts. At present the only establishment in a district in which education of this sort is afforded is one which is not attractive in other ways, viz, the District Jail. Instruction in the industrial a.ts is not intended to be given merely for the sake of entertainment, although it will not be denied that even such instruction is certainly calculated to give a tone to the minds of such as receive it and to have in general a humanizing and beneficial influence. Wnat is now proposed is to introduce such a system as would be welcome to people of the non-agricultural and non-genteel classes as affording regular means of livelihood and gain. Men of the genteel classes also might, if they condescended to share in an humble education like the above, find many occasions in life to turn it to good account. Then again the society at large would be a gainer by it in as much as it would have comparatively better articles at a cheaper price. Thus we scarcely

need make any apology in asking the generous and patriotic public to lend their aid to the proposal, now made, of establishing an Industrial Arts School at Rampur Boalia. It will, for the present, contain classes for teaching carpentry, tailoring, watch and clock repairing, working in gold and iron, &c., &c.

Should we be successful in cecuring an amount of subscriptions sufficient to make a beginning, we intend to make an application for Government aid, through the District committee of Public Instruction, after the School is fairly set agoing for some time.

YOURS FAITHFULY

Kailas Chundra Bose,
Jagabandhu Bose,
Ram Chundra Vidyavachaspati,
Kali Kumar Das, B A.,
Kisori Mohun Roy, B. L.,
Syama Churn Majumdar, B. L.,
Krishna Chaitanya Bhumik, B. L.,
Jadu Nandan Sen,
Kisori Lal Sarkar, M. A., B. L.,
Barada Govinda Sen, B. L.,
Bhuvan Mohun Maitra,
Sasi Bhushan Roy,
Ram Chandra Majumdar,
Beni Madhav Sarkar,
Jadab Chandra Sarkar,
Govinda Chandra Mittra,
Lakshmi Narayan Lahuri,
Becharam Gangoli,
Pyari Mohun Mukharji,
Sri Krishna Das,
Krishna Jivan Saha,
Treasurer.
Hara Govinda Sen,
Secretary.

——*oo*——

WANTED

a carpenter, a tailor and a watch and clock repairer for the Institution. Apply to the undersigned with copies of testimonial.

Hara Gobinda Sen
Secretary, Managing Committee.

কলিকাতা।

বহুবাজার ষ্ট্রিট নং ৯২।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক স্ত্রীণ লোক ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীরের শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা ও ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তিবিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত, ধারণাশক্তি বৃদ্ধি এবং শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছুক হইলে পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিয়া ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ (৫) পাঁচ টাকা পাঠাইতে হইবেক।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

হেয়ার প্রিজারভেটর।

যুবা ও বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের শুক্ল বর্ণ কেশ ইহাদ্বারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।

হেয়ার প্রিজারভেটর কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণ বর্ণ, ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থা হইবে।

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ১ টাকা
ঐ ডাক মাশুল সহিত ১॥৶

শূল বেদনা, মস্তকাদি, কলকাশ, ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য, অর্শ, বহুমূত্র ও সর্প ও দংশন রোগের ঔষধ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্ন থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতিদিন কিঞ্চিৎ মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসাদ ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। মাথা ও ধাতুর পক্ষেও। শিরঃ শূলরোগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ১ টাকা
ঐ ডাকমাশুল সহিত ১॥৶

কলেরা ক্যাম্ফার।

ওলাউঠা রোগের কর্পূরের অরিষ্ট। মাত্রা এক বিন্দু হইতে দশ বিন্দু পর্যন্ত, মূল্য আধ ঔন্স সিসি চার আনা, এক ঔন্স সিসি এক টাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৹ টাকা। ডাক মাশুল প্রত্যেকের চারি আনা।

বিলাতি যত প্রকার ওলাউঠা রোগের ঔষধ আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী ও ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

Registered No. 109.

JNA'NA'NKURA

OR

THE SPROUT OF KNOWLEDGE,

A MONTHLY MAGAZINE AND REVIEW

OF

LITERATURE, PHILOSOPHY, SCIENCE, HISTORY, BIOGRAPHY, ANTIQUITIES, AND RESEARCHES, POLITICS, ARTS, COMMERCE, &c. &c.

জ্ঞানাঙ্কুর।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাসাদিসম্বন্ধীয়
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সূচী

কলিকাতা ঃ

বহুবাজার, স্মিথ এণ্ড কোর যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮০

বিজ্ঞাপন।

নয়শোরূপেয়া।

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে ও ঢাকার ফৌজদারীর হেডক্লার্ক বাবু হারাণচন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা। ডাক মাশুল ৵০আনা

জ্ঞানাঙ্কুর

—০০০———

মাসিক পত্র।

খণ্ড ভাদ্র ১২৮০ ১২শ সংখ্যা।

স্বর্ণলতা

——০০——

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—৩।০—

নীল। " হোল বটে কিন্তু তুমি যেন না বল্লে, আর সকলে ছাড়বে কেন! তারা তো 'বেঁদে মারে শয় বড়' তাতো বুঝবে না। আমর যে কত দুঃখ হয় তারা তো টের পাবে না। দাদা ঠাকুর আমি যদি এ জান্‌তাম, তা হলে কি আমি কখন রাম যাত্রার দলে মিশি।"

বিধুভূষণ কহিলেন " আচ্ছা তুমি এইখানে বসো আমি গিয়া সকলকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া আসি তার পর তোমাকে লইয়া যাইব।" বিধুভূষণ এই বলিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন। নীল-কমল বিধুভূষণের কথায় অনেক আশ্বাসিত হইয়া অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লচিত্ত হইল। এবং ঘুন২ করিয়া " পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে, পদ্মবনে আমি যাব, " ইত্যাদি গাইতে লাগিল।

নীলকমল তিন চারি ফেরতা পদ্ম আঁখি গাইলেন। বিধুভূষণ তথাপি ফিরিয়া আইসেন না। কাহারো জন্যে প্রতীক্ষা করিয়া থাকা অপেক্ষা কষ্টকর কার্য্য বোধ হয় আর কিছুই নাই। নীলকমল বিরক্ত হইয়া একবার উঠিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া ফিরিয়া নিজের জায়গায় বসিয়া " পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে ইত্যাদি ঘুন ঘুন করিতেছেন এমন সময় বিধুভূষণ ফিরিয়া আসিলেন।

নীলকমল ঘুন ঘুন না ছাড়িয়া ইসারার দ্বারায় জিজ্ঞাসা করিলেন " খবর কি?"

বিধুভূষণ অনেক দিবসের পর পদ্ম আঁখির গান শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া নীলকমলের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিধুর হাসি দেখিয়া নীলকমলের চেহারা

গরম হইল। বিধু কহিলেন " নীলকমল এবার আমার দোষ নাই, তুমি যদি নিজেই হনুমান হইতে স্বীকার কর তাহা হইলে আর লোকের অপরাধ কি ?'

নীলকমল কহিল " কৈ আমি স্বীকার করিলাম, স্বীকার করা দূরে থাক, আমি সেই অবধিওকথা মনেও করিতেছি না। পাছে মনে হয় বলিয়া গান করিতেছি।"

বিধুভূষণ কহিলেন " ঐ গানই তো সকল দোষের মূল। ও গানটার মানে জান।'

নীলকমল কহিল " আমি জানি না জানি তোমার কি, তোমার কাছে যখন জিজ্ঞাসা করিব তখন বলে দিও।"

বিধুভূবণ কহিলেন " নীলকমল গান করিও না। রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করিবার জন্য দুর্গোৎসব করেন, তখন নীলপদ্ম কে আন্‌বে এই কথা ওঠায় হনুমান বলেছিল ঐ গানটা " পদ্মআখি আজ্ঞা দিল পদ্মবনে আমি, আনিয়া নীলপদ্ম সে নীলপদ্ম চরণপদ্মে দিব।"

নীলকমল বিস্মিত হইয়া কহিল " বটে "

বিধুভূষণ কহিলেন " আমিতো ঠিক করিয়া আসিলাম " তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না। কিন্তু জানিই কি যদি কেহ মনে করাইয়া দেয় তা হ'লে যদি বলে, তবে কিন্তু আমার দোষ নাই। তোমাকে একটা কথা, বলিয়া দি, তুমি আর কখন পদ্মআঁখির গান গেও না। ওটা শুন্‌লেই লোকের মনে হবে।"

নীলকমল কহিল আচ্ছা, আজি অবধি ত্যাগ করিলাম। দাদা ঠাকুর অবশেষে তোমার কথাই বজায় রহিল। মনে পড়ে রাস্তায় সেই কথা।" এই বলিয়া নীলকমল আপনিই হাসিল, বিধুও হাসিলেন।

নীলকমল কহিল " তবে তো আমি তোমাদেরি দলে থাকলাম কিন্তু আর একটা কথার বন্দোবস্ত কোর্‌তে হবে। যতদিন এখানে থাক্‌তে হবে, ততদিন আমি কেবল বাসা চৌকি দেব, আসরে যাইব না।'

বিধুভূষণ সম্মত হইলেন। পরে উভয়েই গিয়া দলে মিসিলেন। বিধুভূষণের নীলকমলের সঙ্গে থাকিতে এক আপত্তি ছিল তার পদ্ম আঁখির গান, কিন্তু দৈববশতঃ সে আপত্তি দূর হইয়া গেল। নীলকমল সেই অবধি পদ্মআঁখির গান ত্যাগ করিল। এমন কি সেই অবধি আর রামায়ণ সম্বন্ধে কোন কথা উপস্থিত হ'লেই নীলকমল চুপ করিয়া থাকিত, আর কথাটি কহিত না। এবং কতক্ষণে অন্যবিষয়ের কথা আসিবে তাই ধ্যান করিত।

—ঃ॥ঃ—

দ্বিতীয়ভাগ

---00--

প্রথম অধ্যায়।

-000

শ্যামা কার কি করেছে।

বিধুভূষণের বাটী হইতে যাত্রা করিয়া বিদেশে গমন করা অবধি ৪ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

"সময় কাহারও হাত ধরা নয়! নদীর শ্রোতের ন্যায়, স্ত্রীলোকের যৌবনের ন্যায়, দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়।" কিন্তু সকলের পক্ষে নয়। যাহাদিগের অদ্য রজনী প্রভাত হইলে কোন বহুকালের আশা ফলবতী হইবেক, তাহাদের সে রজনী যেয়েও যায় না। যার পতি প্রভাতে পুরদেশে যাইবেক, তাহার রজনী দেখিতে দেখিতে অবসান হয়। মনুষ্যের মনের ভাব সকল পরস্পর কি অসংলগ্ন! যে বিরহিনী দুর্গোৎসবের আগে দিন গুণিতেছে কবে কান্ত স্বদেশে প্রত্যাগত হইবেন তাহার পক্ষে যদি দুদিন একেবারেই না থাকিত অর্থাৎ প্রতিপদের পরদিনই যদি চতুর্থী হইত তাহা হইলে তার মনে কত আনন্দ হইত? কিন্তু সেই বিরহিনীর আয়ুঃসমষ্টি হইতে দুই দিন বাদ দিতে চাহিলে কি সম্মতা হইবে?

যতই দিন যায় সরলা ততই উৎকণ্ঠিতা হন। একমাস, দুমাস, তিনমাস এই প্রকারে প্রায় চারি বৎসর অতিবাহিত হইল বিধুভূষণের কোন পত্রাদিও পান না, বিধুভূষণ দেশেও ফিরিয়া আইসেন না। সরলা এমন দেবতা নাই যাহার উপাসনা করেন নাই, এমন উচ্চস্থান নাই যেখানে মাথা খোঁড়েন নাই। ভাবনায় সরলার শরীর শীর্ণ হইয়া গেল। সরলা এক স্থানে বসিলে আর উঠেন না, কেহ পূর্ব্বে কথা না কহিলে কাহার সহিত কথা কন না। সরলার অন্নে রুচি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই। শীতকালে শরীরের ঘর্ম্মে শয্যা ভিজিয়া যায়। তাঁহার শরীর যতই শীর্ণ হইতে লাগিল, মুখের শ্রী ততই বাড়িতে লাগিল। বৈকাল হইলে চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ হয় ও মুখ আরো টলটোলে দেখায়। সরলার শরীরে যক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে।

এতকাল পর্য্যন্ত শ্যামার যে টাকা ছিল, তাহাতেই একরকমে চলিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সে বল ফুরাইয়া আসিল। সরলার ভাবনারও বৃদ্ধি হইল। পতি বিদেশে, তাঁহার কোন খবর নাই, ঘরে অন্ন নাই। সরলার পীড়াও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন ক্ষীণ হইলেন যে, বসিলে আর সহজে উঠিতে পারেন না। শ্যামা তখন উভয়ের মাতা স্বরূপ হইল। প্রাতঃকালে উঠিয়া গোপালের ও সরলার উভয়ের সেবা শুশ্রূষা করিয়া পাড়ায় বাহির হয়। কোন বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম করিয়া দিয়া আপনার আহারের জন্যে যাহা পায়, আনিয়া গোপালকে ও সরলাকে খাওয়ায়; পরে নিজে আর এক বাড়ী হইতে খাইয়া আইসে। ঘরে আর

এমন জিনিস পত্র কিছু নাই যে বিক্রয় করিলে দুদিন চলিতে পারে। শ্যামা এক্ষণে পরিবারের জীবন স্বরূপ।

শশীভূষণ সপরিবারে এক্ষণে নূতন বাটীতে গিয়াছেন। গোপাল কোন স্থানে গেলে সরলাকে একাকিনী সেই বাটীর মধ্যে থাকিতে হইত। প্রথম প্রথম একাকিনী থাকিতে সরলা কোন ভয় পাইতেন না, কিন্তু যত কৃশ হইতে লাগিলেন, সরলার তত্তই ভয় হইতে লাগিল। কে যেন কোথা হইতে আইসে। সরলা টের পান; কিন্তু আর কেহ টের পায় না। শয্যায় শুইয়া মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠেন। গোপালের এক্ষণে জ্ঞানবুদ্ধি হইয়াছে। দুঃখে পড়িলে অল্পবয়সেই বুদ্ধি পরিপক্ব হয়। গোপাল চুপ করিয়া সরলার শয্যার শিয়রে বসিয়া থাকে।

সরলা চমকিয়া উঠিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল "কি মা অমন কোর্‌লে কেন?"

সরলা কহিলেন "না বাবা কিছু না। গোপাল, বাবা তুমি এইখানেই বসে আছ?"

গোপাল। "হাঁ মা; তোমাকে একা রেখে কোথায় যাব?"

সরলা। "কতক্ষণ ব'সে, আজ খেলা করিতে গেলে না?"

গোপাল। "এখন তো মা আমি খেলা করিতে যাই না!"

সরলা ক্ষণেক ক্ষণেক পূর্বের কথা ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। গোপালের সঙ্গে শেষ কথোপকথনের পর আবার ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া একবার চমকিয়া উঠিলেন, এবং যেন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চারিদিগে চাহিয়া দেখিলেন। গোপাল জিজ্ঞাসা করিল 'মা কি দেখছো?'

সরলা "না বাবা কিছু দেখছি না। তুমি এই খানেই বসিয়া আছ?"

গোপাল। "হাঁ মা আমি তো তোমার বিছানা ছেড়ে কোন খানে যাই নাই।"

সরলা। হাঁ হাঁ আমি ভুলে গিয়াছিলাম। গোপাল, 'বাবা আজি কিছু খেলে না!'

গোপাল। "দিদি পাড়া থেকে ফিরে এলেই খাব।"

সরলা। "শ্যামা এখন ফিরে আসে নাই। আহা! বাছা আমার কি ক্লেশই পাচ্ছে। সকাল বেলা যায় আর দুপর বেলা আসে; আবার খেয়ে বেরোয় আর সন্ধ্যা বেলায় আসে। গোপাল তুমি আমার কাছে একটা দিব্বি কর দেখি!"

গোপাল। "কি দিব্বি করবো মা?"

সরলা। "দিব্বি কর যে আমি মোলে তুমি শ্যামাকে কখন অভক্তি করিবে না। তুমি আমারে যেমন ভক্তি কর, অমনি চিরকাল শ্যামাকে করিবে?"

গোপাল। "মা, এরজন্যে আর দিব্বি করিতে হবে কেন? আমি কি জানিনে যে তুমি আমার যেমন এক মা শ্যামাও তেমনি?'

সরলার চক্ষে মুক্তার ন্যায় দুটি অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। সরলা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। গোপাল নিজের বস্ত্রের দ্বারা সরলার চক্ষের জল মুছিয়া দিল

সরলা এক মূহূর্ত্ত পরে কহিলেন, গোপাল. বাবা বালিস গুটা উপরে উপরে রাখ দেখি, আমি একবার বসি।', গোপাল আস্তে আস্তে বিছানার বালিস গুলি উপর্য্যুপরি রাখিল। সরলা বিছানায় বাহুর ভর দিয়া উঠিয়া বালিস ঠেস দিয়া বসিলেন। এই পরিশ্রমে ৪।৫ বার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল। শ্রান্তি দূর হইলে সরলা কহিলেন " বাবা গোপাল একবার এসে আমার কোলে বসো দেখি। এখনো শক্তি আছে। একবার কোলে করিয়া নি, আর দিন কতক পরে তাও পারিব না।"

গোপাল সরলার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে লইয়া চুপ করিয়া রহিল। গোপালের কথা কহিবার যো নাই। চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুপাত হইতেছে!

সরলা বুঝিতে পারিয়া গোপালের হাত ধরিয়া টানিয়া আপনার বামদিগে বসাইলেন। গোপাল সরলার বক্ষোপরি শির স্থাপন করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

সরলা হস্ত দ্বারা আপনারদিকে গোপালের মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলদ্বারা চক্ষু মুছিয়া দিয়া, হাসিয়া কহিলেন " ভয় কি গোপাল, আমি কি তোমাকে ফেলে কোন খানে যেতে পারি! আমি শীঘ্রই ভাল হইব।"

গোপাল পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বেগে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সরলা দুই হাত দিয়া গোপালের মস্তক ধারণ করিয়া সস্নে

একটু পরে শ্যামা আসিল। বহুকাল পরে সরলার মুখে হাসি দেখিয়া শ্যামার আর আনন্দের সীমা রহিল না। শ্যামা বিছানার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল " খুড়ি মা আজি একটু ভাল আছ না? রোজ যদি এমনি কোরে একটু একটু গোপালকে কোলে নেও আর গোপালের সঙ্গে কথা কও, তা হলে ১৫ দিনের মধ্যেই আবার তুমি যেমন মানুষ তেমনি হোতে পার।"

সরলা কহিলেন " শ্যামা আজি আমি ভাল আছি। তোমার মত মেয়ে আর গোপালের মত ছেলে কাছে থাক্‌লে যে হতভাগিনী ভাল না থাকে তার বৃথায় জন্ম।"

শ্যামার চক্ষে জল টল টল করিতেছে। ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া কহিল " আবার শ্যামার মতন মেয়ে, শ্যামার মতন মেয়ে করিতে লাগ্‌লে? কেন শ্যামা তোমার কি করেছে?"

সরলা সজল নেত্রে হাসিয়া কহিলেন " আমায় আপনার মা যা না করেছে, শ্যামা তার বেশি করেছে। এর চাইতে পৃথিবীতে কি আর কেউ কারু বেশি করিতে পারে?"

শ্যামা সরলার কথা শেষ না হইতে হইতেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রান্না ঘরে প্রবেশ করিল। শ্যামা নিজের প্রশংসা শুনিতে পারে না। ব্রাহ্ম সমাজের খবরের কাগজের মত একটা ভাল কাজ করিয়া বলিয়া বেড়াইতে পারে না। শ্যামার দান কেহ জানিতেও পারে

না। কোন খবরের কাগজেও ছাপা হয় না, কোন সভাতেও সে বিষয়ে বক্তৃতা হয় না। কিন্তু আর কারু কথা দূরে থাকুক শ্যামা না জানিতে জানিতেই এক মহাপুরুষ তাহা জানিতে পান এবং তৎক্ষণাৎ অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিয়া রাখেন।

শ্যামা তুমি কি তা টের পাও? কাগজে ছাপান সৎকর্ম্ম সেই কাগজের সঙ্গেই মৃত্তিকা সাৎ হইবে। শ্যামা তোমার কীর্ত্তি সেই অক্ষয় পুরুষ, অক্ষয় কাগজে অক্ষয় অক্ষরে, লিখিয়া রাখিতেছেন।

শ্যামা রান্না ঘরে গিয়া রন্ধনের সমস্ত আয়োজন ও প্রস্তুত করিয়া গোপালকে ডাকিল। সরলা যে অবধি শয্যাগত হইয়াছেন গোপালই সে অবধি পাক করে, শ্যামা কাছে থাকিয়া সমস্ত দেখাইয়া দেয়। গোপাল প্রফুল্লচিত্তে রন্ধন কার্য্য সমাধা করে। কখন না বলে না, কখন বিরক্তি প্রকাশ করে না।

গোপাল সরলার কাছে বসিয়াছিল। শ্যামা কাছে আসিলে গোপাল কহিল "দিদি তুমি মার কাছে বসো, আমি যাই।

সরলা কহিলেন "না বাবা তুমি কি একা পারবে? আমি এখন থাকিতে পার্‌বো। শ্যামা তোমার কাছে যাউক।"

গোপাল উত্তর করিল "না মা, আমি সব শিখেছি, আমি একলাই পারিব।" এই বলিয়া শ্যামাকে রাখিয়া গোপাল রান্না ঘরে গেল।

গোপাল চলিয়া গেলে সরলা আবার পূর্ব্বের মতন শুইয়া পড়িলেন। শ্যামা কাছে বসিয়া সরলার চুল পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিল। শ্যামা কহিল আহা এমন চুল গুলির অবস্থা দেখ?"

সরলা কহিলেন "শ্যামা তোমার এত যত্ন বুঝি বৃথায় যায়। আমি যে ভাল হব এমন তো আর বোধ হয় না। আমি দিন দিন কাহিলই হচ্ছি।"

শ্যামা কহিল "ভয় কি? তুমি কেবল ভেবে ভেবে ব্যামো বাড়াও বৈ তো না। দু দিন ভাবনা ক্ষান্ত দাও দেখি, তা হলেই আবার ভাল হবে।

সরলা উত্তর করিলেন "শ্যামা, এ তো গায়ের ময়লা নয় ধুয়ে ফেল্লেই গেল। আমি কেমন করে না ভেবে থাকি? দেখ দেখি আজি তিন বৎসর হলো তবু একখানি চিটিও পেলাম না। শ্যামা আমি যে কত ভাবছি তা কি তিনি টের পাচ্ছেন!"

শ্যামা কহিল "তুমি চিন্তা করো না। তিনি কি না ভেবে চুপ করে আছেন। দেখ আর কি এসে পড়েন। আমি শুনেছি ঢাকা জেলায় অমনি দুভাই ঝকড়া করে পের্‌থক হয়। তার পর বড় ভাই কোঠা দিয়া এক দিন ছাতের উপর থেকে ছোট ভাইকে ডাকিল। ছোট ভাই উত্তর না দিয়ে, গামছা হাতে কোরে বিদেশে বেরুলো, আর টাকা উপার্জ্জন করে ঘরে এলো। এর মধ্যে চিটিও লেখেনি, পত্রও লেখে নি। বাড়ী এসে সেই টাকায় কোঠা দিয়ে ছাতের উপর উঠে তখন

দাদাকে ডেকে বলিল ' দাদা ডাক্‌লে কেন? লোকে যেখানে এতদূর করে সেখানে খুড় ঠাকুর তো তিন বৎসর যান নি।"

সরলা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন "শ্যামা তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।"

শ্যামা কহিল "আজি সকাল বেলা শুনে এলাম বাঘমারার এক জুগী তাঁর সঙ্গে আছে। সেও এক সময় বাড়ী থেকে রাগ করে গিয়াছিল। ও পাড়ার রায়েরা কালীঘাটে গিয়াছিল, তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে জুগীও তো আজ্ বাড়ী পত্র টত্র তো লেখে নাই। যদি কিছু মন্দ হতো তা হলে অবিশ্যিই এত দিন শোনা যেতো।"

সরলা আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও পাড়ায় কে গিয়েছিল? কৈ এত দিন তো কিছু শুনি নাই?"

শ্যামা কহিল "আজি আমি ও পাড়ায় গিয়া শুনে এলাম। নীলকমল রায় গিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম এতদিন কেন একথা বলেন নি, তা তিনি বল্লেন আমি তো জানিনে যে তোমরা চিটি পত্র পাও না।"

সরলা শুইয়া ছিলেন বিনা সাহায্যে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। শ্যামার দুখানি হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্যামা আমার গা ছুঁয়ে বল দেখি যা বল্লি তা সত্যি।"

শ্যামা কহিল "খুড়িমা যা বল্লাম সত্যি, যদি তোমার বিশ্বাস না হয় বরঞ্চ আমি কালি তাঁকে ডেকে আনিব। তাঁর আপন মুখে শুনলে প্রত্যয় হবে।"

সরলা শ্যামার কথায় আশ্বাসিত হইলেন। গোপাল থালায় করিয়া মায়ের জন্যে ভাত বাড়িয়া আনিল। বিছানার সম্মুখে একখানি চৌকি আনিয়া থালা চৌকির উপর রাখিয়া, গোপাল কাছে দাড়াইয়া রহিল। সরলা অন্যদিন অপেক্ষা আজ কিঞ্চিৎ ভাল আহার করিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—।ঃঃ।—

শশিভূষণের নূতন বাড়ী।

সন্ধ্যার সময় বৈঠকখানায় লোক গিস্‌গিস্‌ করিতেছে। চাকরেরা অনবরত পান তামাক যোগাইতেছে। কেহ কেহ কার্য্যবশতঃ বাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে; কেহ কেহ উমেদায়ার, বা চাকরীর প্রত্যাশায় আসিয়াছে, কেহবা কোন কাজ কর্ম্ম নাই কেবল পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়াছে। এক ঘর লোক। শশিভূষণ এখন বাটী আইসেন নাই। দেওয়ানী ভার পাওয়া পর্য্যন্ত নিয়মিত সময়ে কাছারি হইতে আসিতে পারেন না। সকল আমলারা চলিয়া গেলে শশিভূষণ বাবুর নিকটে গিয়া সমস্ত দিবসের কার্য্যের পরিচয় দেন এবং পরদিবস কি প্রণালীতে কোন্ কার্য্য হইবেক তাহা বিস্তৃতরূপে বাবুকে বুঝাইয়া দেন। বাবুকে একাকী পাওয়াও ভার। বয়স্যগণের মধ্যে যখন বসিয়া থাকেন। তখন তাঁহার সহিত আর কাহারও দেখা হইবার ত যো নাই। সুতরাং শশিভূষণ কখন কাছারি হইতে বাটী আসিবেন আজ্ কাল্ তাহা কেহই বলিতে পারে না। বৈঠকখানায় যাঁহারা নিষ্কারণে বসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাবুর দেরি দেখিয়া হাই ছাড়িতে ছাড়িতে চলিয়া গেলেন; কিন্তু যাঁহারা কার্য্যবশতঃ বসিয়া আছেন তাঁহারা সকলে বসিয়া আছেন। উমেদারেরাও দু একজন করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তামাকের ধোঁয়া অনবরতই উড়িতেছে। পান লইয়া যাইতে যাইতেই ফুরাইয়া যাইতেছে।

গদাধর চন্দ্রের এক ভিন্ন বৈঠকখানা। সুন্দর একটি ছোট ঘর। ঘরের মেজে জুড়ে একখানি শতরঞ্জি পাতা। শতরঞ্জির উপর তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র একখানি গালিচা পাতা, গালিচা খানি যুড়ে তাহার উপর একখানি যাযিম পাতা। যাযিমের উপর একটি তাকিয়া, তাহার সম্মুখে দুইটি রূপা বাঁদা হুঁকা বৈঠকের উপর বসান। তাকিয়ার পশ্চাৎভাগে একটি একটি আলনার উপর ৩। ৪ খানি কোকিল পেড়ে শিমলাই ধুতি, কোঁচান, একখানি চাদর ও দুটি পিরাণ। আলনার নিম্ন থাকের উপর দু জোড়া জুতা ও আলনার ধারে একগাছি বেতের ছড়ি। আলনার অপর ধারে একটি আম্র কাষ্ঠের সিন্দুক আছে।

"এহেন স্থানে আজি কিহেতু বসিয়া, গদাধরচন্দ্র কহ পদ্মাসনে বীনাপানি" এমন সময়ে গদাধর চন্দ্র কখন বাড়ী থাকেন না। সূর্য্যদেবও অস্ত যাইতে থাকেন গদাধর চন্দ্রের চক্ষু ফুটিতে থাকে। গদাধর একজন নিশাচর বলিলে হয়। কিন্তু আজি গদাধরের মুখ যেন বিরস বিরস বোধ হইতেছে। গদাধর একবার বসিতেছেন, একবার উঠিতেছেন। একভাবে পাঁচ মিনিট থাকিতেছেন না। মাঝে ২ জানালা দিয়া রাস্তার দিগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। আজি কি

গদাধর কাহারো আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন না কি? কৈ কেহই তো আসিতেছে না। গদাধরচন্দ্র "দূর হোক্‌গে" বলিয়া উঠিয়া আলনার উপর হইতে একখানি কোঁচান ধুতি পরিলেন, একটা পিরাণ গায়ে দিলেন। তদ্‌পরে পৈতার ঝুলান চাবিটি লইয়া সিন্দুকটি খুলিলেন (আজি কালি পৈতার একমাত্র দরকার চাবি রাখা) সিন্দুকটি খুলিয়া গদাধর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটী বোতল বাহির করিয়া লইলেন এবং বাম হস্তের দ্বারা একটি কাচের গেলাস ধরিলেন। বোতল হইতে একটা ঈষৎ লাল রঙ্গের আরক গেলাসে ঢালিয়া, তাহাতে খানিক জল মিশাইয়া গদাধর আরক টুকু সেবন করিলেন। পান করিয়াই একবার মুখ ব্যাঁকাইলেন, এবং অস্পষ্টাক্ষরে কহিলেন "শালা রামধনা ব্রাণ্ডি দেবে, তা না দিয়ে রোম দিয়েছে।" কিন্তু "রোম" বলিয়া যে বোতলটি রাখিলেন তা নয়। ৩। ৪ বার বোতল হইতে ঢালিলেন ৩। ৪ বার জল মিশাইলেন, এবং ৩। ৪ বার মুখ ব্যাঁকাইয়া ডান হাতে করে প্রথমবারের মতন খাইলেন। যখন দেখিলেন কিস্তি বেশ বোঝাই হইয়াছে, তখন বোতলটির ছিপী বন্দ করিয়া আলোকের দিগে উচু করিয়া ধরিলেন এবং অতি মৃদুস্বরে 'এখন ঢু আমার বেশি আছে' বলিয়া পুনরায় তাহাকে সিন্দুকে রাখিয়া চাবি বন্দ করিলেন। পরে চাদর খানি স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া বাম হস্তদ্বারা কোঁচার অগ্রভাগ এবং দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ছড়ী গাছটির মস্তক ধরিয়া বাহির হইলেন।

গদাধর চন্দ্রের বৈঠক খানা হইতে বাহির হইতে গেলে শশিভূষণের বৈঠক খানা দিয়া যাইতে হয়। বড় লোকের বাড়ীর বেরাল টা পর্য্যন্ত মুরুব্বী হয় এবং খানসামা দিগকেও বাবু বলিতে হয়। গদাধর চন্দ্র বাবুর সম্বন্ধীকে সকলেই জানে এবং অনেকেই শালা বাবু বলিয়া সম্বোধন করে। শালা বাবুও একজন ক্ষমতাপন্ন লোক কত বার কত জনের চাকরি করিয়া দিয়াছেন। উমেদারদিগের নিকট শালাবাবুর বড় মান। আপাততঃ বাহির হইয়া যাইবার সময় একজন উমেদার 'শালা বাবু অনুগ্রহ করে আমার একটা কথা শুন্‌বেন?'

শালা বাবু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন "আমি ডেখটে পাচ্চি, আমার আর এ রাষ্টা ডিয়ে চলা হবে না। এ ডিকে এলেই কারু না কারু কটা শুণ্টে হয়।"

উমেদার। "শালা বাবু আমার জন্য আপনার দেরি হবে না। এক কথা মাত্র।"

শালা বাবু। "আর বেশি কটায় কাজ নেই তবে এখন কথাটা কি বল।" এই বলিয়া উভয়ে একটু তফাতে গেলেন।

উমেদার। "সে কর্ম্মটার কি হলো? আমার প্রতি কি দয়া কর্‌বেন না?"

শালা। "টোমারে যা একবার বলেছি, টা নৈলে হবার যো নেই। কাল যে এসে ছিল সে আরও বেশি ডিটে চাচ্চে, কিণ্টু টোমারে আগে কটা ডিয়েছি, আমি টারে এখন কিছু বলনি। টুমি আজি বলে যাও টুমি কর্ম্ম চাও কি না?" উমেদার কিঞ্চিৎ

কাল নীরবে থাকিয়া উত্তর করিল, " তবে তার কমে কি হবেই না ?"

শালা। " কোন মটেই না।'

উমেদার। " দেখুন আমি গরিব মানুষ, তিন মাসের মাইনে দিতে হলে আর থাকে কি ?"

শালা। 'কেন টোমার কর্ম্মটাই রৈল। কিছু টাকা ডিয়ে কর্ম্ম নেওয়া আর গরু কেনা সমান। যখন টখন ডুবে ডুড খাবে টখন টো আমি টোমার কাছে জাবনা যে একটু ডেও।'

উমেদার। 'যদি নিতান্তই না ছাড়েন, করা যায় কি, দেব তিন মাসের মাইনে।'

শালা। 'সুটু ডেবো নয়। সমস্ট টাকাগুলি আগে ডিটে হবে।'

উমেদার। 'আমি আগে সমস্ত টাকা কোথায় পাব ? যেমন মাস যাবে অমনি টাকা দেব। আগে আমি হদ্দ এক মাসের মাইনের টাকা দিতে পারি।'

শালা। 'টার কাজ নয় হে, টার কাজ নয়। এ কি আমার হাটের কাজ যে আমি কিস্তিবন্দি করে নেবো ?'

উমেদর। আপনার হাতের কাজ নয় তো কার হাতের কাজ। আপনি যা মনে করেন তাই কর্‌তে পারেন।

শালাবাবু। 'টা নয় হে, টা নয়। এই টাকার টিন ভাগের একভাগ ডিডিকে ডিটে হবে, ডিডি তোমার কটা বল্লে চাক্‌রি হবে। শশীবাবু কি টেমন লোক, যার টার কটায় ভোলে ?'

উমেদার। 'আচ্ছা তবে তিন ভাগের এক ভাগই আগে দেব, চাকরি হইলে আর বাকী দেব।'

শালাবাবু। 'এখন, পটে এস। আচ্ছা কালি টাকা এন, ড্যাখা যাবে।'

উমেদারে। 'দেখা যাবে সুচ বল্লে হবে না কালি দিতেই হবে।'

শালাবাবু 'আচ্ছা টবে টাই' বলিয়া রাস্তার দিগে যাইতে অগ্রসর হইলেন। দুই চারি পদ গমন করিয়াছেন এমন সময় রমেশ নামক কনষ্টেবলটীর সহিত দেখা হইল। রমেশ গদাধরচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিতেছে। গদাধরচন্দ্র রমেশকে দেখিয়া কহিলেন ' রমেশ বাবু নাকি টবু ভাল। আমি মনে করেছিলাম টুমি বুঝি ভুলে গেলে।'

রমেশ কহিল 'যেখানে আসিব বলিয়াছি সেখানে কি আর ভুল হয়। পুলিষের লোক, আমাদের যেমন কথা তেমনি কাজ।'

উভয়ে অল্পে আসিয়া গদাধরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। গদাধর পুনরায় সিন্দুকের চাবিটি খুলিয়া বোতলটি বাহির করিলেন এবং জলে আরোকে মিশাইয়া রমেশের হাতে দিলেন।

রমেশ গেলাসটী হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল ' কি ?'

গদাধর। 'রোম'

রমেশ। 'জল দিয়াছ নাকি ?'

গদাধর। 'হাঁ।'

রমেশ। 'তবে ওটা তুমি খেয়ে ফ্যাল। আমি পান্তাভাত খেতে পারি না। আমরা পুলিশের লোক। গরম জিনিস নৈলে আমাদের মুখে ভাল লাগ না।'

গদাধর সে গেলাসটী সেবন করি-

লেন। রমেশ নিজের হাতে এক গেলাস ঢালিয়া লইয়া নির্জ্জলা খাইলেন।

গদাধর বোতলটী আবার সিন্দুকে রাখিতে চেষ্টা করিলেন। রমেশ কহিলেন দিচ্ছ নাকি?'

গদাধর কহিলেন 'না। জানিকি যডি কেউ আসে। ও ঢাকা ঠাকা ভাল।' রমেশ কহিলেন 'তবে আমি আর এক গেলাস একেবারে খাই।' রমেশ কথা কার্য্যে পরিণত করিলেন। গদাধর বোতল বন্দ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন 'তবে এখন কাজের কথা কও।'

রমেশ কহিলেন 'কাজের কথা যা বলিয়াছি ভাই। আমরা পুলিশের লোক বেশি কথা কই না।'

গদাধর কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন 'ডেখ ডেখি ভাই টোমার কি অন্যায়? আমি সকলি করলাম, ঝুঁকী সমুডায় আমার, টুমি ভাই ফাঁকের ঘরে এসে অট ডাওয়া করলে চলবে কেন?'

রমেশ কহিলেন 'আমি আর কত দাওয়া করিলাম। আজি কাল তাদের যে অবস্থা হয়েছে আমি যদি বলেদি তা হলে তারাই আমাকে তিন ভাগ দিতে পারে।'

গদাধর। ডেখ ডেখি ভাই আমার কট কষ্ট। আজি আবার ডাক হরকরা এসেছিল। চিটিখানা ডিয়ে জিজ্ঞাসা করলে 'আপনি যে চিটি লেখেন টার কে হন?' আমি বল্লাম 'আমি টার ছেলে।' ড্যাখ ডেখি ভাই আমি এট মিট্যা কটা কয়ে জাল করে টাকাগুলি করলাম, টুমি টার ৺০ আনা চাও। আমার পক্ষে টা হলে বড় অন্যায় হয়।'

রমেশ। 'তুমি মিথ্যা কথা বল্লে জাল করলে সত্যি, কিন্তু তোমাকে শিখালে কে? তুমি তো পত্র পেয়েই তাদের দিতে যাচ্ছিলে। আমি যদি না পরামর্শ দিতাম তা হলে তোমার তো এক পয়সাও থাক্‌তো না।'

গদাধর। 'টুমি টো পরামর্শ ডেও নি, ডিডিই আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। টোমাকে এযে ডিচ্ছি এ কেবল আমার বোকামির জন্যে বৈটো নয়। তোমাকে না বল্লে কি টুমি টের পেটে?'

'আমাকে না বল্লে এতদিন তোমাকে পুলিশে পাকড়া করে ফেলতো। আমিই তো তোমাকে বল্লাম যে রসিদে নিজের নাম সই না করিয়া গোপালের নাম সই কর তা হলে আর কোন গোল থাকিবে না। কেমন একথা আমি বলি নাই?'

'টা টুমি বলেছিলে বটে কিন্ট ডেখ ডেখি তোমার ডাবিটা অন্যায় কট? এখন ৬শো টাকায় ৪শো টোমাকে ডিলে আমার ঠাকে কি? আবার এর মধ্যে ঠেকে ডিডিকে ডিটে হবে?'

রমেশ একটু কৃত্রিম বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া কহিল "আমি কিছুই চাইনে। যার টাকা সেই পায় এই আমার মত। তোমারও নিয়ে কাজ নাই আমারও নিয়ে কাজ নাই। চল যার কাছে যা আছে সমুদায় গোপাল কি গোপালের মার কাছে দিয়ে আসি। আমি ও টাকা চাইনে, কখন চাইও নি। তোমার ইচ্ছা হয়

তুমিই সমুদায় নেও আমি যা জানি তাই কর্‌বো এখন।” এই বলিয়া রমেশ বাবু উঠিতে উদ্যত হইলেন।

গদাধর একটু হাসিয়া কহিলেন “রমেশ বাবু চট্‌লেনা কি? আমি তো ভাই চট্‌বার কথা কিছু বলি নাই। আচ্ছা যার টাকা টাকেই দেওয়া যাবে এখন তুমি বসো। বোটলটা খালি করা চাই তো?”

রমেশ বসিলেন, এমনি ভান করে বসিলেন যেন তাঁকে কতই অনুরোধ করা হইয়াছে।

পাঠকবর্গ বোধ হয় টের পাইয়াছেন যে, বিধুভূষণের রেজিষ্টরি চিটি গুলি কোথায় গিয়া পড়িয়াছিল।

বিধুভূষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান না করিয়া আর দেশে প্রত্যাগত হইবেন না। মাঝে মাঝে বাটীর খরচ পত্রের জন্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠাইয়া দিতেন। চিটির কোন জবাব পাইতেন না বটে, কিন্তু গোপালের সাক্ষরিত রসিদ দেখিয়া মনে করিতেন টাকা সরলার হস্তেই হইয়াছে। গোপাল ছেলে মানুষ, ভাল করিয়া লিখিতে শেখে নাই বলিয়াই বুঝি তাঁহাকে পত্র লেখে না।

বিধুভূষণের প্রথম চিটি গদাধর চন্দ্রের হস্তে পতিত হয়। গদাধর চন্দ্র চিটিখানি খুলিয়া নোট দেখিতে পাইয়া অমনি প্রমদার নিকট গিয়া জানাইলেন। প্রমদা তাঁহাকে রসিদ সৈ করিয়া চিটিখানি রাখিতে পরামর্শ দেন। গদাধর নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া পত্র রাখিবেন স্থির করিয়া বাহিরে আসিলেন। নোট পাইয়া গদাধরের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার পরম বন্ধু রমেশ বাবু আসিয়াছেন। গদাধর অবিলম্বে রমেশ বাবুর নিকট চিটিখানি দেখাইয়া প্রমদার উপদেশের কথা কহিলেন। রমেশ পরামর্শ দিলেন গোপালের নাম লিখিয়া দিতে। গদাধর সেই পরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া গোপালের নাম লিখিয়া দিলেন। বিধুভূষণ কখন গোপালের হস্তাক্ষর দেখেন নাই। তিনি সই দেখিয়া মনে করিলেন এই গোপালের লেখা।

গদাধরের সহিত রমেশের প্রণয় এই ঘটনা অবধি ঘনীভূত হইতে লাগিল। এই প্রণয়ের উপর নির্ভর করিয়াই শ্যামার নামে নালিস করিতে গিয়াছিলেন। রমেশ যথার্থই পুলিষের লোক। অপর লোক উপস্থিত থাকিলে গদাধরের সহিত এরূপ কথা বার্ত্তা কহিতেন যে সহজে কেহ বুঝিতে পারিত না যে তাঁহাদের সহিত বড় অধিক প্রণয় আছে।

যতবার রেজেষ্টরী চিটী আসিয়াছে গদাধর হস্তগত করিয়াছেন। গদাধরেরা পুরাতন বাটী হইতে নূতন বাটীতে আসিলে রমেশ হরকরাকে নূতন বাড়ী দেখাইয়া বলিয়া দেয় “ঐ বাড়ীতে সরলা থাকেন।” ডাকমুনসী ও খোয়াড় রক্ষক একব্যক্তিই। সে থানায়ই থাকিত সুতরাং যখন রেজেষ্টরি চিটী আসিত রমেশ জানিতে পারিত।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গদাধর ও রমেশ সমান ভাগ করিয়া টাকা গুলি লইয়াছেন। কিন্তু শেষ চিটীতে বিধুভূষণ সত্তরে বাটী আসিবেন লিখিয়া দিয়াছেন। চিটী খানি সকাল বেলা পাইয়া পড়িবার সময় গদাধরের মুখ কালী হইয়া গেল, এবং হাত কাঁপিতে লাগিল। তদ্দর্শনে হরকরা মনে করিল কোন বিপদের সম্বাদ আসিয়া থাকিবেক। এই ভাবিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "গোপাল বাবু এ কার চিটী।" হরকরা গদাধরকে গোপাল বাবু বলিয়াই জানিত। গদাধর অম্লান বদনে উত্তর করিলেন "আমার বাপের।"

হরকরা কহিল "খবর তো ভাল সব?"

গদাধর উত্তর করিলেন, "ভাল।"

সেই চিটী অবিলম্বে গদাধর রমেশকে দেখান। রমেশ যখন তখন বলিতেন "আমরা পুলিসের লোক।" বস্তুতঃই তিনি যথার্থ পুলিসের লোক তার ভুল নাই। চিটী খানি দেখিয়া তিনি গদাধরের ভয় আর দশ গুণ বাড়াইয়া দিলেন! তখন বন্ধুতা ত্যাগ করিয়া কহিলেন "আমাকে ২০০ টাকা দাও নচেৎ আমি সমুদয় প্রকাশ করিয়া দেব?"

গদাধর কহিলেন তোমাকে ২০০ টাকা ডেব কেন? টুমি কি এর মধ্যে নও? টোমারও যে বিপড আমারও সেই বিপড।'

রমেশ কহিল "আমার বিপদ কি? আমি কি তোমার টাকা নিয়েছি যে আমার বিপদ?"

গদাধর আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "সে কি রমেশ বাবু? টুমি কেমন করে বল্লে যে টুমি টাকা লও নাই?"

রম। "আমি টাকা নিয়েছি কে দেখেছে?"

গদা। "আমি ডেখেছি।"

রম। "তুমি আসামী, তুমি তো সকলকে জড়াবেই? তোমার কথা কে বিশ্বাস করে?"

গদাধর অতল জলে পড়িলেন। ঘোর বিপদ! এখন উপায়? সর্ব্বসমেত ৬০০ টাকা চুরি করিয়াছেন। তার অর্দ্ধেক রমেশ বাবু লইয়াছেন। বাকী অর্দ্ধেকেরও ২০০ চান!

বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া রমেশ ১০০ টাকায় নামিলেন। গদাধর দেখেন তা দিতে গেলেও নিজের চুরি করাই লাভ। কারণ তাহার নিজের ৩০০ এর ১০০ প্রমদা লইযাছেন। প্রমদা অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল হইলেও টাকা কড়ীর বিষয় ছাড়িয়া কথা কহিতেন না। সেকরারা মায়ের কানের সোনা চুরি করে।

গদাধর একতশত টাকা দিতে নিমরাজি হইয়া বাটী আসিয়াছেন। আসিবার সময় রমেশকে বলিয়া আসিয়াছিলেন "সন্ধ্যার পর একবার আমাডের বাড়ী অবশ্য করিয়া এস।" রমেশ যথার্থ 'পুলিসের লোক।' গদাধরকে বাগে পাইয়া নিজে গম্ভির হইল; কহিল "যদি অবকাশ পাই তবে যাব। আমরা পুলিসের লোক আমাদের কি অল্প কাজ!"

গদাধর বাটী আসিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় রমেশের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন। রমেশ আসি আসি বলিয়া সন্ধ্যার সময়

আসিলেন। গদাধর রমেশকে তুষ্ট করিবার জন্যে এক বোতল রম রামধন শুঁড়ির দোকান হইতে আনাইয়া রাখিয়াছেন। ব্রাণ্ডির কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু রামধনের পাঁড়াগেঁয়ে দোকানে সর্ব্বদাই ভাল বিলাতি জিনিস থাকে না, এজন্য রমই পাঠাইয়া দিয়াছে।

গদাধর কহিলেন " রমেশ বাবু বসো, বোতলটা খালি করা চাই টো?"

রমেশ বসিলেন কিন্তু কহিলেন " আজ আমার শরীরে কিছু অসুখ হয়েছে, বিশেষ আজ বড় কাজ আছে, আর খেলে কাজ করিতে পারিবনা। এখন কাজের কথা বল। তা না হলে বৃথা বসে থাকা।"

গদাধর পৈতা দিয়া রমেশের দুই হাত জড়াইয়া কাতর স্বরে কহিলেন "রমেশ বাবু এ বিপড্ ঠেকে আমাকে উড্ডার কর। টোমায় একশ টাকা ডিটে হলে আর বাঁচি নে। যডি আমার হাটে টাকা ঠাকিত টা হলে টুমি যা চাইটে আমি টাই ডিটাম, কিণ্টু আমার একটি পয়সাও নেই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া গদা ধর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় রমেশের হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার পায় ধরিলেন এবং শ্রাবণের ধারার ন্যায় নেত্রাসার বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

রমেশ যথার্থ পুলিসের লোক। গদাধরের রোদনে তাহার হৃদয় কিছুমাত্র আর্দ্র হইল না। কহিল " ছি গদাধর বাবু, ও কি? অমন কর তো আমি এক্ষণই সব কথা ভেঙ্গে দেব। চুপ করে বোসে কাজের কথা বল। আমরা পুলিসের লোক, কত ব্যাটা আমাদের পায় ধরে থাকে।"

গদাধর পা ধরিয়াই আছেন। রমেশ ছাড়াইতে পারিল না।

ক্ষণকাল নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিয়া গদাধর পুনরায় কহিল " রমেশ বাবু, টোমার পায়ে পড়ে আছি টবু কি টোমার ডয়া হয় না। আমার ধন, মান, প্রাণ সকলি টোমার হাটে। টুমি রক্ষা করিলেই ঠাকে। টুমি যদি না রক্ষা কর টবে আমি আর বাঁচি নে।"

রমেশ (এবার গদাধরকে ঠাট্টা করিয়া গদাধরের স্বরে) কহিল " টোমার মান, ধন, প্রাণ সকলি টোমার হাটে। টুমি যদি না রাখ টবে আমার সাড্য কি আমি রাখি।"

গদাধর। ' রমেশ বাবু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা ডিওনা।'

রমেশ চুপ করিয়া রহিল। গদাধর মনে করিলেন রমেশের দয়া হইল। পা ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন " টবে কি বল রমেশ বাবু?"

রমেশ। " নগদ কোম্পানি সিক্কা এক শ টাকা।"

গদাধর। " টবে আমাকে কেটে ফ্যাল।"

রমেশ। " আমি কাট্‌বো কেন, যারা কাটবার তারাই কাটবে।"

গদাধর দেখিলেন রমেশ ১০০ টাকার কম কোন মতেই ছাড়ে না। তখন রমেশকে বসিতে বলিয়া নিজে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

রমেশ একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন "বাছা ধন ঘু ঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি। এখন হয়েছে কি? আগে জেলে যাউন তখন সুখ পাবেন। ভগিনীপতির টাকায় বাবুয়ানার ফল পাবেন। আর লম্বা কোঁচা বাঁকা সিঁতি থাকবে না।"

অর্দ্ধ ঘণ্টা আন্দাজ বাটির মধ্যে থাকিয়া গদাধরচন্দ্র ম্লান মুখে পুনুরায় ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন রমেশ যেখানে ছিলেন সেই খানেই বসিয়া আছেন। গদাধরকে দর্শন করিয়া রমেশ জিজ্ঞাসা করিল "কি খবর?"

গদাধর "আর ভাই খবর কি! আমি টো টোমাকে বলেছি আমার হাটে এক পয়সাও নাই। ডীডীর কাছে ঠেকে টাকা বের করা কি সহজ কটা? লোকে ডিডিকে খোলা ঝাড়ার মেয়ে বলে গালি দেয়। টা পরের কাজ কি, আজ আমারি ইচ্ছা কচ্ছে আমিই খোলা ঝাড়ার মেয়ে বলে গালি ডি।"

রমেশ একটু হাসিয়া কহিল, "আমরাও ইচ্ছা কচ্ছে আমি তোমাকে খোলাঝাড়ার ছেলে বলি। কিন্তু কাজের কথা কি এখন বল। আমি আর দেরি করিতে পারি না। জানতো ভাই আমরা পুলিশের লোক, কোনখানে দুদণ্ড থাকবার যো নাই। একরকম জবাব পেলেই আমি চলে যাই। পরের কাজে মিথ্যা সময় নষ্ট করা কি উচিত?" রমেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রেরও উত্তম জ্ঞান আছে?

গদাধর কহিলেন। "ভাই বিশেষ কেঁড়ে কেটে বলায় ডিডি ডিটে স্বীকার হয়েছে। প্রথমে কিছুই ডেবে না, টার পর পঞ্চাশ টাকা। টার পর আমি অনেক বলে কয়ে, আর মা অনেক কেঁডে কেটে ১০১ টাকা ডিতে স্বীকার কর্‌রাইয়া আসিয়াছি। টোমার ১০০ টাকা আর ঐ রোমের (গদাধর রমকে রোম বলিতেন) ডাম এক টাকা।"

রমেশ কহিল। "তবে টাকা আন।"

গদাধর। "আজিই?"

রমেশ। "এখুনিই।"

গদাধর। "টা টো হবে না।"

রমেশ। তা না হলে চলে কই। তোমার কাছে বলবো ভাই তার দোষ কি? কারণ তোমার কথা সাক্ষীর মধ্যে গণ্য নয়। সকাল বেলা ঐ চিটীটে শুনে অবধি আমারও গা কাঁপছে। বলা যায় না, ফৌজদারির হ্যাঙ্গাম, কোথা থেকে কোথায় যায়। আমার ইচ্ছা করছে আমিই আগে প্রকাশ করি তা হলে তো আমি বেঁচে যাব। হয় ত এতক্ষণ বোলে ফেলতেম, তা তোমার বিস্তর অনুরোধে বলি নাই। আর কেহ হলে আমি ছেড়ে কথা কৈতাম না, কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাদা কথা। তোমাকে ভাই এত ভাল বাসি বলেই বলি নাই। যদি এবিপদে আর কেহ পড়তো তা হলে কি আমি পাঁচ শত টাকার কম ছাড়িতাম? তবে তুমি নিতান্ত আত্মীয় বলেই ১০০ টাকায় সম্মত হইয়াছি। যদি নগদ পাই তবে "পেটে খেলে পিটে সয়" মনে করিয়া চুপ করে থাকি। কিন্তু নগদ না পেলে ভাই বড় সুবিধা হবে বোধ হয় না।"

রমেশের কথা শুনিয়া গদাধরচন্দ্র পুনরায় বিরস বদনে বাটীর মধ্যে গেলেন। এবং ঘণ্টা খানেক পরে

১০০ টাকা আনিয়া রমেশের হাতে গুণিয়া দিলেন। রমেশ টাকা লইয়া থানায় গমন করিল।

বিধুভূষণের দেশে প্রত্যাগমন—সরলার ঋণ পরিশোধ।

ভাদ্রমাস। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। টীপ্ টীপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বের সাত দিবস অনবরত বৃষ্টি হইয়াছে। রাস্তায় কর্দ্দমময়। অধিকন্তু গাড়ির চাকায় কাটিয়া গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল হইয়াছে, সেগুলি জলে পরিপূর্ণ। তাহার দুই পার্শ্বে মৃত্তিকা উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। অসাবধানতা প্রযুক্ত তথায় পদপ্রক্ষেপ করিলে পিচকারির ন্যায় বেগে পঙ্কিল সলিল উঠিয়া সমুদায় বস্ত্রাদি নষ্ট করিয়া ফেলে। যেখানে রাস্তার ধারে বৃক্ষাদি আছে সেখানে শুষ্কপত্র পড়িয়া জল সংযোগে পচিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করিয়াছে। গ্রামের মধ্যে প্রতি গৃহ হইতে ধুম উঠিতেছে, গৃহস্তেরা বেলা থাকিতে থাকিতে বাহিরের কর্ম্ম সমাধা করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিতেছে, ঝিঝি, মসা ইত্যাদি নানাবিধ কীট পতঙ্গ উড়িতেছে, ভেককুল আনন্দে রব করিতেছে, ঝিল্লীগণের কর্কশ স্বরে কর্ণে তালা লাগিতেছে। গাভী, ছাগ, মেষ, প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু একটীও বাহিরে নেই। মনুষ্যের গতায়াত অনেকক্ষণ বন্ধ হইয়াছে।

এমন সময়ে দুইটী পথিক কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাইতেছে। পথিকদ্বয়ের বাম হস্তেএকটী একটী ক্ষুদ্র ব্যাগ, দক্ষিণ হস্তে একটী ২ কাপড়ের ছাতি; গায়ে পিরাণ, মস্তকে চাদরের উষ্ণিব, পদযুগ বিনামা শূন্য। যে অগ্রে যাইতেছে তাহাকে দেখিলে বড় শ্রান্ত বোধ হয় না। কিন্তু যে পশ্চাৎ ২ যাইতেছে তাহার পদ প্রক্ষেপ দর্শন করিলে বোধ হয় যেন তাহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। সন্ধ্যাও হইল, পথিকদ্বয়ও এক গ্রামে প্রবেশ করিল। এতক্ষণ তাহারা পরস্পর কথা কহে নাই, কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী অগ্রগামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল "দাদা ঠাকুর আজি আর চলে কাজ নেই, এই গ্রামেই থাকা যাউক।" "এই কথাটী এমন মৃদুস্বরে কহিল যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি শুনিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিত পথিক কোন না কোন প্রকার ভয় পাইয়াছে। বোধ হয় কথা শুনিয়া পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে বক্তা নীলকমল এবং যাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিল তিনি আমাদের বিধুভূষণ।

প্রথমবার কোন উত্তর না পাইয়া নীলকমল পুনরায় পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে কহিল "দাদা ঠাকুর,পূজার সময় রাত্রে রাস্তাচলা কিছু না, এস আমরা এক বাড়ী থাকি, কালি রাত থাকিতে উঠে চলে যাব।'

বিধু একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন "কেন নীলকমল, এখন ভয় কর কেন? আগে তো তুমি চোরের ভয় করিতে না?"

নীলকমল কহিল "আগে কিছু ছিল না, এখন কিছু হয়েছে। কিন্তু যা বল্লাম সে কথার কি?'

বিধুভূষণ উত্তর করিলেন 'এই গ্রামের পরই হাঁসখালি। হাঁসখালি গেলেই তো বাড়ী গেলাম। এই টুকুর জন্যে এখানে থেকে কষ্ট পাওয়া কি ভাল ? তুমি যে ভয়ের কথা কহিতেছ এখানে সে ভয়ের কোনই কারণ নাই। এ কৃষ্ণনগরের নিকট, এখানে কি রাস্তার লোক কেউ মেরে নিতে পারে।'

'তবে চল। কিন্তু যদি আমার কথা শোন তবে এই খানেই থাকা উচিত।'

বিধুভূষণ নীলকমলের কথা না শুনিয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। নীলকমলও কিন্তু অত্যন্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিয়দ্দূর নীরবে গমন করিয়া বিধুভূষণ সম্মুখে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "নীলকমল সেই গাছ তলা দেখা যাইতেছে।" নীলকমল একটু হাসিয়া উত্তর করিল "সেই একদিন আর এ এক দিন।"

পুনর্ব্বার কিয়দ্দূর নীরবে গমন করিয়া সেই বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইলে, বিধু কহিলেন নীলকমল চল গাছ তলায় বসিয়া আর একবার তামাক খাই।"

নীলকমল উত্তর করিল "দাদা ঠাকুর অত্রার মা যা বলেছেন তাই। তুমি মনের কথা টেনে বলেছ।'

উভয়ে বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন। নীলকমল অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল "দাদা ঠাকুর তুমি ঠিক যেখানে বসেছ ঐখানেই বসেছিলে আর আমিও এখানে এসে বসেছিলাম। তুমি আমাকে দেখে ডরিয়ে উঠেছিলে।"

বিধুভূষণ চতুর্দ্দিগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

হায়! আমাদের যে দিনটী যায় সেটীর মতন আর আইসে না। বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া কে কদিন সুখ ভোগ করিয়াছেন ? কাহার চিত্ত আর নবযৌবনের ন্যায় সৌহৃদ্য বা প্রণয় রসে অভিষিক্ত হইয়াছে ? * সংসার তোমাকে ধন্যবাদ! তোমাকে প্রবেশ করা আর বিস্মৃতি হ্রদে অবগাহন করা উভয়েই সমান। বিদ্যালয়ে থাকিতে যে সুহৃদকে অবলোকন করিলে ভাবনা চিন্তা দূর হইয়া যাইত, যাহার মুখে হাসি দেখিলে হৃদয়াকাশে শরচ্চন্দ্রের জ্যোতির ন্যায় প্রভা বিকীর্ণ হইত, যাহার বিরহ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর বোধ হইত; সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে যাহার চিরসহচর হইব মনে হইত; এখন সে প্রিয় সুহৃদ কোথায় ? সকলেই স্বার্থপর পাশে আবদ্ধ হইয়া আপনাপন চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছে! মুখ তুলিয়া অগ্রে পশ্চাতে কে আছে দেখিবার অবকাশ নাই।

চারি বৎসর অগ্রে বিধুভূষণের চিত্ত এক প্রকার ছিল। এখন আর এক রূপ হইয়াছে। অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হওয়া অবধি প্রকৃত সুখের সঙ্গে চিরবিদায় লইয়াছেন। নবযৌবনের সুখের সহিত

*স্বভাবের শোভা দর্শনে কাহার অন্তঃকরণে আর সেরূপ নির্ম্মল প্রীতির সঞ্চার হইয়াছে ?

সংসার জ্বালা যন্ত্রণা তুলনা করিলে কাহার হৃদয়ে না শোকানল জ্বলিয়া উঠে? কে দীর্ঘ নিশ্বাস না ছাড়িয়া থাকিতে পারে?

নীলকমল চকমকি ঠুকিয়া আগুণ বাহির করিল। উভয়ে তামাক খাইয়া বৃক্ষ মূল হইতে পুনরায় যাত্রা করিলেন।

বহুকাল বিদেশে থাকিয়া বাটি আসিবার সময় মনোমধ্যে কত প্রকার ভাবের উদয় হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কখন কখন আনন্দে হৃদয় উচ্ছলিত হইতে থাকে, কখন কখন ভয়ে শরীরকে কম্পিত করে। যাহাদিগকে বাটি রাখিয়া গিয়াছিলাম তাহাদিগকে সুস্থকায় দেখিতে পাইব ভাবিলে মনে কতই আহ্লাদ হয়; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে কি হয় তাহা যে স্থলে জানা যায় না সেখানে যে সকলকে পূর্ব্ববৎ দেখিব তাহারি বা প্রমাণ কি? এরূপ চিন্তায় হৃদয়কে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। বিধুভূষণ পর্য্যায় ক্রমে ভাল মন্দ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বাটির দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইলেন। বাটি হইতে যাইবার সময় দেখিয়া গিয়াছিলেন বাটীতে লোক ধরে না। তখন শশিভূষণের নূতন বাটী প্রস্তুত হয় নাই। শশিভূষণ তাঁহার সন্তানাদি গদাধরচন্দ্র ও ত্বদীয় জননী ও খুল্লতাত প্রভৃতি সকলেই এক বাটীতে থাকিতেন। সুতরাং অহর্নিশ বাটীতে গোলমাল থাকিত। বিধুভূষণ এখন বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া সে গোলমালের চিহ্নমাত্রও শুনিতে পাইলেন না। ভয়ে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া নীলকমলকে কহিলেন "নীলকমল তুমি ডাক দেখি একবার "বাড়ী কে আছে বলে?" বিধুভূষণের নিজে উচ্চ কথা কহিবার সামর্থ্য হইল না। নীলকমল উচ্চঃস্বরে "বাড়ী কে আছ" বলিয়া দুই তিন বার চীৎকার করিল। কোনই উত্তর নাই। বিধুভূষণ কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন "সর্ব্বনাশ হইয়াছে।' নীলকমল পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল। এবার শ্যামা বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'এত রাত্রে তোমরা কারা দরজায় ঘা দিচ্ছ?"

নীলকমল 'বাহির হইয়া দেখ।'

শ্যামা দরজা খুলিয়া দেখিল দুটী লোক। একটী দরজার ধারে বসিয়া আর একটী দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কারা?

বিধুভূষণ জিজ্ঞাসিলেন "শ্যামা তোমরা সব ভাল আছ?'

শ্যামা বিধুভূষণের স্বর জানিতে পারিয়া কম্পিত কলেবরে উচ্চৈস্বরে কহিল 'তুমি কোথা থেকে এলে?'

বিধুভূষণ কহিলেন 'শ্যামা স্থির হও। বাটীর সকলে ভাল আছে?' শ্যামা একটু বিলম্বে কহিল 'প্রাণে ২। তুমি কোথাথেকে এলে?,

বিধুভূষণ শ্যামার কথা শুনিয়া 'মা দুর্গা' বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কহিলেন 'শ্যামা আমি কোথা থেকে এলাম যে জিজ্ঞাসা করলে? আমার পত্র কি পাও নাই।'

শ্যামা কহিল "তুমি বাড়ী ছাড়া অবধি পত্র পাওয়া দূরে থাকুক, কোন

লোকের মুখে তোমার খবর পাই নাই। খুড়ি মা ভেবে ভেবে প্রায় এখন তখন এমনি অবস্থা হয়েছে।”

বিধু। “আর গোপাল—সে কেমন আছে?”

শ্যামা। “সে ভাল আছে।”

বিধু। “তবে চল শ্যামা বাড়ীর মধ্যে যাই?”

শ্যামা কহিল “এখন বাড়ীর মধ্যে গেলে খুড়ী মা মূর্চ্ছা যাবেন। তোমরা এইখানে বোসো, আমি আগে গিয়া তাঁকে বলি, তার পর তোমাদের লইয়া যাইব।”

বিধু কহিলেন। “শ্যামা সরলা কি এতই কাহিলী হইয়াছে যে আমাদের বাটী আসার খবর শুনিয়া মূর্চ্ছা যাইবেক?”

শ্যামা। “বড় কাহিলী।”

বিধুভূষণ শ্যামার নিকট সরলার অসুস্থতার খবর পাইয়া বড় অধিক কাতর হইলেন বোধ হইল না। তাঁহাকে এত ভাল বাসেন যে তাঁহার বিরহে কাহিলী হইয়াছেন শুনিয়া যেন বিধুভূষণের দুঃখের মধ্যে কিঞ্চিৎ সুখের উদয় হইল। যেন অন্ধকার রজনীতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ খেলিল। হায়! ভাবিয়া ভাবিয়া সরলার যে যক্ষ্মারোগ হইয়াছে বিধুভূষণ আর তাহা জানিতে পারিলেন না!

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে শ্যামা আসিয়া বিধুভূষণকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বিধুভূষণ সরলার গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত প্রায় হাসিতে ২ গমন করিলেন বলিলে হয়। কিন্তু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি বসিয়া পড়িলেন। সরলাকে আর চেনা যায় না এরূপ কৃশ। কিন্তু তথাপি বিধুভূষণের নাম শুনিয়া তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন। বিধুভূষণকে দেখিয়া সাশ্রুনয়নে হাসিতে হাসিতে কহিলেন “এতদিনের পর কি দুঃখিনীকে মনে পড়েছে?”

বিধুভূষণ কাঁদিতে ২ কহিলেন, “সরলা এতকাল পরে তোমার নাম জপ করিয়াই আমি বাঁচিয়াছিলাম। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবি নাই যে তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখিব।”

সরলা হাসিয়া উত্তর করিলেন ‘এখন ভাল হবো। কিন্তু আজি আর অধিক বলিতে পারিতেছি না, আমার মাথা ঘুরিতেছে সর্ব্বাঙ্গ শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে’ এই বলিয়া সরলা শয়ন করিলেন। শ্যামা নিকটে বসিয়া সরলার কেশ একত্র করিয়া বাঁধিয়া দিল।

রজনী প্রভাত হইলে সরলা প্রত্যূষে নিজে উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছেন। তদ্দর্শনে শ্যামার যার পর নাই আহ্লাদ হইল। শ্যামা মনে করিল ভাবিয়া ভাবিয়া সরলা এরূপ কৃশ হইয়া ছিল। সরলাকে সম্বোধন করিয়া কহিল ‘খুড়ী মা দেখ দেখি আমি তো বলেছিলাম খুড়াঠাকুর বাড়ী এলেই তোমার ব্যামো সব আরাম হয়ে যাবে।’

সরলা কহিলেন “শ্যামা তুমি আমার লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি আমার অন্নপূর্ণা। তোমার কথা সত্যি হবে না তো কার কথা সত্যি হবে?’

সরলার কথা শুনিয়াই শ্যামা বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। শ্যামার মহৎ

দোষ সে নিজের প্রশংসা শুনিতে পারে না। আহা! শ্যামার পরকালে কি উপায় হবে? ‘পৃথিবী সংশোধনী সভায়’ যদি শ্যামা অন্ততঃ দু দিন যাইতে পারিত তাহা হইলে শ্যামার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি থাকিত না!!

রজনীর প্রথম ভাগে চিন্তায় বিধুভূষণের নিদ্রা হয় নাই। শেষ রাত্রে একটু ঘুম হইয়াছিল। এজন্য বিধুভূষণ সকালে উঠিতে পারেন নাই। শ্যামা পাক শাকের উদ্যোগ করিয়া দিয়াছে এমন সময় বিধুভূষণ শয্যা হইতে উঠিলেন। সরলা উঠিয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া বিধুভূষণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সরলা অত্যন্ত কাহিলী বটে কিন্তু এরূপ ভাবে বেড়াইতেছেন এবং এরূপ প্রফুল্ল চিত্তে কথা বার্ত্তা কহিতেছেন যে সকলের দেখিয়া যার পর নাই আহ্লাদ হইল। সরলা রন্ধন করিতে প্রস্তুত হইলেন কিন্তু শ্যামা কোন মতেই তাঁহাকে রান্নাঘরে যাইতে দিবে না। সরলা কহিলেন “আমি না রাঁদ্‌লে কে রাঁদ্‌বে, শ্যামা?”

শ্যামা কহিল “ঠাকরূণ দিদিকে ডেকে আনি।”

সরলা কহিলেন “শ্যামা, ঠাকরূণ দীদী কি আসবেন?”

শ্যা। “খুড়ী মা পয়সা হইলে সকলি হয়। আমাদের ভাবনা কি?” বস্তুতঃ শ্যামা যাহা বলিয়াছিল তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। ঠাকরূণদীদী যে শুনিলেন যে বিধুভূষণ অনেক টাকা লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন অমনি আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া চলিয়া আসিলেন। সরলাকে দেখিয়া ঠাকরূণদীদী কহিলেন “বাছা আমার তুমি এমন কাহিলী হয়েছ, আমাকে এক দিনও বল নাই?”

সরলা একটু হাসিলেন আর উত্তর করিলেন না।

বিধুভূষণ অনেক টাকা লইয়া বাটী আসিয়াছেন এ কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল। সকলেই দেখা করিতে শশব্যস্ত। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক গদাধরচন্দ্র স্বয়ং আসিলেন। আগে যাহারা ঘৃণায় কথা কহিত না এক্ষণে যেন তাহারা চির সুহৃদের ন্যায় হইয়া উঠিল। “রজতের” কি মহিমা!

লোকের সহিত আলাপ করিতেই বিধুভূষণের প্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। বাটির মধ্যে আসিয়া যে সরলার কাছে দু দণ্ড বসেন, সন্ধ্যার অগ্রে তাঁহার অবকাশ হইল না। সন্ধ্যার সময় সকলে চলিয়া গেলে বিধুভূষণ বাটীর মধ্যে আসিলেন।

সরলা প্রাতঃকালে শরীরে এরূপ বল পাইয়াছিলেন যে তাঁহার মনে হইয়াছিল তিনি যেন পূর্ব্বের ন্যায় নীরোগ অবস্থায়ই আছেন। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত সরলা সহাস্য বদনে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাজ কর্ম্ম করিলেন। কিন্তু দুই প্রহরের পর হইতে তাহার হস্ত পদ বল শূন্য হইয়া আসিতে লাগিল। কাহাকে কিছু না বলিয়া আপনার ঘরে গিয়া শয়ন

করিলেন। শ্যামা যে কোন কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকুক, তাহার এক চক্ষু নিয়তই সরলার উপর থাকিত। সরলা শয়ন করিলেই শ্যামা তাহার বিছানার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "খুড়িমা আবার শুলে যে?"

সরলা উত্তর করিলেন 'শ্যামা কাল রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই। ঘুমে আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। আমাকে জাগাইও না, আমি একটু ঘুমাই।' সরলা এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। শ্যামা আপনার কাজ করিতে গেল।

ক্ষণকাল পরে শ্যামা আবার সরলার বিছানার নিকটে গেল। সরলা এখনও নিদ্রা যাইতেছেন। মুখমণ্ডলে আর কোন চিন্তার লক্ষণ নাই; প্রফুল্ল কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এত বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, বায়ু শীতল হইয়াছে, তথাপি সরলার ঘর্ম্ম হইতেছে। শ্যামা অঞ্চলদ্বারা আপনার হস্ত পরিষ্কার করিয়া আস্তে আস্তে সরলার কপাল স্পর্শ করিল। কপাল শীতল। কিন্তু শ্যামার হস্তস্পর্শে সরলা চমকিয়া উঠিলেন। পাছে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় শ্যামা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তথা হইতে চলিয়া আসিল।

শ্যামা বাহিরে আসিয়া ভাবিল এখন 'গ্রীষ্ম কিছু নেই, তবু গা ঘামে কেন?' কিন্তু সরলা বহুকাল শয্যাগত ছিলেন, আজি উঠিয়া বেড়াইয়া কাজ কর্ম্ম করিয়াছেন, সুতরাং শ্যামার কোন ভয় হইল না পরন্তু মনে করিল শ্রান্তি প্রযুক্ত সরলার শরীরে ঘর্ম্ম হইতেছে।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল সরলার তথাপি নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। বিধুভূষণ বাড়ীর মধ্যে আসিয়া সরলাকে নিদ্রিত দেখিয়া শ্যামাকে জিজ্ঞাসিলেন 'শ্যামা সেই ঘুম এখনও ভাঙ্গে নাই?' শ্যামা কহিল 'না।' তখন বিধুভূষণ শয্যার শীয়রে বসিয়া সরলার কপালে হাত দিলেন। কপাল যেন হিম পাথর। বিধুভূষণ কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া 'সরলা, সরলা' বলিয়া ৩। ৪ বার ডাকিলেন।

সরলা চক্ষু মেলিয়া বিধুভূষণকে দেখিতে পাইলেন। পাইয়া বিস্ময়াত্মক স্বরে কহিলেন 'কে তুমি?' বিধুভূষণের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার কহিলেন 'না আমার ভুল হয়েছিল। চিনেছি এখন। তুমি বুঝি আমার গোপালকে নিতে এসেছ? তা পারবেনা আমি যাচ্চি।'

সরলা প্রলাপ বকিতেছেন।

বিধুভূষণ ৩। ৪ বার বড বড় করিয়া সরলার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। সরলা উত্তর করিলেন "কি? একশবার ডাক কেন? এই যাচ্ছি।" এই বলিয়া সরলা পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

বিধুভূষণ রোদন করিতে করিতে ঘরের বাহিরে আসিলেন। শ্যামাকে ডাকিয়া কহিলেন "শ্যামা সরলা বুঝি ফাঁকি দিলে। তুমি ঘরে যাও, আমি দেখি যদি একজন ডাক্তার পাই।"

শ্যামা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া ঘরে আসিল। দেখিল সরলা পূর্ব্ববৎ নিদ্রা

যাইতেছেন। "খুড়ি মা" "খুড়িমা" করিয়া ডাকিল, সরলা উত্তর দিলেন না। নিশ্বাস স্বাভাবিক বহিতেছে, মুখভঙ্গী স্বাভাবিক আছে। কিন্তু সরলার শরীর শীতল হইয়াছে। শ্যামা পায়ের কাছে বসিয়া সরলার পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

গোপাল অনেক দিনের পর আজি মাতাকে একটু ভাল দেখিয়া ভুবনের সহিত খেলা করিতে গিয়াছে। বিধুভূষণ ডাক্তার ডাকিতে যাইবার সময় ভুবনদের বাড়ী গিয়া ভুবনের মাতাকে সরলার অবস্থা জানাইয়া গোপালকে সে রাত্রে সেইখানে রাখিতে বলিয়া গেলেন।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে বিধুভূষণ ডাক্তার সমভিব্যাহারে ফিরিয়া আসিলেন। ডাক্তার বাবু আসিয়াই রোগীকে একটু আরোক খাওয়াইয়া দিলেন। পরে বসিয়া শ্যামা ও বিধুভূষণের নিকট সমুদায় বিবরণ অবগত হইলেন। ঘড়ি খুলিয়া সরলার নাড়ীর গতি দেখিলেন, তৎপরে যন্ত্রদ্বারা সরলার বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ পরীক্ষা করিলেন। তখন বিধুভূষণ চিন্তাকুল চিত্তে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন দেখলেন মহাশয়?"

ডাক্তার উত্তর করিলেন। "রোগ সাংঘাতিক। বাঙ্গালায় ইহাকে যক্ষ্মা বলে। এরোগ কখন আরাম হয় না। পুস্তকে লেখে বটে যে দৈবাৎ আরোগ্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আমি এই ৩০ বৎসরের মধ্যে একটিকেও আরাম হইতে দেখি নাই। রোগীর ছেহারায় বোধ হইতেছে ৪।৫ বৎসর এরোগের সূত্রপাত হইয়াছে। বোধ হয় প্রথমাবধি যত্ন করিলে আরও ২।১ বৎসর বাঁচিবার সম্ভব ছিল কিন্তু সে অনুমান মাত্র। এরোগে কখন মৃত্যু হয় তাহার স্থিরতা নাই। এক্ষণে যে এত মন্দ দেখা যাইতেছে তথাপি এমন হইতে পারে যে এখনও ৫।৬, মাস বাঁচিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত অসম্ভব। আমার বোধ হইতেছে অদ্য শেষ রাত্রেই ইঁহার প্রাণত্যাগ হইবেক। অদ্য সকালবেলা হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত ভাল ছিলেন সে কেবল আপনার আগমন প্রযুক্ত। তাহাতেই রোগীর মনে উৎসাহ উৎপাদিত হইয়াছিল। কখন কখন সুসমাচার পাইলে অম্বুঃজলের রোগীও পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া ৪।৫ দিন বাঁচিয়া থাকে। বোধ হয় আপনি যদি এমন সময় বাটী না আসিতেন তাহা হইলে আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিতেন। কোন উৎসাহ হইলেই কিঞ্চিৎ পরে তাহার বিপরীত ফলোৎপত্তি হয়। রোগীর তাহাই হইয়াছে। বাঁচিতেও পারেন, নাও পারেন। কিন্তু অদ্য বাঁচিলেও অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না।"

ডাক্তারের কথা শুনিয়া বিধুভূষণ ম্রিয়মাণ হইলেন। "হায় আমিই সরলার মৃত্যুর কারণ হইলাম" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

ডাক্তার বাবু কহিলেন। "আপনি যদি ছেলে মানুষের মতন অমন কাঁদেন তাহা হইলে আপনি ঘরে থাকিবার যোগ্য নহেন। এখনও বলা যায় না কি হইবে। হয়তো বাঁচিতে পারেন। কিন্তু অমন গোলমাল করিলে সে সম্ভব তত থাকিবেক না।"

বিধুভূষণ কহিলেন। 'মহাশয় আর না। আর কাঁদিব না; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন আমি বাটী না আসিলে আর কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভব ছিল। একথা শুনিয়া কি আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারি ?'

ডাক্তার বাবু সস্নেহে বিধুভূষণের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন 'সে অনুমান মাত্র আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাহা না হইলেও গত বিষয় লইয়া কষ্ট পাইবার দরকার কি? যে বিষয় আর সংশোধিত হইবার যো নাই তাহা মনে না করাই ভাল।'

বিধুভূষণ চুপ করিয়া বসিলেন। ডাক্তার বাবু অনন্যমনা হইয়া সরলার মুখপানে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল পরে সরলার ঠোঁট নড়িল। সরলা অস্পষ্টস্বরে যেন জল জল বলিলেন, শ্যামা জল দিতে গেল। ডাক্তার বাবু শ্যামার হস্ত হইতে গেলাস লইয়া একটী ঝিনুকে একটু জল ও আর একটু আরোক একত্র করিয়া সরলাকে খাওয়াইয়া দিলেন। সরলা খাইয়া মুখ বক্র করিয়া কহিলেন 'বড় ঝাল।'

ক্রমে ক্রমে সরলার চৈতন্য হইল। বিধুভূষণ আর থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে সরলাকে কহিলেন "সরলা তোমার আর এক দিনের তরেও সুখ হইল না।"

সরলার এক্ষণে উত্তম জ্ঞান হইয়াছে। মৃত্যুর অগ্রে প্রায় সকলেরি হইয়া থাকে। এক দৃষ্টে বিধুভূষণের দিকে চাহিয়া কহিলেন "তুমি কাঁদিতেছে কেন?"

বিধুভূষণ কহিলেন "সরলা তুমি চলিলে, আর আমি কাঁদিতেছি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছে?"

সরলার প্রেমময় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ডাক্তার বাবু রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিলেন।

সরলা কহিলেন। "আমি যাইতেছি সত্য কিন্তু আমার সুখ হয় নাই কে কহিল? পতির সেবা ও সন্তান পালন করা আমাদের প্রধান সুখ তাহা আমার হইয়াছে। যে টুকু দুঃখ ছিল তাহা কালি তুমি বাড়ী আসায় দূর হইয়া গিয়াছে। আমার ন্যায় সুখী কজন হযেছে?"

বিধুভূষণ কহিলেন "সরলা তুমি আর ও কথা বোলো না, তাহলে আমার বুক ফেটে যাবে।"

সরলা বিধুভূষণের হস্ত ধরিয়া কহিলেন "শেষ কালে আমার এক অনুরোধ আছে।" এই বলিয়া শ্যামার দিগে চাহিলেন। সরলার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল বহিতে লাগিল। বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিলেন না। শ্যামা উচ্চৈঃস্বরে রোদনকরিয়া উঠিল। ডাক্তার বাবু থামাইবেন কি তাঁহারও আর কথা বলিবার সামর্থ্য রহিল না। অবিশ্রান্ত কেবল রুমাল দিয়া মুখ চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

বিধুভূষণের হস্ত সরলার হাতেই আছে। তিনি এক পরে কহিলেন "অনুরোধ এই যে শ্যামাকেকখন দাসী বোলে মনে করো না। চিরকাল তো-

মার যেন জ্ঞান থকে যে শ্যামা তোমার আপন মেয়ে।” সরলা আবার চুপ করিলেন।

বিধুভূষণ কহিলেন। “সরলা, শ্যামা সুদু আমার মেয়ে নয় শ্যামা আমার মা। শ্যামা ছিল বোলেই আমরা এখন বেঁচে আছি। শ্যামাকে যদি আমি ভুলি তবে আমার নরকেও স্থান হবে না।”

বিধুভূষণের কথা শেষ না হইতে হইতেই শ্যামা গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

ডাক্তার বাবু অনেক চেষ্টা করিয়া চক্ষু মুছিয়া ঝিনুকে করিয়া আর একটু ঔষধ সরলার কাছে লইয়া গিয়া কহিলেন “এই টুক খাউন দেখি ?”

সরলা কহিলেন “আর কেন ? ওষুধে আর আমার দরকার কি ?”

বিধুভূষণ কহিলেন “সরলা খাও। এখনও তোমার পীড়া তত শক্ত হয় নাই।”

সরলা কহিলেন “আমার নিজের শরীরের ভাব আমি বুঝি। আমি এত দিন মরিয়া যাইতাম। কেবল তোমাকে দেখিব বলিয়াই জীবনটা বাহির হয় নাই। একবার আমার গোপালকে ডাকিয়া দাও ?”

বিধুভূষণ ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিলেন। ডাক্তার বাবু কহিলেন ‘এখন আর কি ? যা বলিতেছেন তাই কর।’

শ্যামা দৌড়িয়া গিয়া গোপালকে কোলে করিয়া আনিল। সরলার নিকট আনিয়া নামাইয়া দিতে গেল। সরলা কহিলেন ‘না—না অমনিই থাক।’ তখন গোপালের এক হাত ও শ্যামার এক হাত ধরিয়া কহিলেন ‘গোপাল তুমি সে দিন যে দিব্বি করেছিলে তা মনে আছে তো ? শ্যামা তোমার মা, তোমার যথার্থ মা। দেখো যেন তোমার দিব্বি মনে থাকে।’ পরে শ্যামার দিকে চাহিয়া কহিলেন ‘শ্যামা তুমি আমার বিস্তর করেছ। আমার মা বাপও এমন করিতেন না—আমার গর্ভের মেয়ে এমন করিত কি না সন্দেহ। তোমার ধার এ জন্মে তো হলোই না, আর কোন জন্মে যে শোধ দিতে পারিব তাহাও অসম্ভব। আমি তোমাকে কি দেব ? আমার সর্ব্বস্ব ধন গোপাল। শ্যামা গোপালকে আমি জন্মের মত তোমাকে দিয়া গেলাম।’

সরলার কথা শুনিয়া সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সরলার চক্ষের তারা দেখিতে দেখিতে মস্তকে উঠিল।

সকলে ধরা ধরি করিয়া সরলাকে বাহিরে আনিল। মুহূর্ত্তেকে সরলা জন্মের মতন চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

রমেশ বাবু পুলিসের লোক।

রমেশ বাবু পুলিসের লোক। গদাধরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুলিসেই গেলেন। রাত্রে দারগা বাবু গারদ ঘরের পাহারার জন্যে ডায়ারিতে রমেশের নাম লিখিয়া রাখিয়াছেন। রমেশ আহারাদি করিয়া নিজের খাটিয়া খানা গারদ ঘরের বারাণ্ডায় রাখিয়া তাহার উপর বিছানা করিলেন; পরে

তামাক খাইলেন, ও চারিদিকে দেখিলেন — কেহ কোথায় নাই। আস্তে আস্তে বিছানার নিকট আসিয়া পাশ বালিশটীকে বিছানার মধ্যস্থানে লম্বা করিয়া রাখিলেন এবং তাহার এক ধার শীয়রের বালিশের উপর তুলিয়া দিলেন। তৎপরে এক খানি সিন্দুর দোলাই আনিয়া বালিশটীকে ঝাপিয়া দিলেন। দিব্বি বোধ হইতে লাগিল যেন একজন মানুষ শুইয়া রহিয়াছে। এই বন্দ বস্ত শেষ হইলে রমেশ বাবু একবার বাহিরে গিয়া হৃষ্ট চিত্তে দর্শন করিলেন। লোকে আগেই জানে যে রমেশ বাবু একবার ঘুমাইলে তাঁহাকে সহজে জাগান যায় না। বালিশ্‌কে কাহার সাধ্য জাগায়?

বন্দবস্ত পাকা হইলে রমেশ বাবু একটী সিন্দুক খুলিয়া দিব্বি একখানি ধুতি পরিলেন ও তাহার উপযুক্ত এক খানি চাদর লইয়া, একগাছী বেতের ছড়ি হাতে করিয়া চরিতে গেলেন। আমরা গ্রন্থকার, মনে করিলেই এখনি রমেশ বাবুর সঙ্গে ২ গিয়া তাহার সমুদায় বুজরূগী প্রকাশ করিয়া দিতে পারি। কিন্তু কাজ নাই। চোরদিগের মনে এক কুসংস্কার আছে যে থানায় সমস্ত রাত্রি পাহারা থাকে, এজন্য তাহারা থানায় কিম্বা তাহার নিকটে চুরি করিতে সাহস পায় না। কিন্তু কালে যখন তাহারা সুশিক্ষিত হইবেক তখন অন্যান্য কুসংস্কারের সঙ্গে ২ এটীও দূরীভূত হইবেক এবং তখন কি থানা কি অন্য স্থান সর্ব্বত্রেই সমান চুরি হইবেক। কারু হাসি কারু কান্না থাকিবেক না।

রাত্রি অবসন্না প্রায় হইল, রমেশ পুনরায় থানায় আসিলেন এবং পরিধান বস্ত্রাদি সিন্দুকে রাখিয়া পূর্ব্বে যে কাপড় খানি ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহাই পরিয়া শয়ন করিলেন।

সকাল বেলা সকলি উঠিয়াছে, রমেশ বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হয় না। লোকে কত ডাকিতে লাগিল তথাপি রমেশ বাবুর চৈতন্য নাই। এবার কিন্তু যথার্থই রমেশ বাবু অনেক ডাকা ডাকির পর উঠিলেন এবং একটু কাজ কর্ম্ম করিয়া ডাক হরকরাকে ডাকিলেন। হরকরা নিকটে আসিল। রমেশ বাবু হরকরাকে দেখিয়া কাছারি হতে বাহিরে আসিলেন এবং কহিলেন "হরকরা, যদি আমি তোমার কিছু লাভ করাইয়া দিতে পারি তবে আমাকে কি দাও?"

হরকরা কহিল "আপনি আমার কি লাভ করাইয়া দিবেন?"

রমেশ। তাতে তোমার কাজ কি? লাভ হলেই তো হলো? হরকরা হাসিয়া বলিল "আচ্ছা যদি বিশেষ লাভ হয় তবে অর্দ্ধেক দেব।"

রমেশ। "তবে হবে না। তুমি যা পাবে তার যদি ৩ ভাগ আমাকে দাও তবে আমি বলি।"

হরকরা মনে করিল সকলি ঠাট্টা, এজন্য অন্য কিছু চিন্তা না করিয়া কহিল, আচ্ছা দেব, বল।

তখন রমেশ বাবু গদাধর চন্দ্রের বৃত্তান্ত বলিলেন। হরকরা শঙ্কিত হইয়া কহিল "তবে তো আমাকে নিয়েও টানা টানি করিবে?"

রমেশ। তোর ভয় কি? তুই যা আদায় করিতে পারিস করিয়া আগে আমার ঘরে দে। তোর কোন

দোষ হবে না। আইনের এক ধারায় আছে যে নিজের চিটী নয় জানিতে পারিয়া যদি কেহ চিটী রাখে তবে তারি দণ্ড হবে। তোকে তো ও গোপাল বোলেই পরিচয় দিয়েছিল।

হরকরা রমেশের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে কহিল "তবে এখনই যাই।"

রমেশ। তা যাও কিন্তু ভাগের কথাটা যেন মনে থাকে। আমরা পুলি-শের লোক, গোল মাল বুঝিনা। এ কথা নিয়ে যেন এর পর আর গোল না হয়।

হরকরা শশীভূষণের বাটী পোঁছিয়া গদাধরকে দেখিয়া কহিল "মহাশয় আমার এক কথা আছে"

গদাধর পুর্ব্বরাত্রের কথা মনে করিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া রহিলেন। "কি কথা?"

হরকরাএকটু ধুত্তমীর হাসি হাসিয়া কহিল,"ঠাকুর তুমি বাপের নাম পর্য্যন্ত ভাড়াইতে পার? এত দিন যে চিটী গুল তোমার বাপের চিটী বোলে নীলে সেগুলা কার চিটী?"

হরকরার কথা শুনিয়া গদাধরের কাণও মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু রাগ করিয়া কিছু করিবার যো নাই সুতরাং ঢোক গিলিয়া কহিলেন "টোমাকে কে বলিল?"

হরকরা কহিল "যেই বলুক না কেন। এখন রক্ষা পাবার ইচ্ছা আছে না জেলে যাবে?"

গদাধর 'কেন? কেন? জেলে যাব কেন?'

হরকরা। "ঠাকুর ওসব কথা রেখে দাও। তুমি কিছুই জান না আর কি? এখন ভাল চাও তো আমাকে সন্তুষ্ট কর।'

গদাধর। "টোমাকে এ কটা কে বল্লে?"

হরকরা। "কাল যাকে টাকা দিয়েছ সেই বলেছে।"

গদাধর মনে ২ ভাবিতে লাগিলেন কি বিশ্বাসঘাতক। কালি আমি এত পায় ধরে, এত খোসামোদ কোরে রাজি কোল্লাম কারু সঙ্গে বলবে না, আজ এখনই প্রকাশ কোরে ফেলেছে? গদাধরের এরূপ ভাবনা হইল না, "আমি কি নরাধম, একজনের টাকা চুরি করিলাম আর একজনের নাম জাল করিলাম।' না হবারি কথা। গদাধর তো মনুষ্যের মধ্যে নহে। কত সাধুব্যক্তিরা আপনাদিগের মহৎ ২ দোষে অন্ধ কিন্তু অপরের ক্ষুদ্রতম অপরাধও বিলক্ষণ দেখিতে পান। নিজের মুখ দর্শনে সহস্রবার দেখিয়াও যদি লোকে মনে রাখিতে না পারে তবে যে নিজের চরিত্রের কথা বিস্মৃত হইবেক তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

গদাধর কহিলেন 'টুমি যেখানে টের পেয়েছ সেখানে আর টোমাকে লুকালে কি হবে। যঠাউই এই কম্ম হয়েছে। টোমাকে ডশটী টাকা ডিচ্ছি, আর যেন গোল যোগ না হয়।'

হরকরা। সেকি ঠাকুর দশ টাকা? দশ টাকার কথা কেমন করে মুখ দিয়ে বের করলে?"

গদাধর কহিলেন। 'টবে কট চাও'

হরকরা কহিল, ১০০টাকার কম নহে। কাল যা দিয়াছ আজও তাই লাগবে। রমেশ বাবুকে না দিলেই বা তিনি

তোমার কি করিতেন, কিন্তু আমার হাত তো ছাড়িবার যো নাই।"

গদাধর কহিলেন 'হরকরা টুমি আমার বাপ, আমারে রক্ষা কর,আমায় ১০০ একশ টাকা পোড়ে মরুক, ২০ টাকা ডেবার ক্ষমটাও নেই।'

হরকরা কহিল "ঠাকুর, বাপ কথা টা তো তোমার মুখে সহজ হয়ে গিয়েছে, বাপতো তুমি যাকে তাকে বল। কিন্তু তাতে তো আর কাজ উদ্ধার হয় না।'

গদাধর। টবে কি বল্লে উড্ডার হয় আমি টাই বলি।

হরকরা কহিল "কিছু বোল্লে উর্দ্ধার হবে না, টাকা চাই। বিনা টাকায় উদ্ধার নাই।'

গদাধর চন্দ্র হরকরাকে বসাইয়া আবার বাড়ীর মধ্যে গেলেন। আন্দাজ দুঘণ্টা পরে ২০টী টাকা আনিয়া হরকরার হাতে দিলেন।

হরকরা কহিল "আর ?'

গদাধর। "আমার যা সাট্য ডিলাম, আমাকে কাট্‌লেও আমার নিকট ঠেকে আর এক পয়শাও বেরোবার যো নাই।"

হরকরা। 'যদি একথা প্রকাশ হয় তখন কি হবে।'

গদাধর। "সে এখন টোমার টর্ম্ম। আমার যঠাসর্ব্বস্ব টোমাকে ডিয়াছি। টবে এক কটা এই, যদি প্রকাশ না কর টবে আর মাস খানেক পরে আর ৮০ টাকা ডেব।'

হরকরা দেখিল আর কিছু হবার যো নাই। তখন ফিরিয়া আসিল।

রমেশের কাছে আসিয়া কহিল '৫ টাকা বৈ হইল না।"

রমেশ। "পাচ টাকা কিরে। আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা ?"

হরকরা। "দোহাই খোদার যদি মিথ্যা কথা কই। যদি পাঁচ টাকার বেশী পেয়ে থাকি সে হারাম।' হরকরা মুসলমান।

রমেশ কহিলেন। "দেখ বাবা আমরা পুলিষের লোক, আমাদিগকে ফাঁকি দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে।" এই বলিয়া ঐ পাচ টাকার ৩ টাকা গ্রহণ করিলেন। হরকরা অত্যন্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক তিনটী টাকা দিল।

—।।০।।—

সরলার শ্রাদ্ধ।

বঙ্গদেশের কি চমৎকার প্রথা! জীবিতাবস্থায় আমরা যাহার জন্য এক টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হই, মৃত হইলে তাহার জন্যে অনায়াসে হৃষ্ট চিত্তে ১০ টাকা ব্যয় করিতে পারি। পীড়া হইলে ডাক্তারকে দু টাকা দিতে হইলে যে পরিবারে ১৫ দিবস এক সন্ধ্যা ব্যতীত দু সন্ধ্যা আহার চলে না, শ্রাদ্ধের সময় যদি তাহার অন্ততঃ ৫০ টাকা ব্যয় না করিলেই নয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া বসিলেন "তাহা না করিলে হাতের জল শুদ্ধ হইবেক না।" গ্রামের প্রধান প্রধান মহাশয়েরা এ দিগে লুচি মণ্ডার ইস্টীমিট করিতেছেন কিন্তু সে জীবিত থাকিতে তাহার সহিত এক দিবস আলাপ করেন নাই, পীড়িত হইলে এক দিবস দেখিতে আইসেন নাই। ক্রিয়া বাড়ীর লোকের চক্ষু অন্ধ। তাহারা মনে করিতেছে ইহারাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। আর ডাক্তার

বাবু একটি ডাকাত্। "তিনি জান্তেন রোগী বাঁচ্‌বে না তবু রোজ এসে এসে দশুনী বাড়ালেন। দেখলে্ন তো মহাশয়, এমন পাষণ্ড কি আর হয়? ছেলেটীকে অন্তর্জলে নামাচ্ছি এ দিকে ডাক্তার বাবু 'আমাকে বিদায় কর, আমাকে বিদায় কর' করছেন। ব্যাটার চক্ষের চামড়া নেই।' কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয়! একটু বিবেচনা করিয়া গালি দিবেন। ডাক্তারটি বড় পিশাচ আমি জানি, সে সময় অসময় বোঝে না। কিন্তু বেচারা কি করে? তার ব্যবসাই ঐ। আপনার ছেলেটির যখন অন্নপ্রাসন দিয়েছিলেন তখন ডাক্তারকে ডেকে দু টাকা দিয়েছিলেন কি? সে দিন যখন এত যাঁক যেঁামকে ছেলেটার বিয়ে দিলেন তখন কি ডাক্তারকে এক সাঁজ নিমন্ত্রণ কোরে খাওয়াইয়াছিলেন? আপনার ছেলের পীড়ার সময়ও তো সে যেচে আপনার বাড়ী আইসে নাই। না ডাক্‌লেই তো হোতো? ডেকে এনে কেন বেচারাকে গালি দেন?

বিধুভূষণের এখনও চক্ষুর জল শুখায় নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তাহার জট নড়িয়াছে আর থাকিতে পারেন না। বিধুভূষণ যখন বিদেশে ছিলেন,ভট্টাচার্য্য মহাশয় শশীভূষণের বাটী আসিতেন, যাইতেন, আহারাদি করিতেন, কিন্তু সরলাকে ডাকিয়া কোন দিন একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাঁহারা মরিয়াছেন কি জীবিত আছেন অনুসন্ধান করিয়া জানেন নাই। এখন আসিয়া চির সুহৃদের মত শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ করিতেছেন। ফর্দ্দের মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য তাঁহার নিজের প্রাপ্য তাহারি ভাগ অধিক। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে শ্রাদ্ধের দানই প্রধান অঙ্গ। এ দিগে গ্রামস্থ ভদ্র লোকেরা রসদের দিগেই অধিক যত্নবান। তাঁহাদিগের মতে কৃষ্ণনগরে ভাল ময়দা পাওয়া যায় না, কলিকাতা হইতে ময়দা ঘৃত ইত্যাদি না আনিলে ভদ্র লোকের পাতে দিবার যোগ্য লুচি হইবেক না। পূজার সময় ঘটনাটা হইয়া অনেকের পক্ষে বড় ক্ষতি হইয়াছে! হয় কিছু পরে নয় কিছু পূর্ব্বে হইলেই সুবিধা হইত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূজায় আর কোন স্থানে ব্রতী হইতে পারেন না। গ্রামের ভদ্রলোকেদেরও এক দিবসে দুই স্থানে আহার করিবার ক্ষমতা নাই। কাছারির আমালাদিগের যেমন রবিবারে কোন পর্ব্ব পড়িলে কষ্ট হয়, পুরোহিত ও গ্রামস্থ ভদ্র লোকের সরলার মৃত্যুতে সেইরূপ কষ্ট হইতে লাগিল। আহা! পুরোহিত ও ভদ্র লোক মহাশয়দিগের কি কোমল হৃদয়!

দশ দিন দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত। পালে পালে অধ্যাপক আসিতেছেন। এঁদের যখনিই কেন শ্রাদ্ধ হউক না তখনই লাভ- যেখানে নিজে না যাইতে পারেন শিষ্য পাঠাইয়া দিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। অধ্যাপক নিমন্ত্রণের ভার পুরোহিত মহাশয়ের উপরই অর্পিত হইয়া থাকে। বিধুর বাটীতেও তাহাই হইল। পুরোহিত মহাশয় এমন অধ্যাপক বাছিয়া বাছিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন যেন আবার তাহাদিগের

যজমান বাটীতে কোন 'শুভশ্রাদ্ধ' উপস্থিত হইলে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইতে পারে।

বিধুভুষণের পুরোহিত মহাশয় বড় পণ্ডিত উপস্থিত সকল অধ্যাপকই স্বীকার করিলেন। না করিলে কৃতঘ্নতা প্রকাশ হয়। অধ্যাপকেরা সকালে সকালে আহারাদি করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কার্য্য বাটীতে আসিয়া সকলেই কহিতেছেন "এখনও আমার আহ্নিক হয় নাই। প্রাতঃকালে তিন ঘণ্টা মাত্র অবকাশ পাইয়াছি বৈ ত নয়, এত অল্প সময়ে কি প্রকারে প্রত্যাহিক ক্রিয়া সমাধা হইতে পারে।" সকলে সভায় সমবেত হইলে পুরোহিত মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "আপনাদের অনুমতি হয় তো শুভ শ্রাদ্ধ আরম্ভ করা যাউক।" পুরোহিত মহাশয় ক্রিয়া মাত্রকেই "শুভ" বলিয়া জানিতেন, শুভ অন্নপ্রাসন, শুভ নামকরণ, শুভ বিবাহ, শুভ বৃক্ষোৎসর্গ, শুভ সপিণ্ডীকরণ ইত্যাদি।

সমবেত অধ্যাপকগণ। "হাঁ শুভস্য শীঘ্রং" বলিয়া শায় দিলেন।

পুরোহিত ঠাকুর আজি কিছু বেশী বেশী বিদ্যার পরিচয় দিতেছেন। আজি পণ্ডিত বলিয়া যদি খ্যাতি উঠিয়া যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার আর নিমন্ত্রণ ফাঁক যাইবেক না। পুরোহিত মহাশয় কহিলেন "তবে এখানে গঙ্গোজল আনয়ন কর।"

উপস্থিত অধ্যাপকেরা 'সাধু ২' বলিয়া উঠিলেন। "আমাদের বিদ্যারত্ন মহাশয় সংস্কৃত ব্যতিরেকে কথা বাচ্য করেন না।" পুরোহিত এর মধ্যে বিদ্যারত্ন উপাধি পাইয়াছেন

পুরোহিত আত্ম প্রশংসা শ্রবণ করিয়া আরও হেঁকে হেঁকে 'গঙ্গোজল' 'গঙ্গোজল' করিয়া চীৎকার করিতেছেন। ভাবিলেন কি কথাই বোলে ফেলিছি।

"গঙ্গোজল" প্রাণের ভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বোধ হয় ভাবিলেন "যদি এখন না যাই তা হলে হয় তো আরও একটা জঘন্য নাম দেবে।"

"গঙ্গোজল" আসিলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূর্ব্ববৎ হাঁকিয়া কহিলেন "শ্রাদ্ধাদিকারিকে লইয়া আনয়ন কর।"

শ্রাদ্ধও আরম্ভ হইল, অধ্যাপকেরাও বিচার আরম্ভ করিলেন। বিদ্যায় আর আজি কালি অধ্যাপকের ইতর বিশেষ নাই। এখনকার পেটে কত বোঝাই সয় এই লইয়া অধ্যাপকের ছোট বড় বাছা যায়। আহার বিদ্যাটা যে সহজে উপার্জ্জিত হয় তাহা নহে। যাত্রাওয়ালা যেমন 'গলাসাধে' অধ্যাপকেরা তেমনি পেট সাধেন। যত দিন পর্য্যন্ত এক গাড়ির বোঝাই না টানিতে পারেন তত দিন অধ্যাপক উপাধি পান না। সমাজ তোমাকে ধন্যবাদ! তোমারি খাতিরে এরূপ অধ্যাপকে অদ্যাপি টাকা পান।

দৈ, সন্দেশ, কদলীপত্র ইত্যাদি ভারে ভারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যতই বেলা হইতে লাগিল ততই লোক সমারোহ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ ভোজন হইল, এবং অন্যান্য লোকেও আহারাদি করিয়া গেল।

অধ্যাপকেরা অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া, লুচি ও মণ্ডা সরায় সরায় সঞ্চয় করিয়াছেন এবং যমকর্ত্তৃক কেশে গৃহীতের ন্যায় হইয়া উদরে বোঝাই চাপাইয়াছেন।

সন্ধ্যা সমাগত হইলে তাঁহারা যে যার বাসায় আসিয়া শরশয্যায় শয়ন করিলেন। বাছাদের আর উঠিবার যো নাই। যখন আহারটী চড়ান তখন পেটগুলি যে নিজের তাহা কাহারও স্মরণ থাকে না। মনে করেন যার মণ্ডা তারি পেট। সেটী যে ভ্রান্তিমূলক তাহা কেবল বাসায় আসিয়াই জানিতে পারেন। কেহ ২ গাত্র দাহতে ছটফট করিতেছেন, কেহ ২ পেটের কামড়ানিতে বিছানায় এ পীট ও পীট হইতেছেন, কেহ বা অতিরিক্ত বোঝায়ে বমী করিয়া ভার লাঘব করিতেছেন। অধ্যাপকদিগের পঞ্জিকা মতে নিমন্ত্রণের দিবস সায়ং সন্ধ্যা নাস্তি। সুতরাং আজি আর সে ভাবনা নাই।

কিন্তু শ্রাদ্ধ বাটীতে সন্ধ্যাবেলা কি হইতেছে দেখা যাউক।

যেখানে পাতা গুলা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে সেখানে দেশের কুকুর একত্রিত হইয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতেছে, এবং এক স্থানের ময়লা সাত স্থানে করিতেছে, উঠনে কাক পালে পালে কা কা করিয়া বেড়াইতেছে, ঘরের যেখানে যেখানে কোন মিষ্ট দ্রব্যাদি পড়িয়াছে সেই খানে মাছি ভ্যান ২ করিতেছে। পাতার গন্ধে, দৈ ক্ষীরের গন্ধে, সন্দেশের গন্ধে বায়ু দূষিত হইয়াছে, ঘরের মেঝেয় রাশীকৃত ধূলি জমিয়াছে, বিছানা গুলা লোকের গায়ের ময়লায় কাল হইয়া গিয়াছে, থালা ঘটী বাটীতে ঘিয়ের গন্ধ হইয়াছে। এমন পরিস্কার স্থান নাই যে একটু বসা যায়, এমন একখানি কাপড় নাই যে মলিন ও দুর্গন্ধময় হয় নাই, এমন একটী গেলাষ ঘটী নাই যাহাতে জল রাখিলে উপরে ঘী না ভাসে, সংক্ষেপে ক্রিয়া বাটী নরক সদৃশ ভয়ানক স্থান হইয়াছে। বাড়িতে কোন কাজ কর্ম্ম হইয়া গেলে যে বাটির লোকের পীড়া হয় তাহার এই কারণ। হায় কত কাল আর সমাজে এরূপ কুরীতি থাকিবেক।

শ্রাদ্ধের পর দিবস বিধুভূষণ দাদার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। প্রথমত রাগ করিয়া যান নাই কিন্তু আজি না গেলেই নয়। কি করেন? শশিভূষণ কাছারি যাইবেন বলিয়া বাটীর মধ্যে কাপড় পরিতে গিয়াছেন, বিধুও বাটির মধ্যে গেলেন। দাদাকে প্রণাম করিয়া কথা কহিবেন কিন্তু তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। শশিভূষণের চক্ষের জল দেখা দিল। বলিলেন 'বিধু বসো।'

প্রমদা দূর হইতে বিধুকে দেখিতে পাইয়া হাসিতে হাসিতে গদাধর ও বিপিনকে ডাকিয়া কহিলেন, 'ও গদাধর চন্দ্র, ও বিপিন, এই দেখ্‌সে আমাদের বাড়ী যাত্রাওয়ালা এসেছে।'

বিধুভূষণ প্রমদার কথা শুনিয়া শশিভূষণের দিকে কাতর নয়নে চাহিলেন। তদ্দ্বারা এই ভাব প্রকাশ হইল যে "আর কেন? এখনও জ্বালাতন কর্‌বে?"

শশিভূষণও কাতর নয়নে অশ্রু

বিরক্ত হইয়া বিধুভূষণের দিগে চাহিলেন। এইভাবে যেন 'আর আমার সাধ্য নাই। আমি জ্বালাতন হইয়াছি।'

বিধুভূষণ কহিলেন "দাদা যার জন্যে এত গোলযোগ সেই চলে গেল আর এখন গোলে দরকার কি?'

শশিভূষণ লজ্জিত হইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। এমন সময়ে গদাধর ও বিপিন কৈ কৈ বলিয়া প্রমদার নিকট আসিল। প্রমদা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ঘরের দিগে দেখাইয়া দিলেন। উভয়ে ঘরের মধ্যে আসিল। শশিভূষণ রাগ করিয়া গদাধরকে কহিলেন ' আবার এখানে কেন? যত বুড়ধাড়ি হচ্ছেন ততো যেন ছেলেমি বাড়ছে?'

শশিভূষণের কথা শুনিয়া উভয়েই ফিরিয়া আসিতেছে এমন সময় তিনি বিপিনকে ডাকিয়া কহিলেন " বিপিন তোমার কাকা এসেছেন প্রণাম কর।"

প্রমদা মনে করিলেন তিরস্কার তবে গদাধরকেই করা হইয়াছে। কিন্তু তখন কিছু কহিলেন না। বিধুভূষণ চলিয়া গেলে শশীভূষণও কাচারি গেলেন।

বিধুভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া পর্য্যন্ত শশিভূষণ অত্যন্ত চঞ্চল চিত্ত হইলেন। এজন্য অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজি সকালে সকালে কাছারি হইতে বাটী আসিলেন। নিজের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বোঁচকা বাক্স বাক্কা প্রস্তুত। আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসিলেন 'এ কি?' প্রমদা উত্তর চ্ছলে মুখ ঘুরাইয়া বসিলেন।

শশিভূষণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন 'এসব বাঁদা ছাঁদা প্রস্তুত যে? কেহ কোনখানে যাবে?'

এবারও উত্তর না পাইয়া শশিভূষণ বিরক্ত হইয়া কহিলেন 'আমার আর বরদস্ত হয় না। দূর হও তোমরা দূর হলেই বাঁচি।'

প্রমদা কাতরস্বরে কহিলেন "আমরা ত দূর হবই। এখন ভাই এসেছে, দুভাই সুখে সচ্ছন্দে থাক। আমরা ভেসে এসেছিলাম ভেসেই যাই।" এই বলিয়া মুখ ফিরাইয়া গদাধরের উদ্দেশে "ওগদাধর চন্দ্র? বলি আবার তুই কোথায় গেলি, পরের বাড়ী আর কতকাল থাক্‌বি? তুই তো আর পথের কাঙ্গাল না যে ভিক্ষে করে বেড়াবি। আমার ব্যাম হয়েছিল তাতেই তোর এত দুর্গতি। তা নৈলে কেনই বা তুই এখানে?"

কিন্তু গদাধরচন্দ্র না আসিয়া গদাধর চন্দ্রের জননী আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন শশিভূষণ কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়াছেন। তখন অনতিমৃদুস্বরে (অর্থাৎ যেন শশিভূষণ শুনিতে পান) কহিলেন "বাছা এখন পস্তালে হবে কি! আমি তো তখনি বলেছিলাম প্রমদা আমাদের নিয়ে যাচ্ছে, এর পর তো অপমান হয়ে আসতে হবে না। তুমি বল্লে না মা। আমার বাড়ী আমার ঘর, অপমান করবে কে? দেখ দেখি বাছা আমার কথা সত্যি হলো কিনা?"

শশীভূষণের শুনিয়া রাগে শরীর কম্পিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রমদা

উত্তর করিলেন। 'যা অদৃষ্টে ছিল তা হয়ে গেল, এখন তোমরা যাও। তোমরা তবু ভাল আছ চলে গেলে বাঁচলে। আমার তো আর সে যো নেই। আমি গয়ার পেত্নী। আমার আর উদ্ধার নেই।'

প্রমদার জননী কহিলেন "বাছা তোমার তো সৈতে হবেই। 'বেঁদে মারে সয় ভাল' তোমার হয়েছে তাই। আমি তখনি তোমার বাপকে বলেছিলাম একর্ম্মে সুখ হবে না। তিনি বড় কুলীন দেখে দিলেন আর তো কিছুই দেখ্‌লেন না।"

শশীভূষণের আর বরদস্ত হইল না। তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন। এদিগে গদাধর চন্দ্রও আসিয়া উপস্থিত হইল। গদাধরকে দেখিয়া প্রমদা করুণস্বরে কহিলেন "গদাধর চন্দ্র এখন যাও, যা হবার তা তো হয়েছে। এখন বাড়ী যাও।"

গদাধর। যখন টখন বাড়ী যাও বাড়ী যাও, বাড়ী গিয়ে খাব কি টার কি বল ডেখি।"

গদাধরের মাতা। ছিছি গদাধর ওকি?

গদাধর। ওকি? ও সট্টি কটা আর কি?

প্রমদা। খাবার জন্যে তোমার ভাবনা কি? যত দিন মা বেঁচে আছেন তত দিন আর তোমার ভাবনা নেই।

গদাধর। কেন, মা কি কাণে কলম গুঁজে চাকরী কোর্‌টে যাবে?

প্রমদা। ছিছি গদাধর্ চন্দ্র, তোমার কি একটুও জ্ঞান বুদ্ধি হলো না?

গদাধর। আবার ঐ জ্ঞান বুড্‌ডির কটা আনলে?

প্রমদা। তুই যে নেহাত বোকা।

গদা। আমি যডি বোকা হই টবে টুমি বোকার ঢাড়ি। বুড্‌ড ২ কর বড় টুমি বড বুড্‌ডমানের মেয়ে, না?

প্রমদা। ফের আবার বুদ্ধিমানের মেয়ে বল্‌ছিস?

গদা। টুমি মেয়ে না কি ছেলে?

গদাধরের জননী রাগ করিয়া গদাধরকে প্রহার করিতে গেলেন। গদাধর কহিল 'আজ কাল আর ওসব খাট্‌বে না। ছেলে বেলা যা করেছ টা করেছ। এখন এক চড় মারবে আর পাঁচ চড় খাবে।' গদাধর এইরূপ বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইল।

প্রমদা। মা ক্ষান্ত দাও ক্ষান্ত দাও। গদাধরের মাতা প্রমদার কথা শুনিয়া বসিলেন। গদাধর তদ্দর্শনে কহিলেন 'কেন এখন বসলে কেন?' এই বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

শশীভূষণ গদাধরকে অপমানের কথা বলিয়াছিলেন বলিয়াই বাটী যাইবার সজ্জা হইতেছিল। এখন সেই গদাধরই যাইতে অসম্মত। সুতরাং যাওয়া হইল না।

—:o:—

সভ্যতার ইতিহাস

—॥৩॥—

অষ্টমঅধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতে পর।

স্বভাব—২ সম্পত্তির ভাব স্বাভাবিক—৩ কৃষিই উন্নতির মূল—৪ চুরি ও সতর্কতা—৫সভ্যতার দোষ—৬ কৃষি হইতে যুদ্ধ—৭ লুটাদি হইতে অস্ত্রাদির উদ্ভাবন—৮ যুদ্ধের উপকার ৯ শান্তি ও শাসন প্রণালীর আরম্ভ—১০ রাজপদ—১১ বংশ পরম্পরা গত রাজপদ—১২উপসংহার—১৩ বাণিজ্য---১৪ ধর্ম্ম।

স্বভাব মনুষ্যের যাবতীয় ভাবই স্বাভাবিক। মানব চরিত পর্য্যালোচনা করিলে যে ঘটনা বা যে কার্য্য দৃষ্ট হয়, একমাত্র প্রকৃতিই তাহার মূল। জিতেন্দ্রিয় স্বার্থশূন্য পরম পবিত্র সাধু হইতে ঘোর স্বার্থপর কামান্ধ পশুবৎ আচারী পাষণ্ড পর্য্যন্ত সকলেই স্বভাবের অনুগামী। এক্ষণে এই প্রশ্ন হইতে পারে স্বভাব কাহাকে কহে? বস্তুর ভাব বিশেষের নাম স্বভাব। অবস্থাভেদে ইহার প্রভেদ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা একই পদার্থ। গগন মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে তাহাতে যে সূর্য্য রশ্মি পতিত হয় তাহা দারুণ নিদাঘ কালীন প্রখর সূর্য্য কীরণসহ। একই পদার্থ, কেবল মাত্র পাত্র ও অবস্থা ভেদে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। এই স্বভাব জন্য কালীনই ছিল কিন্তু উপযোগী বিষয় অভাবে জ্ঞান গোচর হয় নাই পরিণত বয়সে কোন ভাব বর্দ্ধিত হয় এবং কোন ভাব নিস্তেজ হয়, সুতরাং সে সময়ের ভাব দেখিলে কখন প্রকৃতি বৈষয়িক প্রকৃষ্ট জ্ঞান জন্মে না।

২ সম্পত্তির ভাব স্বাভাবিক প্রকৃতির অবস্থাতে কেবলমাত্র বুদ্ধি বৃত্তি অঙ্কুরিত হইতেছে এমন শিশুদিগের মধ্যে সম্পত্তিরভাব দেখাযায়। বিচার শাস্ত্রের মূল যে তিনটি নিয়ম * শিশু সে ভাব বিশিষ্ট। অনেকেই দেখিয়াছেন যখন দুইটী বালক একটী পুষ্প বা লোষ্ট্রের নিমিত্ত পরস্পর কলহ করে তাহাদিগের মধ্যে উভয়েই কহিয়া থাকে, আমি অগ্রে অবলোকন বা স্পর্শ করিয়াছি উহাতে আমার অধিকার, তুমি লইতে পারিবে না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে শারীরিক বা মানসিক শ্রমই অধিকারের মূল এবং অধিকারের ভাব নৈসর্গিক শ্রমার্জ্জিত পদার্থ কেন আমার? তোমার নহে, এরূপ প্রশ্ন কেহই জিজ্ঞাসা করে না। যে বস্তু যে শ্রম দ্বারা উপার্জ্জন করে, সে বস্তু তাহারই। নিজস্ব এইভাব স্বাভাবিক। সুতরাং মানবজাতি মধ্যে কৃষিকার্য্য হইতেই প্রকৃষ্টরূপে সম্পত্তির ভাব উদ্রিক্ত হয়।

* What I have a right to do and no one has any right to deprive me of it.

II. What I have a right to possess and no one has any right to deprive me of it.

III. What I have a right to expect from others and no one has any right to deprive me of it.

৩ কৃষিই উন্নতির মূল — যখন কেবলমাত্র মৃগয়ালব্ধ মাংস বা অযত্ন সম্ভূত ফলমূল দ্বারাই লোকে জঠর যন্ত্রণা নিবারণ করিত তখনও এভাব একেবারে ছিল না একথা আমাদিগের বক্তব্য নহে। বিনাশ্রমে কিছুই হইতে পারেনা। ফলমূল আহরণ বা মৃগয়া দ্বারা পশু হনন মধ্যে শেষোক্ত কার্য্য কঠিন ও শ্রমসাধ্য। কিন্তু এক দুই দিনের শ্রমার্জ্জিত অপেক্ষা প্রায় ৫। ৬ মাসের শ্রমসাধ্য শস্য বা ২। ৩ বৎসরের প্রতিপালিত গবাদি পশু বা ৮। ১০ দশ বৎসরের রোপিত সুরভি পরিপূর্ণ সুস্বাদফল-বৃক্ষ অবশ্যই লোকের অধিক আদর ও যত্নের ধন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আপন দ্রব্যের প্রতি যত্নই লোকের ধনশালী হইবার প্রধান কারণ। অধিক আয়বান লোকও যদি "লক্ষ্মী ছাড়া" হয় তাহা হইলে কখনই ধনশালী হইতে পারে না। এই জন্যই সাধারণ কথাতে লোকে বলিয়া থাকে "স্ত্রীভাগ্যে ধন।" বস্তুতঃ স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা গুণবতী রমণী দ্বারা আলোকিত কুটীর বাসীও অচিরে ধবল রজতনিভ অট্টালিকাবাসী রমণী বিহীন পুরুষাপেক্ষা অধিক ধনশালী হইতে পারে। তাহার কারণ প্রথমোক্ত দম্পতী যেরূপ স্বকীয় সম্পত্তির প্রতি যত্নশীল হইবে, শেষোক্ত লোক কখনই তাহার দশমাংশও প্রদর্শন করিতে পারিবে না। এই কারণে কৃষিকার্য্যারম্ভ অবধি লোকে ধনশালী হইতে লাগিল এবং অধিক শ্রমের ধন সম্বন্ধে মিতব্যয়ী হইয়া উঠিল।

৪ চুরি ও প্রসতর্কতা — যেমন একদিকে কৃষি প্রযুক্ত ধন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অপরদিকে জীবিকা নির্ব্বাহ অপেক্ষাকৃত আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিল। একথা কখনই সম্ভবপর নহে যে সকল লোকেরই শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু জঠরানল জ্বলিয়া উঠিলে সকলেই আহারক্ষম। শ্রম বিমুখতা প্রযুক্ত গৃহে আহার্য্য নাই অথচ দগ্ধোদর মানে না এস্থলে বলদ্বারা বা গুপ্তভাবে অপরের দ্রব্যাদি অপহরণ স্বাভাবিক। এই কথায় কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে কৃষির পূর্ব্বে কি এরূপ অবস্থা ছিল না? আমরা ইহার উত্তর স্থলে বলিতেছি যে চুরি ও বল প্রয়োগ পূর্ব্বেও ছিল কিন্তু তৎকালে জীবনোপায় তাদৃশ ক্লেশ সাধ্য না থাকায় অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে ছিল। বাস্তবিক মানব সমাজ যতই সভ্যতাতে উন্নত হইতেছে, ততই জীবিকা নির্ব্বাহ ক্লেশ সাধ্য হইয়া উঠিতেছে; সুতরাং উদরান্নের জন্য লোকে ততই দুষ্কর্ম্মে রত হইতেছে। এই জন্য অনেক সভ্য সমাজে এরূপ পাপাচরণ শ্রবণ করা যায় যাহা অসভ্যেরা ভ্রমেও কল্পনা করে নাই। এই জন্যই আধুনিক সভ্যতম ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনেক মধ্যবিত্ত লোক জীবিকা নির্ব্বাহের সুলভ পন্থা না দেখিলে স্ত্রীগ্রহণে এবং আমরণ চির কৌমার্য্যাবস্থায় অবস্থিতি করে। এবং এই জন্যই ইংলণ্ডীয় সম্বাদপত্র সমূহে অনেক শিশু হননের কথা শুনা যায়।

৫ সভ্যতার দোষ। পক্ষান্তরে বঙ্গদেশের পল্লীগ্রাম বিশেষে গমন কর, দেখিতে পাইবেন যেন পুনরায় আদিম কাল উপস্থিত। সভ্যতা লোকের ঈদৃশ অভাবাবলী বৃদ্ধি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ সমধিক ক্লেশসাধ্য করে নাই এবং তন্নিমিত্তই লোকে সর্ব্বস্বপণ, অপরে ঋণ গ্রহণ করিয়াও, প্রথমে বিবাহিত হয়। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য যে সভ্যতাতে উন্নত হওয়ায় ক্রমশঃ পাপ স্রোতঃ প্রবল হইতেছে বলিয়া কি উহা প্রার্থনীয় নহে? একথার উত্তর স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে প্রত্যেক বস্তুর দুই দিক্ আছে। একেবারে মন্দ অথবা ভাল জগতে কদাপি দৃষ্ট হয় না। যে সভ্যতা মানব জাতির ভূষণ ও গৌরবের এক মাত্র মূলাধার, তাহাই পাপের প্রবর্ত্তক। আবার সেই পাপই উন্নতি সুতরাং ধর্ম্মের নিয়ামক।

৬ কৃষি হইতে যুদ্ধ। কৃষি হইতে কালে অপহরণাদি পাপাচরণ সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তন্নিবারণার্থ যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হইতে লাগিল। একমাত্র সতর্কতাই চুরির নিবারক, সুতরাং চুরির আরম্ভ অবধি লোকে সতর্কতা শিক্ষা করিলে এবং কাল সহকারে উহা অভ্যস্ত হইয়া প্রকৃতিগত হইলে কৃষি অবধি যাবতীয় কার্য্য অধিকতর উৎকৃষ্ট রূপে নির্ব্বাহ পাইতে লাগিল। এক চুরিই কত উপকারের নিদান।

৭ লুটাদি হইতে অস্ত্রাদির উদ্ভা- লুটতরাজ ও ডাকাইতি, বল ও ক্ষমতা সাপেক্ষ, সুতরাং যে সকল লোক সেই পথের পথিক হইতে লাগিল, তাহারা কিরূপে অধিক বলশালী হইবে, নিয়তই এই চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিল। পক্ষান্তরে কেবল মাত্র অঙ্গ ব্যতীত অস্ত্রাদি ধারণ করিলে এই সকল কার্য্য আরও সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে এই জন্য প্রথমতঃ সামান্য লোষ্ট্র, তৎপর লোষ্ট্রের সম্মুখ চিকণ করা তৎপর বল্লম ও ধনুর্ব্বাণ আদির উদ্ভাবন হইতে লাগিল।

৮ যুদ্ধের উপকার। ক্রমশঃ অত্যাচারী ডাকাইতদিগের এইরূপ অনিষ্টাচরণ দেখিয়া সকল লোকেই তন্নিবারণার্থ প্রয়াস পাইতে লাগিল, এবং ডাকাইতেরাও কিসে সমধিক বলশালী হইয়া ঐ সমুদায় প্রতিবন্ধক সত্তেও আপনাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে তন্নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিল। এইটী যুদ্ধ বিগ্রহাদি ও অস্ত্র শস্ত্র উদ্ভাবনের পূর্ব্ব লক্ষণ। সত্য বটে, যুদ্ধ দ্বারা মানব জাতির সমধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। হরিতবর্ণ শস্য ক্ষেত্র কখন নর শোণিতে লোহিত বর্ণ হইবে, বিধাতার এরূপ ইচ্ছা নহে। বল ও বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্য পরস্পর পরস্পরের ও আপনার হিত সাধন করিবে, কখন অন্যকে উৎপীড়ন করিবে না। যুদ্ধের দ্বারা কতক গুলি বিশেষ উপকারও আছে সুপ্রসিদ্ধ কবি টেনিসন বলেন বৃক্ষের ন্যায় মানব সমাজেরও উন্নতি হেতু এক এক বার শাখা প্রশাখা কর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হয়। বস্তুত যুদ্ধের উপায় উদ্ভাবন জন্য মনোবৃত্তি পরি-

চালন ও যুদ্ধে শারীরিক শ্রম, সতর্ক হওয়া, দূর্গ নির্ম্মাণ, সেতুবন্ধন, পথ ও রণ পোত প্রস্তুত প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য যে একমাত্র যুদ্ধ হেতু বিশেষ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে একথাতে অণু-মাত্র সন্দেহ নাই।

৯ শান্তি ও শাসন প্রণালী আরম্ভ।

যখন মানব সমাজে এই রূপ যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হইল, তৎসহ আরও কতক গুলি উন্নতি লক্ষিত হইতে থাকিল। শান্তি লোকের প্রকৃতি সিদ্ধ। যুদ্ধ কার্য্যে কিয়দ্দিবস ব্যাপৃত থাকিলেই লোকের ক্লান্তি বোধ হয়। এই জন্য কেহ উৎপীড়িত হইলে কেবল মাত্র যুদ্ধ ও প্রতিহিংসা দ্বারা তন্নিবারণে চেষ্টিত না হইয়া উভয়ে আপনাদিগের ঐক্যমতে বুদ্ধি বৃত্তিদ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু মনুষ্য স্বার্থপরজীব, সর্ব্বদাই আপনার স্বার্থ অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত, সুতরাং স্বার্থ যে বিচার শক্তির ব্যাঘাত করিবে, আশ্চর্য্য কি? এইজন্য কালে নালিশ, গ্রাম্য পঞ্চাইত বা পেট্রিয়ারকিক্যাল কর্ম্ম গবর্ণমেণ্ট (Patriarchical form of Govt.) আরম্ভ হইল। বস্তুতঃ বিচার ও ন্যায় পরতার এই সূত্রপাত। অদ্যাবধি আফ্রিকার কোন কোন স্থানে রাজা নাই। গ্রাম্য পঞ্চাইতে সমুদায় বিবাদ বিসম্বাদ ভঞ্জন করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের বিচার পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা ইহার উদাহরণ দেখিতে পাই। পঞ্চাইত প্রায় সকল বিষয়ের কর্ত্তা। ভাল হউক আর মন্দ হউক পঞ্চাইত ব্যতীত কোন কার্য্যই হইবার উপায় নাই। সামান্য লোকে রাজা বা ভূম্যধিকারীকে চিনে না। যদিও ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে পঞ্চাইত পদ্ধতি অনেক হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু ইহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। পঞ্চাইতেরা অন্যান্য সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব হারাইয়া জাতি সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব রাখিয়াছেন। ইত্যাকার কারণে বোধ হয় এইরূপ পঞ্চাইত বা সালিসী পদ্ধতিই বিচার কার্য্যের প্রথম সোপান। কালে হয় ত এই পঞ্চাইত দিগের মধ্যে কেহ প্রভুত্ব মদে মত্ত হইয়া আপন অধিকার বিস্তার করিল এবং লোকে তাহাকেই ভয় করিয়া তাহারই অনুসরণ করিল। এই রাজত্ব পদ সৃষ্টির প্রথম আরম্ভ। অধিক লোক দ্বারা বিচার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ না হওয়ায় অথবা পঞ্চাইতদিগের মধ্যেই একজন বিশেষ প্রভাবশালী হওয়ায় অপর সকলে তাঁহার অপেক্ষা হীনবল থাকায়, প্রথমতঃ ৫।৬ জন পঞ্চাইতের পরিবর্ত্তে একজন কিম্বা তন্মধ্যে একজন অধ্যক্ষ হইল। অধ্যক্ষ ব্যতীত সমক্ষমবান্ ২।৪ জন দ্বারা কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় না। বর্ত্তমান সুসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও কোন সভাতে অনেক ব্যক্তি আহত হইলে যদি সকলে সমান ক্ষমতাশালী ও বুদ্ধিমান হয়, তাহা হইলেও তন্মধ্যে একজনকে অধ্যক্ষ পদে বরণ করিতে দেখা যায়। এবং সময়ে ২ তর্ক বিতর্ক বা বল দ্বারা কোন বিষয়ের শেষ মীমাংসা না হওয়ায় চিটি বা অন্য কোন রূপ দৈবের উপর নির্ভর করিয়া তত্তৎ বিষয় মীমাংসিত হয়। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে একজন সাপেক্ষ ব্যতীত একমাত্র বুদ্ধি ও মনুষ্যের স্বার্থযুক্ত ন্যায়পরতা দ্বারা

সকল বিষয়ের শেষ সিদ্ধান্ত হইবার উপায় নাই।

১০ রাজপদ এই সমস্ত কারণ হইতে কালে প্রথমতঃ রাজা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানের পদ সৃষ্টি হইয়াছিল। কোন্ সময়ে কোন্ জাতির মধ্যে এই পদ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা বলা যায় না, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে জাতি প্রথম সভ্যপদবিতে অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যেই সর্ব্বাগ্রে এইপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ রাজপদ বংশ পরম্পরাগত ছিল কিনা এবিষয়ের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অনুমান দ্বারা বোধ হয় যে পুর্ব্বে রাজপদ বংশ পরম্পরাগত ছিল না। বোধ হয় যে ব্যক্তি সকলের মধ্যে সর্ব্বাংশে বিশেষ ক্ষমতাশালী বা বলবান হইত সেই সর্ব্বপ্রধান রাজারূপে গণ্য হইত। কালে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার নিম্ন স্থানীয় লোক ঐপদে অভিষিক্ত হইত। কারণ আপনার বল দ্বারা বা বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শনে অন্যের সম্পত্তিতে লোকে রাজপদ প্রাপ্ত হইত, কিন্তু তাহার সন্তানের ঐ সকল গুণ তাহার সদৃশ থাকা সকল স্থলে সম্ভবপর নহে।

১১ বংশ পরম্পরা গত রাজপদ কালে কোথা হইতে বংশ পরম্পরাগত রাজপদ উপস্থিত হইল, তাহাও স্থির বলা যায় না। বোধ হয় ক্ষমবান্ পিতার দৃষ্টান্তে সন্তানের অনেক অংশে তাদৃশ গুণবান হওয়া এবং ক্ষমবান্ পিতার দ্বারা জাতি সাধারণে বিশেষরূপে উপকৃত হইয়া তাহার নিকট নিরতিশয় কৃতজ্ঞতাপাশেবদ্ধ থাকায় তদীয় সন্তানকে নামে রাজা করিয়া অন্য লোক দ্বারা তৎকার্য্য নির্ব্বাহই বংশ পরম্পরা গত রাজপদ সৃষ্টির একমাত্র নিদান।

১২ উপসংহার কালে এইরূপ রাজপদ হইতে সমাজ মধ্যে অনেকরূপ অত্যাচার উপস্থিত হইয়াছিল এবং তন্নিবারণার্থ প্রজাসমূহ অনেক চেষ্টা ও উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহা হইতে অনেকরূপ উন্নতি হইতে লাগিল।

আমরা এপর্য্যন্ত সভ্যতার ইতিহাসের যে যে বিষয় বর্ণন করিলাম, তাহা কেবল উন্নতির প্রথম সোপান মাত্র, বাস্তবিক সভ্যতার মূল কারণ জ্ঞানানুশীলন ও বুদ্ধি পরিমার্জ্জন। মনুষ্য মার্জ্জিত বুদ্ধিপ্রভাবে কালে সমুদয় নূতন সত্য উদ্ভাবন ও তজ্জনিত আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে লাগিল।

কালে এই বুদ্ধি পরিচালন হইতে মানবসমাজ কিরূপে উন্নত হইতে লাগিল তদ্বিষয় আমরা সভ্যতার ইতিহাসের দ্বিতীয় পুস্তকে অনুসন্ধান করিব।

বাণিজ্য।

বাণিজ্য জীবন রক্ষার্থে যে সমুদয় বস্তুর প্রয়োজন প্রত্যেকের সেই সমুদয় স্বহস্তে প্রস্তুত করা সহজ নহে। অহোরহ আমরা কৃষিজাত বা শিল্পজাত বস্তু ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহার একটি উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে হইলে কত শিক্ষার প্রয়োজন; এইক্ষণেও

কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে এই ব্যবহার দেখা যায় যে তাহাদের সাংসারিক সমুদয় উপকরণ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া লয়; এইরূপ প্রণালীতে তাহাদের সাংসারিক ব্যাপার বিনা বাণিজ্যে নির্ব্বাহ হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল প্রয়োজনোপযোগী সামান্য বস্তু সকল প্রস্তুত করিতে সমস্ত পরিবারকে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, বস্তু সকল তেমন উত্তম হয় না, অধিকন্তু সাংসারিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেই সমুদয় সময় অতিবাহিত হয়। এদিকে জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনার কিছুমাত্র সময় থাকে না, পক্ষান্তরে ব্যক্তি বিশেষ ব্যবসা বিশেষে বিযুক্ত থাকিলে তদ্ব্যবসায়ের প্রচুর উন্নতি হইতে পারে, আনুষাঙ্গিক সাংসারিক উন্নতিও বিলক্ষণ হইয়া উঠে, এতদ্বিষয় আমরা চতুর্থ অধ্যায় সবিস্তার বলিয়াছি।

বোধ হয় আদিম কাল হইতেই মানবজাতি দ্রব্য বিনিময় করিত, এই বিনিময় প্রথা দ্বারাই লোকে শ্রম বিভাগের উপকারিতা অনুভব করে। যখন মানব সমাজ রাজা কৃষক শিল্পী প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইল তৎকালে বিনিময় প্রথা দ্বারা লোকে বিলক্ষণ সুবিধা বুঝিত। এই বিনিময় প্রথা পরিশেষে বহু স্থান ব্যাপী হইয়া উঠিল। এইরূপে ক্রমে ভিন্ন দেশীয় লোকের সহিত দ্রব্য বিনিময় বা বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়।

ভিন্ন দেশীয় বাণিজ্যের দ্বিতীয় কারণ এই যে; সকল দেশে সকল শস্য জন্মে না এবং সকল দেশীয় লোক সকল প্রকার শিল্প কর্ম্মেই বিশেষ পটুতা লাভে সমর্থ হয় না। বীর প্রকৃতি সবল লোকের রুচি ও দুর্ব্বল হীনসাহস লোকের রুচি একরূপ হইবার নহে সুতরাং দেশ বিশেষে শিল্প বিশেষের যে বিশেষ উন্নতি হইবে তাহা সহজেই অনুমান হইতে পারে; অত্যল্প শারীরিক শ্রম সাধ্য সূচি কর্ম্ম অথবা তাদৃশ অপর ব্যবসা সহিষ্ণু বাঙ্গালী বা উৎকল বাসী দ্বারা যেমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে বলবীর্য্য সম্পন্ন উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের দ্বারা ততদূর হইতে পারে না। আবার কঠোর শারীরিক বল সাধ্য কার্য্য দুর্ব্বল বাঙ্গালীর দ্বারা হইবার বিষয় নহে। এই কারণেই পৃথিবীতে দেশ বিশেষের লোকেরা শিল্প বিশেষে পারদর্শী হইয়াছিল।

যখন মানব সমাজে শ্রম বিভাগ প্রকৃষ্টরূপে হইয়াছিল তৎকাল হইতেই লোকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিল, আহার ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির নিমিত্ত পরিশ্রম করিয়াও অনেক সময় থাকিত। এইরূপে সময় পাওয়াতেই লোকের মনে বিলাস বাসনা উপস্থিত হয় এবং এই বিলাস সামগ্রীর উৎপাদন নিমিত্ত লোক বিশেষে ব্যবসা বিশেষ অবলম্বন করিল।

স্থান বিশেষে বস্তু বিশেষের উৎপাদন এবং কোন কোন দেশীয় লোকের শিল্প বিশেষে বিশেষ পারদর্শিতা হওয়াতে দেশান্তর বাসীদের তাহা প্রাপ্ত্যর্থে ঐ সকল দেশে উপস্থিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে; ফলতঃ এইরূপেই এক দেশীয় লোকের সহিত অপর দেশীয় লোকের বাণিজ্য বা দ্রব্য বিনিময় আরম্ভ হয়।

বোধ হয় মানবগণ প্রথমে পণ্যদ্রব্য স্বয়ং বহন করিয়াই বিনিময় কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এই সময়ে তাহাদের বাণিজ্যের সীমাও বহুদূর ব্যাপিনী ছিল না। কালে যখন জনসমাজে পশুর ব্যবহার শিক্ষা করিয়া ছিল তৎকালেই লোকে কিয়ৎ-পরিমাণে দূর দেশে যাতায়াত করিতে লাগিল। ফলতঃ উষ্ট্র, গবাদি ভারবাহী পশুদিগের ব্যবহার অবগত হইলেই প্রকৃতরূপে বাণিজ্যের সোপান আরম্ভ হয়।

যখন মনুষ্যগণ পরস্পর দ্রব্য বিনিময় দ্বারা সাংসারিক বিশেষ সুবিধা দেখিল, তখন পশু-বাহিত দ্রব্যজাত তাহাদের নিকট যৎসামান্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ নদী সকল অতিক্রম করিয়া অপর কূলে উত্তীর্ণ হইয়া দ্রব্যাদি বিনিময় পশুদ্বারা হইয়া উঠে না; এই সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শীঘ্রই লোকে যত্ন করিতে লাগিল, এই যত্নের বলেই তরণী সকলের সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রথম হইতেই যে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট তরণী সকলের সৃষ্টি হয় নাই একথা বলা বাহুল্য। লোকে প্রথমতঃ বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ড অথবা ভেলা দ্বারা নদী পার হইত। কালে কালে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের অভ্যন্তর খুঁদিয়া কোষ নৌকা প্রস্তুত হইত। এই সকল কোষ পশ্বাদি অপেক্ষা অধিক দ্রব্য বহন করিত বটে, কিন্তু মানব জাতির যে আশা বৃত্তি বর্ত্তমান সময়ের বৃহৎকায় অর্ণবপোত সকলে সম্যক্ চরিতার্থ করিতে পারে নাই, তাহা কি এই সকল সামান্য কোষ নৌকা দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারে? লোকে যখন দেখিতে পাইল যে এই সকল ক্ষুদ্র নৌকা দ্বারা তাহাদের অভিলাষানুরূপ দ্রব্য বহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না; বৃহৎ বৃহৎ নদী পার অথবা সমুদ্র যাত্রা সম্পন্ন হয় না; তখন উপায়ান্তর অবলম্বন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। কালে এই প্রয়োজনেই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নৌকা সকল প্রস্তুত হইল।

বোধ হয় প্রথমতঃ লোকে লগী দ্বারাই নৌকা পরিচালন করিত। কিন্তু যে সকল স্থানে জলের গভীরতা অধিক তথায় লগী কার্য্যকরী হয় না, এই নিমিত্তই পরে ক্ষেপণী ও কর্ণ প্রভৃতি নৌকা চালনোপযোগী পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ হয়, অবশেষে বায়ুর সাহায্যে নৌকা চালান অর্থাৎ পালের ব্যবহার হইয়াছিল।

সমুদ্রযাত্রা। লোকে যখন ক্ষেপণী কর্ণ ও পালের ব্যবহার উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়া ছিল তখনই সমুদ্র যাত্রা প্রথম আরম্ভ হয়। প্রথমই, এইক্ষণকার ন্যায় বৃহৎ অর্ণবপোত ব্যবহার হইত না, কিন্তু সমুদ্র যাত্রার্থ যে সকল নৌকা ব্যবহার হইত তাহা নিতান্ত সামান্য ছিল এমন বোধ হয় না। এক্ষণে চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে সামুদ্রিক বাণিজ্যার্থ যে সকল সুলুক বা জাহাজ ব্যবহার হয়, বোধ হয় পূর্ব্ব কালের লোকেরা এতাদৃশ কোন জলযান ব্যবহার করিত। এইরূপেই কাল প্রভাবে বর্ত্তমান সময়ের অর্ণব পোত সকলের ব্যবহার হইয়া আসিল।

এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে বা-

ণিজ্য আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে লোকে পরস্পর দ্রব্য বিনিময়ের নিমিত্তই বাণিজ্যের আরম্ভ করে কিন্তু এই বাণিজ্য দ্বারা কেবল দ্রব্য বিনিময় মাত্র উপকার সাধিত হয় নাই, বিদ্যা বুদ্ধিরও অনেক উন্নতি হইয়া ছিল। ফলতঃ রাজ শাসন, ধর্ম্মনীতি, চিকিৎসা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উন্নতির মূল বাণিজ্যকে বলিলে অত্যুক্তি হয়না। নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট বিদ্যা বুদ্ধির সমালোচনা দেখিলে, স্বভাবতঃই তাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে এবং ঐ সকল বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন আচরণ দৃষ্টে স্বকীয় আচরণ সংশোধনে প্রবৃত্তি হওয়াও অসম্ভব নহে। এইরূপেই ভারতবর্ষজাত গণিত বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র গ্রীকজাতি দ্বারা ইউরোপে নীত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বণিকবৃত্তিপরায়ণ দেশে কখন নিতান্ত স্বেচ্ছাচার রাজ শাসন চলিতে পারে না, বাণিজ্যের দ্বারা শীঘ্রই জন সাধারণ ধনী হইয়া উঠে, নানা দেশ ভ্রমণ দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তি মার্জ্জিত ও সাহসের বৃদ্ধি হয় সুতরাং এই সকল প্রজার উপর রাজা নিতান্ত স্বেচ্ছাচার ব্যবহার করিতে পারেন না, অনেক বিষয়ে রাজাকে প্রজা সকলের মতবাদ অপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হয়। আসিয়া খণ্ডের পূর্ব্বাপর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাতকরিলে এইখণ্ডে বাণিজ্য পরায়ণ দেশ যেমন অল্প, স্বেচ্ছাচারি রাজত্বের সংখ্যাও তত অধিক। কিন্তু এই স্বেচ্ছাচার পরায়ণ রাজ তন্ত্রের দেশে বাস করিয়া প্রাচীন ফিনিসীয় গণ এক মাত্র বণিক বৃত্তি পরায়ণ হইয়া নিজ দেশে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপন করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের শাসন প্রণালী যে এত উৎকৃষ্ট, বাণিজ্য যে তাহার অন্যতর কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। এই বাণিজ্য সৌকার্য্যার্থেই মুদ্রা প্রচলিত হয়।

ধর্ম্ম।

এ পর্য্যন্ত আমরা মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বর্ণন করিয়াছি তদ্দ্বারা মনুষ্য সমাজ কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা কথঞ্চিৎ অনুভব হইবে। পরন্তু মনুষ্যের প্রধান একটী স্বভাবের বিষয় এপর্য্যন্ত উল্লেখ করা যায় নাই। যে স্বভাব প্রভাবে মনুষ্য পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, যে সদ্বৃত্তির দ্বারা পৃথিবীর সমুদয় দুঃখ রাশিকে তৃণজ্ঞান করিয়া মনুষ্যের আত্মা অপূর্ব্ব শান্তি সম্ভোগ করিয়া থাকে, যাহার প্রভাবে মনুষ্য এই পাপময় পৃথিবীতে থাকিয়াও স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন, এইক্ষণে সেই প্রবৃত্তির—ধর্ম্ম প্রবৃত্তির বর্ণন করা যাইতেছে।

কৃতজ্ঞতার ভাব মনুষ্যের মনে স্বাভাবিক এবং যে স্থলে আত্মসুখ সাধন স্বকীয় ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়, সেই স্থলে অপরের সাহায্যাবলম্বন করাও মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ প্রবৃত্তি।

জল, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, প্রভৃতির অনির্ব্বচনীয়, উপকারিতা,

অনিবার্য্য শক্তি, ও অদ্ভুত তেজস্বিতা দৃষ্টে আদিম নরগণ যে

কাত উপেতি মনসো বরায়।
ভুরদাগ্ন শংতমা কামনীয়া॥ (১)

ইত্যাদি স্তুতিপাঠ করিবেম আশ্চর্য্য কি।

আদিম সময়ে গৃহাদি বিরহিত মানবগণ যখন অমানিশির স্চিভেদ্য অন্ধকার আবৃত হইতেন, যখন অন্ধকারময়ী রজনীতে ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণের আক্রমণ ভয়ে বৃক্ষশাখা বা ভূমি গর্ভ আশ্রয় করিতেন; তৎকালে প্রভাত সময়ে সূর্য্যের সৌম্যমূর্ত্তি সন্দর্শনে বীতভয় হইয়া যে তাহাদের সরলমন ভক্তিরসে আদ্র হইবে তাহার সন্দেহ কি। বিশেষতঃ বহুদূরস্থিত সূর্য্যে এরূপ তেজস্বিতা উপকারিতা সামান্য বিস্ময়াবহ নহে। এই সকল কারণেই প্রাচীনজাতি মাত্রেই সূর্য্য, অগ্নি জলবায়ু প্রভৃতির উপাসনা করিতেন। ঋগ্বেদ এবং জেন্দাভেসতা অপেক্ষা প্রাচীনগ্রন্থ বোধ হয় জগতে অতি বিরল অথবা নাই। এই দুই গ্রন্থ পাঠ করিলেই আমাদের উক্তিতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যদিও পরকালের ভাব লোকের আত্ম প্রত্যয় সিদ্ধ তথাপি আলোচনা ব্যতীত এই ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে না। আমরা নিতান্ত আদিম সময়ের যে সকল গ্রন্থ পাই প্রায় সকল স্থলেই দেখা যায় তৎকালীন মনুষ্যগণ সাংসারিক উপকার কামনায়ই উপাসনা করিতেন। (১)

কিন্তু মনুষ্যদিগকে বহুকাল এই অবস্থায় থাকিতে হয় নাই; রোগ, শোক, মৃত্যু প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ পরিদর্শন দ্বারা স্বভাবতঃই লোকের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই বৈরাগ্য হইতেই লোকের মনে পরকালের ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তৎকালে এই জড়োপাসনাই প্রচলিত ছিল, এই সকল জড়পদার্থের নিকট তাহারা ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখের নিমিত্ত প্রার্থনা করিত।

কিন্তু পরকালের ভাব উপস্থিত হইলেও আত্মার অজড়ত্ব বিষয়ে আদিম নরগণ বহুকাল অনভিজ্ঞ ছিলেন, তৎকালে লোকে বোধ হয় আত্মাকে জ্যোতি অথবা বায়ুবৎ কোন পদার্থের ন্যায় কল্পনা করিতেন। প্রাণবায়ু প্রভৃতি শব্দ দ্বারা এটি বিলক্ষণ অনুভব হয়। মৃত ব্যক্তির

(১) হে অগ্নি! আমাদের উপর তোমার মনকে সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত কি প্রকার প্রত্যুদ্গমন করিতে হইবে। কীদৃশ স্তুতি তোমার প্রীতিকর।

(১) অবস্তিরগ্নে অবতো নৃভির্নৃন্ বীরৈর্ব্বীরান্নুয়াম ত্বোতাঃ। ঈশানাসঃ পিতৃবিত্তস্য রায়ো বিস্নরয়ঃ শতহিমা নো অশুঃ।

হে অগ্নি আমরা যেন তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অশ্বদ্বারা শত্রুদিগের অশ্ব, যোদ্ধাদ্বারা শত্রুদিগের যোদ্ধা এবং পুত্র দ্বারা শত্রুদিগের পুত্রদিগকে সংহার করিতে পারি। আমাদের পুত্রেরা যেন পৈতৃক ধনের স্বামী, বিদ্বান ও শতায় হয়। ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল দ্বাদশানুবাক ৯ শ্লোক।

উদ্দেশে পিণ্ডদান, তাহার প্রিয়তম ভক্ষ্য তদুদ্দেশে যাজকদিগকে ভোজন করান প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপও এই বিশ্বাস হইতেই সমুদ্ভব হইয়াছে।

ইহার পরেই প্রকৃত পক্ষে আত্মজ্ঞান ও পরমাত্মতত্ত্ব মানব সমাজে প্রচারিত হয়। সমাজ যখন ক্রমে উন্নত হইতে ছিল, যখন মানবগণ সাংসারিক কার্য্যাবসানে অবকাশ পাইয়া পরমার্থ তত্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, যখন একমাত্র ভয়াভিভূত না হইয়াও ভক্তি ও প্রীতি পূর্ব্বক উপাসনা করা কর্ত্তব্য এটি লোকের বিশ্বাস ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল, তৎকালেই আত্মতত্ত্ব মানব মনে সমুদিত হইয়াছিল। ফলতঃ স্বাভাবিক কার্য্য কারণ ভাব কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোচনা সহযোগে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া, অচিন্ত্য অদ্বিতীয়, পরম কারণ পরমেশ্বরের প্রকৃত সত্ত্বা পৃথিবীতে প্রচারিত করিল। (১)

ইতি প্রথম খণ্ড।

---

(১) এই বিষয় দ্বিতীয় খণ্ডে মহান্ ব্যক্তিদিগের জীবন চরিত লিখন সময়ে বিশেষরূপে সমালোচিত হইবে।

Registered No. 109.

বিজ্ঞাপন।

১। জ্ঞানাঙ্কুরের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাসুল সহ ২।৷০ টাকা; প্রতি সংখ্যা।০।

২। যাঁহারা এই পত্রের গ্রাহকশ্রেণিভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা রাজসাহী বোয়ালিয়ায় আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

৩। কলিকাতায় যিনি গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ৮৮ নং চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন' শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়কে পত্র লিখিবেন এবং তাঁহারই দস্তখত রসীদে মূল্য দিবেন।

৪। ছাত্রদিগের পক্ষীয় বিশেষ নিয়ম আমরা উঠাইয়া দিয়াছি। যে কএক জনকে পূর্ব্বে পত্র দেওয়া হইয়াছে, কেবল তাঁহারাই পাইবেন।

রাজসাহী বোয়ালিয়া
জ্ঞানাঙ্কুর পত্রালয়।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস
সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

যদি কেহ কোন সংখ্যক জ্ঞানাঙ্কুর নিয়মিত রূপে প্রাপ্ত না হন, তবে তিনি আমাকে পত্র লিখিবেন।

৮৮নং চাঁপাতলা
সেকেণ্ড লেন,
কলিকাতা।

শ্রী রজণীকান্ত
গঙ্গোপাধ্যায়।

কবিতা কুসুম মালা।

কবিতা কুসুম মালা। মূল্য।৵০ আনা। বিদেশে পাঠাইতে হইলে প্রতি ২ খণ্ডে অতিরিক্ত ডাক মাশুল ✓০ আনা লাগে। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী, ভারত যন্ত্র ৮৩ নং যোড়াশাঁকো ও মুর্শিদাবাদ সত্যরত্ন যন্ত্র কাকিনীয়া [illegible] র শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়ের নিকট উক্ত পুস্তক প্রাপ্তব্য।

স্মৃতিতত্ত্ব

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত। মূল কাশীমবাজার রাজধানীর সভাপণ্ডিত রমাপতি তর্কভূষণ কৃত অনুবাদ উভয়ই বঙ্গাক্ষরে প্রতি মাসে বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্র হইতে৮০পৃষ্ঠা করিয়া প্রকাশ হইবে। নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে স্বাক্ষরকারী মধ্যে গণ্য হইবেন। স্বাক্ষরকারীর সংখ্যার অতিরিক্ত পুস্তক হইবে না। মূল্যের নিয়ম যথা — মূল্য ও অনুবাদ একত্রে ৮০ পৃষ্ঠা ১২ সংখ্যা

	বার্ষিক মূল্য	ডাকমাশুল
	৬	।৵
কেবল মূল ৪০ পৃষ্ঠা	৩	।৵
কেবল অনুবাদ ৪০ পৃষ্ঠা	৩	।৵

সানুবাদ স্মৃতিতত্ত্ব প্রকাশক
বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্র।

শিল্প বিদ্যালয়।

রাজসাহী বোয়ালিয়াতে একটী শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপন হইবার প্রস্তাব হইতেছে। ছুতার খলিফা ঘড়ি মেরামত কারী প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবেক। এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ আগামীতে প্রকাশ করা যাইবেক।